

শ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতেরেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।	বৈশাখ।	১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

ওঁ তৎসত্।

মঙ্গলাচরণ।

—•:০:•—

ওঁ শান্তিঃ।

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতং, আবিরাবীর্ম্ম এধি, বেদস্য ম অণীস্থঃ শ্রুতম্মে মাপ্রহাসীরনেনাধীতেন অহোরাত্রান্ সন্দধামি, ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারং। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ওঁ হরিঃ।

জগৎ যাঁহার করুণাছায়ায় লালিত, পালিত, সঞ্জীবিত-সম্বর্দ্ধিত, সেই মহামহিম পরমেশ্বরের চরণকমলে প্রণিপাত করি। জীব-জীবনের মানদণ্ডস্বরূপ পরমপবিত্র, মহৎ হইত মহীয়ান, গুরু হইতেও গরীয়ান্‌'ধর্ম্ম'কে নমস্কার করি। পরমারাধ্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, বাক্য যেন অকপটতা অবলম্বন করিতে পারে। মনে যে সত্যতত্ত্ব যেরূপে প্রতিভাত হয়, বাক্যও যেন তাহাতেই পর্য্যবসিত হয়; মনের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, বাক্য "চৌর্য্যবলে" যেন তাহার অতিরিক্ত কিছুই সংগ্রহ করে না। সত্য যেন আমার নিকট স্বরূপে আবির্ভূত

হয়। যেন জ্ঞানপদ সত্য অধ্যয়নেই দিন-যামিনী যাপন করিতে পারি। সত্যের দ্বার যেন সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত থাকে। এই অতীত-শ্রুতসত্য যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না বা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না। সত্য বলিব, সত্য বলিব। সত্যই জীবনের একমাত্র শান্তি। সত্য বর্ষ্মাকে রক্ষা করুন। সত্য-স্বরূপ ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

বর্ষপ্রারম্ভে।

পুরাতন বর্ষের অবসান। শত আদর-অভ্যর্থনায় দৃক্‌পাত করিল না. কত ক্রন্দন, কত মর্ম্মপীড়াপ্রকাশ, কিছুই শুনিল না; নীরবে জগতের চ'খে ধূলি দিয়া পুরাতন-বর্ষ মহাকালের বিরামমন্দিরে অস্তমিত হইল। বর্ষ গেল বটে, কিন্তু প্রাণের জ্বালা, মনের বেদনা, চিত্তের অশান্তি, সংসারের উপদ্রব, কিছুই লইয়া গেল না! পতিবিরহিণী রমণীর আকুল আর্ত্তনাদ, পুত্রহারা মাতার হৃদয়ের তীব্র অনল, বন্ধুবিয়োগ-স্বজনের সুতপ্ত অশ্রুবারি, রুগ্নব্যক্তির [illegible] দাহ, যেমন তেমনি রহিল! কালের গতি অনিবার্য্য, সুতরাং সহস্র অনুরোধেও মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করা সম্ভব হইল না। কিছুরই প্রতিবিধান কি করিয়া গেল না? অবশ্যই গেল। মানবের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবিধানে প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া চলিয়া গেল। কতকগুলি স্মৃতি-কণ্টক মর্ম্মস্থানে বিঁধাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। যে কণ্টকগুলি কর্ত্তব্যের তাড়নায় অবিমৃশ্যকারী মানবের পথ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিবে, সেই স্মৃতিকণ্টক আমূল হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেল। অজ্ঞতার অন্ধকারে দৃষ্টিহারা, আত্মহারা আমরা দেখিতে পাই না, পুরাতন বর্ষ আমাদের কি মহোপকার করিয়া গেল। অবশ্য অনেকাংশে অতীতের ব্যবহার নির্ম্মম, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে "নির্+মম" ব্যবহারই সুচারু-কর্ত্তব্যের পরিচয়। "মম" জ্ঞানই জগৎকে কর্ত্তব্য-বহির্ভূত পন্থায় লইয়া যায়। অনুচিত পক্ষপাত অবলম্বন করিতে, মানব কেবল একমাত্র 'মমত্বের' নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে কর্ত্তব্যসাধন, সেইখানেই নির্ম্মমতা, সেইখানেই তীব্রতা; কর্ত্তব্যের মার্গ বড় দুর্গম--বড় দুরারোহ। শাস্ত্র বলেন, "ক্ষুরস্য ধারানিশিতা দুরত্যয়া" কর্ত্তব্যপন্থা ক্ষুরধারের ন্যায় দুরত্যয়ই বটে। সুতরাং কেমন করিয়া বলিব, কঠোরতায় শিক্ষা নাই। পুরাতন বর্ষ নীরবভাষায় বলিয়া গেল, "জাগ, কর্ত্তব্যের অনুশরণ কর।" ভ্রান্ত আমরা শুনিতে পাইলাম না, সে নীরব-অপূর্ব্ব ভাষার অপূর্ব্ববাণী কর্ণগোচর হইল না! তাই পুরাতন বর্ষ স্মৃতিকণ্টক হৃদয়-দেশে বিঁধাইয়া রাখিয়া গেল! যদি এ নেশা ছুটে, যদি এ দশার পর্য্যবসান ঘটে, তবে সেই এক একটী কণ্টকের একটু একটু বেদনা আমাদিগকে অকর্ত্তব্য মার্গে পদার্পণ করিতে সহস্রঅসুরবলে বাধা দিবে। তাই বলিতেছি, পুরাতন বর্ষ অনেক শিক্ষা ও কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া গিয়াছে। সেই কর্ত্তব্য জীবনে প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই কল্পিত আদর্শের প্রতিকৃতিরূপে জীবন গঠন করিতে হইবে। নচেৎ যে তিমিরে-সেই তিমিরে, সেই অঘোর নিদ্রায়!

বর্ষপ্রারম্ভে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, সেই উপদেশই যেন কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকা নববর্ষে নব নব কর্ত্তব্যভার মস্তকে বহন পূর্ব্বক ইষ্টনিষ্ঠ হিন্দু-সমাজের নিকট উপস্থিত। ধার্ম্মিকের আশীর্ব্বাদে, পূর্ব্বাচার্য্য মহর্ষিগণের অপূর্ব্ব-মাহাত্ম্য-বলে, যেন কর্ত্তব্যের তীব্র অগ্নি-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে, ইহাই পরমেশ-পদে প্রার্থনা। হিন্দু-পত্রিকা যেন সাধু-অসাধু শত্রু-মিত্র সকলকেই সমস্নেহে আলিঙ্গন করিতে পারে। সকলেরই প্রীতির কারণ হইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকা হিন্দু-সমাজের পরিচর্য্যাব্রত যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা যেন সম্পূর্ণ করিতে পারে; দেশের দশের কাছে, হিন্দু-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও হিন্দু-পত্রিকার প্রতি স্নেহশীল মহাত্মাদের কাছে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিলপ্রবাহে যেন হিন্দু-পত্রিকার কলেবর কর্দ্দমাক্ত না হয়। নিন্দাপ্রশংসার পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেবল বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য পালনেই যেন ইহার জীবন অতিবাহিত হয়, সকলের নিকট এই আশীর্ব্বাদ চাই। সমাজের দ্বেষ-বিদ্বেষের অংশ গ্রহণে যেন হিন্দু-পত্রিকার অধিকার না থাকে, ইহাই চাই। বন্ধুগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ যেন অক্ষয় কবচরূপে হিন্দু-পত্রিকার অঙ্গে লগ্ন থাকে। মঙ্গলময়ের চরণে প্রার্থনা করি, হিন্দু-পত্রিকার অনুগ্রাহক গ্রাহকমণ্ডলী যেন হিন্দুধর্ম্মের আলোচনায় ও অনুষ্ঠানে তৎপর থাকিয়া আর্য্যধর্ম্মের মহামাঙ্গ সত্যগুলির সম্মান সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হন। হিন্দু-পত্রিকার সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ, তাহাও যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন। [illegible] স্বধর্ম্মপরায়ণ মহোদয়গণের [illegible] প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্দেশে যথোচিত সম্মাননা প্রদর্শন পুরঃসর "পরস্পরের কর্ত্তব্যবিনিময়ই প্রার্থনীয়" এই অনুরোধ করিয়া নববর্ষের কর্ত্তব্যপালনে মনোনিবেশ করিলাম।

ওঁ শান্তিঃ।

ধর্ম্ম [illegible]ল্পিত বস্তু নহে।

(ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ—, উৎকৃষ্টই হউক আর অপকৃষ্টই হউক, সকলই কালধর্ম্মের অধীন। মহাকালের সর্ব্বগ্রাসী কবলে বিলীন না হইবে, এমন বস্তু, ব্যক্তি, গুণ, ক্রিয়া, কিছুই এ সংসারধামে সম্ভবে না। অল্লাধিক ভাবে সকলের উপরই কালচক্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যথা কথঞ্চিৎ বিকৃতি বা অন্যথাভাবও সঙ্গে সঙ্গেই সংঘটিত হইয়া থাকে; ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইলে, শেষে আমাদের স্থূলদর্শী লোচন উহা গ্রহণ করিতে পারে। সূক্ষ্ম বা দুর্লক্ষ্য ভাব গ্রহণে আমরা সততই অপারগ, এইজন্য বিশেষ বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রকৃতপদার্থের প্রকৃতরূপ পরিগ্রহে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অপারগতা পরিলক্ষিত হয়। কালমাহাত্ম্যে ধর্ম্মজ্ঞানের অবস্থা-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; আকার প্রকার অন্যভাব ধারণ করায়, বাহ্যদর্শী বৈদেশিক

পণ্ডিতগণ বস্তুতঃ উহার তত্ত্ব অবধারণ করিতে পারিতেছেন না।

পাশ্চাত্য দেশীয় কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, জগতের আদিম বয়সে জীবকুল ধর্ম্ম-প্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয় ইত্যাদি কত কিসের প্রিয় ছিল; আবার অধুনাতন সময়ে লৌকিক সুখ বা বিলাস-তরঙ্গেই ডুবিতে ভালবাসে। তাঁহারা ইহাদ্বারা সময় সময় এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে (!) উপনীত হন যে, ধর্ম্ম বস্তুতঃ কাল্পনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, উহার কোনও যৌক্তিকতা নাই; জনসমাজের বয়োবৃদ্ধি এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত ধর্ম্মের প্রতিও শ্রদ্ধাহ্রাস হইতেছে; অতএব ধর্ম্ম কেবল সমাজের শৈশবাবস্থার চিত্রক্রীড়া মাত্র, বুদ্ধিমান্ মানব উহার কোনও অস্তিত্ব পাইবেন না।"

পণ্ডিতপ্রবরের তর্কবিতর্ক উল্লেখ করা ও তাঁহার খণ্ডন মণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মহর্ষি মনুর নিকট আমরা ধর্ম্মের যে লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা যে জনসমাজের শৈশবাবস্থার ক্রীড়ামাত্র নহে, এবং তাহাই যে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ বলিয়া জগৎ গ্রহণ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য, এই কথাই এ প্রসঙ্গে বক্তব্য। যদি জগতে 'ধর্ম্ম' নামে পরিচিত পদার্থ বুদ্ধির বালক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই না হয়, যদি কল্পনা ব্যতীত সত্তা উহার সংস্পৃষ্ট না হয়, তবে উহা যে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, ইহা বলিবার আবশ্যকতা দেখি না।

কল্পনার কুহকে অনুসন্ধিৎসু বিংশ শতাব্দীর মানব বাস্তবিকই ভুলিতে চাহে না। বিজ্ঞানের অভিমান এখন সমাজের মজ্জায় মজ্জায় খর-বেগে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। এদিনে কেহই আর ভিত্তিশূন্য বস্তুর প্রতি বিশ্বাসবান হইতে চাহে না। প্রাচীন তন্ত্র, মন্ত্র, বচন রচন আর এখনকার গণ্য মান্য জনসমাজে আদর পায় না! অবশ্য যুক্তির আড়ম্বর, তর্কের কর্কশতা না হইলে এখন চলিতে পারে না। অতএব বাধ্য হইয়া আমরা তাহার বিবেচনা করিতেছি।

ধর্ম্ম শব্দ 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহার দ্বারা যে বস্তু ধৃত হয়, তাহাই সেই বস্তুর ধর্ম্ম। যে শক্তি-বলে পদার্থ ধৃত অর্থাৎ অবস্থিত থাকে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পদার্থের স্বরূপ যাহাদ্বারা রক্ষিত হয়, যে অনির্ব্বচনীয় বলে পদার্থ আপন প্রকৃতরূপ বা অস্তিত্ব সংরক্ষণে সমর্থ হয়, অথবা বিরূপতার (ধ্বংসের) করাল-কর হইতে আপনাকে রক্ষা করে, পদার্থের সেই অন্তর্নিহিত মেরুদণ্ডের মত শক্তি-বিশেষই ধর্ম্ম শব্দের অর্থ। ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা এই স্থানে আসিতে পারি। অগ্নির ধর্ম্ম দাহকতা, দাহকতাই অগ্নির স্বভাব রক্ষা করিয়াছে, দাহকতার বিগমে আর আমরা অগ্নির অনুসন্ধান পাই না। অগ্নির দাহকতাই ধর্ম্ম। অগ্নির স্বরূপ রক্ষা আবশ্যক হইলে, দাহকতার পরিরক্ষণ বা পরিবর্দ্ধনে যত্ন করাই সঙ্গত হয়। প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম্মই তাহার আত্মরক্ষার উপায়। মানব সমাজেও 'ধর্ম্ম' বলিলে ঐরূপ বুঝা আবশ্যক হয়। যে শক্তি আছে বলিয়া আমরা মানুষ, যাহার অপগমে আমরা আর মানুষ থাকিতে পারি না, তাহাই আমাদের (মানুষের) ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকে না। কখনও ইহা কোনও মানবে পরিস্ফুটরূপে পরিদৃষ্ট হয়, আবার কোনও স্থানে ইহাকে নিদ্রিত ভাবে আমরা লাভ করি। মনে করা উচিত, উপযুক্ত উপকরণের সাহায্য ব্যতীত আমরা বহ্নির দাহকতাও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। আবার কোনও পদার্থবিশেষ দ্বারা অগ্নির দাহকতা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তাহাতেই 'দাহকতা নাই' এরূপ অনুমান সঙ্গত নয়। অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যেখানে আমরা স্পষ্টতঃ ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি না, সেখানে ঐ ধর্ম্ম বীজভাব বা সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিয়া ঐ বস্তুকে বিজাতীয় পরিবর্ত্তন হইতে রক্ষা করিতেছে। যদি ঐ ধর্ম্ম বস্তুতই বিদ্যমান না থাকিত, তবে ঐ বস্তুর জাত্যন্তরপরিণাম সংঘটিত হইত। এখন বলা যাইতে পারে, মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার জন্য যে "মনুষ্যধর্ম্ম" স্বীকার করিতে হয়, তাহা কোনও মনুষ্যে অল্প, কোথাও তদপেক্ষা অধিক, আবার অন্যত্র অধিক বা অল্প মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। এক কথায়, মানুষ নামে যাহারা পরিচিত, তাহারা প্রত্যেকেই বিকাশিত মনুষ্যধর্ম্ম লাভ করিতে পারে নাই, অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানুষ হইতে পারে নাই। ধর্ম্মের বিকাশের সহিতই তাহাদের মনুষ্য নামের সার্থকতা সুসম্পন্ন হইতে পারিবে।

এই মনুষ্যত্ববিকাশের জন্যই ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অংশের আবশ্যকতা। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভাগ অশেষ শাখায় বিভক্ত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এক বই নানারূপ হইতে পারে না। যে সকল অনুষ্ঠানের সাহায্যে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম নিদ্রিতাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিকাশদশা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল অনুষ্ঠান দেশ, কাল, পাত্র ভেদে অসংখ্য বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমাজের অদূরদর্শিতায়, অশিক্ষার কুশিক্ষায়, অহঙ্কার অন্ধতায়, উপায় অনুষ্ঠান অনুপযুক্ত পাত্রে, অস্থানে অসময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রের গভীর গৌরবময় অধিকার-নির্ব্বাচন বৌদ্ধবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হওয়ায়, অমুচিত অধিকার অনুপযুক্তপাত্রে অর্পিত হইয়া, উদ্দেশ্যের মূলদেশ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে; কাজেই ধর্ম্মভাবের বিকাশ সুদূরপরাহত হওয়ায় ক্রমে নিদ্রিতভাবের আধিক্য উপস্থিত হইতেছে। তবে এখনও ধর্ম্মজীবনের বিকাশাবস্থা সজ্জনাকীর্ণ মহানগরীতে বিরল বলিয়া, একেবারে বিরল হইতে পারে নাই।

এখন আমরা দেখিব, মহর্ষি মনুর ধর্ম্মলক্ষণ মানবজীবনে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কি না। ধর্ম্মলক্ষণ যথা,—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥

(৬ অঃ ৯২ শ্লোক মনুসংহিতা।)

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। ধর্ম্ম এই দশ আকারে মানবদেহে বিরাজিত। প্রাচীন পণ্ডিত কুল্লুকভট্ট বলেন— ধৃতি অর্থ সন্তোষ। ক্ষমা অর্থ অপকারীর প্রতি প্রত্যপকার না করিয়া হৃদয়ের উদারতা প্রকাশ। চিত্তবিকারের নানাবিধ প্রলোভক উপকরণ উপস্থিত

হইলেও, অন্তঃকরণকে স্বাভাবিক সংযত ভাবে রাখার নাম দম। অস্তেয় শব্দের অর্থ অন্যায়রূপে পরধন গ্রহণ না করা। আর শৌচ অর্থ দেহশুদ্ধি। (এখানে অন্তঃশুদ্ধির কথাও বুঝিতে হইবে) ইন্দ্রিয়গণের অধীনরূপে বিষয়চর্য্যা না করিয়া ইন্দ্রিয়কে নিজের অধীন করার নাম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ধীঃ অর্থে শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং বিদ্যা অর্থ আত্মজ্ঞান। (আত্মার স্বরূপ কি? এই দার্শনিক মহারহস্যের আবিষ্কার) সত্য অর্থ যথার্থ কথন, অক্রোধ অর্থ ক্রোধের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও অসাধারণ ধৈর্য্য-বলে ক্রোধের নিবারণ করা।

এই দশটী দ্বারা বাস্তবিকই মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয়। মানুষের স্বতন্ত্রতা-অসাধারণতার মূলাধার এই দশটী। ইহারই নাম "মনুষ্য-ধর্ম্ম"। সন্তোষের অভাবে জীবন শ্মশানে পরিণত হয়, সন্তোষ বড় সুখদ, বিশৃঙ্খল-সংসারে মানবাত্মার একটু বিরাম। এ বিশেষত্ব কল্পিত নহে, সমাজের শৈশব জীবনের খামখেয়ালীও নহে। ক্ষমা যথার্থই মানবের মহত্ব, ক্ষমাহীন মানব দানবের জ্যেষ্ঠতাত। এ তত্ব অবশ্য বুঝা আবশ্যক, ইহা জগতের অত্যুচ্চ নীতি। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া, তাহারই কথায় তাহার পাছে যাইতে লাগিলে, প্রকৃতির স্রোতে ভাসমান পশুর সহিত মানব স্বীয় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখাইতে পারিবেন না। ব্যবহার-নীচতায় মনের সহিত দেহেরও পরিবর্ত্তন ক্রমে২ সাধিত হয়। শাস্ত্র, "তদ্ভাবভাবিত" হইলে তত্তদ্দেহলাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়পরবশ না হওয়া মনুষ্যের আত্মরক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। চিত্তদমনও এইরূপ। অন্তঃকরণে কলুষিত চিন্তার আবির্ভাবে বাধা দেওয়াই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, লোভের সামগ্রীতে উচ্ছৃঙ্খল মন না যাইতে পারে, ইহাও প্রায়তঃ দেখিবার বিষয়, ইহা আলঙ্কারিকের কল্পিত-তত্ব নহে। শরীরের শুচিতা ও মনের শুচিতা উন্নতির সোপান। মন অশুচি অবনত হইলে নৈতিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। দেহ অশুচি থাকিলে আবার মন শুচি থাকিতে পারে না; সুতরাং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে, শুচিসম্পন্ন হইতে হয়। গ্রন্থের অনুশীলন দ্বারা আমরা যে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করি, তাহাও আমাদের মনুষ্যত্ব রক্ষার উপায়। অবশ্য পুস্তকে বৈজ্ঞানিক সত্য পাঠ করা এবং অপরোক্ষপরীক্ষিত সত্য লাভ, ভিন্ন পদার্থ; কিন্তু পূর্ব্বোক্তটী অপরোক্ষ জ্ঞানের উপকরণ, সুতরাং স্বরূপরক্ষার অনুকূল। ইহা ত্যাগ করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব মলিন হইতে থাকে, ক্রমশঃ অনুশীলনহীন পশুপ্রকৃতির সন্নিকৃষ্ট হইতে থাকে। এ বিষয়ে প্রমাণ দিবার আবশ্যকতা নাই, সভ্যজগতে ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত। বিদ্যা অর্থ আত্মজ্ঞান, এই "আমি কি?" চিন্তায় একমাত্র মানুষের অধিকার। এতাদৃশ মস্তিষ্কযন্ত্র বা স্নায়বিকশক্তি আপাততঃ অন্য কোনও জীবের দেখা যায় না, যাহা আত্ম-স্বরূপ নির্ব্বাচনরূপ গুরুতর চিন্তার স্থান দিতে পারে। যদি আমাকে আমি না চিনিলাম, তবে আমার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ কিসে? সত্যের কথা বলিতে চাহি না,

সুসম্প্রসারণই সমস্বরে সত্যের মহিমা ঘোষণা করে। সত্য যে মনুষ্যত্ববিকাশের একান্ত অনুকূল, যথার্থ ব্যতীত কৃত্রিম উপকরণ আত্মরক্ষার উপায় হইতে পারে না, ইহা নীতিবাদের বিজয়দুন্দুভিতে মহারবে ঘোষিত হইতেছে, এখানে উহা বক্তব্য নহে। উদার নীতির মধ্যে অক্রোধ শ্রেষ্ঠাসনে বসিবার যোগ্য। এই সকল গুলির নাম ধর্ম্ম, ইহাই মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করে। এগুলিকে ত্যাগ করিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, পশুর সহিত মানুষের বিশেষ কিছু পার্থক্য আর তখন দেখান যায় না।

তাই আমরা বলিতে চাহি, লৌকিক-যুক্তি-বলেই এগুলি দ্বারা মনুষ্যত্ব রক্ষিত ও বিকশিত হয়, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে, কল্পনার উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে হয় না। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা ধর্ম্মের এই লৌকিক-আদর্শই অনেকে গ্রহণ করেন, তজ্জন্য অনেকে নীতিবাদী হন। তাঁহারা ইহার অলৌকিক তত্ত্ব আত্মস্বরূপ লাভটা একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের যুক্তি-তর্কের বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, নীতি কেবল সংসারের চ'খে ধূলি দেওয়া মাত্র হইলে চলে না, উহাতে নীতির মূল্য অত্যল্পই থাকে। মহাসত্তায় বিশ্বাস করিতে হইবে। ধর্ম্মহীন নীতি কুনীতি, নীতিহীন ধর্ম্ম অধর্ম্ম। ধর্ম্ম ও নীতি একই দ্রব্যের লৌকিক এবং অলৌকিক দুই পৃষ্ঠ। একটী ছাড়িলে অপরটীর গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হয়, পাশ্চাত্য দেশীয় কোনও কোনও পণ্ডিত ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় (১৩০৮) হিন্দু-পত্রিকায় 'ইহকাল পরকাল' প্রবন্ধে "নীতি ও ধর্ম্মের অপেক্ষা পারস্পরিক, যেহেতু দুইটী একই জিনিষের অবস্থাদ্বয়" ইহা সংক্ষেপতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসু তাহা দেখিতে পারেন।

সময়ান্তরে আমরা দেখাইব "নীতি-বিজ্ঞান ধর্ম্মের অনুকূল। কেবল লৌকিক মানিলে চলিবে না, ধর্ম্মের অলৌকিক স্বরূপও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে" বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাই বলা আবশ্যক, মনুক্ত দশলক্ষণধর্ম্ম মানবের আত্মোন্নতির উৎকৃষ্ট লৌকিক কারণ। ঐ ধর্ম্ম বীজভাবে আমাদিগের সত্তায় অবস্থান করিতেছে বলিয়াই আমরা মানুষ। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, ঐ বীজভাবাপন্ন ধর্ম্মকে জাগাইতে হইবে; তাহাহইলে মনুষ্যত্বও জাগিবে। নামে মানুষ, কার্য্যেও মানুষ হওয়া যাইবে। মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটিত না হইলে, মানুষ নাম ধারণ বৃথা। ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতিকে পরিপক্ক অবস্থায় না লইতে পারিলে, ধর্ম্ম বিকশিত হইল না। ধর্ম্মজীবন পূর্ণতা লাভ করিল না, প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া গেল না; এক কথায়, প্রকৃত মানুষ হওয়া গেল না; তাই নানাবিধ আনুষ্ঠানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। আমাদের প্রত্যেক আচার ব্যবহারই আত্মবিকাশের অনুকূল, মানবাত্মার উন্নতির উৎকৃষ্ট উপকরণ। তবে সময়বিশেষে গৃহীত আচার, আবশ্যক অতীত হইলেও কুলক্রমাগত ভাবে চলিত হইয়া গিয়াছে।

একটী বাল্যকালের গল্প মনে আসিল, পাঠকগণ চপলতা মার্জ্জন করিবেন। কোনও

গৃহস্থের গৃহে পালিত কতকগুলি মার্জ্জার ছিল, তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবহার্য্যসামগ্রী-গুলি অপবিত্র করিবে মনে করিয়া গৃহস্বামী ধর্ম্মকার্য্যের দিনে তাহাদিগকে বন্ধন করিতে বাধ্য হইতেন। অপরিণত-বুদ্ধি বালক পুত্র পিতার এই কার্য্য শিক্ষা করিল, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিল না। পরে পিতার মৃত্যুর পর, ধর্ম্মকার্য্যমাত্রেই সে মার্জ্জার বন্ধন করিত; গৃহে পালিত মার্জ্জার না থাকিলেও অন্য বাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিত; মনে করিত উহা ধর্ম্মের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। বর্ত্তমান অনেক আচার ঐ প্রকার কারণ হইতে আসিয়াছে। উহারা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। কোনও প্রথা সর্ব্বদা সমভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে না, এই জন্য অনেক শাস্ত্রীয় প্রথাও আত্মবিকাশের প্রতিকূল হইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র-ভেদ না ভাবিয়া, কেবল উপধর্ম্মকে ধর্ম্মের আসনে বসাইয়া, আমাদের ধর্ম্মজীবন ক্ষীণ করিতেছি। অবসরে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ মনুষ্য-ধর্ম্মবিকাশের জন্য যে আনুষ্ঠানিক উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিব এবং উপযোগিতা বুঝাইতে প্রয়াস পাইব।

দীন শ্রী————ভারতী।
(যশোহর, বেদবিদ্যালয়।)

বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচন।

জাতি-বিভাগ নির্ব্বাচন তত্ত্ব লইয়া আজ আমরা হিন্দু-সমাজে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, মহাব্যতিব্যস্ত দেখিতে পাইতেছি। মহামান্য টি মাধবরাও এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "যতই অধিক দিন বাঁচিয়া থাকা যায় এবং যতই অধিক পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পৃথিবীতে অন্য কোন জাতিই, হিন্দু-সমাজের ন্যায় নিজেদের স্বইচ্ছায় সৃষ্ট সুতরাং সহজেই পরিহার্য্য সামাজিক আচার ব্যবহারের নিয়ম পদ্ধতি হইতে যত অধিক দুঃখ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করেন, রাজনৈতিক কার্য্যাবলী হইতে সেরূপ বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করেন না।" আত্মসৃষ্ট বিপদাবলীর মধ্যে জাতিপ্রথা অন্যতম বিপদ্। হিন্দু-সমাজে ইহা অভিশাপের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। প্রত্যেকে জাতিগর্ব্বে গর্ব্বিত। স্বদেশহিতৈষিতা ভারত হইতে তিরোহিত হইয়াছে। হিন্দুগণ সাধারণতঃ স্বজাতি ব্যতীত, অন্য কোন জাতি বা শ্রেণীর সুখ-দুঃখের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করেন না। জাতিভেদ-প্রথা পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে লোকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি স্বরূপ গণ্য করিয়া থাকে। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর চামার প্রভৃতি জাতিকে স্পর্শ করাও অপবিত্র বোধ করেন। ত্রিবাঙ্কুড় দেশে কোন কোন নীচ জাতি ব্রাহ্মণের পাঁচাত্তর পদ পরিমিত স্থান অপেক্ষা নিকটে আসিতে পারে না। উচ্চ-বংশের কোন লোক তাহাদের নিকট আসিতে লাগিলে তাহারা রাস্তা হইতে দূরে চলিয়া যায়। যদিও বর্ত্তমানে সামাজিক আচার ব্যবহারের অনেকটা শৈথিল্য দৃষ্ট

হয়; তথাপি কোন কোন নীচ জাতীয়ের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে কেহই সহ্য করিতে পারেনা। এমনকি, বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ ধনশালী সুবর্ণবণিক ও সাহাদিগের প্রতি এতদূর অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করা হয় যে, উচ্চ শ্রেণীর কেহই তাহাদের জল পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের কার্য্য কলাপ দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, জাতিপ্রথাই যে জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ, তাহা যেন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। হিন্দু জাতির অবনতির প্রধান কারণ সেই জাতিপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রায় সকলকেই বদ্ধপরিকর দেখা যাইতেছে। নীচ জাতিদিগের প্রতি আমরা যেরূপ অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব প্রদর্শন করি, তাহা একান্ত অন্যায়। বরঞ্চ তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দু-ধর্ম্মানুযায়ী নিকৃষ্ট জাতি সকল সমাজে যে অবস্থায় পরিণত ও যে যে কার্য্যে নিয়োজিত আছে, তাহারা যদি সে অবস্থায় থাকিতে ও সেই সব কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে তখন যে সমাজে কিরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রজকের জল কোন হিন্দুই ব্যবহার করে না এবং তাহার ঘরেও সে প্রবেশ করিতে পারে না। যদি সে তাহার পৈত্রিক বস্ত্রধৌত-করণ ব্যবসায় করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আমাদিগকে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ আরও বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বোম্বে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব চন্দ্র বার্কর এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "জাতি-প্রথার পক্ষপাতীদিগকে আমি অনেক সময়ে এরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিতে পাই যে— "ইংলণ্ড দেশেও কি জাতিপ্রথা প্রচলিত নাই? আভিজাত্যাভিমানী কোন ব্যক্তি কৃষকের কন্যাকে বিবাহ করিতে অপমান বোধ করেন না কি?" এই প্রশ্নোত্তরে আমি এই কথা বলি যে, ভারতবর্ষে যে আকারে ও যেরূপ ভাবে জাতি-প্রথা প্রচলিত আছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বিলাতের কোন লর্ড কোন কৃষকের কন্যার পাণিগ্রহণ করা অপমানসূচক বোধ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই কৃষক আবার সময়ে নিজেই একজন লর্ড হইতে পারেন। কার্ডিন্যাল নিউম্যান সাহেব খৃষ্টিয়ানদিগের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, সমস্ত ইংরাজ জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। 'যাহারা এখন খৃষ্টিয়ান দলভুক্ত নহে, তাহারা যে কোন সময়ে ঐ দলভুক্ত হইতে পারিবেন না, এরূপ বলা যাইতে পারে না।' কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকিবে, শূদ্র শূদ্রই থাকিবে। শূদ্র কস্মিন্ কালেও ব্রাহ্মণ হইবার আশাও করিতে পারে না। এইজন্য পরস্পরের মধ্যে আদৌ সৌহৃদ্য ভাবও দৃষ্ট হয়না। ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন হিন্দু-সভাতে বায়রন্স সাহেবের নিম্নলিখিত কথাগুলি অতি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল :—

অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থার লোকের প্রতি আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে কবি কারলাইল বলেন যে—"কঠিন পরিশ্রমকারী, বঙ্কিম দেহধারী সদাশয় শ্রমজীবীগণকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি। প্রখর রৌদ্রতাপে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাধুভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনকারী শ্রমজীবীদিগকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। ভ্রাতাগণ! লোকে তোমাদের প্রতি বড়ই নির্দ্দয় ব্যবহার করে। তোমাদের শারীরিক পরিশ্রমের জন্য তোমাদিগকে অবশ্য আমরা দয়া করিব এবং ভাল ও বাসিব। আমাদিগের জন্যই তোমার পৃষ্ঠদেশ এরূপ ন্যুব্জভাব ধারণ করিয়াছে। আমাদিগের জন্যই তোমার সরল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের জন্যই পরিশ্রম করিতে করিতে তোমার শরীর এরূপ বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে। তোমার সুন্দর আকৃতি আদৌ বিকাশিত হইতে পারে নাই। অনবরত শারীরিক পরিশ্রমে ইহা বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। তোমার আত্মা এবং শরীর কখনও স্বাধীনতার বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারে নাই। অনবরত পরিশ্রম করাই তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। দলিল জাল, মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা মোকদ্দমা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনকারী, আলস্যপরায়ণ, ভদ্র বংশীয় ব্যক্তি অপেক্ষা কঠিন শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাধুভাবে জীবিকাঅর্জ্জনকারী চণ্ডালও শতগুণে শ্রদ্ধাস্পদ ও মাননীয়।

বর্ত্তমানে শিক্ষিত হিন্দুসমাজকে জাতিপ্রথার প্রতি বিশেষ অনুকূল দেখা যাইতেছে। এই জাতিপ্রথার আন্দোলনে গভর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষভাবে থাকা উচিত। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গভর্ণমেণ্ট পরোক্ষভাবে ইহা আরও উত্তেজিত করিয়া দিতেছেন। শিক্ষিত হিন্দুসমাজে যে নব জাতীয় ভাবের বিকাশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট যে অসন্তুষ্ট হইবেন, একথা আমরা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। জাতিপ্রথার তথ্য অনুসন্ধানে, গভর্ণমেণ্টের রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। জমির সহিত বিভিন্ন জাতির সংস্রব, তাহাদের খাজনা পাওয়ার অধিকার, বাণিজ্যের সহিত তাহাদের সংস্রব, এবং তাহাদের আভ্যন্তরিক অন্যান্য বন্দোবস্ত, এই সমস্ত বিষয় রাজ্যশাসন প্রণালীর সহিত অচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। জাতিপ্রথার বিশেষ অনুসন্ধানে আধুনিক মানববিজ্ঞান [anthropology] শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত স্যার জন লাবক, স্যার হেনরী মেন, টেলর সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণও বিশেষ সাহায্য ও উপকার পাইতে পারেন। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটী বিদ্বেষ ভাবের উৎপত্তি না করিয়াও এই সমস্ত অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। যদিও স্যার লিপেল গ্রিফিন এক সময় বলিয়াছিলেন যে, "জাতি প্রথা এখনও বিশেষ বলবৎ আছে এবং সুবিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা ঐ জাতীয় বিদ্বেষভাব একেবারে উন্মূলিত না করিয়া বরঞ্চ আরও বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করিবেন।" তথাপি গভর্ণমেণ্টের জানা উচিত যে, এই জাতিপ্রথা এবং ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কুসংস্কারই ইহার প্রধান শত্রু। সেই

সেপাহীবিপ্লবও জাতিপ্রথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ভারতবাসীদিগের স্বাধীনতা ও স্বত্বাধিকারের প্রধান সনন্দস্বরূপ সেই ১৮৫৮ সালের সুবিখ্যাত ঘোষণাপত্রে গভর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালী সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য জাতি-প্রথা উঠাইয়া দিতে পারেন না। কিন্তু ইহাকে কোনরূপে বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়াও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত জাতির প্রতি গভর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করাই উচিত।

জাতিবিভাগের অবশ্য অনেক প্রকার সুবিধা আছে। যখন কোন একটী ব্যবসায় বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতে থাকে, তখন সে ব্যবসায়ে পিতার উপার্জ্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য সহজেই পুত্রে আসিয়া বর্ত্তায়। অসভ্য মনুষ্যগণ পশুদিগের ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে ভালবাসে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসায়ানুযায়ী জাতিবিভাগে পরস্পরের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। ইহাতে মানব একই স্বার্থবিশিষ্ট বৃহত্তর একটী পরিবারভুক্ত হওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে মানবকে শান্তস্বভাববিশিষ্ট এবং কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি সম্ভ্রমশীল করে। এক পক্ষে যেমন এই সব সুবিধা আছে, অন্যপক্ষে ইহাপেক্ষা অনেক বেশী অসুবিধাও আছে। জাতীয় উন্নতির প্রথম অবস্থায় জাতিবিভাগ আবশ্যকীয় হইতে পারে, কিন্তু চরম উন্নতির পক্ষে ইহা চরমে বিঘ্নকর হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদিগের শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে আমরা কতকটা উন্নতি করিয়া ক্ষান্ত আছি। দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞান যে অবস্থায় উন্নত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেই অবস্থায় আছে। ইউরোপ ও আমেরিকা দেশে বাষ্পীয় যন্ত্র ও সূত্র প্রস্তুতির যন্ত্রাদি যে মহাত্মারা করিয়াছেন, তাঁহারা সেই২ ব্যবসায়ী লোক ছিলেন না। এদেশে আমরা শিল্প কার্য্য ও ব্যবসায়কে বিশেষ ঘৃণা করি। সূত্রধর, চিত্রকর, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতি নীচ জাতি মধ্যে গণ্য। অন্যান্য শ্রমজীবী ব্যক্তিগণও বিশেষ সম্মানিত বলিয়া বিবেচিত হন না। সমাজ যে ব্যবসায়কে সম্মানিত বিবেচনা না করেন, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সেরূপ ব্যবসায় অবলম্বনে স্বীকৃত হইবেন না। বৈদেশিক বাণিজ্যের পথেও জাতিপ্রথা নানারূপ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করে। বোধ হয়, কেবল একমাত্র হিন্দু-জাতিরই কোন বৈদেশিক বাণিজ্য নাই। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে নানারূপ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে এবং জাতীয় ভাবের উন্নতি বিষয়ে বিঘ্ন করিয়াছে। ইহাতে সমস্ত জাতিকে অবনত করিয়াছে এবং কোন কোন শ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিয়াছে। মনু-সংহিতা পাঠে চণ্ডাল ও শূদ্রদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহারের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঋষিদিগের কথা দূরে থাকুক, কোন মানবে যে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা আদৌ বিশ্বাস হয় না। কতকগুলি পশুবধে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, একটী শূদ্র হত্যাতেও সেই প্রায়শ্চিত্তের

বিধান রহিয়াছে। শূদ্র হত্যা করিলে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, বিড়াল, নকুল, কুকুর, ভেক, সরীসৃপ, পেচক বা কাক মারিলেও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মনু বলেন, উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের দাসত্ব করার জন্যই শূদ্রের জন্ম। ক্রীত বা অক্রীত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দাসত্ব করিতে বাধ্য করিতে পারেন। তাহার প্রভু তাহাকে মুক্তি দিলেও সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। শূদ্রের দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণে নিরুদ্বেগে দখল করিতে পারেন। যদি কোনরূপ অসম্ভ্রমসূচক ভাবে সে উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখ করে, তবে দশ অঙ্গুল পরিমাণ তপ্ত লৌহশলাকা তাহার মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। সে যদি তাঁহাদিগকে গালাগালি করে, তবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবে। সে যদি তাঁহাদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে তাহার পশ্চাদ্ভাগে তপ্ত শলাকা দ্বারা দাগ দিয়া তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিবে অথবা সেই পশ্চাদ্ভাগ একেবারে কাটিয়া ফেলিবে। মৃত ব্যক্তিদিগের ত্যক্ত পরিচ্ছদাদিই চণ্ডালেরা বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবে এবং ভগ্ন পাত্রে তাহারা আহার করিবে। লৌহের গহনা পরিধান করিবে এবং অনবরত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। এই সমস্ত বিধান পাঠ করিতেও শরীর কম্পিত হয়। জাতিপ্রথানুযায়ী উচ্চশ্রেণীস্থ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সকল লোকই একরূপ অজ্ঞ থাকিবে। উচ্চশ্রেণীর লোক অপেক্ষা অন্যান্য শ্রেণীর লোক বোধহয় শতগুণ অধিক। জাতিপ্রথানুসারে তাহারা সকলেই অজ্ঞ থাকিবে।

জাতিপ্রথা প্রকৃত ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভারতবর্ষে ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং হঠাৎ ইহা রহিত করা যাইতে পারে না। আমাদিগের ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই জাতিবিভাগই আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, শারীরিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবনতির প্রধান কারণ এবং সমাজকে একেবারে বিধ্বস্ত না করিয়া সর্ব্ববিষয় সংশোধন করিতে হইবে। ভারতমাতার সন্তানগণ জাতীয় বিদ্বেষভাব আর বর্দ্ধিত না করিয়া সকলেই কমাইতে চেষ্টা করিবেন। একজন মহাত্মা বলিয়াছেন যে "জাতিপ্রথা মানবমণ্ডলীর ভ্রাতৃভাব নষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে সামাজিক পার্থক্যকে ঐশ্বরিক বিধানরূপে পরিণত করে এবং ঈশ্বরের দোহাই দিয়া পরস্পরের মধ্যে নানারূপ শত্রুতা ও বিবাদের সূচনা করিয়া দেয়। ইহাতে এক সম্প্রদায়কে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করে। তাহাকেই শিক্ষা দীক্ষার ভার এবং সামাজিক প্রাধান্যের অন্যান্য যাবতীয় সুবিধা অর্পণ করে। তাহাকে লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগা মানবকে চিরদাসত্বে আবদ্ধ করিয়া যথেচ্ছভাবে পদদলিত করিবার ক্ষমতা দান করে। ইহাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেয় এবং অন্যান্য লোকদিগকে স্বর্গের বা মনুষ্যত্বের অযোগ্য, অপবিত্র নীচজাতীয়রূপে পরিগণিত করে। এইরূপ ঘৃণিত দাসত্বের বিধান এবং এইরূপ কষ্টকর যথেচ্ছাচার কে সহ্য করিতে পারে? অপর, আর একজন পণ্ডিত

ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে, 'জাতিপ্রথা যুক্তি এবং বিবেকবিরুদ্ধ এবং ইহাতে নানারূপ অবনতি ঘটে। ইহাতে সমাজের অধিকাংশ লোক বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, অর্থ ও পবিত্রতাশূন্য হইয়া পড়ে। ইহাতে পরম পিতা পরমেশ্বরকে পক্ষপাতী ও রাগ-দ্বেষপূর্ণ বলিয়া পরিচয় দেয়। আমি এজন্য পুনরায় বলিতেছি যে, আমরা যদি মানবপ্রকৃতি এবং ঈশ্বরের চিরন্তন নিয়মের প্রতি লক্ষ্য এবং দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষা করি, তাহা হইলে জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য"।

বনপর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে "সকল মনুষ্যেরই জন্ম, মৃত্যু ও সন্তানোৎপত্তি একইরূপ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহার চরিত্র পবিত্র, তিনিই ব্রাহ্মণ"। যুধিষ্ঠিরের মত বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন যে "জন্ম, বংশ বা জটাজুটদ্বারা কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। যাঁহাতে সত্যতা ও ধর্ম্ম বিরাজমান, তিনিই ব্রাহ্মণ।" বর্ত্তমানে যাঁহারা জাতিপ্রথা ও বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জাতিপ্রথা হইতে কোনরূপ সুফল লাভের আশা করা একরূপ বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ত্তমানে যেরূপ জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্মবিরুদ্ধ। অধ্যাপক মোক্ষমুলর সাহেব বলিয়াছেন যে, মনুসংহিতায় উল্লিখিত এবং বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত জাতিপ্রথা বৈদিক সময়ে বিদ্যমান ছিল না। কি বিভিন্ন জাতিবিভাগ, কি ব্রাহ্মণদিগের নানারূপ স্বত্বাধিকার, কি শূদ্রদিগের নীচ অবস্থা, ইহার কোন বিষয়েরই বেদে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের একত্র বাস করা, পান আহার করা কিংবা পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করা সম্বন্ধে নিষেধসূচক কোন বিধান ছিল না। বর্ত্তমানে প্রচলিত জাতিবিভাগ বৈদিক সময়ে ছিল না, কিন্তু মনুসংহিতায় উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ক্রমশঃ দেখাইব যে, জাতিবিভাগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হইয়াছে এবং ইহা বেদবিধানানুযায়ী নহে। শ্রুতিশাস্ত্রের সহিত পুরাণ বা স্মৃতিশাস্ত্রের অনৈক্যস্থলে শ্রুতিই প্রামাণ্য।

ক্রমশঃ—

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় শ্লোকের আলোচনা।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণ হতে নিজকে যে নীচ মনে করে।
তরু হইতেও যেবা সহিষ্ণুতা ধরে॥
নিজে যে অমানী হয়ে অন্যে মানদাতা।
তারি দ্বারা হরি হন কীর্ত্তনীয় সদা।

এই শ্লোকটির দ্বারা প্রকৃত হরি-সংকীর্ত্তনকারীর উপযোগিতা বা লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। শুধু শব্দের "হরি" হয়ত

অনেকের দ্বারাই কীর্ত্তিত হন, কিন্তু অর্থের হরি— ভাবের হরি— রসের হরি— স্বয়ং হরি কেবল উপরোক্ত লক্ষণালঙ্কৃত নিরীহ নিষ্কিঞ্চন সুদীন ভক্তের পবিত্র কণ্ঠেই প্রকীর্ত্তিত।

"হরি" ত অনেকেই বলে, কিন্তু বলার মত বলিতে পারে কজনে? শিক্ষিত পক্ষীও ত হরি বলে। শুকের মুখে সুখের সময়েই কৃষ্ণনাম,—বিড়ালে ধরিলে কেবল ক্যাঁ ক্যাঁ—! সে অন্তিমে আর সে 'অন্তিমের ধন কৃষ্ণনাম' মুখে আসেনা। মনে যাহা নাই, তাহা কি আর তখন মুখে আসে? ভগবন্নামকে যে অন্তিমের সম্বল বলিয়া ঠিক চিনিয়াছে, অন্তিমকালে নাম তাহাকে ত্যাগ করেন না। আমাদের 'হরি' বলা একরূপ সখের হরি বলা; সুতরাং তাহাও শুকের হরিবলা-বিশেষ। আমাদের হরিনাম যেন পোষাকী, সুদীন ভক্তের হরিনাম প্রকৃত "আটপহুরে।" "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাক্যের তাহাই তাৎপর্য্য। কাহারও অন্তরে নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তন হইতেছে, যিনি শুনিবার তিনি শুনিতেছেন; বাহিরের লোকের শ্রুতি-নিরপেক্ষ-নীরবতায় সে সংকীর্ত্তন সংহত হয় না। সে অন্তঃশীলা সুধা-স্রোতস্বতী সদাকালই বহিতে থাকে।

"লোক-প্রতীতি বিষয়ে প্রবদামি কৃষ্ণং।
চেতঃ পুন র্বিষয়রাশি-নিবেশিতং মে॥
ভ্রষ্টাবধূর্নিজকরেণ পতিং স্পৃশন্তী।
গোপ্যাঙ্গমর্পয়তি জারজনায় সুপ্তং॥"

লোকেরে বুঝাতে বৈষ্ণবতা মোর
"কৃষ্ণ" বলি রসনায়।
কিন্তু মম চিত নিত্য নিবেশিত
বিষয়রাশিতে হায়॥
ভ্রষ্টাবধূ যথা করি আলিঙ্গন
করে সুপ্ত স্বপতিরে।
স্বগোপ্যাঙ্গ করে গোপনে অর্পণ
আপন উপপতিরে॥

আমাদের হরিবলা এইরূপ। ভক্তের হরি স্বয়ং হরি, আর আমাদের হরি যেন 'হ' আর 'র' এ "ইকার"-ধারী! দীনের হরি রাসবিহারী, আর দাম্ভিকের হরি কেবল রসনা-বিহারী!

"অন্তরে বিষয়াসক্তি, বাহ্যে ভাক্ত হরিভক্তি,
দেখে শুনে 'হরিভক্তি উড়ে।'
ভাক্ত স্বর্ণ-অলঙ্কারে, আও অঙ্গ শোভা করে,
পরীক্ষা-অনলে মরে পুড়ে॥"

অতএব শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোকে হরি-কীর্ত্তনের যথার্থ অধিকারী নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। ভাক্ত অনধিকারীর হরি-কীর্ত্তন-হুঙ্কারে কণ্ঠ বিদারিত, বায়ু বিকম্পিত, এবং নভোস্থল নিনাদিত হইলেও তাহা ভূলোকের ব্যোমভূতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভক্ত অধিকারীর নীরব অন্ত-কীর্ত্তনও ভূলোক এড়াইয়া, দ্যুলোক ছাড়াইয়া, গোলকের সেই মোহন-মুরলী-তানে মুখরিত হয়! তাহাতে গোলকেশ্বরীর পুলক-নৃত্য-বিলাস বর্দ্ধিত হয়। হরিসংকীর্ত্তনের সার্থকতা ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? যে যে লক্ষণে অধিকারী হইলে, এহেন সার্থক-সংকীর্ত্তন-সাধনের অধিকার সুলভ ও স্বাভাবিক হয়, তাহারই শিক্ষা দেওয়া এই শিক্ষাশ্লোকটির উদ্দেশ্য।

'তৃণাদপি সুনীচেন।'—দীনতায় তৃণ হইতেও নীচ ভক্তের দ্বারা হরি কীর্ত্তনীয় হন। তৃণ হইতেও নীচ হওয়া কি? রূপকার্থ আলোচনায় ইহাই বলা যায়, তৃণ হইতে নীচ মাটি; অতএব তৃণ হইতে নীচ হওয়াই মাটি হওয়া। আপাততঃ তৃণ সকলেরই নীচে, সকলেরই পায়ের তলে। বিষ্ঠার কৃমিটাও তৃণের উপর দিয়া যায়। তৃণ যেন দীনতার আদর্শ হইয়াই জীব-জগতের পদতলে পড়িয়া আছে। কিন্তু মাটি এই তৃণেরও নীচে, সুতরাং মাটি দীনের দীন। সকলের পদানত যে তৃণ, মাটি সে তৃণেরও পদানত! মাটি চরম দীনতার পরম উদাহরণ। মাটির মত বিনীতা বৈষ্ণবী কে? "সর্ব্বংসহা" মাটির দৈন্যের উপমা মাটির উপরে নাই! হরিকীর্ত্তনকারীকে মাটি হইতে হইবে অর্থাৎ মাটির প্রকৃতি সাধন করিতে হইবে। মাটির আদর্শে "মাটি" হইয়া মাটিতে থাকিতে হইবে।

নিন্দার্থক ভাবে 'মাটি' শব্দও অস্মৎসমাজে প্রচলিত আছে। যথা—"লোকটা সঙ্গদোষে মাটি হইয়া গেল" ইত্যাদি। কিন্তু সঙ্গগুণে স্তুত্যার্থক মাটি হওয়াই সাধনের মাটি হওয়া। সাধুসঙ্গ-গুণে তৃণাদপিসুনীচত্ব-সম্পন্ন নাম-সাধক ভক্তের অনায়াসলভ্য হয়।

একটা "নেড়ার তুক্কো" গানে আছে,—

"যদি হবে খাঁটি, হওরে মাটি,
নৈলে মাটি হবে জান্।
হয়ে আছে মরা, তাজ ত্বরা,
মাটির দেহের অভিমান॥"

ফলে বক্ষ্যমাণ শিক্ষাশ্লোকের তাৎপর্য্যালোচনেও এই উপদেশ লভ্য হয় যে, মাটি না হলে খাঁটি হওয়া যায় না। উদারতায় ও দীনতায় মাটি না হইতে পারিলে সাধন-ভজন সব মাটি হয়—মানবজীবনটাই মাটি হয়। "মাটির মানুষ' কথাটি অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ স্তুত্যার্থক বটে, কিন্তু কখন কখন সাত্ত্বিক আত্মসম্মানবোধ, সদ্বুদ্ধিবিবেক ও সাধন-ভজনের অভাবে এই মাটিরমানুষতা অকর্ম্মণ্যতা বা অপদার্থতায় পরিণত হয়। সুকৃষিকার্য্যের অভাবে উর্ব্বর ক্ষেত্র আগাছায় পরিপূর্ণ হয়। কেবল ভগবন্নামকীর্ত্তনাদিতেই সে আশঙ্কা থাকেনা।—অতএব মাটির মানুষ হইবার জন্যও যেখানে নামকীর্ত্তন আবশ্যক, সেখানে স্বভাবতঃ মাটির মানুষ হইয়া যে ভগবন্নাম কীর্ত্তন না করে, সে বড়ই দুর্ভাগা। সে হেলায় "নাল জমী গোভাগাড়" করিয়া ফেলে।—সে 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে'!

যাহাহউক, আপনাকে অতীব দীন হীন অকিঞ্চন জ্ঞান করাই এস্থলে মাটি হওয়া বা তৃণেরও নীচ হওয়া। আমি কিছু না, আমার কিছু নাই; আমি পদে২ অপরাধী! নীতি-পুণ্য-পবিত্রতা, জ্ঞান-ভক্তি--বৈষ্ণবতা, আমার কিছু নাই। আমি এমন দীন—যে দীনতা-বোধেও হীন। আমার এমন অভাব—যে অভাব-বোধেরও অভাব! আমি কৃষ্ণ-বিরহে কাঙাল, কিন্তু ততোধিক কাঙাল সেই বিরহ-বোধ-বিরহে! আমি যে আমার সর্ব্বস্ব কৃষ্ণধন হারাইয়াছি, হায়! সে জ্ঞানও হারাইয়া বসিয়াছি! তাই এত দুঃখেও বুক ফাটেনা, প্রাণে

কাঁদে না, মন গলেনা, নয়ন ঝরে না। কাঁদিলে দুঃখীর দুঃখের লাঘব হয়; যাহার কাঁদিবারও অধিকার নাই, তাহার মত দুঃখী কে? কৃষ্ণ-বিরহে যে আমার কান্না আসে না, এ দুঃখেও যদি একটু কান্না আসিত, তবু কৃতার্থ হইতাম। দুঃখ আমার দূর হওয়া দূরে থাক্, দুঃখ বুঝিলেও একটু বাঁচিতাম। আমি কৃষ্ণধনের কাঙাল বলিয়া যে আমার দুঃখবোধ নাই, ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ!" ইত্যাকার ভাবানুবন্ধ যাহার মনে জীবন্ত হইয়া উঠে, যাহার মনের প্রতিকৃতি গড়ে, সে-ই যথার্থ মাটি হওয়ার যোগ্য; হরি-কীর্ত্তন তাহারই ভাগে ভোগ্য।

শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংস যখন তখন প্রায়ই বলিতেন, "আমি দীনের দীন হীনের হীন।" আহা! অমন দীন হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি দীননাথের ইচ্ছায় সাধন-জগতে অমন ধনী মহাজন হইয়াছিলেন। তাই ভগবান রামকৃষ্ণ আজ তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলে রাম-কৃষ্ণের অবতাররূপে অর্চ্চিত। দীন দেখিলে দীননাথ দান করেন; আর তাঁহার দানে সকল অভাবের অভাব হয়। দীনবন্ধু, কৃপা-সিন্ধু, অনাথশরণ, অধম-তারণ, পতিতপাবন, কাঙালের ঠাকুর, এই সমস্ত আশাময় মধুময় শ্রীভগবন্নাম দীন ভক্তেরই প্রাণের প্রদত্ত; এ অমৃতের প্রকৃত রসাস্বাদ দীন ভক্তেরই ভাগ্যায়ত্ত।

"কাঙালের ঠাকুর শ্রীহরি, সবে বলে।
কে পায় সে হরি-কৃপা কাঙাল না হলে॥
কাঙাল হইয়া দ্বারে আঁচল যে পাতে।
দয়াময় প্রসাদান্ন ভিক্ষা দেন তাতে॥
অদীন উদ্ধত যেবা যায় হরি-দ্বার।
দ্বারী-হস্তে "অর্দ্ধচন্দ্র" ভাগ্যে ঘটে তার।
দীন হীন হয়ে চেয়ে থাক দ্বার পানে।
দেখা দিবে দীনবন্ধু দিবা অবসানে॥"

এই ক্ষণস্থায়িনী আয়ু-দিবার অবসান সময়ে,—সেই কাল-যামিনীর ঘোর-তিমিরা-ঞ্চল-সঞ্চালন-সময়ে—দীনবন্ধু-দর্শন ভক্তি-দৈন্যবানের ভাগ্যেই ঘটে। দৈন্যই ভক্তের ভূষণ, দৈন্যই সাধুর সম্পদ, দৈন্যই সেবকের শোভা। আর সেই শোভা স্বয়ং সেবক-বৎসল মনোমোহনের মনোলোভা। দৈন্য চাই। দৈন্য ভিন্ন মানুষ নরম হয় না। নরম না হলে গঠন হয় না। ঘৃত যেমন ময়দার "ময়ান্"—দৈন্য তেমনই মানব-মনের ময়ান। ময়ান-শূন্য মনো-পিষ্টক ইষ্টকবৎ অখাদ্য হয়। তাহা ঠাকুর-সেবায় দেওয়া যায় না। মোলায়েম্ হওয়া চাই। শক্তের সুগঠন সম্ভবে না। নর-মের প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন-পরিগঠন চলে। অতএব "তৃণাদপি সুনীচ" মাটি হইতে হইবে। মৃদবস্থা ভিন্ন মৃদুতা অর্থাৎ কোমলতা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কৃষ্ণ-সেবার সর্ব্বোপকরণেই মৃদুতার প্রয়ো-জন। সাধুগণের হৃদয় "বজ্রাদপি কঠো-রাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"। যখন বিষম বিষয়-বিগ্রহে বাসনা-নিগ্রহের প্রয়োজন, তখন কঠোর বজ্র, আর যখন আনন্দে-আগ্রহে ভগবচ্চরণার্চ্চনের আয়োজন, তখন কোমল কুসুম!

কৃষ্ণ বড় কোমল ভালবাসেন। গোপীরা তাঁহাদের প্রাণ-কৃষ্ণকে "নিপট-কপট-শঠ-কঠিন কালিয়া" বলিয়া গালি

দিতেন।" কোনং রসিক ভক্ত বলেন, "উহা গালি নহে, স্তুতি; কারণ স্বরূপ-বর্ণনা।" তাই বুঝি কৃষ্ণ নিজে কঠিন বলিয়াই নিজ অভাব পূরাইতে ব্রজগোপীশ্বরী কমলিনীর কমলাধিক সুকোমল হৃদ্-কমলবিলাসী! কোমলের কাছে কঠিন পরাস্ত, কঠিন আয়ত্ত। দয়া ন্যায়কে আয়ত্ত করে, ভক্তি জ্ঞানকে অধীন করে। শীলতায় হৃদয় গলে; চন্দ্রিকায় সিন্ধু উথলে। প্রবাহে পর্ব্বত কাঁদে; লতা তরুকে বাঁধে। তাই প্রকৃতিতে পুরুষ পরিচিত; শক্তিতে চৈতন্য নিয়মিত; ভক্তিতে ভগবান বশীভূত। তাই মহাশ্মশানে রণরঙ্গে শিব-হৃদয়ে শ্যামার নর্ত্তন; আর তাই মদনমোহন-মোহিনীর মানভঙ্গে শ্যামের শ্রীমুখে "দেহি পদপল্লবমুদারম্!"

সে যাহাহউক, দৈন্য ভজনের একান্ত আবশ্যকীয় অঙ্গ; অথচ তাহার স্বাভাবিক সম্প্রাপ্তি ভিন্ন সাধন-সম্প্রাপ্তি সহজ নহে। কেবল করযোড়, গলবস্ত্র, শিরাবনতি, বাক্য-বিনতি, অঙ্গ-সঙ্কোচন, আত্মনিন্দন, ভূ-লুণ্ঠন, ভূরি-অভিবাদন প্রভৃতিতেই প্রকৃত দৈন্য প্রকটিত হয় না। দৈন্য অন্তরের বস্তু। উহার বহির্বিকাশ কেবল শিক্ষাসাধ্য হইলে, তাহা দৈন্যের অভিনয় মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অন্তরে অকৃত্রিম দৈন্যের উদয় হইলে, তাহার ঐ সমস্ত বাহ্যলক্ষণ স্বতঃ বিকসিত হয়। সাধুসঙ্গ, ভগবৎপ্রসঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্র-সেবন, তীর্থভ্রমণ, অনুতাপ বা আত্মাপরাধ-চিন্তনে নিরন্তর অন্তর্বিলাপ, এই সমস্ত অকৃত্রিম আন্তরিক দৈন্য-সিদ্ধির সাধন। ব্যাপার বস্তুতঃ সহজ নহে। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ-পদ্য এই,—

'বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ।
'তৃণাদপি সুনীচে' ঘটালে পরমাদ॥"

যথার্থ দৈন্য বহু-পুণ্য-প্রেরিত, কৃপাময়ের বহুকৃপা-প্রসাদিত, সন্দেহ নাই। কণ্ঠী-তিলক-মালার পলী, কৌপীন-করোয়া-নামাবলী, বৈষ্ণবতার এই সব বাহ্যসজ্জা সহজেই সংগৃহীত হয়, কিন্তু দুর্লভ দৈন্যই একমাত্র অন্তঃসজ্জা। সে সজ্জার অভাবে ভজনপথে পদার্পণ কেবল সাধু-সমাজে লজ্জার কারণ হয় মাত্র।

লোকে বলে "কষ্ট ভিন্ন কৃষ্ণ পায় না" তাহা সত্য, কিন্তু দৈন্যশূন্য কাষ্ঠ-বৈষ্ণবের তপস্যাজাতীয় শতসহস্র কষ্টেও কৃষ্ণ মিলাইতে পারেনা, কিন্তু দীনতার একটু কাতর ক্রন্দনও নন্দ-নন্দনের পদারবিন্দে প্রেম-বন্ধন প্রদান করে! বলিয়াছিত কৃষ্ণ কেবল কোমল ভালবাসেন।

"কোমল-নয়না, কোমলবয়না,
কোমল-হৃদয়া রাধা!
(ওতায়—)
কোমল প্রেমের কোমল বাঁধনে
কঠিন কৃষ্ণ বাঁধা!"

তাই কোমল-বিলাসী কৃষ্ণ নারীচিত্ত-হারী—ভক্তহৃদ্বিহারী! তাই কৃষ্ণের নিত্য ননী-চুরী। তাই বুঝি কৃষ্ণাকৃষ্ট-মতি গোপ-যুবতীরা প্রাণেশ্বরের পাদপদ্ম হৃদ্পদ্মে ধরিতেও সঙ্কুচিতা; আর প্রৌঢ়া গোপিকারা কোমলবক্ষ-বিলেপিত কুঙ্কুম-চন্দনে শ্রীনন্দ-নন্দনের পদ-প্রসাধন-নিরতা। অতএব কেবল কোমলতায় কৃষ্ণ-সেবার ব্যবস্থা।

"চাঁদ নিঙাড়িয়া, অমিয়া ছানিয়া,
রাধা-হৃদি বিধি গঠিল তায়।

তাই দিবানিশি, কোমল-বিলাসী,
শ্যাম প্রেম-শশী তাহে লুটায়॥"

দিশাহারা কবি-লেখনী অগত্যা রাধা-হৃদয়ের সৌকুমার্য্য শশী সুধা সহ কথঞ্চিৎ উপমিত করিয়াছে। ফলে যেখানে সাত্ত্বিক সুকুমারতার চরম পরিণাম, সেইখানেই শ্রীনন্দকুমার সানন্দে বিরাজমান! তাই বিশুদ্ধ দৈন্যের সাত্ত্বিক সৌকুমার্য্যময় ভক্ত-হৃদয় সেই সুখময়েরই সুখাধিষ্ঠান।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, এই যুগলতত্ত্বেরই পূর্ণবিকাশ। তন্মধ্যে ব্রজ-লীলায় মাধুর্য্যের পূর্ণতম পরিণতি, আর ঐশ্বর্য্যে সকল লীলারই গতি ও নিয়তি; কেননা তাহাতেই বহিরঙ্গ সাধক-সাধারণের ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্বের প্রতীতি। কেবল মধুর-রসতত্ত্বাধিকারী অন্তরঙ্গ সাধকেরই সাধ্যতত্ত্ব ভগবন্মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের অতুল কোমলাঙ্গের সুকোমল অঙ্গুলিতে গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ ঐশ্বর্য্য-ভক্তের অতুল আনন্দের কারণ; কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ নবনীত-চোরের নবনীতাধিক কোমল করে মা যশোদার বন্ধন-চিন্তনও মাধুর্য্য-ভক্তের সহনাতীত! কঙ্কর-কুশ-কণ্টকিত গোকুল-গোষ্ঠে গোপালের গোচারণ ভ্রাম্যমান পদযুগলে মাধুর্য্য-ভক্তের হৃদয় পাদুকারূপে পরিবেষ্টিত। মাধুর্য্য-ভক্ত মাথুর-কীর্ত্তনের মর্ম্মভেদী কৃষ্ণবিরহ-বর্ণন আকর্ণন করিতেও অক্ষম! কবি-উক্তি বুঝি এ হেন ভক্তের মুখেই বলিয়াছিলেন,——

"বিনয়ে বারণ করি, এসনা এসনা হরি!
এ হিয়ার মাঝে।
কঠিন পাষাণ-সঙ্গে সুকোমল ও শ্রীঅঙ্গে
ব্যথা লাগে পাছে॥"

ভক্তের কি সুন্দর ভয়! ভক্তের সবই সুন্দর। ভয়ও সুন্দর, সাহসও সুন্দর। কৃষ্ণ-পদ-স্পর্শের সাহসও সুন্দর এবং নিজের খর-কর-স্পর্শের ভয়ও সুন্দর! ভব-ভয়-জয়যুক্ত মুক্ত পুরুষও ভক্তের এবম্বিধ মধুময় ভয়ে ভীত হইবার জন্য লালায়িত! সে যাহাহউক, ফলতঃ কি ঐশ্বর্য্য-ভক্তি, কি মাধুর্য্য-ভক্তি, কিছুতেই তৃণাদপি সুনীচতা ভিন্ন অধিকার লাভ অসম্ভব। অকিঞ্চনত্ব— দীনতা ভিন্ন কোনরূপ ভক্তি-ভজনেরই অধিকার হয় না। অদীন অনধিকারীর নৃত্য-কীর্ত্তনাদি ভক্তিচর্চ্চা কেবল ভাক্তভায় পরিণত, সুতরাং বিনাশের হেতুভূত।

"অধিকারী নহে চাহে ভক্তি আচরিতে।
অচিরে বিনাশ পায় নাচিতে গাইতে॥"

বিদ্যা-বুদ্ধি গুণ-জ্ঞান বিশেষ কিছু না থাকিলেও, একমাত্র দৈন্য থাকিলেই, ভজনাধিকার থাকে; তদ্ভিন্ন অপর সহস্র উপযোগিতাতেও সে অধিকার অধিগত হয় না; সুতরাং অনধিকারচর্চ্চার বিষময় ফল অনিবার্য্য—অপরিহার্য্য।

দৈন্য বৈষ্ণবের বর্ম্ম। অনেক অপরাধের আঘাত উহাতে ব্যাহত হয়। যশের-আকাঙ্ক্ষা বা প্রতিষ্ঠা ভজনের প্রধান শত্রু। অনেক সাধক অনেকদূর উঠিয়াও আবার এই শত্রুর আক্রমণ-আকর্ষণে অধঃপতিত হন। একমাত্র দৈন্য-সৈন্য-সহায়েই এই শত্রুর সংহার-সাধন সুসাধ্য। যে ঠিক ভাবিতে পারে যে, আমি কিছু না, আমার কিছু নাই, তাহার প্রতিষ্ঠা বা যশ-তৃষ্ণা কিরূপে ও কোথা হইতে আসিবে?

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।"
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচী কেবল
নাচে মম হৃদাগারে।
শুদ্ধ সাধু-প্রেম সে অশুচি স্থল
পরশিবে কি প্রকারে॥"

তাই এই প্রতিষ্ঠা-পিশাচীকে সুদীন সাধুরা বড় ভয় করেন। সবলাধিকারী সিদ্ধভক্ত মহর্ষিগণ ইহাকে বড় ঘৃণা করেন।
'অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবং ধ্রুবং।
প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা ত্রয়ন্ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ॥
অভিমান হয় হায়! সুরাপান সম।
গৌরব জানিবে ঠিক রৌরব-উপম॥
প্রতিষ্ঠারে শূকরীর বিষ্ঠা জ্ঞানকরি।
এই তিন পরিহরি ভজ সে শ্রীহরি॥

ভজন-বাধক এই তিনের পরিহারে সাধকের দৈন্যই উত্তম উপায়। যে জানে যে আমার কিছু নাই, তাহার কিসের অভিমান হইবে? সে কিসের গৌরব করিবে? সে কিসের জন্য প্রতিষ্ঠাশা ধরিবে? যেখানে বিষ-বৃক্ষের মূলের অভাব, সেখানে আর ফলের ভয় কি? তাই বলিতে হয়, দৈন্যই সাধকের ধর্ম্ম-রক্ষার বর্ম্ম, আত্মরক্ষার অভয়-আশ্রয়।

দৈন্য বৈষ্ণবের লাবণ্য। বিশুদ্ধ দৈন্য ভিন্ন আর কোন গুণেও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-কান্তি বিকসিত হয় না। তবে দৈন্যের আবার বিশুদ্ধাবিশুদ্ধি কি? স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক দৈন্যই বিশুদ্ধ দৈন্য। আর শিক্ষিত—অভ্যস্ত বা সাধিত দৈন্যও অকৃত্রিমতায় শুদ্ধ ও মধ্যম; কিন্তু বাহ্যসর্ব্বস্ব আভিনয়িক ভাক্তদৈন্যই অবিশুদ্ধ ও অধম। উহা দৈন্যই নহে। কৃত্রিম দৈন্য ও "গিল্টী-সোণা" এক জাতীয় বস্তু। উহা স্বার্থ-সংরচিত চপল চাতুর্য্যের ছদ্মবেশ মাত্র। বরং উলঙ্গ ঔদ্ধত্য ভাল, তবু দৈন্য-ছদ্মবেশিনী ধূর্ত্ততা ভাল নয়। সাধক সর্ব্বদা হরিনাম করিয়া উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। কৃত্রিম দৈন্য বৈষ্ণবের আত্মহত্যা মাত্র।

জন্মান্তরীণ সংস্কার-সিদ্ধ স্বাভাবিক দৈন্য নিখুঁত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তাহা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? ফলে সাধারণতঃ দৈন্য শিক্ষণীয় ও সাধনীয় বটে। অকৃত্রিম দৈন্যের ঐকান্তিক আবশ্যকতাবোধ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহ অন্তর্য্যামী কৃপাময়ের কৃপায় সময়ে সহজেই শিক্ষাধিগত ও সাধিত হয়; আর উহাতেই সাধকের স্বভাব-দৈন্যের অভাব পূর্ণ হয়। এই ঔদ্ধত্য, উদ্দামতা, ধৃষ্টতা, ব্যাপকতা ও প্রগল্ভতার যুগে সাবধানে সাধুসঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে আত্মদীনতাবোধের সাধনা বর্দ্ধন ও পোষণ করিতে হইবে।

যে কোন বিষয়ের অভ্যুদয়-সাধনে অভাববোধই আদি-মূল। অভাববোধ ভিন্ন উপার্জ্জনের আবশ্যকতাই প্রতীত হইতে পারে না। এই দৈন্যও অভাব-বোধময়। যথার্থ অভাববোধ ব্যতীত অকৃত্রিম দৈন্য সম্ভবেনা। অকৃত্রিম দৈন্য ভিন্নও সাধনোন্নতি সম্পন্ন হয় না।

'দুর্লভ জনম পেয়ে কিছুই না করিলাম।
অলসে অবশে হায়! মিছে কাল হরিলাম॥
কিছুই না জানি হায়! কিছুই না বুঝি।
খুঁজিতে এসেছি যারে, তারেও না খুঁজি॥
হৃদয় শ্মশান মোর——মন মরুভূমি।

কড়ার ভিখারী হয়ে ভব-হাটে এমি ॥
যুটাতে খেয়ার কড়ী নাহিক যোস্তর।
মানস-প্রদেশে মোর মহা মন্বন্তর ॥
নৈতিক নগরে মোর মহামারী ঘোর।
বিরাজে অরাজকতা হৃদিরাজ্যে মোর ॥
অবিচার-অত্যাচার—নিত্য হাহাকার।
নিরাশ্বাস—দীর্ঘশ্বাস—সার অশ্রুধার ॥
কিছুনই—কিছুনই—কিছু আমি নই।
দীনহীন অধীন হইনু হায় কই ॥
দীন হয়ে না ভজিনু দীননাথ হরি।
মিছে কাল হরিলাম, হরি হরি 'হরি ॥"

এইরূপ জীবন্ত ভাব-প্রবাহ, চিন্তা চর্চ্চা, ধারণা ও সাধনাভিব্যঞ্জনাই দৈন্যের চারু-চিত্র। এবম্বিধ অকিঞ্চনতা-বোধ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইলেই দৈন্যের প্রকৃত মূর্ত্তি খোলে। কিন্তু দৈন্যের সঙ্গে আশা চাই। আত্মোন্নয়নে উৎসাহ চাই। সাধন-ভক্তিতে আশ্বাস ও দৈন্যের শক্তিতে বিশ্বাস চাই। নচেৎ অসহায় দৈন্য সাধককে অবসন্ন করিয়া বরং হিতে বিপরীত ঘটাইতে পারে। "আশাবদ্ধতা" সিদ্ধির প্রধান উপাদান। এইজন্য আশার আহার দিয়া দৈন্যের পালন আবশ্যক। আত্মঊর্দ্ধোঃঅনন্ত বিস্তারিত উচ্চাদর্শ দর্শনে দৈন্যের বিবর্দ্ধন-প্রয়োজন। সাংসারিক সন্তোষ সাধনে যেমন নিম্নাদর্শ দর্শন প্রয়োজন, দৈন্যের বিকাশ-বিবর্দ্ধনে তদ্রূপ উচ্চাদর্শ দর্শনের প্রয়োজন। সাংসারিক সন্তোষ সাধনার্থে নিম্নে তাকাইলে যদি দৈন্যের অঙ্গে আঘাত লাগে, তবে অমনি উপরে চাহিয়া সে আঘাত সামলাইয়া নিতে হয়। সর্ব্বোপরি ভগবন্নামই দৈন্যের পরম রক্ষাকর্ত্তা জানিতে হইবে। দৈন্যবধার্থে অহঙ্কার তাঁহার যে কোন সৈন্যই প্রেরণ করুক্, ভগবন্নাম-দুর্গাশ্রয়ে তাহা নিশ্চিত নিরাপদে থাকে।

অধুনা কালধর্ম্ম-বশে বোধহয় অনেক সাধকবেশীর স্বগত আত্মোক্তি এইরূপ,— "আমি বাস্তবিক দীন নহি; ধনী না হইলেও অন্ততঃ 'মধ্যবিত্ত' সন্দেহ নাই। পড়া-শুনা দেখাশেখা একরূপ মন্দ হয় নাই। গীতাখানি প্রায় আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ; অন্যান্য অনেক শ্লোক-শাস্ত্র মুখস্থ। মাসিক পত্রিকার (লোকে বলে) সুলেখক। আবার প্রয়োজনমত ধর্ম্মপ্রচারক, সুতরাং (লোকে বলে) সুবক্তা। আমার মুখে হরিকথা শুনে অনেক পাষাণ-চক্ষেও জোয়ার আসে। আমার মুখের কীর্ত্তন-গানে অনেক শুষ্ক হৃদয় সুধায় ভাসে। আর মোটামুটি পাপ একরূপ করি না বলিলেই হয়। মাছ-মাংসে লোভ থাকা সত্ত্বেও জোর করে ছাড়িয়া দিয়াছি। প্রায় মশা-পিপড়াটিও মারি না। মিথ্যা কথার হাত এড়াইবারও বিশেষ চেষ্টায় আছি। গুরু কৃপায় ইন্দ্রিয় সংযমাদিও স্বকিঞ্চিৎ সুসাধ্য হইয়াছে। ভগবৎপ্রসঙ্গে কখন কখন বেশ কান্না পায়। চেহারাটাও আমার বিবেচনায় (ভগবৎ কৃপায়) অন্ততঃ অভক্তের মত নয়। কয়েকবার কয়েকজনে আমার শিষ্য হতেও চাহিয়াছিল। তবে যেন আমি কিঞ্চিৎ হইয়াছি। অন্ততঃ নেহাৎ দীন নিশ্চয়ই নহি। আমি ইহা জানি, লোকেও জানুক্; কিন্তু আমি যে জানি, তাহা লোকে নাজানুক্; আমাকে লোকে ধনসত্ত্বেও পরম দৈন্যপরায়ণ সাধু বলিয়া জানুক্। এই "সাধু" শব্দটি মনে আসাতেও একটু লজ্জা আসে বটে, কিন্তু

নির্লজ্জ। মন লোক সাধুবাদেরই চির-ভিখারী। ভগবান যাহা ভাবুন, সে ভাবনা বড় আসেনা, লোকে ভাল ভাবিলেই যেন ভবের লোকযাত্রা সার্থক হইল! এটী যে মহাভুল, তাহা বুঝি, কিন্তু মনের সঙ্গে যুঝিয়া পারিয়া উঠিনা। প্রতিষ্ঠা-মদিরার মোহ-মাদকতায় অনায়ত্ত হইয়াও দৈন্যের অভিনয় করিতে থাকি। অন্ততঃ সামাজিকতার শিষ্টাচারের প্রতিষ্ঠাশাবিষ্ট হইয়াও আত্মিনয়িক দৈন্যবিশিষ্ট হইয়া পড়ি। নিজকে নিষ্কিঞ্চন না জানিলে খাঁটি দৈন্য আসেনা, তবে সুকিঞ্চন জানিয়াও এই যে দর্পিত দৈন্য, ইহা অতি অদ্ভুত পদার্থ বটে! ইহার অভিনয়ের নেশা এ জন্মে কাটিবে কিনা, তাহা সেই জন্ম-জন্মান্তর-নিয়ন্তাই জানেন। কখনও বা আপন কৃত্রিমতায় আপনি বিরক্ত হইয়া বলি, "ভগবন্! রক্ষা কর, একটু শুদ্ধদৈন্যের স্বর্গীয় সমীরণ দিয়া এ অভিমানতপ্ত হৃদয় জুড়াও।" তা এই খাঁটি দৈন্যের প্রার্থনাটিও একটু খাঁটি দৈন্য কিনা; তাই ভগবান একটু শুনেন; তাই একটু উঠি; কিন্তু আবার ভুলি, আবার পড়ি, আবার ভুগি। এই দশাতেই দিনে দিনে দিন যাইতেছে।" বস্তুতঃ অনুতাপ ব্যতীত যথার্থ দীনতারূপ বৈষ্ণবী ধনবত্তা লাভ হয় না। অনুতাপ, সাধকের আধ্যাত্মিক জন্মের প্রসব-বেদনা। আধ্যাত্মিক জাতকই "তৃণাদপি সুনীচ"—সদা হরিকীর্ত্তনাধিকারী সুদীন বৈষ্ণব। অদৈন্য-দোষে যে অহঙ্কারী, সে তত্ত্বতঃ নামকীর্ত্তনে অনধিকারী, সুতরাং রসতত্ত্বাস্বাদনে তাহার অধিকারিত্ব সদূর-পরাহত।

"অহঙ্কারী পাপী যারা,
আমার নাগাল্ পায়না তারা,
দীনজনের বন্ধু আমি জগতে জানে"

ভগবদুক্তি স্বরূপ এই গীতি দীনভক্তের প্রীতি-প্রতিধ্বনিময়ী আশার ভাষা। এতৎ-প্রত্যুত্তর স্বরূপ ভগবানের প্রতি অদীন অধমের একটি উক্তি-গীতিও এইস্থলে নিবেদন করিলাম।

'দীনবন্ধু তুমি হরি জানে জগতে॥
হও এবার অদীনের বন্ধু, পার তুমি সব্ হতে।
দীন যে, সে ভাগ্যবান, তার বোঝা ভগবান!
বহু যে আত্মমান কালক্রমাগতে।
ভাগ্যবানের মুটেগিরি, চিরকাল্‌টা কর্‌লে হরি
হতভাগ্যের বেলায় বুঝি হতবল হে গিরিধারি!
দেখাও এবার নূতন হাত,
নূতন নাম "অদীননাথ;"
তেলা-মাথা রেখে এ হাত,
ঢাল নেহাৎ রুক্ষ মাথে॥
দীনতা-ধনে যে ধনী,
দীন সেত নয়, সেইত ধনী,
অদীন যেজন, সুদীন সেজন,
মহাজনের বিচার মতে।
(এবার) আসল দীনের হওহে নাথ,—
এই মিনতি ও পদে॥"

"তরোরপি সহিষ্ণুনা।"——

তরু হইতেও সহিষ্ণু ভক্তের দ্বারাই হরি সদা কীর্ত্তনীয় হন। সহিষ্ণুতাও দৈন্যেরই অঙ্গবিশেষ। অসহিষ্ণুতায় দীনতা রক্ষা পায়না। উদ্বেগ, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য প্রভৃতি অসহিষ্ণুতার ফল দীনতার শীতল-শান্তিময়-পবিত্রতাময় ভাবকে নষ্ট করে। দীনতার রক্ষণ-পোষণার্থে সহিষ্ণুতার অত্যাবশ্যকতা

যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টতা ভিন্ন দৈন্য টিঁকেনা। যে ভক্তিভরে যথার্থ দীন, সে তাহার ভাবেই লীন, তার কি আর মাথা তুলিবার যো আছে? অসহিষ্ণুতার তরল চাপল্য তাহাতে সম্ভবে না; সুতরাং——

"কর যাহা ইচ্ছা যায়।
অধমেরে রেখো পায়॥"

দৈন্যসম্পন্ন শান্ত ভক্তের এই ভাব। "কর যাহা ইচ্ছা যায়'—অতএব ঈশ্বর-কৃত জগতের যে কোন ঘটনায় অধৈর্য্য-চঞ্চল হইতে আর ভক্ত দীনের অধিকার নাই।

অসহিষ্ণুতা অবশ্য দুঃখের অনুভূতি। ভগবদিচ্ছাকৃত কোন ঘটনা বা কার্য্যেই অসহিষ্ণুতাবশে দুঃখিত হওয়া দীন ভক্তের পক্ষে অসম্ভব; সুতরাং অসহিষ্ণুতার অভাব অর্থাৎ সহিষ্ণুতা যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট—সত্ত্বগুণ-ভূয়িষ্ঠ সুদীন সাধকের স্বাভাবিক। অতএব স্বভাব-সহিষ্ণুতার অভাবে যদি সহিষ্ণুতা শিখিয়া সাধিয়া নিতে হয়, তবে তরুই তাহার স্বাভাবিক শিক্ষাগুরু। তরুই অনুপম আত্মাদর্শ প্রদর্শনে ত্যাগস্বীকার, নিঃস্বার্থ পরোপকার ও ঔদার্য্যভূষিত ধৈর্য্যগুণের নৈসর্গিক নীরব আচার্য্য।

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এ বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,——

"উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইরূপে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছুনা বলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহ আনে করয়ে রক্ষণ॥"

আমরা বাল্যকালে পদ্যপাঠে কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রচিত "বৃক্ষশ্রেণী" প্রবন্ধে পড়িয়াছি,—

"কঠিন অপ্রিয়ভাষ করিলে শ্রবণ,
রক্তজবা-রাগ ধরে মনুজ-লোচন;
ইহাঁদের শিরোপরে লোষ্ট্র নিক্ষেপণে,
সুফল প্রদান করে বিনম্র বদনে!"

ইত্যাদি। ফলে বৃক্ষের এই সমস্ত নর-শিক্ষণীয় স্বাভাবিক সাধু-গুণাবলী অনেক কবিই আনন্দে গাহিয়াছেন।

"তরুর কি সহিষ্ণুতা——উদারতা-ব্রত,
ছেদকেও ছায়া দানে নাহয় বিরত!
মার খেয়ে ফল দেয় রসনা-তোষণ;
মার খেয়ে নাম দেন নিতাই যেমন!
কীট-পক্ষী-কত প্রাণী—শ্রান্ত পান্থ কত,
শিরে-উরে-ক্রোড়ে নিয়ে সেবে সাধ্যমত।
রোদ বৃষ্টি-শীত-বাত সহি শিরোপরে।
রোদ-বৃষ্টি-শীত-বাতে বাঁচায় অপরে!
নিঃস্বার্থ সর্ব্বসেবক—সর্ব্বহিতকারী,
শুকায়ে মলেও নাহি চাহে বিন্দুবারি।
উদারতা-সহিষ্ণুতা-শিক্ষা-আবশ্যক—
হয় যার, তরু তার সুযোগ্য শিক্ষক।
বিনা বাক্যে বৈষ্ণবতা প্রচারে নিয়ত;
সাধকের শিক্ষাগুরু তরু স্বভাবতঃ।"

আর্য্য-নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,——

"অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃপার্শ্বাগতাচ্ছায়াংনোপসংহরতিদ্রুমঃ॥
অতিথিসৎকার কর শত্রুও আসিলে ঘরে।
ছেদকের পার্শ্বগতা ছায়া তরু নাহি হরে॥

তরুর নিকট গৃহী-সন্ন্যাসী উভয়বিধ সাধকেরই অনেক শিখিবার আছে। সাধু-সেবা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ। আবার সাধারণতঃ

অতিথিসেবা গৃহীর পরমধর্ম্ম। সগৃহাগত আততায়ী শত্রুরও সেবারূপ উচ্চনীতির তরুই নীরব শিক্ষাদাতা।

তরুর অভিনন্দনসূচক কতিপয় ভাবময় পরমার্থ-সংগীতও বঙ্গীয় সংগীতকাব্যকে সুশোভিত করিয়াছে।

"তরু বলরে বল।
কে তোরে সাজা'ল দিয়ে পত্র-পুষ্প-ফল ‖
১। বলরে তরু কার উদ্দেশে,
গগন ভেদকরে যাস্ উর্দ্ধদেশে,
হাল সংসারে এসে কার প্রেমে অচল ‖
২। কার প্রেমে প্রভাতকালে,
ধরা ভেসেযায় তোর নয়নজলে?
নাজেনে লোকে বলে শিশির-পড়া-জল ‖'
(ইত্যাদি।)

আবার——"বল্ দেখিরে তরু-লতা!
(আমার) জগৎজীবন রৈল কোথা?
(তোরা) পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে!"
(ইত্যাদি।)

আহা! গান ত নয়, যেন মোহ-মন্ত্র! ভক্ত সাধকের কি হৃদয়তর্পণ! প্রেমিক-প্রাণের কি পীযূষ-প্রলেপন!

সে যাহাহউক, তরুর কাছে যত ভাব, যত শিক্ষা বা যত সাধনাই আমাদের লভ্য হউক, মুখ্য লক্ষ্য বা লভ্যই সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা তৎসমস্তেরই সার স্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নির্গত শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকে তরুর নিকটে পরম প্রয়োজনীয় দৈন্যের মূলভিত্তি স্বরূপ—সাধকের আত্মরক্ষাকবচ স্বরূপ এই সহিষ্ণুতা শিক্ষারই বিশিষ্ট আদেশ উপদেশ।

সহিষ্ণুতা অর্থ সহ্যকরার শক্তি। সাধারণতঃ "ধৈর্য্যগুণ" পদও প্রায় ঐ তত্ত্বেরই প্রকাশক। লোকে প্রায়সঃ প্রবাদ-কথায় বলে "যে সয়, সেই রয়।" এস্থলেও সেই তাৎপর্য্য খাটে।

জগতে সহ্য করিতে হয় দুঃখ। "অসহ্য সুখ"ও একরূপ আছে, কিন্তু তাহা অনুভূতির তীব্রতায় দুঃখেরই প্রকারভেদ মাত্র। ফলে যে অনুভব দুঃখধর্ম্মী, তাহাই অপ্রিয়; যাহা অপ্রিয়, তাহাই অসহ্য। অসহ্যকে সহ্যকরাই ধৈর্য্যগুণ বা সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা-সাধন ভিন্ন এই অসংখ্য পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক-দুর্ভোগ-সঙ্কুল সংসারে চিত্তের শান্তি ও আনন্দ স্থির রাখিয়া, সেই শান্তিস্বরূপ আনন্দময়ের উপাসনা কিরূপে সম্ভবে? সহিষ্ণুতার ফলে চিত্ত-প্রসন্নতা না পাইলে, সেই চিত্তচোর হরির নিত্যপ্রসন্ন মুখ দর্শন বিষণ্ণ ও অসম্পন্ন ভুরিভজনেও ভাগ্যে ঘটেনা। অসম্পন্ন ভজন আর উন-মাপের ওজন ফলিতার্থে ভজনও নহে, ওজনও নহে।

"সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্‌নে আমারে।
ও তা ছোঁবনা করে।
না পেলে প্রেম ষোলআনা,
আমারত মন ওঠেনা;
(আমি) ষোলকলা কালোশশী
প্রেমের অম্বরে ‖"

প্রাণেশ্বরকে ষোলআনা প্রাণটাই দেওয়া চাই। গোটা প্রাণটা তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে নিবেদন করিয়া, পরে সেই প্রসাদ সবকে দাও,—সংসারে বিলাও। ভগবান পাট্টাই স্বত্ব চাননা, মূল-মালেকত্ব চান; সুতরাং

একেবারে দানপত্র উৎসর্গ করিতে হইবে। তবে কিনা, তাঁর জিনিস তাঁরেই দেওয়া—ফলিতার্থে গ্রহণ মাত্র। আমার অন্তর-রাজ্য ভগবদ্গ্রাহ্য হইলেই, আমি যাহা পাইবার তাহা পাইলাম। কৃতার্থতাই বলুন আর চরিতার্থতাই বলুন, মানুষের ভাষার যে শব্দ উপযুক্ত বুঝেন, তাহাই ব্যবহার করুন, মোটকথা, জীবের একটা আত্মগত চরম ও পরম লাভের কল্পনা আমিত্বসর্ব্বস্ব জীবত্ব-ধর্ম্মে স্বাভাবিক। ভগবানকে দেওয়া হইলেই আমারও পাওয়া হইল।

ভগবানকে আত্মসর্ব্বস্ব সমর্পণের প্রক্রিয়াই ভজন। অষ্টপ্রহর ভজনে না থাকিলে তৎসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

"উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে
উপাসনা মানা নাই।
ওঠা বসা খাওয়া শোয়া এ সবাইতে
উপাসনা আনা চাই॥
ভোজন আমার আহুতিপ্রদান,
শয়ন আমার সাষ্টাঙ্গপ্রণাম,
ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তাঁর,
প্রতি কথা মোর মন্ত্র।
প্রতি অঙ্গভঙ্গি মুদ্রা-বিরচন,
যে ভাবেই বসি, সেই ত আসন,
যে চিন্তাই করি, তাঁরি ধ্যান ধরি;
এ জীবন তাঁরি যন্ত্র।"

ইহাই আত্মসমর্পণ। সবেতেই আছি, অথচ কিছুতেই নাই—কেবল ভগবানেই আছি। অর্থাৎ সবই ভগবান অথবা ভগবানেই সব। এ বিশ্বের নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণ—সবই তিনি। এই জগৎ-রূপ ঘটের তিনিই কুম্ভকার, তিনিই মাটি। ফলে তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ। এই ভাব সিদ্ধ হইলেই জীবন উপাসনাময় হয়। নিবেদিতাত্ম সিদ্ধ ভক্তের সর্ব্বকার্য্যই ভগবদ্ভজন মাত্র।

"প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্॥"
প্রাত হতে সন্ধ্যাকাল, সন্ধ্যা হতে প্রাতঃকাল,
যাহা কিছু করি,
সে সকলি সুনিশ্চয়, তোমারি পূজন হয়,
জগন্নাথ হরি!

ইহাই আমাদের আদর্শ। তবে কিনা, আত্ম-নিবেদন ভিন্ন এ উক্তির উপযুক্ত অধিকারী হওয়া যায়না। আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া, গুরু-কৃপা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; তারপর যত দিনে বা যত জন্মেই হউক, ভগবদিচ্ছায় যথাসময়েই ভগবানের সর্ব্বকাল, সর্ব্বভাব ও সর্ব্বকর্ম্মগত ভজন-সম্পদ লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এই জন্যই সহিষ্ণুতার আবশ্যক। সহিষ্ণুতা ভিন্ন এ নিত্য ভজনের আশা নাই। দিবারাত্রির মধ্যে কয়েক বার কয়েক মিনিটের জন্য একটু সাময়িক ভজনে বসিলেও, যত রাজ্যের বিঘ্ন, বাধা, উৎপাত, উন্মনস্কতা যেন পরামর্শ করিয়া দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়! সব সময়ে সব কাজের মধ্যেই উপাসনা চালান কি সহজ কথা? তবে কিনা গুরু-কৃপা হইলে, সকল অসাধ্য সিদ্ধ ও সকল অসম্ভব সম্ভাবিত হয়।

এ সাধনে সহিষ্ণুতা প্রধান উপকরণ; অসহিষ্ণুতা প্রধান অন্তরায়। সংসার-সমুদ্র, সংসার অরণ্য, সংসার মরুভূমি, ইত্যাদি অনেক বাক্য সাহিত্যের বাজারে প্রচলিত

আছে। অর্থাৎ কিনা সংসার কষ্টময়, বিপদ-সঙ্কুল, সুতরাং পদে পদে সহিষ্ণুতার প্রকট পরীক্ষাস্থল। সহিষ্ণুতার সহায়তায় সংসার-সঙ্কটে শান্ত সমাহিত না থাকিতে পারিলে সেই সংসার-সারধনের সাময়িক সাধনও সম্ভবেনা; তবে সর্ব্বকাল, সর্ব্বভাব ও সর্ব্বকার্য্যগত সাধনের আর কথা কি?

সত্বাদি গুণত্রয় ভেদে সহিষ্ণুতাও তিন-প্রকার। কষ্টের অনুভূতি স্পষ্ট বিদ্যমান, অথচ ভয়াদি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ফলে অধিকতর কষ্টের আশঙ্কায় বা ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির আশায় কোন উত্তেজনা সহিয়া থাকা তামসী সহিষ্ণুতা। আর কষ্টানুভূতি সত্বেও যশের আশায় বা পুণ্যাদির আশায় যে সহিষ্ণুতা, তাহা রাজসী। ফলতঃ সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গলেচ্ছা-সম্ভূত শুভাশুভ সমস্ত ঘটনাতেই যে সহিষ্ণু ভক্ত সাধকপ্রবরের স্বতঃসিদ্ধ নিষ্কাম সহিষ্ণুতা, তাহাই সাত্বিকী-সহিষ্ণুতা। ভক্ত-গুরুর কাছে সেই সহিষ্ণুতাই শিক্ষণীয়। নিত্য ভজনার্থ চিত্ত-গঠনের প্রয়োজনে সেই সহিষ্ণুতাই সাধনীয়।

ভক্ত কেন অসহিষ্ণু হইবেন? ভক্ত জানেন, অসহিষ্ণুতার উত্তেজক সংসারের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টই সেই বিশ্বগুরুর হাতের বেতের বাড়ি! সেই বিশ্ব-চিকিৎসকের বিকট বিষ-বড়ী! বুদ্ধিমান ছাত্র এবং জ্ঞানবান রোগী কখনও শিক্ষক-দত্ত দণ্ড পাওয়ায় এবং বৈদ্য-দত্ত বিস্বাদ ঔষধ খাওয়ায় অসহিষ্ণু হন না। পতিপ্রেম-বিহ্বলা সতী স্ত্রী প্রিয়তমের প্রতিকার্য্যই প্রেম-মন্ত্র-মুগ্ধ নয়নে সতত সুন্দর দেখে। সুন্দরতম প্রিয়তমের প্রতি কার্য্য সুন্দর, প্রতি কথা সুন্দর; চক্ষের দৃষ্টি, অঙ্গের ভঙ্গি, সব সুন্দর! প্রিয়তমের নিশ্বাসটি—আভাসটি পর্য্যন্ত সুন্দর-সুমধুর!

আহা! বঙ্কিমচন্দ্র কি মধুরই গাহিয়াছেন,———

"এই মধুমাসে, মধুর বাতাসে,
শোনলো মধুর বাণী।
এই মধুবনে শ্রীমধুসূদনে
দেখলো সকলে আসি॥
মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর হাসে।
মধুর আদরে মধুর অধরে
মধুর মধুর ভাসে॥
মধুর শ্যামল বদন-কমল,
মধুর চাহনী তায়।
কনক নূপুর যেন মধুকর,
মধুর বাজিছে পায়॥
মধুর ইঙ্গিতে আমার সঙ্কেতে
কহিল মধুর বাণী।
সে অবধি চিতে মাধুরী হেরিতে
ধৈরয নাহিক মানি॥"

সতীধর্ম্মী ভক্তের নিকট প্রিয়তম পতি ভগবানের সবই সুন্দর। তাঁহার দণ্ড-পুরস্কার, নিগ্রহ-অনুগ্রহ, সব সুন্দর। তাঁহার কার্য্য, তাঁহার তত্ত্ব বা তাঁহার স্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময়—মধুময়! তাঁহার সর্ব্বতত্ত্বসমন্বিত নামতত্ত্ব———

"মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং।"

ভগবানের নাম-রূপ (ধ্যান-মন্ত্র) সাধকের সর্ব্বস্ব। তাঁহার বিশ্ববিমোহন রূপও অনন্ত মধুময়।

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।

মধুগন্ধী মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।"
মধুর মধুর বপুটি বিভুর,
মধুর মধুর বদন মধুর।
মধুগন্ধী মৃদু হাসি সুমধুর,
মধুর মধুর মধুর মধুর!

যাঁহার সব মধুময়, সব মঙ্গলময়, তাঁহার কার্য্যে কি কখনও দুঃখ হয়? দুঃখদ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব কি সে সুখস্বরূপে সম্ভবে? অমৃত-বৃক্ষে কি বিষফল ফলে? জীবের যে দুঃখ, তাহা কেবল অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার ফল। ভক্তিভরে ভগবৎপদে প্রপন্ন হইলে সে অবিদ্যা কাটে। ভগবান নিজেই কাটিয়া দেন। অবিদ্যা ভগবানেরই জীবাবরণী মায়া। প্রপন্ন ভক্তের জৈবিক তত্ত্বের উপর হইতে ভগবান আপনি আপনার সে জাল গুটাইয়া লন। গীতায় স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"
আমাতে প্রপন্ন যারা।
এ মায়ায় তরে তারা॥

অবিদ্যা-মায়ামুক্ত সাত্ত্বিকীসহিষ্ণুত্ব-শক্তিযুক্ত মুখ্য ভক্তের আর দুঃখের হেতু থাকেনা। সে নিত্যপ্রসন্নচিত্তে স্বচ্ছভাবে প্রতিকার্য্যেই ভগবানের নিত্যভজনের অধিকারী হয়। যাহা মন্দ, তাহাই দুঃখদ; যাহা দুঃখদ, তাহা অবশ্য অপ্রিয়; সুতরাং যাহা অপ্রিয়, তাহাই অসহ্য। ভক্তের চক্ষে ভগবানের বিশ্বৈশ্বর্য্য-লীলা-মূর্ত্তি স্বরূপ এই জগতের কিছুই মন্দ বোধহয়না। সবই সুন্দর-মধুর-সুখদ; সুতরাং কদাচ কিছুতেই অপ্রিয়তার আশঙ্কা নাই; অতএব অসহিষ্ণুতার অবকাশ কোথায়? এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সাত্ত্বিক সহিষ্ণু দীন ভক্তকেই নিত্য হরি-সংকীর্ত্তনের উত্তম অধিকারী বলিয়াছেন। বিশেষতঃ অসহিষ্ণুতায় চিত্ত উদ্বিগ্ন ও অপ্রসন্ন হয়। ঐহিক বিষয়ে উদ্বিগ্ন ও অপ্রসন্ন চিত্তের উপাসনা সে নিত্যানন্দধামে পঁহুছায় না। সংকীর্ত্তন অতি শ্রেষ্ঠ উপাসনা। অন্তরে বাহিরে সদা স্থূল ও সূক্ষ্মসংকীর্ত্তন ভক্তের জীবনাবলম্বন। সেই অবলম্বন সুদৃঢ় রাখিবার জন্যই এই সহিষ্ণুতার সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। এতাবতা শত দার্শনিকতত্ত্ব-বিচার অপেক্ষা একটি উপযুক্ত উদাহরণের ফলোপধায়কতা অধিকতর বলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু এই সুগহন শিক্ষা-বিষয়ে কেবলমাত্র বলিয়াছেন, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।"

তবে অসহিষ্ণুতার একটি অবকাশ আছে;—সেটি ভগবদ্বিরহ। বিরহ সহজে সহ্য হইলে আর মিলনের জন্য ব্যগ্রতা থাকে না। "লালসা" হইতে "মৃত্যু" পর্য্যন্ত বিরহীর উত্তরোত্তর দশা-বিপর্য্যয় কেবল অসহিষ্ণুতার ফল। ভগবদ্বিরহে অস্থির-ব্যাকুল-উন্মত্ত হইয়া মহাপ্রভু যে "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" ভক্ত-লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাতেই সাধকের পক্ষে অসহিষ্ণুতার সাত্ত্বিকী কার্য্যকারিতা সর্ব্বতোভাবে শিখাইয়াছেন। ঐহিক বিষয়ে মহাপ্রভুর যেমন অসাধারণ হইতেও অসাধারণ সহিষ্ণুতা, ভগবদ্বিরহে তদ্রূপ উন্মাদিনী অসহিষ্ণুতা।

ঐহিক বিষয়ে ভক্তের অসহিষ্ণুতা অসম্ভব। ঐহিকে ভক্তের বাসনাই নাই। বাসনা কেবল সেই কমলাসনার কোমল ক্রোড় লাভে

শ্রীপদকমলে! ঐহিক বিষয়ে যা হবার তা হউক, কিন্তু শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম হৃদ্‌পদ্মে চিরবিরাজিত রহুক্, ভক্তের ইহাই আশা; আর সর্ব্বাশা ইহাতেই কেন্দ্রীভূত।

ঐহিক লোক ঐহিক সামান্য বিষয়ের বিরহে অসহিষ্ণু হয়। কিন্তু ভাগবত জন ঐহিক বস্তুর বিরহ-মিলনে সমভাবাপন্ন।

"সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা
লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।" (গীতা)

কিন্তু ভগবদ্বিরহ ভক্তের অসহ্য; কারণ সর্ব্বমধুময় ভগবানের বিরহটিই কেবল অমধুর, অপ্রিয়, অরুন্তুদ।

উত্তরচরিতের শ্রীরামচন্দ্র সীতার সর্ব্বপ্রিয়তা ও সর্ব্বমধুরতা বর্ণন করিয়া অবশেষে বলিলেন,——

"কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যো ন বিরহঃ।"

অর্থাৎ আমার প্রিয়াতে অপ্রিয় কিছুই নাই, কেবল প্রিয়ার বিরহই অতি অসহ্য;—সুতরাং অপ্রিয়। ভগবান সম্বন্ধেও ভক্তের প্রাণও এইরূপ বলে;——আমার প্রাণকৃষ্ণের সমস্তই প্রাণতোষক, কেবল বিরহই প্রাণ-শোষক; সুতরাং অসহ্য। ভক্তের অসহিষ্ণুতা এই স্থানে। এস্থানে বরং সহিষ্ণুতারই নিন্দা।

এ বিষয়ে স্বয়ং শ্রীমতীর শ্রীমুখের "করুণ জবাব" বিল্বমঙ্গলের বিশ্ব-বৈষ্ণব-বিমোহিনী বীণাধ্বনিতে শুনুন;—

"যক্তোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলতা
গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা।
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা
যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ॥
ধর্ম্মঃসোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো।
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং
জীবামি পাপীয়সী॥"

যার আলিঙ্গন-সুখসঙ্গ-আশাভরে।
গুরু-গঞ্জনার লজ্জা গণিনি অন্তরে॥
প্রাণাধিকা সখী তোরা—তোদিগেও হায়।
দিয়েছি কতই কষ্ট তাহারি আশায়॥
সাধ্বী রমণীর যাহা পরম ধরম।
তাহারি আশায় তাও করিনি গণন॥
তবু বেঁচে আছি হয়ে উপেক্ষিতা তার।
পাপীয়সী আমি—ধিক্ ধৈরযে আমার॥

এ বিষয়ে আধুনিক বঙ্গ-কবিও রাধা-উক্তিতে ভক্ত-হৃদয় কাঁদাইয়া গাইতেছেন,—

"প্রাণাধিক শ্যাম-বঁধুর বিরহে,
দহে দাবানল সম।
নিলাজ এ প্রাণ তবু দেহে রহে;
ধিক্! এ ধৈরযে মম॥
যেত যদি প্রাণ প্রাণনাথ-সনে,
চকোরী পাইত চন্দ।
চিত-চাতকিনী পেত নবঘনে,
বিরহে মিলনানন্দ॥
ধৈরয আমার বিষম বিপক্ষ,
দেহে প্রাণ রাখে ধোরে।
আছে অভাগীর কে হেন স্বপক্ষ,
বধিয়া বাঁচাবে মোরে॥"

অথবা——

"মরণরে! তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঁহু, মেঘ জটা-জুট,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
মরণরে! তুঁহু মম শ্যাম সমান॥"

যেখানে মৃত্যুই প্রার্থনীয়, সেইখানে নই

সহিষ্ণুতা অনাদরণীয়। তখন অসহিষ্ণুতার বিহ্বলতা ও উন্মত্ততাই সাধকের সর্ব্বস্ব। সে অসহিষ্ণুতায় স্বয়ং ভগবানের সহিষ্ণুতা পরাস্ত হয়! ভক্তপ্রেমাধীন ভক্তিপ্রিয় ভগবান সেধে এসে আপনি ধরা দেন। তখন ভক্তপ্রেম-পদ্ম-মধুপ মধুর হরি আপনি ভক্তের হৃদয়মাঝে উদয় হন।

হায়! কোথায় আমরা, আর কোথায় সেই পরমর্ষিজন-স্পৃহণীয় "ভগবদ্বিরহ"! আমাদের এখন বিরহেরই বিরহ! আমাদের এখন কৃষ্ণ-বিরহের সঙ্গেই মিলনের প্রয়োজন। কৃষ্ণ-মিলন হয়ত আমাদের শতজন্মদূরবর্ত্তী নিশার স্বপন! আমরা কৃষ্ণ-বিরহ-বিরহী বলিয়াই ঐহিক অসংখ্য বিরহে অনুক্ষণ অসহিষ্ণু। অতএব সহিষ্ণুতার শিক্ষা আমাদেরই একান্ত কর্ত্তব্য। হরিবিরহ জাগাইতে হরিনামই আমাদের সম্বল। বিরহ ত আছেই, কেবল বোধের অভাব। বলিতে কি, হরি যেন এখনও আমাদের "হরির খুড়ো"! নামেতে তিনি এবং নামই তিনি বলিয়াই ক্রমিক নাম-সাধনে "নামে রুচি" অর্থাৎ তাঁহাতে রুচি হইলেই, তাঁহাকে ক্রমে প্রিয় লাগিবে, মধুর লাগিবে, আর ক্রমে বিরহও জাগিবে। বিষয়-বিক্ষুব্ধ চিত্তে নাম-সাধন শুধু শব্দ-সাধন হইয়া পড়ে; এই জন্যইত সহিষ্ণুতার আবশ্যকতা। ঐহিক ভোগ-লুব্ধ বিষয়-বিক্ষুব্ধ অসহিষ্ণু জীবের হরি-সংকীর্ত্তন ঠিক হয় না। তাই গৌরহরি শিক্ষাষ্টকে বলিতেছেন,——"তরোরপি সহিষ্ণুনা———কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ'—

নিজের মান যাঁহার তুচ্ছ, জ্ঞান, অথচ অন্যকে মান দিতে যিনি নিত্য যত্নবান্, তিনিই নিত্য হরিকীর্ত্তনের অধিকারী। শ্লোকের এই শেষাংশেও কলিতার্থে দৈন্যেরই উপদেশ। দাম্ভিকেরই প্রতিপদে আত্মমানের অপেক্ষা, কিন্তু ভক্ত দীনের তাহাতে অতীব উপেক্ষা। আত্ম-শ্রেষ্ঠতা-বুদ্ধিই মান-লাভেচ্ছার জনয়িত্রী। দীন আপনাকেই হীন জানিয়া নিজ নিকৃষ্টতারই চিন্তা করেন, সুতরাং স্বীয় অমানীত্ব-বোধই তাঁহার স্বাভাবিক। অপিচ, যিনি আত্মবিনয়বৃত্তির নিত্য-নমনীয়তায় সকলকেই— অন্ততঃ অনেককেই আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং ভগবদধিষ্ঠান ভাবিয়া জীব মাত্রকেই আদর করেন, তিনিই যথার্থ মানদ। পরকে মান না দিলে যেন পরাৎপরকেই মান দেওয়ার ত্রুটি হইল, এইরূপ তাঁহার মনে হয়। যিনি আপনার কৃষ্ণদাসত্ব কল্পনায় কৃতার্থ হন, তিনিই জগতের দাসত্বে আগ্রহে অগ্রসর। সুদীন ভক্ত অমানী মানদের এইখানেই বৈষ্ণবতা। এই বৈষ্ণবতার বলেই তাঁহার নিত্য হরি কীর্ত্তনের অধিকারিতা।

স্বয়ং মহাপ্রভু নিজে অমানী হইয়া জগৎকে মান দিয়াছেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইলা জীবে।" শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর স্কন্ধা-রোহণে সেই প্রেমবিহ্বলা জরতীর জগন্নাথ-দর্শনের ঘটনা স্মরণ করুন। এইস্থানে অসাধারণ অমানীত্ব ও মানদত্বের উদাহরণ উদ্ভাসিত! হরিভক্তি-দীনতার সুদীপ্ত দৃষ্টান্ত

প্রদর্শিত। যেমন দীনতা, তেমনি সহিষ্ণুতা; যেমন অমানীত্ব, তেমনই মানদত্ব। ফলে "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক এইখানে যেন মূর্ত্তিমন্ত। মহাপ্রভুর মহতী চরিত-লীলায় এ জাতীয় শত২ দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান। প্রভুত্বই মানের হেতু, কিন্তু যিনি প্রভুর প্রভু, যাঁহার আখ্যাই "মহাপ্রভু"—তিনি মূর্ত্তিমান অমানীত্ব। সাধারণতঃ যিনি প্রভু তিনি মানাদ (মান-গ্রহীতা), কিন্তু যিনি আমাদের মহাপ্রভু, তিনি মানদ (মানদাতা)।

"অমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জ্জবম্"

দৈন্যের এই পঞ্চ উপকরণ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-প্রপঞ্চে এই পঞ্চের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত। দৈন্যপোষণের উপাদান নির্দ্দেশে গীতা বলেন,——'মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্।'মহাপ্রভুর মহোপদেশে এ উপাদান অজস্র বিতরিত। মহাপ্রভু স্বয়ং দৈন্যের প্রশান্ত মহাসিন্ধু; আর তাঁহার পরিকর ভক্তনিকরও এক এক জন মূর্ত্তিমান দৈন্য। এই বর্ত্তমান দাম্ভিকতার যুগে তাঁহাদের এক এক জনের অসামান্য দৈন্য-দৃষ্টান্ত "পাগ্‌লামী বিশেষ" বোধ হওয়াও অসম্ভব নয়। হরিদাস ও শ্রীরূপ-সনাতন—ইঁহারা তিনজন আত্মদৈন্যের আবেগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন না। তাঁহারা তাঁহার ধ্বজা ও চক্র দেখিয়াই প্রণিপাতপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইতেন। শ্রীসনাতন শ্রীশ্রীগোপীনাথ দেবের মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে যাইতে স্বীয় দৈন্যের আবেগে শ্রীজগন্নাথ-পুরীর সিংহদ্বারের পথ দিয়া যাইতেন না; প্রচণ্ড প্রতপ্ত বালুকাকীর্ণ সিন্ধু-তীর-পথে যাইতেন; তাহাতে পদতল বিদগ্ধ ও ব্রণপীড়িত হইলেও গ্রাহ্য করিতেন না। সনাতন ভাবিতেন, তিনি অতি অপবিত্র, অধম, সিংহদ্বার-পথে শুদ্ধ সাধুগণের সর্ব্বদা যাতায়াত; পাছে তাঁহার অশুচি-সঙ্গে তাঁহাদের অসেবা ঘটে! ধন্য এই অপূর্ব্ব দৈন্য! গৌর-লীলায়, গলিতকুষ্ঠী বাসুদেবের কি অলৌকিক দৈন্য! এহেন মহাব্যাধির মুক্তি হইলেও, তাহাতেও যেন সুখ নাই; পরন্তু পাছে তজ্জন্য অদৈন্য আসিয়া তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব বৈষ্ণবতার আধার স্বরূপ দৈন্যকে দূরীভূত করে, এই ভয়! তাই মহাপ্রভুর প্রতি মহাব্যাধিমুক্ত বাসুদেবের উক্তি এইরূপ,—

"মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে মোর অহঙ্কার জন্মিবে আসিয়া॥"

চমৎকার! এমন না হইলে মহাপ্রভুর আলিঙ্গনইবা পাইবে কেন? কুষ্ঠমুক্তইবা হইবে কেন? আহা! অব্যাহত দৈন্যে কুষ্ঠব্যাধিও স্বীকার্য্য, কিন্তু ব্যাহত দৈন্যে কন্দর্পকান্তিও অগ্রাহ্য! দৈন্য বৈষ্ণবের বিষ্ণু-সেবাগ্রাহ্য অন্তঃ-সৌন্দর্য্য; তাহাই যদি নষ্ট হইল, তবে কুষ্ঠমুক্তি জনিত বাহ্য সৌন্দর্য্যে প্রয়োজন? বাসুদেবের এই ভাব! অতএব ধন্য তাঁহার দৈন্য-প্রভাব!

তৃণাদপি সুনীচত্ব, তরোরপি সহিষ্ণুত্ব, আত্ম-অমানীত্ব ও পরমানদাতৃত্ব, এই চতুরঙ্গসমবায়ই দৈন্যের প্রধান উপাদান। বৈষ্ণবের অত্যাবশ্যকীয় দৈন্যের শিক্ষাই শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকটির সমগ্র উদ্দেশ্য। এই দৈন্যের চরমফল পরমাত্মা হরিকে আত্মসমর্পণ।

"আমি কিছু নই, তুমিই সকল।
তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র কেবল॥
তুমি খেলোয়াড়, আমি পুতুল।
'আমি আমি' শুধু আমারি ভুল॥"

সকলই তোমার, ভুলটি কেবল আমার! তা এটিও তুমি গ্রহণ কর, সকল লেঠা চুকিয়া যাউক্। আত্মনিবেদনার্থী ভক্তের ভগবৎপ্রতি এইরূপ আত্মোক্তি। ভগবান কিন্তু ঐটি নিতে সহজে সম্মত নহেন। জ্ঞানযোগে ওটি ভগবানে সমর্পণ কলিযুগে বড় কঠিন, তাই ভক্তিযোগের সুলভ ব্যবস্থা। আর একমাত্র ভগবন্নাম-সাধনেই সে ভক্তিযোগের সিদ্ধি; কিন্তু নিরপরাধ নামসাধন চাই। এই নাম-সাধনে শ্রবণ-কীর্ত্তনই সর্ব্বাগ্রে। বিশেষতঃ কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ-মনন সবই হয়; সেইজন্যই হরিসংকীর্ত্তনের এই বিশ্বব্যাপী গৌরব। তারপর, এই হরিসংকীর্ত্তন বাহিরে সাময়িক ভাবে থাকিলেও, অন্তরে নিরন্তর থাকা চাই। কেবল গান গাওয়াই হরি-কীর্ত্তন নয়; কেবল বাগিন্দ্রিয়-সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গই 'কীর্ত্তন' নয়; হরির নাম-রূপ-গুণ-লীলার স্মরণ মননাদি অন্তশ্চর্চ্চা বা মানস-বর্ণনও হরি-কীর্ত্তন। এবম্ভূত হরি-কীর্ত্তন সিদ্ধ হইলেই সাধকের অন্তরকন্দরে নিরন্তর নাম-নির্ঝরিণী ঝরিতে থাকে। ফলে হরি-কীর্ত্তনের উপযুক্ত অধিকার লাভ ভিন্ন এই দেবদুর্লভ নিত্য-নাম-সেবা কাহার ভাগ্যে ঘটে? এই অধিকার লাভে সাত্বিক দৈন্যই সাধকের সর্ব্বপ্রধান সহায়। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকে হরিকীর্ত্তনের যোগ্যাধিকারপ্রদ দৈন্য-সাধনের শিক্ষা দিয়াছেন।

যে প্রভুর জীবের প্রতি এই দৈন্যশিক্ষাদান, তাঁহার নিজের দৈন্যলীলা কাজেই প্রকৃত দৈন্যের পূর্ণাদর্শস্থান। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন স্বীয় প্রিয়পার্ষদ ভক্তগণের কণ্ঠ ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিতেন, যখন নয়ন-জলে চন্দ্রবদন ভাসাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেন——"আমি অতি দীনহীন——ভজনবিহীন, আমাকে তোমরা কৃপা কর। আমি কৃষ্ণ-প্রেমের কাঙ্গাল, তোমরা আমারে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন দানকর"——তখন বুঝি পাষাণও গলিয়া যাইত, মরুভূমেও বারি আসিত! একবার মানসচক্ষে সে দৃশ্য ধ্যান করিলে দৈন্য-সাধক কৃতার্থ হইবেন।

যে প্রভুর কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে জগৎ মাতিয়াছে, যে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-প্লাবনে জগৎ ভাসিয়াছে, যে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিবশ-বিহ্বল, উন্মত্ত-উদ্ভ্রান্ত ও মূর্চ্ছিত-মৃতবৎ, তিনিই অসামান্য দৈন্যাবেশে বলিতেছেন, "হায়! কৃষ্ণ-প্রেমের লেশমাত্রও আমি পাইলামনা।"

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরোঽপি মে হরৌ,
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশী-বিলাস্যানন-লোকনং বিনা,
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥"
হরিতে প্রেমের মম নাম-গন্ধ নাই।
তবে যে কাঁদি, সে শুধু সৌভাগ্য জানাই।
যেহেতু না হেরে বংশীবিলাসি-বদন।
করিতেছি বৃথা প্রাণ-পতঙ্গ পোষণ।

পুনশ্চ,——

'মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধীচ কশ্চন।
পরিহারেঽপিলজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম'

আমার সমান পাপী নাহি হয়।
মম সম কেহ অপরাধী নয়॥
কি আর কহিব হে পুরুষোত্তম।
পরিহারেতেও লজ্জা হয় মম॥

অপিচ,——

"শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবনং বিনা,
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো,
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ।"

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবন বিনা,
বৃথা মোর দিন গেল।
শিলা-শুষ্ককাষ্ঠ সম দেহেন্দ্রিয়
ভার মাত্র সার হল॥
কেন তবে আর বিলজ্জ হয়ে,
বৃথা ফিরি হরি! সে ভার বয়ে?

লোকশিক্ষার্থ মহাপ্রভুর দৈন্য-প্রকাশক এইরূপ অনেক উক্তি প্রচারিত আছে। ফলে মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তি-ভাবাবিষ্ট দৈন্য যে কি অসাধারণ অনুপম অপূর্ব্ব বস্তু, তাহা তাঁহার কৃপা ভিন্ন কে বুঝিতে পারে? কেবা বুঝাইতে পারে? যাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ-বিলাপের অজস্র অশ্রুজলে সত্য সত্য শুষ্ক ভূমি কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে, তাঁহার অমানুষী দীনতা মানুষের ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কলিপাবন কৃষ্ণনাম প্রচারার্থই যিনি অবতীর্ণ, যাঁহার শ্রীমুখে একবার শ্রীনাম শ্রবণ মাত্র প্রচণ্ড পাষণ্ডও সুদীন বৈষ্ণব হইয়াছে, যাঁহার উত্থাপিত নাম-বন্যার উচ্ছ্বাস আজ সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইতে চলিল, তিনি নিজে কাঁদিয়া বলিতেছেন,—

"আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।"

আমরা আর কি বলিব? যাহাহউক, ভুবনপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-লীলামৃত সেবন করিলে, বোধ হয় মূর্ত্তিমান ঔদ্ধত্য ও দম্ভেরও দৈন্যলাভ অসম্ভব নহে। ফলকথা "গৌরকৃপাহি কেবলম্।" তবে শ্রীগৌরের শ্রীচরণোদ্দেশে আমাদের ন্যায় অদৈন্য-দীনদলের জন্য একটি আর্ত্ত আদর্শ আবেদন এই যে,——

"মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ত্বৎসমো
নাস্তি পাবনঃ।
ইতি চিত্তে সমাধায় যথেচ্ছসি
তথা কুরু।"

মম সম নাহি পাপীজন।
তব সম নাহিক পাবন॥
ইহা চিত্তে সমাধান করি।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর হরি॥

এ প্রার্থনাটীও কিন্তু দৈন্যপূর্ণ! দৈন্য ভিন্ন প্রার্থনাই হইতে পারে না; "হুকুম" হইতে পারে বটে। "অনুরোধ" অন্যও কিছু দৈন্য চাই। তবে অদীনের দৈন্য-প্রার্থনার্থ যেটুকু অগ্রিম দৈন্য চাই, তাহা গৌর-কৃপায় দৈন্য-প্রার্থনায় প্রয়োজন-বোধের পুরস্কার স্বরূপেই পাওয়া যায়।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ঐ প্রয়োজন-বোধের উপায় কি? এইরূপে "শিকলি-গাঁথা" প্রশ্নপরম্পরা চলিতে পারে। শাস্ত্র, যুক্তি ও মহাজনবাক্য অনুসারে তাহার উত্তর-পরম্পরাও পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহা অনন্ত——অফুরন্ত। ফলিতার্থে এই অনন্তশাস্ত্র কেবল প্রশ্নোত্তরই মাত্র। অতএব এ বিষয়ে উপসংহারে আমাদের এই মাত্র নিবেদন যে, ধর্ম্মজীবন লাভার্থে 'আদৌ

শ্রদ্ধা' ইহাই শাস্ত্রোক্তি; সাধুসঙ্গাদি ক্রমে তাহার পরে পরে। অতএব এই শ্রদ্ধাটি যেন স্বয়ম্ভূতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ "শ্রদ্ধা" অর্থ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে চলিত কথায় 'মনের টান' বা 'ঝোঁক' বলা যায়। (ইংরাজীতে Tendency বলা যাইতে পারে।) এইটিকে আপাততঃ যেন স্বভাব-সম্ভাব্য বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রও সাধন-ক্রম প্রদর্শনের একটা মূল ভিত্তির আবশ্যকতায় সেইরূপই ধরিয়া লইয়াছেন; ফলে কিন্তু কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। শ্রদ্ধারও কারণ আছে। অনাদি-অনন্ত প্রবাহরূপে নিত্য সৃষ্টির সহিত সৃষ্ট জীবের কর্ম্মবন্ধ-পরম্পরাও অনাদি অনন্ত প্রবাহরূপে নিত্য! দর্শনশাস্ত্র এখানে হাবুডুবু খাইয়াছেন; অগত্যা 'অনাদি অনন্ত' তত্ত্বেই 'ইতি' দিতে বাধ্য হইয়াছেন। জ্ঞান-মার্গের এই জটিল কুটিল সিদ্ধান্ত-রহস্য ভক্তিমার্গে আসিয়া ভগবদিচ্ছা-তত্ত্বে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। তারপর ভক্তিভজ-নার্থীর অত্যাবশ্যকীয় "আশাবন্ধ" বিধানার্থে কৃপাময় ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন "ভগবৎকৃপা"। যদি "শ্রদ্ধা" এই ভগবৎকৃপার হেতু বলা যায়, তবে শ্রদ্ধার হেতুও আবার এই ভগ-বৎকৃপা! ফলে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ভগবৎকৃপা! ভক্তিমার্গীয় সিদ্ধান্তে মূল ভিত্তিই ভগবৎকৃপা। অখিল ধর্ম্মমূল বেদ ঘোষণা করিলেন,—"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"। এ ব্রহ্ম অবশ্য নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম নহেন। নির্গুণে কৃপা-গুণ অসম্ভব। তাই পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্র বেদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—সর্ব্বগুণনিধান পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বা সংক্ষেপতঃ ভগবৎকৃপাই সার। এই ভগবৎকৃপাবলে চরমে কৃষ্ণদাসত্ব বা ভগবৎসেবানন্দ লাভই জীবের চরমসিদ্ধি বা পরমপ্রাপ্তি। কলিযুগ-পাবনাবতার কৃপাময় শ্রীগৌরহরি কৃপা করিয়া ইহার কালোপযোগী সুগমপথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং সেই পথের সম্বল হরি-নাম প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেবল গৌর কৃপা-বলেই জীবের সে সম্বল লাভ হয়। অতএব "গৌরকৃপাহি কেবলম্।"

"গৌর-কৃপা সর্ব্বসার।
গৌরকৃপায় জীবোদ্ধার॥
গৌর-কৃপা-বলে ভবে গৌর-কৃপা চাই।
গৌরকৃপা পেলে কৃষ্ণ-সেবানন্দ পাই॥
গৌরপ্রেমানন্দে সবে হরি বল ভাই॥"

—:—

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(যশোহর।)

শ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

-•:০:•-

শূদ্রের বেদাধিকার-বিচার।

১ম অধ্যায়। ৩য় পাদ

(১১। ১২)

৩৪। শূদ্রস্য তদনাদর শ্রবণাৎ-দাত্রবণাৎ সূচ্যতে হি।

৩৫। ক্ষত্রিয়ত্ব গতেশ্চোত্তরশ্চ চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।

৩৬। সংস্কার পরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ।

৩৭। তদভাব নির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ।

৩৮। শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ।

৩৯। কম্পনাৎ।

৪০ জ্যোতির্দর্শনাৎ।

৪১। আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশাৎ।

৪২ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন

৪৩ পত্যাদি শব্দেভ্যঃ।

৩৪। আত্ম অপ্রশংসা শ্রবণে দুঃখকর্তৃক প্রচালিত হওয়াতেই 'জনশ্রুতি' 'রৈক' কর্তৃক "শূদ্র" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শূদ্র-জাতীয়ত্ব-হেতুতে নহে।

৩৫। চৈত্ররথের সহিত একত্রে উল্লেখিত হওয়াতেই জনশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অনুমিত হইয়াছে।

৩৬। উচ্চ ত্রিবর্ণের উপনয়ন-সংস্কার থাকায় এবং শূদ্রের তাহা না থাকায়, শূদ্রের বেদে অনধিকার বিহিত হইয়াছে।

৩৭। সত্যকাম জাবাল শূদ্র নহে, বুঝিয়াই গৌতম তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন; এই জন্যও শূদ্রের বেদে অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩৮। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারাও শূদ্রের বেদ-শ্রবণ-অধ্যয়ন বারিত হওয়াতে, শূদ্রের বেদে অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩৯। প্রাণই ব্রহ্ম, যেহেতু বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থই ইহাতে কম্পিত হয়।

৪০। ব্রহ্মই জ্যোতিঃস্বরূপ, শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হওয়াতে "জ্যোতি" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৪১। আকাশ নাম-রূপ-উপাধির অতীত উক্ত হওয়ায়, "আকাশ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৪২। সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদ বোধ হইলেও, তত্ত্বতঃ উভয়ের একত্ব উক্ত হওয়ায়, জীবাত্মা না বুঝাইয়া পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝায়।

৪৩। "পতি" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হেতু পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝায়।

———o———

৩৪হইতে ৩৮সূত্র পর্য্যন্তের বিষয়, শূদ্র যে বেদাধ্যয়নে অনধিকারী, তাহা প্রমাণ করা। ফলে এ প্রামাণিকতা "শূদ্র" পদের প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধের প্রতিই নির্ভর করে। যাহারা আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা মানসিক শিক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শে উপনীত হইতে পারেনাই, তাহারাই যদি প্রকৃত পক্ষে "শূদ্র" পদবাচ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সেরূপ শূদ্র-লক্ষণ অপর উচ্চতর ত্রিবর্ণের মধ্যেও বিস্তর লক্ষিত হইবে। যদি কেবল গুণানুযায়ী জাতিবিচার না ধরিয়া জন্মানুযায়ী জাতি-বিচারই ধরিতে হয়, তবে প্রাচীন কালে অনেক অনার্য্য জাতীয় ব্যক্তিও যে উচ্চতর আর্য্য-বর্ণত্রয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহার ভূরি দৃষ্টান্ত-প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইবে। পুরাকালে যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে প্রাধান্য লইয়া বিবাদ হইয়াছিল, এবং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অবনয়ন ও স্বজাতীয় উন্নয়নে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ব্রাহ্মণ বীর পরশুরামাবতারের অভ্যুদয়। তিনি অনার্য্য জাতীয়কেও গুণোন্নয়ন মতে ব্রাহ্মণত্ব দিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের সম্পোষণ ও বলবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এবম্বিধ উদাহরণ ভূরি পরিমাণে প্রদর্শিত হইতে পারে।

বেদ-স্বাধ্যায়ের সদুপযোগিনী বিদ্যাশিক্ষার অভাবই যদি শূদ্রত্ব হয়, তবে তাহা সর্ব্ববর্ণের প্রতিই খাটে, এবং তাহাহইলে শূদ্রের বেদাধিকারের নিষেধবিধির কোন সার্থকতা থাকেনা। মূর্খেরা ত বেদের কাছে ঘেঁষিতেই পারে না, ঘেঁষিবেও না। তবে আর কাহাদিগকে নিবারণ করিতে উক্ত নিষেধ-বিধির প্রয়োজন হইবে? প্রথমে আমরা দেখিব যে, উক্ত বিষয়ে বাস্তবিক সূত্রসমূহের তাৎপর্য্য কি এবং শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, তাঁহার স্বাভাবিকী সদুদার-নীতি সত্ত্বেও উক্ত সূত্রাবলীর ভাষ্যে উক্ত বিষয়ে তাৎকালিক সমাজ ও কালধর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় কিরূপ সংকীর্ণতায় পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন।

২৫শ সূত্রের উক্তি এইরূপ যে, মনুষ্যগণ বেদ-স্বাধ্যায়ের অধিকারী; কিন্তু এই 'মনুষ্য'

পদে উপযুক্ত শিক্ষাধিকারসম্পন্ন মনুষ্যকেই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই দ্বিজ ত্রিবর্ণের মনুষ্যকেই বুঝাইতেছে। মীমাংসা দর্শন বলেন যে, দ্বিজাতির উপনয়নসংস্কারই বেদ-স্বাধ্যায়ে প্রবৃত্ত হইবার অবশ্য-কর্ত্তব্য প্রাথমিক অনুষ্ঠানবিশেষ; উহা দ্বিজ ত্রিবর্ণের জন্য; উহা শূদ্রজাতির জন্য বিহিত হয় নাই।

৩৪ হইতে ৩৮ সূত্র পর্য্যন্ত, এই পঞ্চ সূত্রের প্রতিজ্ঞাও ঐ একই বিষয়ের প্রতি-পাদ্য, এবং শূদ্রের বেদাধিকার প্রতিপাদনের অনুকূল তর্কসমূহের খণ্ডনই তাহার বিষয়। উক্ত খণ্ডনসমূহ বক্ষ্যমাণ বেদান্তসূত্রে যে ভাবে পরিব্যক্ত বা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এমন কি, সূত্রগুলির সংগঠন-সময়েও শূদ্রগণের বেদাধিকারের অনুকূল অভিমত সূত্রকারের স্বশ্রেণীস্থ অনেকের মধ্যেও বর্ত্তমান ছিল; নচেৎ উক্ত খণ্ডনসমূহের কোনই কার্য্যকারিতা থাকে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়োক্ত জনশ্রুতি ও রৈক-আখ্যান দ্বারা ইহাই প্রমাণিত করার চেষ্টা হইয়াছে যে, "শূদ্র" পদের ব্যুৎপত্ত্যর্থ যাহাই হউক, উক্ত পদে পরিচিত জাতীয়ের বেদে অনধিকার; কিন্তু উক্ত জনশ্রুতি ও তৎপরবর্ত্তী সত্যকাম জাবালের আখ্যানে শূদ্র যে বেদে অনধিকারী নয়, তাহারই বরং অনুকূলতা পাওয়া যায়। কিন্তু সূত্র-ভাষ্যকার স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যায় তাহার বিপরীত প্রমাণেরই প্রযত্ন করিয়াছেন।

আখ্যানটি এইরূপ,——জনশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতি দয়ালু, পরোপকারপরায়ণ ও আতিথেয় ছিলেন। তাঁহার পুরী হইতে কেহই অভুক্ত যাইতে পারিত না। একদা একদল রাজহংস তাঁহার রাজপুরীর মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তীটি রাজা জনশ্রুতির প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী রাজহংসটি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, "রাজা জনশ্রুতির যশ রৈকের যশের সহিত কোন ক্রমেই তুলনীয় নহে।" পরদিন প্রাতঃকালে যখন প্রাচ্য রীত্যনুসারে ঐ রাজা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময়ে বন্দীগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতেছিলেন; তৎকালে সেই রাজহংসের বাক্য তাঁহার বিশেষ স্মরণ থাকায়, তিনি রৈকের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন; এবং তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া, ছয় শত পালিত গবাদি, একগাছি কণ্ঠহার ও যুগল-বড়ব-বাহিত এক রথ উপহার স্বরূপ লইয়া, রৈক-পূজিত দেবতার সাধনশিক্ষা লাভের প্রার্থনায় রৈক-সন্নিধানে সমাগত হইলেন। তখন রৈক প্রায় অর্থলোভী বর্ত্তমান পুরোহিত দলের প্রাচীন আদর্শ স্বরূপে বলিয়া উঠিলেন—"হে শূদ্র! এই সমস্ত পশ্বাদি, কণ্ঠহার ও রথ তোমারই থাকুক।" জনশ্রুতি ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হইলেন না; পরন্তু পুনরায় সহস্র পশু, কণ্ঠহার, বড়বযুগ-বাহিত রথ এবং অধিকন্তু তাঁহার এক রূপসী যুবতী কন্যা উপহার দিতে উদ্যত হইলেন। তখন এই তথাকথিত ঋষি রৈক পশু ও স্বর্ণাদির লোভ সংবরণ করিতে পারিলেও এই মোহিনী কন্যার মোহ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া কহিলেন "হে শূদ্র! তুমি

কি ইহাকেও আমার জন্ম আনিয়াছ? যদি তাহা হয়, তবে এই কন্যাই তোমার সহিত আমার আলাপের হেতুভূতা হইবে। যাহাহউক, ইহাতেই তিনি জনশ্রুতিকে "সম্বর্গবিদ্যা" শিক্ষা দিলেন। আদি তত্ত্বের জ্ঞানই সম্বর্গবিদ্যা। তাহার মর্ম্ম এই যে, অগ্নি, সূর্য্য এবং জলের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বায়ুতত্ত্বগত এবং বায়ুর মূল সত্তা ব্যোমই জড় জগতের আদি মূল সত্তা। জীব পক্ষে জীবনই জৈবিক তত্ত্বের মূলতত্ত্ব। বাক্য, চিন্তা, সংকল্প, মন, এ সমস্তই মূলজীব-তত্ত্বগত; তাহাতেই উদ্ভূত, তাহাতেই বিলীন। বায়ু এবং প্রাণ যুগল মূলতত্ত্বোদ্ভূত যুগল তত্ত্ব, ইত্যাদি। যাহা হউক, এই প্রকার সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ জনশ্রুতির প্রদত্ত মহার্হ উপহার নিচয়ের সমযোগ্য হইয়াছিল কি না, তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। যদি তিনি তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন বিতর্ক নাই; কিন্তু অধ্যাপক মোক্ষমুলর অতি সুযোগ্যভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, রৈকের প্রদত্ত শিক্ষা জনশ্রুতির প্রদত্ত বৃহৎ উপহারের যোগ্য হয় নাই। সে যাহাই হউক, বিচার্য্য বিষয় এই যে, জনশ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র, কিম্বা কেবল রৈক কর্ত্তৃক অবজ্ঞার সহিত "শূদ্র" আখ্যায় অভিহিত। জনশ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র, অথবা ক্ষত্রিয়, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছুই স্পষ্টীকৃত হয় নাই। ৩৫ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি ক্ষত্রিয়ই হইবেন; নচেৎ সেই একই অধ্যায়ে রৈকপ্রদত্ত সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ দান প্রসঙ্গে জনশ্রুতির সহিত ক্ষত্রিয় চৈত্ররথের নামোল্লেখ হইবে কেন? কারণ, একই বিষয়ে পরস্পর সমধর্ম্মী বস্তুদ্বয়েরই একত্রে উল্লেখ হইয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণে, মহাভারতে এবং এমন কি, বেদেও আর্য্য ও অনার্য্যের বহু স্থলে একত্রে উল্লেখ দৃষ্ট হয়; পরন্তু তদ্দ্বারা পরস্পরের জাতি বিপর্য্যয়-সংঘটন অপ্রমাণিত।

অতঃপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, জনশ্রুতির বন্দী, দূত, রথ, ধনসম্পদ ইত্যাদি রাজন্য-জন-সুলভ যত কিছু ছিল, তদ্দ্বারা তিনি ক্ষত্রিয়ই প্রতিপন্ন হইতে পারেন। এ যুক্তিও অদৃঢ়, কারণ পুরাকালে ভারতবর্ষে অনেক অনার্য্য রাজা ছিলেন এবং তাঁহারা তাৎকালিক ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত বন্ধুতাদি বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন। আমাদের জগদ্বিখ্যাত রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন কালে জনৈক অনার্য্য রাজা গুহকের ভবনে কি ভাবে উপনীত ও তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। নীচ ব্যক্তি উচ্চ ব্যক্তির সমাগমে যেরূপ তাঁহাকে অভিভাবক তুল্য গুরু-গৌরব দানে সমাদরে সসম্ভ্রম-সম্বর্দ্ধনা করে, গুহক ঠিক সে ভাবে রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা করেন নাই; পরন্তু পরমপ্রেমাস্পদ প্রাণপ্রিয় বন্ধু জ্ঞানেই হৃদয়াসনে বসাইয়াছিলেন। অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত যাত্রার আসরে বা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে গুহককে অতি নীচ চণ্ডাল রূপে প্রদর্শিত ও রামচন্দ্রকে সমুচ্চ ক্ষত্রিয়রাজ রূপে প্রদর্শিত করা হয়। এতদ্দেশে এবম্বিধ অভিনয় সচরাচর সকলেই দেখিয়াছেন। বস্তুতঃ রাম-গুহক-মিলন পরস্পর সুসমযোগ্য বন্ধু-

ভাবেরই মিলন ; আর্য্য-অনার্য্যের গুরুত্ব-লঘুত্বগত উচ্চ নীচ মিলন নহে।

অপর, ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, জন-শ্রুতি শূদ্র হইলে কদাচ ব্রাহ্মণ রৈক তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিতেন না। এ যুক্তিরই বা দৃঢ়তা কোথায়? আর্য্য-অনার্য্যের বৈবাহিক সম্বন্ধের উদাহরণ বিস্তর বর্ত্তমান। অনার্য্য দাসরাজের কন্যা সত্য-বতীকে ঋষিরাজ পরাশর বিবাহ করিলেন এবং তাঁহাদেরই সুবিখ্যাত পুত্র মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মাতৃধর্ম্মানুসারে বেদ-ব্যাসের অনার্য্যত্ব থাকিলেও, তিনিই তৎ-সাময়িক ঋষিবর্গের শীর্ষস্থানীয় হইয়া অসংখ্য শাস্ত্র-পুরাণাদি প্রণয়ন করেন এবং বেদের 'ব্যাস' অর্থাৎ বিভাগ করিয়া সুপ্র-সিদ্ধ 'বেদব্যাস' উপাধি লাভ করেন। জরৎকারু ঋষি অনার্য্য রাজা বাসুকির ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং এই দম্প-তীর পুত্র আস্তিকই আর্য্যানার্য্যের বিখ্যাত বিবাদ-বিগ্রহে সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন করেন। ভারতীয় পুরাণশাস্ত্রের বিরাট ভাণ্ডারে এবম্বিধ ভুরি দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইতে পারে।

সূত্রকার এবং টীকাকারের মত এই যে, জনশ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র নহেন ; কিন্তু হংস-মুখে আপন অপেক্ষা রৈকের প্রশংসাবাদ শুনিয়া তিনি যে তামসধর্ম্মরূপ দুঃখে বিচলিতচিত্ত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার "শূদ্র" অভিধানের হেতু। "শুচাদ্রবতীতি শূদ্রঃ"—অর্থাৎ যে শোকের দ্বারা প্রচালিত, সেই শূদ্র। এই ব্যুৎপত্ত্যর্থ অনুসারেই জন-শ্রুতির পূর্ব্বোক্ত শুগ্-দ্রবিতচিত্ততা জন্যই তাঁহার শূদ্রাখ্যা ; ফলিতার্থে তিনি প্রকৃত শূদ্রজাতীয় নহেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন,— "কথং পুনঃ শূদ্র শব্দেন শুগুৎপন্না সূচ্যতে ইতি উচ্যতে' তদা দ্রবণাচ্ছুচমভিদুদ্রবে শুচা বাভি দুদ্রুবে শুচা বা রৈক্বমভিদুদ্রাবেতি শূদ্রাবয়বার্থ সম্ভবাৎ রুঢ়ার্থস্য চাসম্ভবাৎ।"

এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, জনশ্রুতির অন্তরোদ্ভূত শোক তৎপ্রতি প্রযুক্ত "শূদ্র" শব্দ দ্বারা সূচিত হইতে পারে কিনা? বাস্তবিক 'শূদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা শোক সূচিত হয়, সন্দেহ নাই। জনশ্রুতি সেই শোকের দ্বারা বিচলিত ও অভিভূত হইয়া-ছিলেন। শোক তাঁহাতে প্রাদুর্ভূত বা তিনি শোকে সমাহিত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার শোকবেগ তাঁহাকে রৈক-সমীপগত করিয়াছিল। আমাদের মতে শঙ্করের ইহা শূদ্রত্ব-সূচিকা কষ্ট কল্পনা মাত্র। আলোচ্য-স্থলের শূদ্র-সম্ভাষণ অনেকটা আলঙ্কারিক ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। ফলে বর্ত্তমান বিতর্কে শঙ্করের যুক্তির সার এই যে, জনশ্রুতি রাজ-হংস সম্বাদে বাস্তবিক বিষাদপ্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন ; কথিত রৈক ঋষি তাহা যোগবলে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে "শূদ্র" সম্বোধন করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যায় যিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন, তিনি হউন ; কিন্তু আমাদের মনে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এতদ্দ্বারা শূদ্রের বেদাধিকার-প্রতিপাদনের সম্ভাবনা নিবারণোদ্দেশেই ভাষ্যকার ঐ প্রকার অসরল ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কার্য্যতঃ সুযোগ্যাধিকারী শূদ্রগণ কদাচ বেদ-স্বাধ্যায়ে বঞ্চিত হন নাই। যজুর্ব্বেদে স্পষ্টই উক্ত

হইয়াছে,——"যথেমং বাচং কল্যাণীম্ আবদানি ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায়।"

এ কল্যাণী বেদবাণী
উচ্চারিয়া বলি আমি—
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় গণে,
শূদ্র আর বৈশ্য জনে।

স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এই শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্যজাতিই শূদ্র হউক, আর মূল আর্য্যজাতিরই কোন অধস্তন শাখাবিশেষই শূদ্র হউক, ফলে শূদ্রের বেদাধিকার যে, বৈদিক সময়ে বারিত হইয়াছিলনা, তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। এমন কি, বেদাধিকারে শূদ্র-বারণ বিধির প্রবর্ত্তনা হইলেও, তাহা কার্য্যতঃ সেরূপ ছিলনা। তখনও স্বীয়গুণে সুযোগ্যাধিকারী শূদ্র বেদ-স্বাধ্যায়ে সমর্থ হইতেন, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত সত্যকাম-জাবাল-সংবাদে সুপ্রতিপন্ন। অধ্যাপক মোক্ষমূলার এই শূদ্র-বেদ-বারণ-বিধি বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,——"ইহা সাধারণতঃ অনুমিত হয় যে, ভারতীয় চতুর্থ জাতি শূদ্র প্রাচীন অনার্য্য অধিবাসী বলিয়া জাতাংশে বস্তুতঃ তাহাদের বিজেতা আর্য্যজাতি হইতে বিভিন্ন, এবং এরূপও হইতেপারে যে, (কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নাই) প্রকৃত আর্য্য-সন্তান হইয়াও কার্য্যদোষে গুণাবনতির ফলে তাহারা বিশুদ্ধ আর্য্যাধিকার-বিচ্যুত ও শূদ্রত্ব তুল্য সামাজিক নীচত্ব অথবা তদধিক অতিনীচত্ব বা পাতিত্যপ্রাপ্ত। বাদরায়ণ বলেন, যাহারা দারিদ্র্য ও অন্যান্য বিবিধ দোষদুষ্ট অবস্থায় পড়িয়া দ্বিজ-ত্রিবর্ণের নিম্নে শূদ্রস্থানীয় হইয়াছে, তাহারা বেদান্ত-বিদ্যায় বারিত হয়নাই। অনেক সময়ে অনেক বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মনে প্রকৃত শূদ্রের বেদাধিকার বিষয়ে বিতর্ক উঠিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাঁহারা সেই নিষেধ-বিধিতেই লাগিয়া রহিয়াছেন। ফলে উপনিষদের বিবিধ বাক্য-প্রমাণে ইহা অনুমিত হয় যে, অন্ততঃ পুরাকালে উক্ত নিষেধ-বিধির বিশেষ দৃঢ়তা ছিলনা। ঋগ্বেদের একটি স্তোত্র আমরা অবশ্য বিস্মৃত হইবনা, যাহাতে স্পষ্টই এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, অন্যান্য জাতির ন্যায় ব্রহ্মা হইতে শূদ্রেরও উৎপত্তি হইয়াছে। অপর, ইহা অবশ্য অপ্রকাশিত নহে যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণের সহিত সমভাষাভাষীই ছিলেন। উপনিষদে অন্ততঃ জনশ্রুতি ও সত্যকাম, এই দুইজন সম্বন্ধে শূদ্রের বেদান্তাধিকার স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

এক্ষণে ৩৫ সূত্র ও তাহার শাঙ্করভাষ্য আলোচনায় এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, শূদ্র শব্দের সাধারণ নির্দ্দিষ্ট অর্থ জনশ্রুতি বিষয়ক উদাহরণে প্রচলিত ও প্রবল থাকার কোন সুযুক্ত কারণ দৃষ্ট হয়না। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐরূপ কোন শূদ্রত্বসূচক রূপক অর্থ পরিগৃহীত বা প্রতিপন্ন হয় নাই। যদি শূদ্র শব্দের প্রচলিত অর্থ স্বীকার না করিয়া, ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থই গ্রহণ করিতে হয়, তবে যাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা যে কোন কারণে শোকাভিভূত হওয়াতেই শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ কেন না বলা হয়? "শূদ্র" শব্দে এমন কিছুই নাই, যাহাতে তদভি-

মানীগণ বেদাধিকার-বঞ্চিত হইতে পারে। আর বেদেও তাঁহার সমর্থক কোন বচন-প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। শঙ্করাচার্য্য বলেন, জনশ্রুতির শূদ্রাভিধান প্রচলিত অর্থানুসারে পরিগৃহীত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবইবা কেন? বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থানুসারে জনশ্রুতি কোন অনার্য্যবংশ-সম্ভূত শূদ্র রাজা হওয়া কি অসম্ভব? আর তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভের জন্য উপযুক্ত গুরু-প্রণামী সহ রৈকের শিষ্যত্বপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু রৈক আধুনিক লুব্ধ ও কোপন গুরু-পুরোহিতের ন্যায় প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও অবশেষে সেই শূদ্ররাজের সুন্দরী কন্যার সুন্দর মুখের মোহে পড়িয়া পরে তাঁহাকে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন, ইহাই বা অসম্ভব কি?

অধুনা ভারতীয় অনেক জাতিই "শূদ্র" বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, যাঁহাদিগকে আমরা বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহারা তদিতর একটি ভিন্ন জাতি, তাহা হইলেই বা সেই শূদ্রজাতীয়ত্ব কোনরূপ লজ্জার বিষয় কিরূপে হইতে পারে? ভারতবর্ষের একজন সর্ব্বপ্রধান সম্রাট অশোক শূদ্র চন্দ্র গুপ্তের পৌত্র। যে বাসুকির সহিত বিখ্যাত আর্য্যরাজগণের বিবিধ বৈবাহিক সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তিনি শূদ্র ছিলেন। শূদ্র অনার্য্য হইলেও বেদে তাহাদিগকে শক্তিশালী জাতি বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের সুন্দর নগর সমূহ, সুবিস্তীর্ণ সুখদ উদ্যান সমূহ, সুদৃশ্য অট্টালিকা সমূহ এবং পাষাণ বা লৌহময় দুর্গসমূহের বর্ণনা বেদে দৃষ্ট হয়। ফলে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লইয়া যে আর্য্য জাতির সহিত তাহাদের সমর-সংঘর্ষ চলিয়াছিল, তাঁহাদের অপেক্ষা সভ্যতায় তাহারা অত্যধিক হীন বলিয়া বোধ হয়না। যদি বাস্তবিক বর্ত্তমান শূদ্রগণ তাহাদেরই উত্তর পুরুষ হন, তবে তাহাতেও কিছু মাত্র লজ্জা বা হীনতার কারণ নাই। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বীর ভীম ও অর্জ্জুনের অনার্য্যবংশীয়া সহধর্ম্মিণী ছিল এবং তাঁহাদের প্রপিতামহী সত্যবতী স্বয়ং অনার্য্য রাজার কন্যা ছিলেন। আমাদের জগদ্বিখ্যাত রামচন্দ্র বিভিন্ন অনার্য্য জাতির সামরিক সহায়তা গ্রহণ করিয়াই সেই অশেষশক্তিসম্পদসম্পন্ন অনার্য্য রাজা রাবণকে সবংশে সংহার করিয়াছিলেন। ফলে এই আর্য্য-অনার্য্য, দেব-অসুর বা নর-রাক্ষস প্রভৃতি জাতি আদিমূলে একই সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত; সুতরাং রাবণাদির জাতীয়তাও তদুদ্ভূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বিভিন্নতা বা বৈপরীত্য, ক্রমে উত্তর পুরুষ-পরম্পরায় বিবিধ কারণে সংঘটিত হইয়াছে। ফলতঃ সুপ্রাচীন সময়ে আর্য্য-অনার্য্যের ভেদ অতি সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর। যদি পুরাকালে তাই হয়, তবে প্রকৃত পক্ষে উক্ত ভেদের বর্ত্তমান কার্য্যকারিতা কিছুই নাই, এবং শতশত শতাব্দী হইতে বিবিধ কারণে শতশত জাতির মিশ্রিত শোণিত আজ ভারতীয় হিন্দু-ধমনীতে প্রবহমান। জাঠ, রাজপুত, গুর্খা, এখন সকলেই হিন্দু। রাজপুতেরা রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষত্ব দাবী করেন,

কিন্তু ইতিহাস দ্বারা কি ইহা ঠিক প্রমাণিত হয়? যাহাহউক, রাজপুত যদি এক্ষণে নিজ জাতিতে সূর্য্যবংশীয়শোণিতের অবিকৃত অস্তিত্ব ঠিক প্রমাণ করিতে না পারেন, তবে কি তিনি হেয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন? বাস্তবিক ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, এই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিস্তারের যুগে মানবের বিবিধ-বিষয়িণী উদারতা বিবিধ প্রকারে বর্দ্ধিতা হইলেও, জাতীয়তার অধিকার-অনধিকারের ঘোঁট বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না; বরং যখন ভারতীয় জন-সমাজ আপনাদের জাতীয় সাহিত্য ভিন্ন আর প্রায় কিছুরই সংবাদ রাখিত না, তখন যেন ইহার এত বাহ্যিক বাঁধাবাঁধি বা বাড়াবাড়ি ছিলনা।

যাহাহউক, আমরা আবার শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যালোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি। ৩৮ সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলেন যে, স্মৃতি শূদ্রের বেদাধিকার বারণ করিতেছেন, যথা—"যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃত সংস্কারবশাৎ বিদুর-ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিস্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তি প্রতিবন্ধং, জ্ঞানস্যৈকান্তিক ফলত্বাৎ। শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানীতি চেতিহাস পুরাণাধিগম চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকার-স্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি।" অর্থাৎ বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির ন্যায় যে সমস্ত শূদ্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার-সিদ্ধ, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে স্বতএব অবারিত; কারণ ঐকান্তিক জ্ঞানের ফল জন্ম-জন্মান্তর-নির্ব্বিশেষে অবিধ্বংসী। স্মৃতি চতুর্ব্বর্ণকেই পুরাণেতিহাসাদির অধ্যয়নে তুল্যাধিকার প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু বেদে শূদ্রের অধিকার বিধান করেন নাই।

"শূদ্র" শব্দের যেরূপ অর্থই গৃহীত হউক না কেন, মন্বাদি স্মৃতি যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু শূদ্রের ইতিহাস-পুরাণাদিতে অধিকার অব্যাহত রাখিয়াছেন। ফলে ইতিহাস-পুরাণইবা কি? মনে করুন, মহাভারত এক মহা ইতিহাস এবং "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' সেই মহাভারতেরই অন্তর্গত সুতরাং শূদ্রের গীতাধ্যয়নে অনধিকার নাই। এই গীতা উপনিষৎসমূহের সারসংগ্রহ স্বরূপ। কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি বিস্তর উপনিষদের বিস্তর বচন প্রায় অবিকল গীতায় উদ্ধৃত। গীতা-মাহাত্ম্যে ত স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে,

'সর্ব্বোপনিষদোগাবো দোগ্ধাগোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃসুধীর্ভোক্তাদুগ্ধংগীতামৃতংমহৎ"
সর্ব্বোপনিষদ্ গাভী, দোহাল গোপাল সুত।
পার্থ বৎস, সুধী ভোক্তা দুগ্ধ মহাগীতামৃত॥

ফলে সাক্ষাৎ ঔপনিষদী শ্রুতি-সমূহ-সমন্বিত গীতাশাস্ত্র তবে কিরূপে শ্রুতি-অনধিকারী শূদ্রাদির অধীত হইতে পারে? বেদান্তের সূত্র ও টীকাকারের মতে তাহা হইলে গীতাধ্যয়নও শূদ্রাদির পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু তাহাত হইতেছে না। গীতাতে শূদ্রাদি স্বচ্ছন্দে শ্রুতি আবৃত্তি করিতেছেন। এখন মনে করুন, গোলাপকে অন্য নামে ডাকিলে কি তাহার গোলাপত্ব নষ্ট হয়? যাহা কার্য্যতঃ সংঘটন, তাহা শত শাস্ত্রবচনেও ব্যাহত হয় না। "বচন-শতেন বস্তুনোঽন্যথা কর্ত্তুং ন শক্যতে।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে শ্রুতিসারসংগ্রহ, তাহা পণ্ডিতগণের সুবিজ্ঞাত; অথচ এই গীতা প্রতিদিন স্ত্রী-শূদ্রাদির পাঠার্থ অনুমোদিত

না ব্যবস্থিত রহিয়াছে! বস্তু একই, কেবল "বেদ-বেদান্ত" না বলিয়া "পুরাণ-ইতিহাস" বলা হইতেছে মাত্র! শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণেও কতিপয় উপনিষদী শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং তাহা অবাধে শূদ্রাদির অধীত হইতেছে। কঠশ্রুতির নচিকেতোপাখ্যান ও তাহার কতিপয় শ্লোক অগ্নিপুরাণে উদ্ধৃত এবং সেই অগ্নিপুরাণ শূদ্রাদির অবাধিত পাঠ্য; কিন্তু সেই মূল কঠশ্রুতিই মাত্র শূদ্রের অধিকারাতীত! ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত বিধান আর কি হইতে পারে? ফলিতার্থে ইহা সাধারণ-জ্ঞান-বিস্তারের প্রতিরোধী সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার কুফল মাত্র। কতকগুলি লোক এই জ্ঞানবিস্তার বিরোধিনী সঙ্কীর্ণা নীতির চিরপক্ষপাতী; আবার কতকগুলি উদারনৈতিক লোক ইহার বিরুদ্ধবাদী। একটি সমগ্র জাতিকে জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সুপবিত্র শিক্ষায় চিরবঞ্চিত রাখা কদাচ তাঁহাদের অভিপ্রেত হইতে পারেনা। তাঁহারা কদাচ এই বিদ্বেষ-বিদূষিত স্বার্থ-সঙ্কুচিত সাংঘাতিক মতের পরিপোষক নহেন।

ভারতবর্ষে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ বেদান্ত-বিদ্যা হইতে ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাৎকালিক গর্ব্বিত-বিপ্রপুত্রও করযোড়ে ক্ষত্রিয়ের নিকট বেদবিদ্যালাভার্থে প্রপন্ন হইতেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ে ৩য় পরিচ্ছেদে যে শ্বেতকেতু আরুণি এবং পাঞ্চালরাজ প্রবাহণের আখ্যান বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্ম বিদ্যালোচনায় কতদূর অধিকার ছিল, তাহা জানা যায়। আখ্যানটি এইরূপ, ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু একদা রাজন্য প্রবাহণের রাজসভায় উপনীত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বালক তদুত্তরদানে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণ বালক শ্বেতকেতু স্বীয় পিতৃ সন্নিধানে আসিয়া, অভিমান ব্যথিত-ভাবে-রাজার কৃত-প্রশ্ন ও স্বকীয় উত্তরদান-অক্ষমতা নিবেদন করিলেন। তাহাতে পিতা বলিলেন, এমন কি, তিনিও তৎসমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানেন না। তৎপর পিতা উক্ত রাজসমীপে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আমার ভাণ্ডারের ঐহিক-দ্রব্যরাশির মধ্যে আপনি যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, তাহাই প্রার্থনা করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, ও সব অনিত্য ধন আপনাতেই থাকুক, আমি উহার প্রার্থী নহি। হে রাজন্! আমার পুত্রকে আপনি কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহারই ব্যাখ্যা করুন। "রাজা কহিলেন" কোন ব্রাহ্মণই ইহা পূর্ব্বে জানিতেন না, পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একমাত্র ক্ষত্রিয়েরাই এই বিষয়ে শিক্ষাদানে সমর্থ।

"সহ কৃচ্ছ্রী বভূব তংহ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তংহোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাহবদো যথে যং প্রাকত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ।

শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, ব্রাহ্মণেরা তৎকালে উক্ত বিষয়ের কিছুই জানিতেন না ; ক্ষত্রিয়েরাই উহার একমাত্র উপদেষ্টা ছিলেন এবং উহা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ক্ষত্রিয় জাতিতেই নিবদ্ধ ছিল। এতাবতা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিল। কতিপয় ক্ষত্রিয় উক্ত-বিদ্যা হইতে ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন, তবে কেবল প্রবাহণের ন্যায় উদারচেতা রাজন্যগণই তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে কোন পার্থক্য বিধান করেন নাই।

তৎপর ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ১২শ পরিচ্ছেদে ঐরূপ আখ্যান বিবৃত হইয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্মণ 'আত্মা কি ও ব্রহ্ম কি" এই তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং তাঁহারা আপনারা কোন সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া উদ্দালক সমীপে গমন করিলেন। উদ্দালকও তাঁহাদের জিজ্ঞাসার প্রকৃত-উত্তর দানে অক্ষম হইলেন; সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজা অশ্বপতির সন্নিধানে উপনীত হইলেন; রাজা অশ্বপতিও তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পরদিবস রাজা তাঁহাদিগকে ধনদানে উদ্যত হইলে, তাঁহারা তৎপ্রতিগ্রহে অসম্মত হইলেন। ইহাতে রাজা ভাবিলেন যে, হয়ত তাঁহার রাজ্য-পালন সম্বন্ধীয় কোন ত্রুটি বা দোষের প্রতীকারার্থে তাঁহারা আসিয়াছেন, এই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্যে ত কোন দস্যু তস্কর নাই, কোন কৃপণ নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতাগ্নি নাই; মূর্খ নাই, ব্যভিচারী নাই, ব্যভিচারিণীও নাই" ইত্যাদি। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা সে সব কোন কারণেই আসেন নাই; তাঁহারা ধনের প্রার্থী নহেন; তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থী। এতচ্ছ্রবণে রাজা বলিলেন, "আমি আগামি কল্য এ বিষয় আপনাদিগকে বলিব। তদনুসারে তৎপরদিবস তাঁহারা শিক্ষা-লাভার্থে গুরুসমীপার্থী শিষ্যবৎ হোম-সমিধাদি সহকারে তাঁহারা রাজা অশ্বপতির নিকট আগমন করিলেন এবং অশ্বপতিও যজ্ঞোপবীত দ্বারা উপনয়ন বিধান না করিয়াই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

"তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরং মধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ। তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নি র্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু ভগবন্ত ইতি॥ তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈব বৈ তদুবাচ।"

এই সমস্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয়-সমীপে ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থ উপস্থিত হইতেন; কিন্তু অধুনা কেবল শূদ্র নহে, পরন্ত

পুরাণাদি-সহ বেদাধ্যয়নে অধিকার থাকা সত্ত্বেও বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় পর্য্যন্তও বেদ-বিদ্যায় অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছেন। অদৃষ্টের কি রহস্য, শূদ্রজার পুত্র বেদব্যাস হইলেন বেদের বিভাগ কর্ত্তা, এবং তাঁহা-রই প্রামাণিক নায়কত্ব মতে শূদ্রগণ বেদা-ধিকারে বঞ্চিত! যাহাহউক, সত্য কদাচ অভিভূত থাকিবার নহে। সংস্কারান্ধ ভাষ্য-কার প্রভৃতিরা যতই চেষ্টা করুন, সত্যা-ধিকারের জয় অপ্রতিহত; এই জন্যই বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেলায় "পূর্ব্ব-জন্মসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার সংস্কার লুপ্ত হইবার নহে" অগত্যা ইহাই সমাধান। অথবা সোজা কথায় এরূপ বলিলেও হয় যে, "যে শিখিয়াছে, যে শিখিয়াছে, তার আর হাত কি? কিন্তু সাবধান! আর যেন কেউ না শিখে। ইহা কি অদ্ভুত ন্যায়ের যুক্তি! এবং সেই জগদ্বিখ্যাত শঙ্করা-চার্য্যের পক্ষে ইহা কি অযোগ্য নীতি! ফলে তাৎকালিক-সমাজের উক্তবিষয়িণী সংস্কারান্ধতা এতই প্রবল ছিল যে, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যকেও তৎসমর্থনে বাধ্য করিয়াছিল।

যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমানে বেদাধিকার-বিচ্যুত হইয়া আছে, তাহারা অনেকেই জাতিতেও বস্তুতঃ শূদ্র নহে; অথচ তাহারাও যেন শাস্ত্র কর্ত্তৃকই বেদ বারিত, এইরূপ সংস্কারান্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে নীরব ও নিশ্চেষ্ট আছেন! ফলে যাহারা বাস্তবিক "শূদ্র" অভিধেয় জাতিতে উৎপন্ন, তাহাদেরও বেদধিকার নিশ্চিত অবারিত। স্মৃতি-শাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার বারিত হইয়াছে, বেদ-বিরোধিতায় তাহা অপ্রামাণ্য, ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। অথবা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এবং তাহাই সমীচীন বোধ হয়; যথা—স্মৃতিশাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা জন্ম বা জাতিগত শূদ্রত্বকে লক্ষ্য করে না; পরন্তু গুণ-কর্ম্মগত শূদ্রত্বকেই লক্ষ্য করে। এইরূপ সিদ্ধান্তই সরল, অকষ্টকল্পিত, যুক্তি যুক্ত, ন্যায় বিচারপূত ও বেদের অবিরুদ্ধ। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা এবং অন্যান্য স্মৃতি সমূহের উক্ত নিষেধোক্তি আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই অবি-তর্কিতভাবে প্রতিপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত শাস্ত্রে তাহাদিগকেই শূদ্র বলা হইয়াছে, যাহারা নীচপ্রকৃতি-ধারী ও হীনকার্য্যকারী, অতএব তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তি উচ্চতম বেদবিদ্যায় স্বতএব অনধিকারী সুতরাং তাহাদের জন্য অন্য সুগম শিক্ষাশাস্ত্র ব্যবস্থেয়। বস্তুতঃ ব্যাপার এই; কিন্তু কালসহকারে এই শূদ্রত্ব জন্ম ও জাতিগত হইয়া পড়াতেই যত গোল বাধিয়াছে; এমন কি এহেন শঙ্করাচার্য্যকেও এই ধাঁধায় পড়িয়া সময়ের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইয়াছে।

আরও দেখুন, গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্টা-ক্ষরেই বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"। অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মানু-সারেই আমি বর্ণবিভাগ করিয়া এই চতু-র্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উৎকৃষ্ট গুণ সত্ত্বগুণ যাঁহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের মধ্যে মধ্যম গুণ—অর্থাৎ রিপুর উত্তেজনা—অথচ

কর্য্যকারিতা প্রদ রজোগুণ প্রবল, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং রজস্তম মিশ্রিত মধ্যমাধম-গুণ-সম্পন্নগণ বৈশ্য, আর অজ্ঞানতাপ্রদ সর্ব্বাধম তমোগুণ ভূয়িষ্ট মানবগণই শূদ্র। আবার শিক্ষার উন্নতি-অবনতিতে ইহার বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। কখনও সাত্ত্বিক ব্যক্তি শিক্ষা ও সঙ্গদোষে রাজস—তামস হইয়া পড়িতেছে; কখনওবা শিক্ষা ও সঙ্গাদিগুণে রাজস তামসগণও সাত্ত্বিক হইতেছে। এই তিনগুণ দেশ কাল পাত্র বিশেষে পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া প্রবল হইতেছে। যথা গীতা—(১৪।১০)

"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বংতমশ্চৈব তমঃসত্ত্বং রজস্তথা॥
অভিভূত করি রজস্তম গুণদ্বয়।
হে ভারত! সত্ত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হয়॥
রজোগুণ বাড়ে যার সত্ত্ব তম পড়ে।
সত্ত্ব রজ অভিভবে তমোগুণ চড়ে॥

অতএব তমোগুণ প্রধান শূদ্রদেরও একেবারে নিরাশ হইবার কথা নহে; তাঁহারাও শিক্ষা সঙ্গগুণে তমোভাবকে অভিভূত করিয়া এবং উন্নততর গুণসম্পন্ন হইয়া বেদবিদ্যাধিকার লাভ করিতে পারেন। ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত-তত্ত্ব এবং পুরাকালে এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের ১৮৮।৮৯ অধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং জগদিদং ব্রহ্ম
পূর্ব্বং হি ব্রহ্মণা সৃষ্টং কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্
ছিলনা বর্ণের ভেদ ছিল সব ব্রহ্মময়।
ব্রহ্মার এ পূর্ব্বসৃষ্ট কর্ম্মে ক্রমে জাতি হয়॥

এইস্থলে জিজ্ঞাস্য হইয়াছে, শাস্ত্র মতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিরূপে নির্ব্বাচিত হইবে? তদুত্তরে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা সত্য ও অপর আধ্যাত্মিক গুণনিচয় অধিকার করিয়াছেন, এবং বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাহারা বীরধর্ম্মের সাধক ও তদানুসাঙ্গিক গুণাবলী ধারক, এবং বেদাধ্যয়নশীল, তাহারা ক্ষত্রিয়। যাহারা কৃষি বাণিজ্য পশুপালন কারী এবং আনুসাঙ্গিক অপর কতিপয় গুণাধিকারী বেদাধ্যয়নশীল, তাহারা বৈশ্য, কিন্তু যাহারা একেবারে বেদ-বিদ্যা-বিমুখ ও বিবর্জ্জিত এবং অন্তর্ব্বাহ্যশুদ্ধ-বর্জ্জিত, তাহারাই শূদ্র। শূদ্রের একটি বিশেষণ "ত্যক্তবেদঃ" অর্থাৎ ত্যক্ত হইয়াছে বেদ যৎকর্ত্তৃক, অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে-বিমুখ, কিন্তু বেদ-অধ্যয়নেই অনধিকারী উক্তপদের এরূপ অর্থ কদাচ সরল ও সঙ্গত হইতে পারে না।

সর্ব্বভক্ষ্যারতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ সবৈ শূদ্র ইতিস্মৃতঃ।
সর্ব্ব ভক্ষ্যে সদা যার রুচি,
সর্ব্বকর্ম্মকারী যে অশুচি;
ত্যক্তবেদ অনাচারী সেই,
স্মৃতি মতে শূদ্র বটে সেই।

"বেদোঽখিলধর্ম্মমূলম্" বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মার্থ বেদাধ্যয়ন; অতএব যে অন্তর্বাহে অশুচি ও অনাচারী হইয়া স্বভাবতই ধর্ম্ম বিমুখ, বেদাধ্যয়নের তাহার প্রবৃত্তি কেন হইবে, সুতরাং সেই "ত্যক্তবেদ" শূদ্র। সে আপন স্বভাবদোষে স্বেচ্ছায় স্বীয় বেদাধিকার হারাইয়াছে, সঙ্কীর্ণ শাস্ত্র সঙ্কীর্ণসমাজ বিধিবিধানে তাহাকে বেদ-বর্জ্জিত

করে নাই। শাস্ত্রের প্রকৃত-তাৎপর্য্য বিকৃত ভাবে বুঝিয়া টীকা ভাষ্যকারগণও সাধারণকে তদ্রূপ বুঝাইয়াছেন। সেই মূল শাস্ত্রবোধের ভুলক্রমে সমাজে বদ্ধমূল হইয়া, "আকৃতি-প্রকৃতি-গ্রাহ্যাজাতি কর্ম্মানুসারিণী" এই বিস্পষ্ট শাস্ত্রীয় জাতিতত্ত্ব ক্রমে অস্পষ্টতা পাইয়া শুধু জন্মগত জাতীয়ত্বই সমাজে সুদৃঢ় সংবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে উপযুক্ত অধিকারী শূদ্রেরও বেদাধ্যয়নে সামাজিক অনভিমত। ফলিতার্থে তাহারই তিক্তবিষাক্ত ফল।

শূদ্রেচ যত্তবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈশূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

শূদ্র-বংশে জাত ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণান্বিত হয়, আর ব্রাহ্মণ-বংশে জাত ব্যক্তি যদি শূদ্র-লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে সে শূদ্র শূদ্র নহে, সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্র ব্রাহ্মণ বটে, এবং সেই শূদ্র লক্ষণ ব্রাহ্মণ শূদ্রই বটে।

গুণে শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে এবং দোষে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে পারে। পুরাণ-রাজ শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্ব্বর্ণের সাধারণ লক্ষণ বর্ণন করিয়া পরে বলিলেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যতে তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

যেরূপ বর্ণলক্ষণ বর্ণিত হইল, তদনুসারে এক বর্ণের লক্ষণ অপর বর্ণজ-পুরুষে লক্ষিত হইলে, তাহার লক্ষণানুসারেই বর্ণ-বিনির্ণয় কর্ত্তব্য। তারপর স্মৃতিরাজ মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র কি বলিতেছেন, দেখুন;—

"প্রচ্ছন্না বাপ্রকাশাবাঁ বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ"

যাহার জন্ম প্রচ্ছন্ন বা যাহার কুল অজ্ঞাত, তাহার স্বকর্ম্মদ্বারাই বর্ণ-বিনির্ণয় হইবে। মনু আরও বলেন,—

তপো বীর্য্য প্রভাবৈস্তত্তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষিহ জন্মতঃ॥

তপস্যা ও জ্ঞান-বলেই মানব যুগেং জন্মগত উৎকর্ষাপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব গুণই শ্রেষ্ঠজাতীয়তার হেতু এবং দোষ বা গুণাভাবই নিকৃষ্টজাতীয়তার হেতু। স্থলান্তরে মনুও স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতিশূদ্রতাম্"

শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়। অপর একস্থলে মনু বলিয়াছেন,—

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্ গুণৈঃ।"

আর্য্যপিতা ও অনার্য্যামাতার পুত্রও গুণের দ্বারা আর্য্যই হইতে পারে। সুবিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্র-কর্ত্তা মহর্ষি গৌতম বলেন, "বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।" গুণের উৎকর্ষাপকর্ষতা ফলেই মনুষ্যের বর্ণান্তর প্রাপ্তি হয়; অর্থাৎ গুণোৎকর্ষে উৎকৃষ্ট বর্ণান্তর প্রাপ্তি ও গুণাপকর্ষে অপকৃষ্ট বর্ণান্তর প্রাপ্তি ঘটে। অপর, মনুর পরেই বিখ্যাতনামা ব্যবস্থাশাস্ত্রকার মহামুনি অত্রি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন-যুক্ত ও অনিত্য-সংসার মোহ-মুক্ত, সেই ব্রাহ্মণ। যে বীর-ধর্ম্মা ও সর্ব্ববিধ ক্ষত্রিয়কর্ম্মা, সেই ক্ষত্রিয়। যে কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাকারী বিহিত বৈশ্যাচারী, সেই বৈশ্য। যে মধু-মাংস-লবণ-বিক্রেয়ী, অজ্ঞ, অনয়ী, সেই শূদ্র। আর যে সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, মহামূর্খ ও সর্ব্বপ্রাণী

হিংসন-দক্ষ, সেই চণ্ডাল। অত্রির এই অভিমতে গুণ-ক্রিয়াগত জাতীয়ত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। অপিচ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ একবাক্যে বলিতেছেন যে, ঘৃৎসমদের পৌত্র, শুনকের পুত্র শৌনক আপন পুত্রগণকে স্ব স্ব কর্ম্ম-ভেদে বিভক্ত করিলেন। যথা বায়ুপুরাণ——

"পুত্রো ঘৃৎসমদস্য শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ॥
এতস্য বংশসম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ——ঘৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যাং প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ" ইত্যাদি।

হরিবংশ অবিকল বায়ুপুরাণের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের যে প্রসিদ্ধ "পুরুষসূক্ত" প্রাচ্য পাশ্চাত্য সর্ব্বপণ্ডিত-সমাজেই রূপক-সিদ্ধান্তে সমাদৃত, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের বিভিন্ন-অঙ্গ হইতে বিভিন্ন-বর্ণের উৎপত্তি। যথা পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র সমুদ্ভূত। এস্থলে প্রশ্ন করা হইয়াছে কি প্রকারে পুরুষের বিভিন্ন-অঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের পরিচয় প্রতিপন্ন হইবে? মুখ কাহাকে বলা যায়? বাহু কাহাকে বলে, উরু এবং পদই বা কাহাকে বলা যায়? যথা—"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য, কৌ বাহূ. কা উরু-পাদা উচ্যেতে।" উত্তর পক্ষ পরিষ্কার'—যথা ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ স্বরূপ, বাহু ক্ষত্রিয় স্বরূপ এবং উরু ও চরণই বৈশ্য ও শূদ্র স্বরূপ।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন বৈদিক-যুগের পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে বর্ণ-ভেদ প্রথা গঠিত হইয়া আসিলে, বর্ণভেদের পক্ষপাতিগণ ঋগ্বেদে উক্তবাক্য প্রক্ষিপ্ত করিয়া আত্মমতস্থ বর্ণভেদ-বিধির প্রাচীন ও সমীচীন সমুৎপত্তি সপ্রমাণিত করিয়াছেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করিতেছি না। আমরা বলি, পুরুষসূক্তের উক্তবাক্য জাতি-ভেদের মৌলিক-অস্তিত্বের কোন পরিষ্কার প্রমাণ নাই এবং সায়ন ও মহীধর প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক টীকাকারগণও উহাকে রূপকার্থ ভিন্ন অন্যার্থে গ্রহণ করেন নাই। পুরুষসূক্তের উক্তবাক্যে মাত্র এই তাৎপর্য্যটুকু ব্যক্ত হইয়াছে যে, চতুর্ব্বর্ণের সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ, উত্তম ক্ষত্রিয়, মধ্যম বৈশ্য, এবং অধম শূদ্র। আর্য্যসমাজ দেহের অঙ্গ বিভাগ এইরূপ। সূক্তে উক্ত হইয়াছে,

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"
বদনে ব্রাহ্মণ জাত, ক্ষত্র বাহুদ্বয়।
উরুতে উৎপন্ন বৈশ্য, পদে শূদ্র হয়॥

যদি কেহ বলে সুবর্ণ অলঙ্কাররূপে পরিণত হইল, তবে বুঝিতে হইবে যে, অবশ্য অলঙ্কারের পূর্ব্বেই সুবর্ণ, তদ্রূপ যদি বলা যায়, ব্রাহ্মণ মুখরূপে পরিণত হইল, তবে মুখের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক, ব্রাহ্মণও মুখ, এই উভয় শব্দই একবচনান্ত হওয়াতে মুখ শব্দকেও কর্ত্তৃকারক ধরা যাইতে পারে, এরূপ বলা যায়; কিন্তু তৎপরেই দেখা যায় যে, রাজন্য "পদ-একবচন" কিন্তু বাহু

দ্বিবচন এবং "কৃতঃ" পদও একবচন, সুতরাং একবচনান্ত কৃতের সহিত বাহুর যোজনা হইতে পারে না, রাজন্যের সহিত উহার অন্বয় হইবে। অতএব "বাহু রাজন্যঃকৃতঃ" বাক্যে, বাহুর পূর্ব্বেই রাজন্যের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে।

উক্ত-সূক্তি দ্বারা বস্তুতঃ বর্ণ-ভেদের উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না; কেবল এতদ্দ্বারা এইমাত্র প্রকাশ পায় যে, একই সমাজ-দেহের চতুরঙ্গ এই চতুর্ব্বর্ণ; ফলে পরবর্ত্তী অপর সমস্ত শাস্ত্রদ্বারাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, এই চতুর্ব্বর্ণ এক মূল বর্ণ হইতে কর্ম্ম ভেদে উৎপন্ন। মহাভারত বলেন, চতুর্ব্বর্ণের সকলেই এক পবিত্র ভাষাভাষী। যথা— "ইত্যেতে চতুরোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী" যদি শূদ্র অপর দ্বিজ ত্রিবর্ণ হইতে প্রকৃত স্বতন্ত্র মৌলিক জাতি হইত, তবে তাহারা কখনও দ্বিজ-ভাষিত-ভাষায় সমভাষী হইতে পারিত না। আমরা দেখিতে পাই যে, মূল আর্য্য ও আর্য্যজাতি পরস্পর বিভিন্ন ভাষা-ভাষী কিন্তু শূদ্র অপর আর্য্য বর্ণত্রয়সহ সম্পূর্ণ সমভাষা-ভাষী। বেদে দেখা যায় যে, অনার্য্যেরা "শূদ্র" সংজ্ঞায় অভিহিত হয় নাই; তাই পাশ্চাত্য অধ্যাপক-প্রবর মোক্ষমূলর বলেন যে, শূদ্র যে স্বীয় জাতীয়ত্বে আর্য্যজাতি হইতে বিভিন্ন, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই শূদ্র; কিন্তু তাঁহাদের কোনরূপ ধর্ম্মক্রিয়াদি চিরকালের জন্য প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। যথা—

"ধর্ম্মযজ্ঞো ক্রিয়াতেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে" ইত্যাদি।

"বজ্রশুচি" উপনিষদে ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে একটি আলোচনা দৃষ্ট হয়। যথা—জীব বা দেহী আত্মা ব্রাহ্মণ নহে; কারণ জীব বহুবিধ-দেহ ধারণ করেন। দেহও ব্রাহ্মণ নহে, কারণ মানুষ মাত্রেরই দেহ সাধারণতঃ এক প্রকার এবং উহা জরা মৃত্যুর অধীন; অপিচ, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপই শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা দৃষ্ট হয় না। জন্ম জাতিগত ভাবেই ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয় না; কারণ ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী-গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ, তদ্রূপ ব্যাস কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভসম্ভূত, বশিষ্ঠ উর্ব্বশীর অপত্য, তথাপি ব্রাহ্মণ। অপর কেবল বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব হয় নাই; যেহেতু ক্ষত্রিয়গণ অপরাপর অনেক মনুষ্য ও বিশিষ্ট বিদ্বান্ ও জ্ঞানী হইয়া থাকেন। কর্ম্ম ও ব্রাহ্মণত্বের হেতু নহে, কারণ প্রত্যেকেই কর্ম্মের অধিকারী। ধর্ম্ম বা পুণ্যের দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ নহে; ধর্ম্ম বা পুণ্য কার্য্য অপরেও করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন। অতএব কেবল জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সংস্কারান্ধ টীকা ভাষ্যকারগণের সমক্ষে বজ্রশূচি বস্তুতঃ এক দুর্ভেদ্য সমস্যা সংস্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে বজ্রশূচী বস্তুতঃই বজ্রশূচী।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে সত্যকাম জাবালের যে আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারা বুঝা যায় যে,

বেদ কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর একচেটীয়া বস্তু নহে। গুণের দ্বারা যিনি উপযুক্ত হইবেন, তিনিই বেদ স্বাধ্যায়ের সমাদৃত-অধিকার প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আখ্যান শূদ্রের বেদে অনধিকারের প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে।

সত্যকাম জাবালের বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। সে গুরু-সমীপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষায় নিজ মাতার নিকট স্বীয় গোত্র জানিতে চাহিয়াছিল। মাতা বলিলেন- "বৎস! তোমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে আমি বহুগোত্রীয় পুরুষের পরিচর্য্যায় ছিলাম, সুতরাং তুমি কোন্ গোত্রজ তাহা অনির্দ্দিষ্ট। যাহাহউক, তোমার নাম সত্যকাম এবং আমার নাম জবালা; অতএব জবালার পুত্র স্বরূপে তুমি সত্যকাম জাবাল নাম ব্যবহার করিও। তৎপর সত্যকাম জাবাল ঋষি হরিদ্রুম গৌতমের নিকটে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম লাভের প্রার্থনায় উপনীত হইলে তৎকর্ত্তৃক তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসিত হইল; তখন সত্যকাম মাতৃসকাশে শ্রুত বিবরণ অবিকল নিবেদন করিলেন। ঋষিবর সত্যকামের সম্পূর্ণ সরল সত্যবাদিতা এবং নিজের লজ্জাজনক জন্মকুৎসা বর্ণনেও অপূর্ব্ব অকুণ্ঠতা দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত এরূপ কেহ বলিতে পারেনা। তুমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ সত্য নিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট হও নাই; অতএব আমি তোমাকে দীক্ষা দিব। যাও বৎস! সমিধ আনয়ন কর।

এই আখ্যানে যদি কিছু প্রমাণিত হয়, তবে তাহা এই যে, পুরাকালে এক মাত্র সত্যনিষ্ঠাই ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। পিতা মাতা যে বর্ণেরই হউন, যিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনিই সত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত। তাই অজ্ঞাত-পিতৃগোত্র-সত্যকাম কেবল স্বীয় সত্য-নিষ্ঠ-প্রভাবেই ব্রাহ্মণ পদে পরিগৃহীত হইল। ৩৭ সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সত্যকাম শূদ্র নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই গৌতম তাহাকে দীক্ষাদানে উদ্যত হইলেন। তিনি সত্যকামের সত্যপরায়ণতা দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহাহউক, সত্যপরায়ণতা দ্বারা যদিও ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয়, তথাপি উক্ত গুণ যে অবশ্য কেবল ব্রাহ্মণাখ্যা একচোটিয়া শ্রেণীবিশেষেই থাকিবে, এমন কোন কথা নহে। তবে যদি বলা যায় যে, যে সত্যপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণ; তবে ত বর্ণ-ভেদকে নিরাপদে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ সত্যকাম-জাবালের ঘটনায় ইহাই ঘটিয়াছে। এই আখ্যানটিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় না যে, সত্যকামের জনয়িতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, বা তৎপরবর্ত্তী অপর বর্ণদ্বয়ের কোন বর্ণীয় ছিলেন; এমন কি, ইহার মাতৃবর্ণ পর্য্যন্ত ইহাতে কিছু মাত্র প্রকাশ পায় নাই; বরং ইহার মাতার বর্ণিত-বিবরণে তাহাকে নিচজাতীয় বলিয়াই অনুমান হইতে পারে। আচার্য্য গৌতম বালকের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়াই "ব্রাহ্মণ ভিন্ন এরূপ সত্য কেহ বলিতে পারে না" এই সমাধানে তিনি তাহাকে শিষ্য করিলেন। এস্থলে অনুসন্ধান দ্বারা সত্যকামের জন্মবৃত্তান্ত জানিয়া তাহার জাতি-নির্ণয় হইল না; পরন্তু তাহার আভ্যন্তরিক-চরিত্র

গৌরবেই তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত বা স্বীকৃত হইল। যদি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সদ্গুণই বেদাধিকারপ্রদ ব্রাহ্মণত্বের হেতুরূপে ধরা যায়, অথচ শূদ্রের বেদে অনধিকার নির্ণীত হয়, তবে নিশ্চয় এই বিধিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বা সদুপপত্তি রক্ষিত হইতে পারে না; কেননা শূদ্রবংশীয় যে, সেও নির্দ্দিষ্ট সদ্গুণের অধিকারী হইতে পারে, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারত্ব অবশ্য তাহার পক্ষে অবারিত। তথাপি যদি গুণ ধরা যায় যে, উক্ত নির্দ্দিষ্ট গুণপ্রাপ্ত শূদ্র স্বীয় শূদ্রত্বমুক্ত ও ব্রাহ্মণত্ব যুক্ত হইয়া তবে বেদাধিকারী হইতে পারে, তাহাতে ফলিতার্থে শূদ্রপক্ষই সমর্থিত হয়। সেই হিসাবে বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি শূদ্রই অহেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব এবং এইরূপে হীন জন্ম হইতেও অনেকের কার্য্যতঃ ঋষিত্ব ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারত্ব লাভ হইয়াছে, তাহার পৌরাণিক সাক্ষ্যের অভাব নাই।

৩৬ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যজ্ঞোপবীত প্রাপ্তির অভাবও শূদ্রের বেদাধিকার বারণের আনুসাঙ্গিক কারণ। উক্ত যজ্ঞোপবীত ত্রিদণ্ডী যুক্ত এবং বস্ত্র, সূত্র বা কুশ নির্ম্মিত হওয়াই বিধি। যাহাহউক, যজ্ঞোপবীতের প্রকৃত তাৎপর্য্যের বিষয়ে মনু বলেন,——

"বাগ্দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি সউচ্যতে
সেই ত "ত্রিদণ্ডী" বাচ্য বুদ্ধি সিদ্ধ যার—
বাগ্দণ্ড মনদণ্ড কায়দণ্ড আর।

অর্থাৎ কায়, মন ও বাক্য যাহার শাসিত ও সংযত, তিনিই যথার্থ যজ্ঞোপবীতধারী! যজ্ঞোপবীতের স্থূল ত্রিদণ্ড এই সূক্ষ্ম ত্রিদণ্ডের বাহ্য নিদর্শন মাত্র। ফলিতার্থে ব্রাহ্মণত্ব বা বেদাধিকরিত্ব কোন স্থূল বাহ্যলক্ষণের অধীন হইতে পারে না। উহা বরং মনুক্ত সূক্ষ্মযজ্ঞসূত্রেরই অধীন বলা যাইতে পারে। পুরাকালে স্থূল যজ্ঞোপবীত গ্রহণ অনেক স্থলে ইচ্ছানুযায়ী ছিল মাত্র। পিতৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে উহা সাময়িকভাবে ব্যবহৃত হইত মাত্র। যাঁহারা ইহা ধারণ করিতেন, তাঁহারাও ঠিক সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেই ধারণ করিতেন। যাহা হউক, এই যজ্ঞসূত্র কেবল একটি স্থূল বাহ্য চিহ্নমাত্র; সুতরাং অভাব কদাচ প্রকৃত গুণের অভাব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যজ্ঞোপবীত ত অদ্যাপি তথাকথিত শূদ্র সংজ্ঞিতগণেরও দেব-পিতৃ কার্য্যে স্কন্ধদ্বয়লগ্নভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়রাজ অশ্বপতি অনেকগুলি ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বাহ্য সূত্রাদির কোন অপেক্ষা রাখেন নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত সেই আখ্যান ইতঃপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

অতঃপর শূদ্রের বেদাধ্যয়ন বিষয়িণী আলোচনার সার সংগ্রহ করা যাইতেছে। শূদ্র বেদাধিকার বর্জ্জিত, এ সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য বা পরিগ্রাহ্য নহে।

বেদে এমন কোন শ্রুতি বা নিষেধ বিধি নাই, যদ্দ্বারা শূদ্রজাতির বেদাধিকার বারিত হয়। বরং বেদে তদ্বিপরীত অর্থাৎ শূদ্রের বেদাধিকার বিষয়িণী শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, সত্যকাম জাবাল, বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেদাধিকারের অনুকূল

দৃষ্টান্ত দ্বারা শূদ্রের বেদাধিকার সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। আর যখন সংস্কারান্ধতা ও স্বমত মত্ততার পূর্ণ প্রভাব ভারত-বক্ষে প্রবল ও প্রকট ছিল, সেই সময়েও ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যয়নে শূদ্রগণের অবারিত অধিকার ছিল। আর তন্তৎশাস্ত্রগত অনেক শ্রুতিবাক্য সুতরাং তাঁহারা অবশ্য অব্যাহতভাবে আবৃত্তি ও শিক্ষা করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় এবং অনেক ব্রতাদি দেবকার্য্যেও বিবিধ মন্ত্রাদিতে শ্রুতি উচ্চারণে শূদ্রদের বাধা ছিলনা এবং এখনও নাই। যদি শূদ্র শব্দে অনার্য্য জাতি বুঝায়, তবে আর্য্যজাতির ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ে বেদ বারণ বিধি প্রযুক্ত হইতে পারে; যেহেতু ভারতীয়-প্রাচীন-সাহিত্যাদি পাঠে জানা যায় যে, আর্য্যজাতির সহিত অনার্য্য জাতির বিবিধ-ঘটনায় বহুসংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তারপর, যদি মানসিক ও শিক্ষাগত গুণা পকর্ষই শূদ্রত্বের হেতু হয়, তবে সে হেতু দ্বিজ ত্রিবর্ণেও অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণেই বর্ত্তিতে পারে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত জাতি 'শূদ্র' সংজ্ঞায় অভিহিত, এবং বেদে অনধিকারী বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কি জাতিতত্ত্ব বিচারে, কি মানসিক-সদ্গুণাধিকারে, কি শিক্ষা--সাধনায়, কি কর্ম্ম-মর্য্যাদায়, কোন বিষয়ে কোন অংশেই তাহারা শূদ্র নহে, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বেদ-বারণ-বিধি তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না।

যাহারা শাস্ত্রীয়-লক্ষণাক্রান্ত যথার্থ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা জ্ঞান-বিস্তারের বিরোধী হইতে পারেন না, কারণ উহা অনুদার-নীতি ও হীন-বিদ্বেষ-দূষিত-স্বভাবের ফল। বেদ বিদ্যা, ব্রহ্ম-বিদ্যা বা ত্রয়ীবিদ্যা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া থাকা কদাচ বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সাধারণে বেদ-বিদ্যা বিস্তারিতা হইলে, তাঁহাদের প্রাধান্য কমিবে এরূপ কল্পনা ও হীন আশঙ্কা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ হৃদয় দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। যে ব্রাহ্মণেরা বেদ-বারণ-বিধির পক্ষপাতী, তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই উক্ত পক্ষপাতের একমাত্র হেতুভূত। যাহাদিগকে তাঁহারা অনধিকারী বিবেচনা করেন, তাঁহারা যদি বেদাধ্যয়নে রত হন, তবে ব্রাহ্মণেরাও বরং তাঁহাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অন্ততঃ প্রতিযোগিতা ভাবেও বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকতর প্রযত্নশীল হইলেও তাহাতেও সমাজে সুফল ফলিবে। এখন ব্রাহ্মণেরাই প্রায় বেদালোচনার বহির্ভূত হইয়া পড়াতে আপনারাই যথার্থ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব যদি বেদপাঠী শূদ্রাপেক্ষা আপনাদের বেদ-জ্ঞান বর্দ্ধিততর রাখিবার অনুরোধেও তাঁহারা উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে বেদবিদ্যায় সাধক হন, তাহাতে সমাজে অতি স্বাস্থ্যকর-পরিবর্ত্তন আসিয়া সমগ্র সমাজের সমুন্নয়নই বিধান করিবে, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্যাদির প্রকৃত পুনরুদ্ধার হইয়া ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইতে পারিবে। তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যিনি তাঁহার পরিচিত ভ্রাতাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লন, কিন্তু যিনি সেই পতিতের চিরপতিতাবস্থারই প্রয়াসী

তিনি যে কিরূপ ব্রাহ্মণ পক্ষাক্রান্ত, তাহা সহজে অনুমেয়।

অধুনা অস্মদ্দেশে শত শত শাস্ত্র গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে। বহুদিন হইতে ঐ সমস্ত গ্রন্থাদির ব্যবসায় কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-নীতি ফলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পরিবার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া তত্তৎ পরিবারের ধ্বংসের সহিতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থাদি সমাজ মধ্যে উদারভাবে সাধারণ্যে ব্যবহৃত ও বিস্তারিত থাকিত, তবে অবশ্য শত বিপ্লবেও কোথাও না কোথাও অদ্যাপি তৎসমস্তের অস্তিত্ব সুবিলুপ্ত রহিত। সংস্কার-অন্ধতা বা গোঁড়ামীর হুজুকে দেশের মঙ্গল ত কিছুই হয় না, অধিকন্তু যাহারা সমাজে অজ্ঞাত ও অধঃপতিত জাতি, উহা তাহাদের উন্নয়নের প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কি পরার্থপরতা, কি স্বার্থপরতা, কি শাস্ত্রীয়-বিধান, অপক্ষপাতবিচার ও যুক্তিপ্রমাণ এ সমস্তই "সমাজের সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞানোন্নতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক" এই অভিমতি বা নীতির উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে! পরার্থপরতার অব্যাঘাতেই যথার্থ স্বার্থপরতা সিদ্ধ হয়। মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞানোন্নতির আবশ্যক, এই সাধারণ ও স্বাভাবিক নীতির উপরই শূদ্রের বেদাধিকার স্থাপিত। ২৫সূত্রে "মনুষ্যাধিকারাৎ" বাক্যে এই সিদ্ধান্তই সূচিত। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সূত্র নিচয়ে যে এই 'মনুষ্য' শব্দের সঙ্কীর্ণার্থ ঘটাইয়া দ্বিজত্রিবর্ণের মধ্যেই যে উক্ত বেদাধিকার বদ্ধ রাখার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কদাচ প্রশস্ত বা পরিগ্রাহ্য হইতে পারে না; ফলে সম্ভবতঃ উক্ত পদ গুলি প্রক্ষিপ্ত।

৩৯ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কম্পন হেতু প্রাণই ব্রহ্ম। কঠোপনিষদে (২।৩।২) উক্ত হইয়াছে—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

যাহা কিছু এই সর্ব্ব জগন্ময়।
প্রাণেতে প্রাণ প্রকম্পিত হয়॥
মহত্তর সমুদ্যত বজ্র প্রায়।
যারা জানে তারা অমৃতত্ব পায়॥

এ স্থানে 'প্রাণ' পদের অর্থ প্রাণ-বায়ু অথবা ব্রহ্ম, তাহাই এই সূত্রের বিচার্য্য বিষয়। ইহার ভীষণসত্তা উক্ত হওয়াতেই যে এতদ্দ্বারা ব্রহ্মই বিজ্ঞেয় হইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব; অতএব ইহা বিবেচনা করাই অসঙ্গত যে, মূল-বিষয় ছাড়িয়া এতদ্দ্বারা কেবল বাতাসেরই স্তুতি করা হইয়াছে। আর বাতাসকে জানিয়াই বা কে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে? কঠোপনিষদে আর একটি এইরূপ শ্রুতি আছে, তদ্দ্বারাও ব্রহ্মের ভীষণ-সত্ত্বা প্রাধান্যই প্রতিপন্ন হয়। যথা—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"
এঁর ভয়ে ভীত হয়ে, বৈশ্বানর বিশ্ব দহে,
ভয়ে ভানু তাপে বসুধায়।
এঁর ভয়ে ইন্দ্র ভীত, ভয়ে বায়ু প্রবাহিত,
পঞ্চমতঃ ভয়ে মৃত্যু ধায়॥

বেদে ঠিক এই তাৎপর্য্যের আর একটি শ্রুতি এই যে,—

ভীষস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥
এঁর ভয়ে হয়ে ভীত, বায়ু হয় প্রবাহিত,
এঁর ভয়ে সূর্য্য সমুদিত।
ভীত ইন্দ্র এঁর ভয়ে, এঁর ভয়ে অগ্নি দহে,
পঞ্চমতঃ মৃত্যু প্রধাবিত॥

কোথাওবা আলঙ্কারিকভাবেও 'প্রাণ' পদের প্রয়োগ হইয়াছে; যথা—"প্রাণস্য প্রাণম্" এই স্থলে এই প্রাণের প্রাণটিকেও ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

৪০ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, জ্যোতিই ব্রহ্ম; যেহেতু ঔপনিষদী শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্ত্বই দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।১২-৩) দৃষ্ট হয়,—

এষ সম্প্রসাদস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সম্পদ্য স্বেন রূপেণ বিনিষ্পদ্যতে

এ শরীর হতে সমুত্থান করি,
সেই সম্প্রসাদ স্ব স্বরূপ ধরি,
সে পরমজ্যোতিঃ স্বরূপ তখন,
করে সে অমনি আত্মসমর্পণ।

এই সূত্রের মীমাংসিতব্য বিষয় এই যে, শ্রুত্যুক্ত "জ্যোতিঃ" শব্দ সূর্য্যাদির জ্যোতির ন্যায় সাধারণ আলোক বুঝাইবে না। এতদ্দ্বারা সেই ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্ম এবং শ্রুতিতে পরজ্যোতি পদে পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

৪১ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, আকাশই ব্রহ্ম; যেহেতু নাম-রূপ-উপাধির অতীত রূপেই এ তত্ত্ব পরিচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১৪-১) উক্ত হইয়াছে,—

"আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্মতদমৃতং স আত্মেতি স্মৃযতে।"

আকাশ পদেতে হন পরিচিত যিনি।
নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক তিনি॥
এই সর্ব্ব নাম-রূপ যাঁর অন্তর্ভূত।
ব্রহ্ম-আত্মা-অমৃত স্বরূপে তিনি স্তুত॥

এখানে স্পষ্টই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, সমস্ত নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক স্বরূপে উক্ত এই "আকাশ" পদ "ব্রহ্ম" পদেরই প্রতিশব্দ বিশেষ। পরন্তু উহা এস্থলে অনিত্য ভৌতিক-আকাশ বা ব্যোম-বাচক নয়। ব্রহ্মকে যেমন ইতঃ পূর্ব্বে আলঙ্কারিকভাবে 'জ্যোতি' বলা হইয়াছে, এস্থলেও তদ্রূপ আলঙ্কারিকভাবে 'আকাশ' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ নাম রূপ-উপাধির পূর্ণ প্রকাশ স্বয়ং পূর্ণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন সৃষ্ট বস্তুর দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। ছান্দোগোপনিষদ্ (৭।৩-২) বলেন—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম রূপে ব্যাকরবাণীতি।

এই সর্ব্ব জীবেতে জীবাত্মা সমন্বিত—
প্রবেশিয়ে নাম-রূপ করি প্রকাশিত।

উপরোক্ত-শ্রুতিতে অতি বিশদরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র ব্রহ্মই যাবদীয় নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক। এস্থলে জীবাত্মা কর্ত্তৃকই নাম রূপাদি-প্রকাশক কথিত হওয়াতেও উক্ত তাৎপর্য্যের কোন বিপর্য্যয় ঘটে নাই; যেহেতু পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপাদির প্রকাশ করিতেছেন। ফলিতার্থে

জীবাত্মা পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক স্বরূপ নহেন।

৪২ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, জীবের সুষুপ্তি সময়ে ও মৃত্যুতে জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া যান; অতএব জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা পৃথক্‌তত্ত্ব, এরূপ সিদ্ধান্ত অবিশুদ্ধ; যেহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মা পারমার্থিক একত্বই শ্রুতি সিদ্ধান্ত সম্মত।

বক্ষ্যমাণ শ্রৌত-প্রসঙ্গের উদ্দেশ্যই পরমাত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন, সুতরাং সুষুপ্তি সময়ে দেহ হইতে দেহীর অর্থাৎ জীবাত্মা উৎক্রামণ জন্য উক্ত জীবাত্মার কোন স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে; যেহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য প্রতিপাদন শ্রুতিবিরুদ্ধ।

৪৩ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পতি প্রভৃতি পদের প্রয়োগ থাকায় তদ্দ্বারা ব্রহ্মই বোধিতব্য।

"স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" ইত্যাদি শ্রৌতবাক্যে পরমাত্মাই প্রতিপাদিত; যেহেতু 'সর্ব্ব' অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ামক, বিশ্বের প্রভু ও বিশ্বের পাতা সেই বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা ভিন্ন জীবাত্মা কদাচ হইতে পারে না, ইতি।

(৩য় পাদ সমাপ্ত।)

(ক্রমশঃ)

আহার।

পঞ্চমাধ্যায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

তবে এখন দেখা যাউক কি বিশেষ কুষ্মাণ্ডাদি সম্বন্ধে কারণ বশতঃ কুষ্মাণ্ডাদি সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম করা হইয়াছে। এই সকল বিধির মূলে যে একটি গূঢ় অভ্রান্ত সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা আর হয়ত এখন কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনি যেন আমার এই প্রবন্ধ পাঠ না করেন, আমি তাঁহার জন্য এত কথা লিখি নাই।

বিশেষ নিয়মের বিশদ যুক্তি।

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড।

পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয় প্রতিপদেই শ্লৈষ্মিক-ধাতু অপেক্ষাকৃত লবণরসাশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্লেষ্মা স্বভাবতঃই লবণরসাত্মক।* রসাদির গুণাবধারণ করিবার সময় দেখান গিয়াছে যে, লবণরস ব্রণাদি ক্লেদরোগবর্দ্ধক। কুষ্মাণ্ডেও আবার লবণের ভাগ (ক্ষার) অত্যধিক পরিমাণে আছে। অতএব কুষ্মাণ্ড যদি প্রতিপদে ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে তিথির ক্রিয়ানুসারে বর্দ্ধিত-লবণরসের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রণাদি ক্লেদরোগ উৎপন্ন করিতে পারে। এই জন্যই প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয়ায় বৃহতী।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিথিগত ধাতুবিকার নির্ণয় করিবার সময় দেখা গিয়াছে যে, দ্বিতীয়ায় স্বভাবতঃই পৈত্তিকধাতু অতীব উষ্ণ হয় এবং বায়ুও রুক্ষ হয়। অতুষ্ণ পিত্তে এবং রুক্ষাদি বায়ুবিকারে 'অর্দ্দিত-রোগ' জন্মিয়া থাকে। অর্দ্দিতরোগকে

---

* শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা।
তমো গুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণো ভবেৎ॥
ভাব প্রকাশ।

ইংরাজি ভাষায় বোধ হয় "cancer" বলে। যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেই অর্ব্বুদরোগের উক্ত হেতু নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সাধারণ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, উষ্ণগুণবিশিষ্ট বীর্য্যবর্দ্ধক কোন দ্রব্য ভোজন করিলে দৈহিক-উত্তাপ স্বভাবাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অপরিমিত দৈহিক-উত্তাপ এবং বায়ুর রুক্ষতায় কি ক্রুরতায় রক্ত ও মজ্জা (মেদ) দূষিত হইয়া পড়ে। সেই সময় যদি পিত্ত সমধিক উষ্ণ অথবা শ্লেষ্মা ক্রুর থাকে, তাহা হইলে সেই বিকারগুলির পরস্পর সংক্রামণে "অর্ব্বুদরোগ" জন্মিয়া থাকে।

বৃহতীর গুণাধারণ করিবার সময় আমরা দেখাইয়াছি যে, বৃহতী পিত্তে যুক্তকারিণী এবং ক্রুরবায়ুবর্দ্ধিনী। সুতরাং দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণ করিলে উক্ত তিথিসম্ভূত-পিত্তের উষ্ণতা এবং বায়ুর ক্রুরতা আরও অধিক প্রবল হইবার সম্ভাবনা। যদি দুরদৃষ্টক্রমে তাহাই হইয়া উঠে, তাহা হইলে অর্ব্বুদরোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই সূক্ষ্মদর্শী মহাপুরুষগণ দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন।

তৃতীয়ায় পটোল। *

তিথি সম্ভূত ধাতুবিকার নির্ণয় করিবার সময় দেখা গিয়াছে যে, তৃতীয়ায় শোণিত অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং বায়ু ক্রুর ভাব ধারণ করে। বায়ুর ক্রুরতায় শোণিত অতিশয় সাচীভাবে চালিত হইয়া ধমনীর ভিতরে প্রবাহিত হইতে থাকে। যদি কেহ ঐ সময় শোণিতোষ্ণতাবর্দ্ধক অথচ স্নিগ্ধোষ্ণ কোন দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে তাহার ফলে সেই স্বভাবাতিরিক্ত উষ্ণ সাচীগামী, বাতাক্রান্ত রক্ত আরও অধিক উষ্ণ হয়। বিকারভাবাপন্ন-রক্তের এই ক্রিয়াবৈষম্য রক্তবাতব্যাধি জন্মে। পটোল যদিও বাতাদি ত্রিদোষনাশক, কিন্তু শোণিতের উষ্ণবিকার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ পারগ। আরও একটী কথা আছে,— বায়ুর ক্রুরতা বা রুক্ষতানাশক কোন-একটী দ্রব্য ভোজন মাত্রেই কি বায়ুর-বিকার সম্যক্ উপশমিত হয়? দ্রব্যের লঘু গুরু ভেদে, নূনাতিরিক্ত বিলম্বে ক্রুর বায়ুর সারল্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধোষ্ণ, বীর্য্যবর্দ্ধক দ্রব্য ক্রুরবায়ু বিলম্বে সরল হয়। কিন্তু শীতলদ্রব্যে অতি সহজেই সে কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। বীর্য্যবর্দ্ধক এবং স্নিগ্ধোষ্ণগুণ সম্পন্ন বলিয়াই, ত্রিদোষনাশক হইলেও পটোলে অতিবিলম্বে যে ক্রুর বায়ুর সারল্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা অভ্রান্ত ও সত্য। বায়ু স্বয়ং সম্পূর্ণ সরল না হওয়া পর্য্যন্ত ধমনীর ভিতর প্রবাহিত সেই সাচীগামী শোণিত কি প্রকারে সরলপথে নীত হইতে পারে? সুতরাং যে দ্রব্যে বায়ুর ক্রুরতা নাশও হয় অথচ রক্তও উষ্ণ হয়, যদি বায়ু ও রক্তের বিকারের সময় তাহাই ভোজন করা যায়, তাহা হইলে এতদুভয়ের বিকার-ভাব নষ্ট করিতে করিতে যে কালবিলম্ব হইয়া থাকে, তাহাতেই ঐ দ্রব্যবিশেষের গুণে তিথি সম্ভাত উষ্ণরক্ত অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণ হইয়া তৎকালিক বায়ুর সংমিশ্রণে রক্তবাতরোগে পরিণত হইতে

পারে। উক্ত কথার প্রমাণ দিবার জন্য আমি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এস্থলে ক্ষান্ত হইতে পারি।

চতুর্থীতে মূলক।

চতুর্থীতে শ্লৈষ্মিক ও পৈত্তিক উভয় ধাতুই রুক্ষ হয়। সেই সঙ্গে বায়ুও ক্রুর-ভাব ধারণ করে। তদ্ধেতু মলাধারস্থ-মল ভালরূপ নিঃসৃত হইতে না পারিয়া দূষিত হয়। ধাতুত্রয়ের উক্ত বিকার বশতঃ মলাধারে বেদনা ও উদ্বেগ অনুভূত হয়। ইহাই আমরোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। এই সময় যদি বায়ুর ক্রুরতা এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার রুক্ষতা নাশক কোন দ্রব্য ভোজন করা না যায়, তাহা হইলে অবিলম্বে আমরোগ জন্মে। মূলক সম্বন্ধে আমাদিগের অভিজ্ঞতা-ফলে আমরা বেশ বলিতে পরি যে, ইহা বাতাদি দোষের সর্ব্বপ্রকার বিকার বর্দ্ধক এবং আমরোগ কারক। মূলকের গুণনির্দ্ধারক-শ্লোক হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং চতুর্থীতে মূলক ভোজন করিলে বাতাদি ত্রিদোষ অস্বাভাবিকরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া আমোৎপাদন করিতে পারে বলিয়াই ঐ তিথিতে মূলক ভক্ষণ নিষেধ।

পঞ্চমীতে বিল্ব।

পঞ্চমীতে পিত্ত অতিশয় প্রবল হয়। বিল্ব ও পিত্তবর্দ্ধক, সুতরাং পঞ্চমীতে বেল ভক্ষণ করিলে জ্বলন্তাঙ্গারে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। তাহার ফলে, পিত্তসম্বন্ধীয়-রোগ হইবার সম্ভাবনা। তাই পঞ্চমীতে বিল্ব ভক্ষণ নিষেধ।

ষষ্ঠীতে নিম্বুক।

নিম্বুক শৈত্যরসপরিবর্দ্ধক এবং অম্লগুণ-সম্পন্ন। ষষ্ঠীতে শিরাসমূহ অতিশয় শৈত্য-রসাশ্রিত হইয়া থাকে। তাই তিথিসম্ভূত শৈত্যরসের সহিত নিম্বুকের শীতাম্লরস যখন শিরার ভিতর মিশ্রিত হয়, তখনই জলব্যাধি (কোষরোগ প্রভৃতি) জন্মিবার সম্ভাবনা।

সপ্তমীতে তাল।

সপ্তমীতে পিত্ত এবং রক্ত এতদুভয়েই যুগপৎ তরল হয়। রক্তপিত্ত রোগবর্দ্ধক তাল যদি এই সময় ভক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিথিসম্ভূত ঐ তরলপিত্ত এবং রক্ত সেই তালরস সংমিশ্রণে রক্তপিত্তরোগে পরিণত হইবার আশঙ্কা করা যায়।

অষ্টমীতে নারিকেল।

যে সময় অগ্নি মৃদুভাবাপন্ন এবং পাকস্থলী দুর্ব্বল থাকে, সেই সময় রেচকগুণ-সম্পন্ন, অগ্নি উদ্দীপক লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করাই বিধেয়। অষ্টমী তিথিতে পাকস্থলী এবং অগ্নি উভয়ই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু নারিকেল অতিশয় দুষ্পাচ্য, মলরোধক এবং গুরু। এই প্রকারের একটি গুরুদ্রব্য দুর্ব্বল পাকস্থলীতে যাইয়া কিছুতেই জীর্ণ হইতে চাহে না। সুতরাং অজীর্ণ রোগ আসিয়া দেখা দিতে পারে। এই সকল কারণেই অষ্টমীতে নারিকেল খাওয়া উচিত নহে।

নবমীতে অলাবু।

নবমী তিথিতে বায়ু কুপিত এবং শ্লেষ্মা উদ্রিক্ত হয়। অলাবু বাতশ্লৈষ্মিক রোগকারিণী

সুতরাং নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিলে সেই কুপিত বায়ু এবং উক্ত শ্লেষ্মা আরও অধিক বিকার প্রাপ্ত হয়। এতদুভয়ের সংক্রামণে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ জন্মিতে পারে।

দশমীতে কলম্বী।

কলম্বী অম্লপিত্ত রোগকারিণী। দশমীতে আবার ক্রূরপিত্ত এবং অম্লের ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এতদুভয়ের সংক্রামণেই অম্লপিত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। যদি এই ধাতুবিকারের সময় কলম্বী ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিকার প্রশমিত না হইয়া যে আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, ইহাতে আর সন্দেহ কি। সুতরাং অবশেষে অম্লপিত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। এই কারণেই দশমীতে কলম্বী ভক্ষণ করিবার আদেশ নাই।

একাদশীতে শিম্বী।

বাতশ্লৈষ্মিক, শ্লৈষ্মিক এবং জ্বরকারক রসে একাদশী তিথিতে নাড়ী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা স্বভাবের নিয়ম। শিম্বী জ্বরকারিণী, তাই একাদশীতে শিম্বী উদরস্থ করিলে জ্বর হইবার সম্ভাবনা।

দ্বাদশীতে পূতিকা।

আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, দ্বাদশীতে রক্ত এবং ক্রূর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বায়ুও ক্রূর হয় ধাতুদিগের এইরূপ বিকার উপশম করিবার চেষ্টা না করিলে, সেই ক্রূর শ্লেষ্মা প্রোক্ত ক্রূরবায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া কণ্ঠদেশ অধিকার করিয়া বসে এবং অবশেষে কাসরোগাঙ্কুরে পরিণত হয়। এদিকে পূতিকা আবার ত্রিদোষবর্দ্ধিনী, অর্থাৎ যক্ষা কাস এবং বাতাদি ত্রিদোষ, পূতিকা সংযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, দ্বাদশী তিথিতে কাসের সঞ্চার কালে যদি যক্ষাকাস উৎপাদক কোন দ্রব্য ভোজন করা যায়, তাহা হইলে সেই ভুক্ত দ্রব্যের রস ক্রূর বায়ুর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডস্থিত রক্তের সহিত শ্লেষ্মার সংযোগ করিয়া দেয়। রক্ত এবং বিকার ভাবাপন্ন শ্লেষ্মার এই ভয়াবহ সংমিশ্রণে যক্ষাকাসের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে।*

ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী।

বার্ত্তাকী বায়ুপ্রকোপনাশিনী, রক্তবর্দ্ধিনী, কণ্ডুকারিণী। কিন্তু তিথ্যনুক্রমেই ত্রয়োদশীতে বায়ু মন্দগামী হয় এবং রক্ত অত্যন্ত গাঢ় হয়। বায়ুর মন্দগতি বশতঃ সেই গাঢ় শোণিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যথোপযুক্ত ভাবে চালিত হইতে পারে না। তাই স্থানে স্থানে বদ্ধ হইয়া দূষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দূষিত রক্তই যে কণ্ডু রোগোৎপাদনক্ষম, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং ত্রয়োদশীতে প্রোক্ত রক্তদোষ নিবারক, বাতোদ্দীপক কোন দ্রব্য ভোজন করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু বার্ত্তাকী ভক্ষণে

---

* পূতিকা ত্রিদোষকারিণী, সুতরাং কোন তিথিতেই পূতিকা ভক্ষণ করা উচিত নহে। তাই শাস্ত্রে আছে:—

'কুষ্মাণ্ডং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পূতিকা তথা।
ভক্ষয়ন্ পতিত স্তস্মাদপি বেদান্তগদ্বিজঃ॥'
স্মৃতি।

সেই বার্ত্তাকীর রস শরীরস্থিত তিথিগত দুষ্ট রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া গাঢ়ভাবেই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উপযুক্ত বাতাভাবে স্থানে স্থানে বদ্ধ হইয়া দূষিত হয়। সেই সকল দূষিত রক্ত হইতে কণ্ডুরোগ জন্মিতে পারে।

চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই।

তিথিগত ধাতুবিকার নির্ণায়ক-শ্লোক হইতে জানা যায় যে, চতুর্দ্দশীতে অপান বায়ু ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধ (আনাহ) রোগ প্রাদুর্ভূত হয় এবং উদরও স্ফীত (স্তম্ভিত) হইয়া পড়ে। কিন্তু মাষকলাই বহুমলবর্দ্ধক, অতিসার রোগোৎপাদক এবং গুরুপাক। চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ভক্ষণ করিলে সেই ভুক্ত দ্রব্যের রসের সহিত মলাধারস্থ পূর্ব্বসঞ্চিত মল সংক্রামিত হইয়া আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত ও দূষিত হইয়া থাকে। ইহাই অবশেষে অতিসারাদি উদরাময়ে পরিণত হইতে পারে।

পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় মাংস।

কোন অত্যাচার না করিলেও, উক্ত দুই তিথিতে কফের সঞ্চার হয়। কফ সঞ্চারিত হইলে পাচিকা শক্তি দুর্ব্বলা হয়। তখন শরীর উষ্ণ বোধ হয় এবং জ্বরের লক্ষণ সকল কতকাংশে অনুভূত হয়। মাংসের গুণাবধারণ করিবার সময় আমরা দেখাইয়াছি যে, ইহা গুরু এবং কফ ও পিত্তবৃদ্ধিকারক। অবশ্য একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, যদি ভোজনান্তে মাংস পরিপাক করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় পাচিকা শক্তি অতিশয় দুর্ব্বল থাকায় জন্য পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। পরিপাকের ব্যতিক্রম ঘটিলেই পাকস্থলী দূষিত হইয়া বিষময় ফল প্রসব করে। ইহা ভিন্ন যে সময় নাড়ীতে কিছু প্রবল ভাবে কফের সঞ্চার হয়, সে সময়ে মাংস ভোজনে উক্ত নাড়ীসংস্থিত কফ, মাংসের কফপিত্তরস সংমিশ্রণে অতিশয় কুপিত হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে পিত্তশ্লেষ্মাত্মক পীড়া উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্যই অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমায় মাংস ভোজন করা উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

রতন সূক্ত।

যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু
অথো পি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং ॥১॥
তস্মা হি ভূতা নিসামেথ সব্বে
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজায়।
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মাহি নে রক্খথ অপ্পমত্তা ॥২॥
যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা
সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং॥
ন নো সমং অত্থি তথাগতেন
ইদং পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৩॥
খয়ং বিরাগম্ অমতং পণীতং

যদ্ ক্কযগা সকাষুনি সমাহিতো।
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি
ইদং পি ধম্মে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৪॥
যং বুদ্ধসেট্ঠো পরিবণ্ণয়ী সুচিং
সমাধিম্ আনন্তরিকঞ্ঞম্ আহু।
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি
ইদং পি ধম্মে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৫॥
যে পুগ্গলা অট্ঠ সতং পসত্থা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্খিণেয্যা সুগতস্স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি।
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৬॥
যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্হেন
নিক্কামিনো গোতমসাসনম্হি।
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয্হ
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৭॥
যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিযা
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো
তথূপম সপ্পুরিসং বদামি
যো অরিয়সচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৮॥
যো অরিয়সচ্চানি বিভাবয়ন্তি
গম্ভীরপঞ্ঞেন সুদেসিতানি।
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা
ন তে ভবম্ অট্ঠমম্ আদিয়ন্তি
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৯॥
সহাবস্স দস্সনসম্পদায়
তয়স্স ধম্মা জহিতা ভবন্তি।
সক্কায়দিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ
সীলব্বতং বা পি যদত্থি কিঞ্চি॥
চতুহপায়েহি চ বিপ্পমুত্তো
ছ চাভিঠানানি অভব্বো কত্তুং
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১০॥
কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা।
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছাদায়
অভব্বতা দিট্ঠপদস্স বুত্তা॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১১॥
বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্সিতগ্গে
গিম্হানমাসে পঠমস্মিং গিম্হে।
তথূপমং ধম্মবরম্ অদেসয়ী
নিব্বানগামিং পরমং হিতয়॥
ইদং পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১২॥
বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহরো
অনুত্তরো ধম্মবরম্ অদেসয়ী।
ইদং পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১৩॥
খীণং পুরাণং নবং নত্থি সংভবং
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং।
তে খীণবীজা অবিরূল্হিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১৪॥
যানীধ ভূতানি সমাগতানি

ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্কে।
তথাগতং দেবমনুস্‌সপূজিতং
বুদ্ধং নমস্‌সাম সুবত্থি হোতু ॥১৫॥
যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্‌খে।
তথাগতং দেবমনুস্‌সপূজিতং
ধম্মং নমস্‌সাম সুবত্থি হোতু ॥১৬॥
যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্‌খে।
তথাগতং দেবমনুস্‌স পূজিতং
সঙ্ঘং নমস্‌সাম সুবত্থি হোতু ॥১৭॥

ভাবানুবাদ।

যত জীবগণ হেথা সমাগত,
ভূমিতলে কিবা অন্তরীক্ষগত—
সকলে সুমনা হইয়া পর,
শাক্যের বচন শুন অনন্তর ॥১॥
শুন, জীবদল! শুন, হে মানবগণ!
সর্ব্বভূতে কর যত্নে মিত্রতাবন্ধন,
দিবানিশি করে যারা বলি আহরণ
তাহাদের হ'তে কর গোদের রক্ষণ। ২
যাহা কিছু বিত্ত দূরে বা এখানে,
উৎকৃষ্ট রতন যাহা স্বর্গধামে
তথাগত সম কিছুই নয়।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন। ৩
ক্ষয় ও বিরাগ, পবিত্র অমৃত—
যাহা শাক্য পান হয়ে সমাহিত;
সে ধর্ম্ম সমান কিছুই নয়।
ইহাও ধরমে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন। ৪
পূতপ্রাজ্ঞ বুদ্ধশ্রেষ্ঠ "অনন্তবিজ্ঞান"
সেই শুচি সমাধিকে দিয়াছেন নাম
কিছু নাই বিশ্বে সেই সমাধি সমান।
ইহাও ধরমে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন। ৫
চারিযুগধরি সেই অষ্টজন
সুগত সেবক প্রসংশিত হন;
দক্ষিণা দানের যোগ্য তাঁরাই কেবল;
তাঁদের করিলে দান হবে মহাফল।
ইহাও সংঘে পরম রতন
এই সত্যে স্বস্তি হ'ক সংঘটন। ৬
দৃঢ় চিত্তে অনুসরি গৌতমশাসন
সুপ্রযুক্ত সুনিষ্ক্রান্ত যত মহাজন,
পরম অমৃত পেয়ে করিয়া গ্রহণ
আনন্দে নির্বৃতি ভোগে প্রীতচিত হন।
ইহাও সংঘে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন ॥ ৮
যথা ভূমে সুপ্রোথিত শ্বেতস্তম্ভচয়
ইতস্ততঃ বায়ুভরে প্রকম্পিত নয়,
সেইরূপ সাধুজন নিষ্কম্পহৃদয়
আর্য্যসত্য অবেক্ষণে কাটান সময়।
ইহাও সংঘে পরম রতন,
এই সত্যে স্বস্তি হ'ক সংঘটন ॥ ৮
গম্ভীরপ্রজ্ঞের উপদেশ মত
আর্য্যসত্য যাঁরা ভাবেন সতত
তাঁরা যদি (ও) হন প্রমাদময়,
অষ্টম জনম তবুও নয়।
ইহাও সঙ্ঘে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন ৯
স্বভাবদর্শনসম্পদের বলে,
তিন ধর্ম্ম হয় বিনষ্ট সমূলে।
বিচিকিৎসা আর স্বকায় দর্শন,
যত কিছু আছে নিয়ম বন্ধন,

সকলি তখন টুটিয়া যায়।
চারি উপায়ের গিয়া বাহিরেতে
ছয় অভিমান না পারে করিতে।
ইহাও সঙ্ঘে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন ॥ ১০
এই সত্য যেই করে দরশন
কেমনে সে করে পাপ আচরণ?
শরীরে বচনে অথবা মনে
যা করে, রাখেনা কভু গোপনে।
ইহাও সংঘে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক্ স্বস্তি সংঘটন ॥ ১১
গ্রীষ্মের প্রথমে গ্রীষ্ম মাসে
বনে অগ্রে যথা কুসুম বিকাশে,
সেইরূপ হিতার্থে দেন উপদেশ
নির্ব্বাণদ শ্রেষ্ঠধর্ম্ম সে বুদ্ধেশ।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন,
এই সত্যে স্বস্তি হ'ক সংঘটন ॥ ১২
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠজ্ঞানময় বরদ মহান্
অনুত্তর নরাহর ক'রেছেন দান
পূত ধর্ম্ম উপদেশ।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক্ স্বস্তি সংঘটন ॥ ১৩
পূর্ব্বজন্ম ক্ষীণ, নবজন্ম নাহি হয়,
আগামি জনম হ'তে সুবিরক্তচিত্ত
অবিরূঢ়ছন্দ ক্ষীণবীজ ধীর যত
প্রদীপ সমান চির নির্ব্বাপিত হয়।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক্ স্বস্তি সংঘটন ॥ ১৪
শুন, যত জীবগণ হেথা সমাগত,
ভূতলে বা অন্তরীক্ষে যারা অবস্থিত,—
দেবনরপূজ্য সেই বুদ্ধ তথাগতে
করি নমস্কার হ'ক্ স্বস্তি বিধিমতে ॥ ১৫
শুন, হেথা সমাগত ভূতগণ যত
ভূমে কিম্বা অন্তরীক্ষে যারা অবস্থিত—
দেবতামানবপূজ্য ধর্ম্মে তথাগতে
করি নমস্কার; হ'ক্ স্বস্তি সংঘটিত। ১৬
হেথা আছ সমাগত জীবগণ যত,
ভূতলে বা অন্তরীক্ষে যারা অবস্থিত,—
শুন, দেবনরপূজ্য সংঘে তথাগতে
করি নমস্কার, হ'ক্ স্বস্তি বিধি মতে ॥ ১৭
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

শ্রী———ভারতী।

হরিবোল!

(১)

জেগেছে যুক্তির যুগ,
লেগেছে ঘোর হুজুগ,
তর্ক তেজে ভরা বুক,
তর্কের তরঙ্গ।
"আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক"
এই বুলি দিগ্বিদিক্,
মূলে কিন্তু ভুল ঠিক
ভৌতিকের রঙ্গ।

(২)

কি ক'রে তর্ক ছাড়,
"পুতুল" আর "নিরাকার"
তুমি যে দুয়ের বা'র,
হায়রে বুঝলে না!
এটা ভাল—ওটা মন্দ,
ওতে প্রেজুডিসের গন্ধ,
এইরূপে করে দ্বন্দ্ব,
সে ধনে খুঁজিলে না।

(৩)

হিন্দু-ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টিয়ান্,
বৌদ্ধ-জৈন-মুসলমান্,
সকলেই যারে চান,
তুমি যদি তারে চাও;
মতের গুণে পথের গুণে,
না মিলে সে কূলে নানে,
কেনা সে ধন ভক্তি-ধনে,
এই সার সত্য লও।

(৪)

গালাগালি দলাদলি,
কেন আর সে চলাচলি?
কোলাকুলি গলাগলি,
করে দেখ কি মধুর!
সাধা-সুধা ফেলে দাও,
জেদ্ করে বিষ খাও,
সগর্ব্বে গোল্লায় যাও,
যেন কত বাহাদুর!

(৫)

গলাবাজি—কসরবাজি,
মন-পাজী তোর বড়ই রাজী,
আসল্ কাজের নয় সে কাজী,
ঐ দিকে যে বাজী তোর।
ক্রমে ছায়া হেলছে পূবে,
অতল-তলে চলছে ডুবে,
পত্তন্-পাতালপুরে নেবে,
চৌদিকে ঘেরিল ঘোর!

(৬)

খেলায় ভুলে বেলা গেল,
আঁধার লয়ে সন্ধ্যা এল,
চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হ'ল,
পন্থা গেল হারায়ে!
"কচ্চে হবে—কচ্ছি করি"—
সেই খেদে যে এখন মরি;
আস্তে লবণ হরি হরি!
পান্তা গেল ফুরায়ে!

(৭)

উদ্দেশ্যে ঐকান্ত ভারি,
উপায় লয়ে মারামারি,
ননী ফেলে কাড়াকাড়ি,
কচ্ছ খালি নিয়ে ঘোল।
শাঁসের তত্ত্ব নাহি জানি,
খোসা নিয়ে টানাটানি,
সমন্বয় নাহি চিনি,
শুধুই পথের গণ্ডগোল।

(৮)

ঢের হয়েছে, আর কি চাই?
অধঃপাতের বাকি নাই;
নাক জিনে জল উঠ্‌ল ভাই!
আর কি আশা আছে?
আছে বৈকি, প্রাণ আছেত,
হয়নি গেত কণ্ঠাগত,
ঘ্রাণেন্দ্রিয় অব্যাহত
আছে দেহের মাঝে!

(৯)

আজও ভাব বহে স্নায়ু,
ফুস্ফুসে সঞ্চরে বায়ু,
বুঝি একটু আছে আয়ু,
আছে একটু আশ।
খোলা আছে কাণের খোল,
ঐ শোনা যায় 'হরিবোল'!

আর কেন ভাই গণ্ডগোল ?
হয়ো না নিরাশ।
(১০)
রসনা রয়েছে বশে,
রসাও সে নাম-রসে,
বাসনা-বিষ-বিরসে
মজোনারে আর ;
বাজা করতাল খোল,
হরি-হরি হরিবোল !
হরিবোল !—হরিবোল !
সর্ব্বসিদ্ধি-সার।
(১১)
হুজুগ ! তফাৎ যাও,
তর্কবাদ ! দূর হও,
বক্তৃতা ! বিদায় পাও,
সভা ! রও চুপ্।
পদে দল দলাদলি,
গলে পর গলাগলি,
প্রেমে কর ঢলাঢলি,
হরি বল খুপ !
(১২)
বল্ হরি—হরিবোল !
ভাবেতে হয়ে বিভোল,
প্রেমে সবে দাও কোল,
ধন্য হ'ক্ প্রাণ ;
বল্ হরি—হরিবোল !
হৃদয়-দুয়ার খোল্,
হরি-হরি—হরিবোল !
কি মধুর নাম !
(১৩)
যেমি হবার তেমি হবে,
যেটি পাবার সেইটি পাবে,
আর কিছু না কর্‌তে হবে,
কেবল হরিবোল্ !
আপ্‌নি হরি নিবেন্ ভার,
কি ভয়-ভাবনা আর ?
তোমার শুধু নামটি সার,
হরি-হরিবোল !
(১৪)
হরিবোল সত্য,
হরিবোল পথ্য,
হরিবোল নিত্য,
হরিবোলে ভক্তি !
হরিবোল চাও,
হরিবোল দাও,
হরিবোল গাও,
হরিবোল হরি !

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সংস্কারকর্ম্ম।

চিত্রংকর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রহ্মণ্যমপি তদ্বৎস্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥

কোনও একটী চারুচিত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে, নির্ম্মাতা এক সময়ে একভাবে একরূপ কার্য্য করিয়া ঐ চিত্রটীর সকল অবয়বের সকল ভাব পরিস্ফুট করিতে পারেন না। তাঁহাকে এক এক শ্রেণীর সংস্কারের দ্বারা ঐ চিত্রের এক একটী ভাব ফুটাইতে হয়। চিত্রারম্ভেই উহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবগুলি স্ফূর্ত্তি পায় না। সাময়িক

সংস্কার বিশেষ দ্বারা ক্রমশঃ উহার উদ্বোধ হয়। উন্নতি ক্রমশঃ এক সোপান হইতে উর্দ্ধতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে। কিন্তু ক্রম ভঙ্গ করিয়া অনিয়ন্তভাবে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না! কার্য্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রমের সমষ্টি মাত্র। একটী ক্রম অতিক্রম ত্যাগ করিলে অন্য ক্রম সন্নিকৃষ্ট হয়, একটীকে বাদ দিলে অন্যটীকে পাওয়া বড় কষ্টকর। সুতরাং চিত্তের সৌন্দর্য্য বিবিধ সংস্কার কার্য্য দ্বারা যথোচিত ভিন্ন সময়ে পুষ্টিলাভ করে। প্রত্যেক কার্য্যের বিভিন্ন অংশই এইভাবে উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক বস্তুর বিভিন্ন স্বতন্ত্রতা বা বিশেষত্ব এইরূপে উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, ইত্যাদিকে বিকসিত করিতে হইলেও উহার ক্ষুদ্রং আংশিক সংস্কারের সহায়তা গ্রহণ আবশ্যক হয়। ব্রাহ্মণত্ব বিকাশের আশা করিলে, উহার ক্ষুদ্র ভূমিকা অতিক্রম করা প্রয়োজন। জাতবালক যাহাতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর উন্নতির অধিকারী হইতে পারে, তজ্জন্য তাহার একটী সংস্কার আবশ্যক। ঐ সংস্কার দ্বারা সে ক্রমশঃ আপনার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট দেখিতে পারিবে। যাদৃশ সংস্কার সম্পন্ন হইলে জ্ঞানার্জ্জনে অধিকার হয়, তাদৃশ সংস্কারের দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনোপযোগী আত্মকর্ষণ প্রসন্ন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রয়াস পাইতে হয়। সৈনিক পুরুষকেও স্বীয় উপযোগিতার পরিচয় স্বরূপ কিছু কিছু সংস্কার-সম্পন্ন হইতে হয়, নচেৎ প্রবেশাধিকার লাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বি এ পরীক্ষা দিবার জন্য আদেশ লাভ করিতে হইলে, এক এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণতাসূচক নিদর্শন আবশ্যক, আবার এফ এ পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইতে হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি আবার প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিতে হইলে মাইনর পাশ করা প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই সকল অধিকারেই নিম্নাধিকারী তদধিক অধিকার লাভের জন্য এক একটী সংস্কার গ্রহণ করেন। গৃহস্থোচিত ধর্ম্মের স্ফুরণই গার্হস্থ্য লাভ। গৃহস্থতা লাভ করিতে হইলে, যে সংস্কার যাদৃশ শিক্ষা আবশ্যক, উদ্বাহ প্রথা তাহাই শিক্ষা দেয়, তাদৃশ উপযোগিতা আনয়ন করিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক ভূমিকায় উপস্থিত হইলেই উৎকর্ষ লাভের জন্য অপর ভূমিকার যোগ্য হইবার জন্য এক এক প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানও তদ্দ্বারা নিজের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পাদন আবশ্যক হয়। সর্ব্ববিধ সংস্কার লাভের পর সুসংস্কার মানব ভগবানের অমৃতময় রাজ্যে যাইবার অধিকারী হইয়া পরম পুলক প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংস্কার অত্যাবশ্যক, সংস্কার ব্যতীত মানব কোনও বিষয় পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

শ্রী——ভারতী, যশোহর।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চরিত্র গঠন। শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস প্রণীত; এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

চরিত্রগঠন পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেরূপ অনুদার এবং উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে, ইহাতে পরীক্ষায় প্রতিযোগিতার জন্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কর্ত্তব্যপালন হইবে না। বর্ত্তমান বিপর্য্যস্ত ভাবের সংস্কারার্থে ইহাদিগকে বহুবিধ নৈতিক শিক্ষা প্রদান আবশ্যক হইয়াছে। বিদ্যালয়ে নৈতিকপুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে অনিষ্টাশঙ্কার মূলে আঘাত লাগিতে পারে এই বিবেচনায় আমরা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পুস্তক প্রচলনের পক্ষপাতী। চরিত্রগঠন পুস্তকখানিতে নৈতিক জীবনগঠনের উপযোগী প্রায় সমস্ত উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার সঙ্কলনে বিশেষ ধীরতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গের অনেক সুসন্তান প্রবাসে থাকিয়াও বঙ্গভাষার পদ পূজনে বিরত নহেন, বরংচ অধিক উদ্যম আগ্রহ সহকারে প্রয়াস পান। গ্রন্থকার জ্ঞানেন্দ্র বাবু বঙ্গমাতার পরিচার্য্যাগ্রহণ করিয়া সেই সম্প্রদায়ের অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহা বঙ্গদেশের গৌরবের ও বাঙ্গালী জাতির বঙ্গভাষানুরাগের পরিচয়স্থল। গ্রন্থখানিতে ভাষার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে। বিষয়গুলির উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য না থাকিলেও স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ পাইয়া মনে কেমন একটু খট্‌কা লাগিয়া যায়। মোটের উপর গ্রন্থখানি পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। আমাদের মনে হয়, উদীয়মান বঙ্গসন্তান যে উপায়েই হউক না কেন পরীক্ষার আধার হন, তাহাই ভবিষ্যত গণদের আশার আলোকের আভাস। পুস্তকের কাগজ ভাল, মুদ্রাঙ্কণও বেশ পরিষ্কার।

দ্রষ্টব্য।

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহাকুমার অন্তর্গত লাউপালা গ্রামে স্বর্গীয় বালকদাস বাবাজীর স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপাল জীউর মন্দিরটী জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ প্রদেশে এই শ্রীগোপাল-বিগ্রহ বড়ই প্রসিদ্ধ, অনেক মাহাত্ম্য সংবাদও প্রচারিত আছে। এখানে শ্রীশ্রীগোপালের রথোৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যাপার। প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তিরক্ষণের জন্য প্রত্যেক স্বধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যগৌরবহিতার্থী ব্যক্তি সাধ্যোচিত যৎকিঞ্চিৎ দান করিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হন না। এই মন্দিরটীর জীর্ণ সংস্কার যে কত প্রয়োজনীয় এবং ইহার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দান যে কত পুণ্যপ্রদ, দেবমন্দির নির্ম্মাতা ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু সম্প্রদায়কে বোধ করি একথা বিশেষ রূপে বুঝাইতে হইবে না। প্রাচীনকীর্ত্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, দেশের সকল সুসন্তানই সমবেত চেষ্টা বলে তাহা সম্পাদন করিতে সতত মনোযোগী হইবেন আশা করা যায়। শ্রীশ্রীগোপাল মন্দিরের সংস্কারার্থে যে মহাত্মা যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা মহাকুমা বাগেরহাটের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা চরণ কর্ম্মকারের নিকট পাঠাইবেন। অলংবহুনা।

সম্পাদকের রাজ-সম্মান।

প্রতিষ্ঠালাভের প্রত্যাশায় মানব প্রাণ সতত ব্যাকুল। প্রতিপত্তির জন্য যদি বিবেক বুদ্ধির পৃষ্ঠদেশে পদাঘাত করিতে হয়, তাহার জন্যও মানব প্রস্তুত। মনুষ্যত্বের নির্ব্বাসনে অনুমোদন করিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইবার প্রয়োজন নাই। সমাজে শতকরা ৯৯ জনের আকাঙ্ক্ষার পরিতোষ প্রতিষ্ঠায়, আশার পর্য্যবসান প্রতিপত্তিতে, মনের তৃপ্তি মানে, প্রাণের প্রীতি-যশে। এক কথায় লৌকিক সর্ব্ববিধ তৃপ্তি বা তুষ্টির মূলাধার খ্যাতি-মান-যশ-প্রতিষ্ঠা। যশের আশায় সংসারে না সম্পন্ন হয়, এরূপ কঠোর কার্য্য কি আছে? মানব যতই আশা কুহকে মুগ্ধ হউক না কেন, শেষে ইহার অসারতা দর্শনে আপনিই বৈরাগ্যের চরণে শরণাগত। কবি বলিয়াছেন "যেই শিরে বাঁধ সোণার পাগড়ী শ্মশানে যাইবে গড়াগড়ি।" আজ যে মুকুটধারী রাজা, যিনি স্তাবকগণ কর্ত্তৃক স্তুত, অধীন গণের নিকট প্রশংসিত ও পূজিত, দেশের নিকট, দশের কাছে মহামহিমান্বিত, তাঁরও চরম দশা দীনহীন ক্ষীণ কুটীরবাসী প্রজার সহিত বিভিন্ন নহে। "আমি" "আমার" জ্ঞানে—এই মহামোহজনক অহঙ্কারে জগৎ প্রমত্ত, তাই প্রতিষ্ঠার চঞ্চল অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া কষ্ট পায়। জ্ঞানীর নয়নে 'প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা' "মানং গর্হা সুরাপানং।" সংসারের প্রশংসা, নিন্দা, সম্মাননা, অবজ্ঞা, তিরস্কার, পুরস্কার সকলেরই মূল্য তত্ত্বদর্শীর নিকট একরূপ। জ্ঞানী, প্রশংসা বা নিন্দার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, প্রতিষ্ঠার আশা মনে না রাখিয়া নীরবে আপনার কর্ত্তব্যপথে পদচারণ করেন, কর্ত্তব্যের বিন্দুবিসর্গও স্খলিত না হয়, এজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। পরোপকার করেন, প্রত্যুপকার প্রার্থনায় বা প্রশংসা কামনায় নহে, কর্ত্তব্য জ্ঞানে; অপরের নয়নের বারিবিন্দু দর্শন করিলে অবিরল দরদর ধারে অশ্রুপাত করেন এবং প্রতীকারের প্রযত্ন করেন, মোহমূলক দুর্ব্বলতায় নহে, মানবোচিত গভীর সহানুভূতিবশে। কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতে নিন্দুকের অহেতুক উপহাস ও সজ্জনের স্বভাব-সুলভ সমাদর ইহার কোনটীতে তিনি বিচলিত হন না। প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণের কর্ত্তব্যজ্ঞান এতই অচল, এতই সুদৃঢ়। সাধারণতঃ কোনও প্রকার অভিসন্ধিমূলকভাব ত্যাগ করিয়া কেবল নিষ্কামভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিলে ও জনসাধারণে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হইতে পারে না, মনে করে তিনিও কামনার অধীন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে ধর্ম্মানুমত কার্য্যসম্পাদন করে, তাহার স্বতঃ প্রাপ্য পুরস্কার ভগবান অযাচিতভাবেই তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। প্রমাণ স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়। গবর্নমেণ্ট স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাকে সম্মান অর্পণ করিয়াছেন। ইনি ইহার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেন নাই। সংসারে এইটুকু কর্ত্তব্যের মহিমা, ইহা সত্যানুষ্ঠানের মর্ম্ম। বর্ত্তমানকালের রাজ-সম্মান অনেকস্থলে অনুচিত পাত্রে পতিত হওয়ায় সমাজের অহিতকর হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারিব যোগ্য পাত্রে সম্মান অর্পিত হইলে, উহাদ্বারা দেশেরই উপকার করা হয়। প্রকারান্তরে সৎকর্ম্মকারীর সমাদর দর্শনে সাধারণের সদনুষ্ঠানে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। 'সম্মান' সৎপাত্রে অর্পিত হইলে সৎকার্য্যের প্ররোচক হয়। আমরা পরম পুলকিত হৃদয়ে যশোহর বারের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও যশোহর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান "হিন্দু-পত্রিকা" এবং "ব্রহ্মচারিন" সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বিএল্ মহাশয়ের রাজকীয় রায় বাহাদুর উপাধিলাভ উপলক্ষে যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠার

পরিচয় পাইয়া সর্ব্বফল দাতা ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এবং সুবিজ্ঞ রাজকীয় প্রধান পুরুষগণের নির্ব্বাচন চাতুর্য্য ও গুণগ্রাহিত্বের প্রশংসা করিতেছি। অযাচিতভাবে গবর্ণমেণ্ট যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন তাহার প্রত্যাখ্যান করিলে ন্যায়বান্ গবর্ণমেণ্টের অপমান করা হয় মনে করিয়া, সম্পাদক মহাশয় ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করেন না। যদিও গবর্ণমেণ্ট "মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্" বলিয়াই তাঁহাকে এরূপ সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীযুক্ত যদু বাবুর সাহিত্যসেবা ও হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুশাস্ত্রের অশেষ উপকার সাধন ও অকৃত্রিম স্বদেশ-হিতৈষিতা ইত্যাদি ও গবর্ণমেণ্টের অবিজ্ঞাত নাই।

সম্পাদক মহাশয়ের রাজকীয় সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে, বঙ্গের বহুস্থান হইতে অস্মদ্দেশের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়া যে সকল পত্র ও বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রতি স্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিগণের অনুগ্রহ ও স্নেহ দেখিয়া, স্বীয় অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছেন। বঙ্গের প্রজাবৎসল ছোটলাট মহামান্য সারজন উড্বরণ কে, সি, এস্, আই, মহোদয় স্বহস্তে লিখিয়াছেন,—

The Shrubbery,
Darjeeling.
29th June 1902.

DEAR SIR,

I offer you my hearty congratulations on the title given you in to-day's Honours list. It is the recognition of the active and effective work you have done in the Municipality of Jessore, and I am glad of the opportunity of giving you my personal thanks.

Believe me, sincerely yours,
J. Woodburn.

বঙ্গের প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার এবং লণ্ডন পোলিসের ভূতপূর্ব্ব চিফ্ কমিশনার, যিনি পূর্ব্বে যশোহরের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং এইক্ষণ লাগাঘাটে চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া প্রত্যহ শতং দীনদুঃখী রোগীকে নিজে এবং নিজের পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও জামতার দ্বারায় চিকিৎসা করাইয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদের ভাজন হইতেছেন, সেই স্বনামখ্যাত জে, মনরো সি, বি, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

Locknagar.
Darjeeling.
27-6-02

My dear sir,

I am very glad that the son of my old friend, Tara Prasanna Babu has been distinguished in this manner. I know that you have well deserved the honour. May you long live to enjoy the distinction which will show people that Government is not blind to good work done by those who are not officials.

প্রেসিডেন্সি বিভাগের বর্ত্তমান কমিশনার এম্ ফিনুকেন্ সি আই ই মহোদয় লিখিয়াছেন,—

Dear sir,

I congratulate you on the well deserved honour of Rai Bahadurship conferred upon you, and hope you will live long to enjoy it.

Yours sincerely, M. Finucane.

প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্পেক্টর্ রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সি আই ই মহোদয় লিখিয়াছেন,—

My dear Jadu,

It is a sincere pleasure to me to see your name in the Coronation Honours list as Chairman of the Jessore Municipality, but the Govt. must have been well aware of your other distinguished services to our country, as an expounder of Hinduism and elevator of the educated classes to a higher sphere of thought.

Long may you live to enjoy your present honour as well as any future honours that may come unasked.

Your sincere will wisher,
Radhika Prasanna Mukerjee.

স্বদেশ এবং ধর্ম্মবৎসল 'ইণ্ডিয়ান মিররের' সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন এটর্ণি মহোদয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন. তিনি ইণ্ডিয়ান মিররে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

We do not know if Babu Jadu nath Mozoomdar cares to have and to keep the title Rai Bahadur ship which a discerning Government has conferred on him as a gift. This honour is in recognition of his valuable services as Chairman of Jessore Municipality. The people have honoured our friend these many years for his many learned contributions in regard to Hindu religion.

There is no more earnest religions reformer in Bengal than Babu Jadu nath Mozoomdar.

লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকা লিখিয়াছেন,

One of these is that of Babu Jadu Nath Mojumdar, Chairman of the Jessore Municipality, one of the ablest and most independent of non-official Municipal Chairmen in Bengal, and for some time Editor of the Tribune. A devoted worker in the cause of social and religious progress of his people, Babu Jadn Nath honours the title of Roy Bahadur rather than being honoured by it?

বঙ্গ সাহিত্যের মহারথী বান্ধব সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিছেন,—

The elevation of a man of your worth to the rank raises the title itself in the estimation of all intelligent man. You have been doing yeoman's service to the cause of Literature in Bengal.

এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির নিকট হইতে পত্র পাইয়াছেন, স্থানাভাবে তাঁহাদের পত্র প্রকাশ করা গেল না, নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটী নাম মাত্র লিখিত হইল। যথা,—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম্ এ গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরিয়ান্। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কলেজ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রফেসর সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা বাবু পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম্ এ বি এল, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাঁকীপুর। বাবু বিপিন

বিহারী বসু জমিদার শ্রীধরপুর। মিঃ এফ্ এল্ মোর্শহেড্ যশোহরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রের এইক্ষণ কলিকাতার কষ্টমের কলেক্টর, বাবু হরিচরণ সেন এল্ এম্ এস্, ডাক্তার বৈদ্যনাথ। বাবু ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী এম্ এ বিএল্, উকিল হাইকোর্ট। বাবু হৃদয়নাথ মজুমদার বি এল্. মুনসেফ্ পিরোজপুর। বাবু রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য বি এ, রাজসাহী। বাবু নরেন্দ্রভূষণ রায় জমিদার নড়াইল। বাবু গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল বিএল্, উকিল ঢাকা। বাবু দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ জমিদার চৌগাছা যশোহর। বাবু প্রমথনাথ দত্ত এম্ এ বিএল্, সব্ ডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট উলুবাড়িয়া। বাবু প্রসন্ন চন্দ্র রায় এম্ এ বিএল্. উকীল হাইকোর্ট। বাবু সুরেন্দ্র কুমার দেবরায় জমিদার ছান্দড়া যশোহর। বাবু যোগেন্দ্র নাথ সেন এম্ এ বিএল্, উকীল হাইকোর্ট। বাবু রাখাল মোহন বানার্জ্জি এম্ এ, সব্ডিভিশনাল ম্যাজিষ্টেট নড়াইল। বাবু শ্রীনাথ দত্ত স্বর্গীয় গোপাল লাল শীলের ওয়ার্ড ষ্টেটের ম্যানেজার। মিঃ জে প্লেটেল্ সেসন্স জজ বরিশাল। খাঁ বাহাদুর আব্দর রহমান কলিকাতার স্মলকজকোর্টের জজ। পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ অধ্যাপক মেট্রপলিটান কলেজ। বাবু বিধুভূষণ গাঙ্গুলী বিএল্ হাইকোর্ট উকীল। বাবু নরেন্দ্র কুমার বসু এম্ এ বিএল্। বাবু কৈলাশ চন্দ্র কাঞ্জিলাল বিএল্, উকীল আলিপুর। বাবু কৈলাশ চন্দ্র বসু উকীল আলিপুর। বাবু চারু চন্দ্র বসু মহাবোধি পত্রিকার সম্পাদক। বাবু রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী ভাগলপুর। মৌলাবী আব্দুল ছালাম সব্রেজেষ্টার। ডব্লিউ আর ম্যাগ্ডোনাল্ড যশোহরের ভূতপূর্ব্ব সিবিলসার্জ্জন বর্ত্তমান কলিকাতার বন্দরের স্যানিটারি অফিসার। মিঃ এফ্ ব্রডিস্ যশোহরের ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পুলিস। মিঃ এ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার হাইকোর্ট কলিকাতা। মিঃ জে চ্যাটার্জ্জি ব্যারিষ্টার হাইকোর্ট কলিকাতা। মিঃ সৈয়দ সামশুল হুদা হাইকোর্টের উকীল ইত্যাদি।

যোগ্যপাত্রে সম্মান অর্পিত হইলে, সমাজ তাহাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে আনন্দিত। আমরা আশা করি, হিন্দু-পত্রিকার প্রত্যেক অনুগ্রাহক গ্রাহক হিন্দুধর্ম্মের সহায় স্বরূপ হিন্দু পত্রিকার সম্পাদকের সম্মানলাভ শ্রবণে আমাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। হিন্দু-পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট সমগ্র হিন্দু সমাজ ঋণী ; ইহাকে সম্মানিত করায় হিন্দুধর্ম্মানুরাগের পুরস্কার প্রদান ও হিন্দুসমাজের স্বধর্ম্ম-পরায়ণতার প্ররোচনা করা হইয়াছে মনে হয়। কর্ত্তব্যমার্গে পদচারণা করিতে যেন শত বাধা বিপদে তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে নাপারে, উত্তরোত্তর অশেষ সম্মানের অধিকারী হইয়া দেশে স্বধর্ম্মানুরাগীর পুরস্কারের দৃষ্টান্ত স্বরূপে সুখে কালাতিপাত করুন ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা। আমরা বুঝিব, ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারের এক অধ্যায় "যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা।"

শ্রীকেদারনাথ ভারতী,
যশোহর।

শ্রীহরিঃ।
১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।

হিন্দু-পত্রিকা

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

জাতিভেদ।

(পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ।)

প্রথম অধ্যায়।

আর্য্য হিন্দু।

আর্য্যজাতির আদিম নিবাস যে কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে অনেক যুক্তিতর্ক হইয়া গিয়াছে। হিন্দু পণ্ডিতগণ বলেন আর্য্যগণ ভারতবর্ষেরই কোন স্থানে বাস করিতেন। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বাল্টিক সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশকেই আদিম আর্য্য-নিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতদিগেরই এইরূপ মত যে, মধ্য এসিয়াই আর্য্যজাতির নিবাসভূমি ছিল। তাঁহারা সেই স্থান হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলর প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে সকল যুক্তিবলে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"প্রথমতঃ, আর্য্যজাতিদিগের দুইটী প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী ভারতবর্ষাভিমুখে, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে এবং আর একটী ইউরোপের অভিমুখে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমদিকে। এই দুইটী প্রবাহের সংযোগস্থল এসিয়া মহাদেশ।"

"দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতম কালের সভ্যদেশ সমূহ এসিয়াখণ্ডেই অবস্থিত। আর্য্যভাষা সমূহের মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। সুতরাং এসিয়াখণ্ডের মধ্য এবং ঋগ্বেদের জন্মস্থান পঞ্জাব প্রদেশ হইতে অনতিদূরে কোনও প্রদেশে আর্য্য জাতির আদিম বাসস্থান হওয়াই সম্ভব।"

"তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মধ্য এসিয়া হইতে বার বার অনেক পরাক্রান্ত জাতি উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ মহাদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর হুনজাতি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোগলজাতি তাহার উদাহরণস্থল। অতএব, প্রাচীনকালেও আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।"

"চতুর্থতঃ, যদি ইউরোপ বিশেষতঃ স্কাণ্ডেনেভিয়া হইতে আর্য্যজাতির উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে আর্য্যভাষা সমূহে সমুদ্র-সম্বন্ধীয় বহু সংখ্যক সাধারণ শব্দ পাওয়া যাইত। এই সকল ভাষায় পশু বিশেষ বা পক্ষী বিশেষের সাধারণ নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ভাষায় সমুদ্র বা জলচর জীবের সাধারণ নাম পাওয়া যায় না!"*

যে সকল যুক্তি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতেই বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ মধ্য এসিয়া হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সুন্দর সুখপ্রদ আহার্য্য, শস্যশ্যামল গোচরভূমি, ধনরত্নশালী নূতন নূতন রাজ্যাদির লোভেই আর্য্যগণ দলে দলে পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানে স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা বোধ হয় প্রথমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া আদিম গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। একদল দক্ষিণ এসিয়া এবং অপর দল ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাই তাঁহাদিগের চিরবিচ্ছেদ; তাহার পর আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

তখনকার সেই প্রাচীন ভারতবর্ষে যাহারা বাস করিত, তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, অধর্ম্মপরায়ণ, নীচ, ম্লেচ্ছভাষী, ছাগনাসাবিশিষ্ট ও আমমাংসাশী ছিল।

"They (the Aryans) called their adversaries (the aboriginal tribes) "Dasyus" "Rakshs" &c. They are described as irreligious, impious, and the lowest of the low ; they are also in some texts contemptuously called black-skinned. Thus, during the Rigvedic period, there were, if we may so express ouoselves, two 'colors'—the fair (Aryan), and the black (Dasyu or Dasa)."*

আরও।—

"The Dasyus are contrasted with the Aryans and are represented as people of a dark complexion who were unbelievers, ie, did not worship the gods of the Aryas and perform the scrifices, but followed another law. The Aryan gods Indra and Agni are frequently praised for having driven away the black people, destroyed their strongholds and given their possessions to the Aryas."†

ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্র সকল পাঠ করিলেই সকল স্থানে 'দস্যু' এবং 'আর্য্য' এই দুই শ্রেণীর লোকেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য্যগণ দেখিতে গৌরবর্ণ, শোভন নাসিকাযুক্ত, এবং পক্কমাংসাশী ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। সে যাহা হউক, এই দুই শ্রেণীর লোকের ভিতর ভাষা-

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই

*'Hindu civilization under British Rule.' By Mr. P. N. Bose. Bse, FGs, MRAs, &c. &c.

† Social History of India—by Ramkrishna Gopal Bhandarkar, M A., PH. D., C. I. E., Late Professor of oriental Languages Deccan college, Poona.

গত এত পার্থক্য ছিল যে ইহাদিগকে কোন ক্রমেই এক বংশজ বলা যাইতে পারে না।

এই সকল আদিম আর্য্য হিন্দুগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য করিয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।* কৃষি কার্য্য হইতেই কর্ষক ধাত্বর্থ মূলক আর্য্য নাম হইয়া থাকিবে। লাঙ্গল, শকট প্রভৃতি কৃষি-কার্যের উপকরণ সমূহের নাম তাঁহাদিগের ভাষায় পাওয়া যায়। প্রকৃতির লীলাভূমি ভারতবর্ষের লগ্ন সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা মোহিত হইতেন। সেই সকল অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্য সমূহ তাঁহাদিগের সরল কোমল হৃদয় মধ্যে এমন সুন্দর সুশোভন চিত্রগুলি অঙ্কিত করিত এবং এমন স্বাভাবিক ভাবের সঞ্চার করিত, যে তাহা হইতেই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী গঠিত হইয়াছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ, বজ্র, উষা, সন্ধ্যা প্রভৃতি এ সকলেরই তাঁহারা উপাসনা করিতেন। তখন ধর্ম্মভাব নিতান্ত সরল ও অকপট ছিল—তখন পর্য্যন্ত যাগ যজ্ঞাদির আড়ম্বর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই আদিম আর্য্য জাতির একদল দক্ষিণ এসিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই এসিয়া-যাত্রিক-আর্য্যেরা ক্রমান্বয়ে দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। পঞ্জাবকে তখন সপ্তসিন্ধু বলিত। সপ্তসিন্ধু দেশে আসিয়াও সেই হিন্দু ও ইরাণী জাতি এক সঙ্গেই ছিল। কিন্তু কালক্রমে ধর্ম্মাদি বিষয়ে বিবাদ হওয়ায় সেই একই জাতি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। "দেবোপাসক" হিন্দুরা পাঞ্জাবে রহিলেন, আর "অসুরোপাসক" ইরাণীরা পারস্যে গমন করিলেন। এই দেবোপাসক হিন্দু আর্য্যই বেদের স্রষ্টা।

ঔপনিবেশক আর্য্য হিন্দুগণ সপ্তসিন্ধু দেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম যুগে খরপ্রবাহিত সিন্ধু তীরে বাস করিতেন। ক্রমে যতই ঔপনিবেশিকগণের সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল, তাঁহারা ততই নূতন নূতন স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সিন্ধু এবং তাহার পঞ্চশাখাতীর-বর্ত্তী প্রদেশ সমূহ আর্য্য হিন্দু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া গেল। নবীন উৎসাহ, অসীম বিক্রম, অদম্য সাহস, অজেয় বাহুবল, ও জাতীয় মুক্ত জীবনের অনুরূপ মুক্ত স্বাধীন চিত্ত হইয়া আর্য্য ঔপনিবেশকগণ যুদ্ধে মনোযোগী হইলেন। হিন্দুর দুর্জ্জয় বাহুবলের নিকট অনার্য্য দস্যুদিগের বিক্রম টিকিতে পারিল না। আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সকল দেশ জয় করিয়া লইলেন। অনার্য্য দস্যুগণ কেহ বা পলায়ন করিল, কেহবা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল।*

* কৃষি সম্বন্ধীয় একটী মন্ত্রের অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:— 'লাঙ্গলগুলি যোজন কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর; এইস্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজবপন কর; আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক ও শৃনিগুলি নিকটবর্ত্তী পক্ক শস্যে পতিত হউক
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ।

* "Those who submitted were reduced to slavery, and the rest

আর্য্যদিগের বিজয় পতাকা দেশ হইতে দেশান্তরে উড্ডীন হইতে লাগিল। অনার্য্যগণ পদে পদে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। যাহারা এই নূতন শত্রুর সম্মুখ হইতে কাননে, প্রান্তরে, দুর্গম গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহারা স্বাধীনতা বিস্মৃত হইতে পারিল না। দলে দলে আসিয়া আর্য্যদিগের অধিকৃত গ্রাম, জনপদ প্রভৃতি আক্রমণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের লাঙ্গল, গো, গোবৎস প্রভৃতি অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল—আর্য্য ঔপনিবেশকগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। হয়ত কথন অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীর রজনীতে এক দল অনার্য্য দস্যু আসিয়া নিশ্চিন্ত, সুপ্ত আর্য্যদিগের গৃহাদি লুণ্ঠন করিয়া খাদ্যাদি যাহা পাইত লইয়া পলায়ন করিত। ঋগ্বেদে তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে— (প্রথম মণ্ডলের ১৭৪।৭।৮)।

"হে অশ্বিদ্বয়! জঘন্য শব্দ করতঃ কুক্কুরের ন্যায় যাহারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বিনাশ কর। তাহারা সংগ্রাম করিতে চাহে, তাহাদিগকে মারিয়া ফেল। তাহাদিগকে মারিবার উপায় তোমরা জান। তোমাদিগকে যাহারা স্তুতি করে, তাহাদের প্রত্যেক কথা রত্নবতী কর। হে নাসত্য দ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার স্তুতি রক্ষা কর।" ইচ্ছা করিলে এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। দস্যুদিগের পরাজয় ও বিনাশের কথা পঞ্চম মণ্ডলের ৭০।৩; ষষ্ঠ মণ্ডলের ১৮।৩ প্রভৃতি ঋকেও দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সকল বীরগণ পঞ্চনদস্থ সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সরস্বতী শতদ্রুর শ্যামল তীরে শান্তভাবে বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। ভারতভূমির আদিম নিবাসীদিগের সহিত নিরন্তর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ কলহ করিয়াও আর্য্যগণ ত্রিহুত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মর্ষি (গাঙ্গ্য) প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। যখন গাঙ্গ্য প্রদেশে অধিনিবেশের সূত্রপাত দেখা গেল, তখনই নানাস্থান হইতে দলে দলে আর্য্যগণ আসিয়া দোয়াব প্রদেশে বসতি করিতে লাগিল।

আর্য্যদিগের মধ্যে তখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার জাতি বিচার ছিল না। কিন্তু "আর্য্য" ও "অনার্য্যের" মধ্যে যে প্রভেদ "আর্য্য" ও "দস্যু" মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা তখন ছিল—"কৃষ্ণ" এবং "গৌরের" ভিতর যে প্রভেদ তাহাও তখন ছিল।

"But before the last notes of the last hymn were chanted by the last of the Rigvedic bards, his brethren had established a caste-system—a system composed of two well-defined, exclusive ethnological castes." *

অন্যত্র আছে :—

---

were driven to the fastnesses of mountain."

Social History of Indra—by Ramkrishna Gopal Bhandarkar, M A. &c.

* Hindu civilization under British Rule, by Mr. P. N. Bose.

"In the very early times the system of castes did not prevail, and it seems to have developed about the end of the Vedic period. It arose from a difference of avocations or professions. The feeling of a father that a son should follow his trade or calling is natural, and it is this which in the beginning, at least when unchecked by other influences, gives rise to separate castes." *

কৃষি, যাজন, যুদ্ধাদি জীবিকাভেদজনক বর্ণ বিচার বা বংশানুক্রমে পুরোহিত বা রাজার প্রথা তখন ছিলনা। শ্যামল শস্য ভরা প্রভৃত ক্ষেত্রের অধিস্বামী যেমন স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন আবার তেমনি বাহুবলে স্বগ্রাম, আত্মজীবন ও অর্থ প্রভৃতি রক্ষাও করিতেন। যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া তাঁহারাই আবার সুন্দর ভাষায় মন্ত্র রচনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতেন। তখন দেবমূর্ত্তিও ছিলনা, দেব গৃহও ছিলনা, পূজা বিধির নানাবিধ আড়ম্বরও ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিরাই তখন রাজা ছিলেন।

"আর্য্যেরা কোন সময়ে এইরূপ পঞ্চনদ অধিকার করিয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত কোলব্রুক ইউরোপীয় সমাজে প্রথমে বেদের একটি বিবরণ প্রচার করেন। তাঁহার মতে খৃষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ মণ্ডলাদি আকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ন্যূনাধিক ৫০০ কি ৬০০ বৎসরে হিন্দু আর্য্যগণ সিন্ধু ও পঞ্চনদ সন্নিহিত প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া তাহাতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক যুগ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এই মত এক্ষণে প্রায় সর্ব্ব পণ্ডিত সম্মত; ভট্ট মোক্ষমূলর তদীয় নূতনতম গ্রন্থে লিখিয়াছেন খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদ প্রণীত হইয়াছিল। অধ্যাপক ওয়েবর বলেন, সিন্ধু হইতে গণ্ডকী পর্য্যন্ত ভূভাগ পরাজয় অধিকার ও কর্ষণ করিয়া হিন্দুত্ব সংস্থাপন করিতে সহস্র বৎসর (খৃঃ পূঃ ১৫০০-৫০০) প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। অধ্যাপক হুইটনী খৃষ্টের ২০০০ হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদমন্ত্র প্রণয়নের সময় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিতবর মার্টিনহগ খৃঃ পূঃ ২৯০০ হইতে ১৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত ঋগ্বেদ প্রণয়ন সময় অবধারণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য বেদবিৎ পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। খৃষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ অব্দ মধ্যে ঋক্ প্রণীত হইয়া থাকিবে, এইটি বহুপণ্ডিত সম্মত মত।" *

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১। হিন্দুর ঋগ্বেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ অব্দ মধ্যে ঋক্ প্রণীত

* Dr. R. G. Bhandarkar PHD, C. I. E., on 'social Reform and the Programme of the Madras Hindu Social Refrom Association."

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

হইয়াছিল। হিন্দুদিগের নিকট মহা আদরের গ্রন্থ। ইহার অবশ্য সম্যক্ কারণও আছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন :—

"মানব জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস লেখক এই ঋক্‌বেদে মনুষ্যের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের কারণ দেখিতে পাইবেন। কেবল মাত্র এক বেদপাঠেই জানা যায়, কিরূপে মনুষ্যহৃদয় সর্ব্ব প্রথমে প্রকৃতির সমুজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়, শক্তিশালী ও বিস্ময়কর ক্রিয়ার স্তব স্তুতি করে। ...... কিন্তু ঋগ্বেদের সমাদর ও গৌরবের আরও বিশিষ্ট কারণ রহিয়াছে। কি প্রকারে মানব হৃদয়ে প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে ঋগ্বেদ তাহার প্রমাণ স্বরূপ। ঋগ্বেদ আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ। আর্য্যেরা পৃথিবীর নানা স্থানে যে সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা প্রাচীনতম ঋগ্বেদে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। ঋগ্বেদে আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা রহিয়াছে। অতি প্রাচীনতম হইতে অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির মানসিক ভাবের বৃত্তান্ত, ঋগ্বেদ না পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় না। কেবল আধ্যাত্মিক কেন, ঋগ্বেদ পাঠে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ও অনেক জানিতে পারি।"

তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, সেই প্রাচীনতম আর্য্য হিন্দু সমাজের অবস্থা জানিবার জন্য ঋগ্বেদই একমাত্র পথ। জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ের অস্তিত্ব ঋগ্বেদ হইতেই প্রামাণ্য। যেহেতু ঋগ্বেদে তাৎকালীক সমাজের সকল কথাই বিশেষভাবে লিখিত রহিয়াছে—"কেমন করিয়া ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া হইত, কেমন করিয়া সোমরস প্রস্তুত হইত, কি উপায়ে যবাদি পেষণ কার্য্য সম্পন্ন হইত প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেক খুঁটি-নুটি পর্য্যন্ত যে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়—জাতিভেদের কথাও নিশ্চয়ই সেই স্থানে থাকিবে। কিন্তু যে ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা ১০২৮ এবং ঋক্ সংখ্যা ১০৪০২ অথবা ১০৪২২ সেই ঋগ্বেদে জাতিভেদ সম্বন্ধে অতি সামান্য কয়েকটী কথা লিখিত রহিয়াছে।*

পাঁচশত কি ছয়শত বৎসর ব্যাপিয়া এই মহাগ্রন্থ ঋগ্বেদের প্রণয়ন কার্য্য চলিয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাতে আর্য্যদিগের আচার নীতি, ব্যবহার, বিশ্বাস প্রভৃতির ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে। আর্য্যদিগের গার্হস্থ্যনীতি, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা, বিবাহ পদ্ধতি, যজ্ঞাদি, ধর্ম্মাচার, জ্যোতিষ আর্য্যদিগের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে বর্ণিত রহিয়াছে; কিন্তু এই জাতিভেদের কথাই তেমনভাবে লিখিত নাই। ইহাও কি সম্ভব?

এই স্থলে পাঠকদিগকে শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনি বলিতেছেন।—"পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় যে 'বর্ণ' শব্দ জন্মগত জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্যে (গৌর ও কৃষ্ণের)

* ঋগ্বেদের "পুরুষ সূক্ত" দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন শারীরিক বর্ণ (রং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্যেরা তিন বর্ণে বিভক্ত ছিলেন এমন কুত্রাপি উল্লেখ নাই। 'ক্ষত্রিয়' শব্দ পরবর্ত্তী সংস্কৃতে জন্মগত জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু ঋগ্বেদে ইহা বিশেষণ মাত্র, অর্থ "বলশালী" দেবতাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা আছে। ৭।৬৪।২ শ্লোকে মিত্র ও বরুণকে "সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়, ৭।৮৯ সূক্তের প্রথম চারি মন্ত্রের শেষে বরুণ দেবকে 'সুক্ষত্র' বলিয়া সম্বোধন রহিয়াছে। পুরোহিত জাতি বুঝাইতে আধুনিক সংস্কৃতে 'বিপ্র' শব্দের ব্যবহার আছে; ঋগ্বেদে 'জ্ঞানী' 'বিজ্ঞ' এই অর্থে 'বিপ্র' শব্দ দেবতাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ৮।১১।৬ শ্লোকে 'বিপ্রং দেবং অগ্নিং' আছে, অর্থাৎ "মেধাবী অগ্নিদেব"। পুরোহিত জাতি বোধক 'ব্রাহ্মণ' শব্দও ঋগ্বেদের শত শত স্থানে শুধু ঋক্ প্রণেতা কবি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"Any one who had the gift and the talent to compose hymns which attracted the attention and commanded the admiration of his brethren, might be honoured with the appellation of 'Brahman", that is, a sage, an offerer of prayer. Any one who rose to distiction in the profession of arms might he eulogised under the epithet of 'Kshatriya'—that is, a man possessing power. But 'Brahman' or 'Kshatriya' wise man, or powerful man, he was a 'vis' that is, one of the people," *

ভট্ট মোক্ষমূলর বলিয়াছেন,—

If then with all the documents before us, we ask the question, does caste, as we find it in Manu and at present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided 'No' "*

আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই,—

"There are no castes as yet, the people are still one united whole, and bear but one name, that of visas." †

শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু একস্থানে বলিয়াছেন, ৭।১০৩।৮ শ্লোকে 'ব্রহ্মকৃন্বন্ত ব্রাহ্মণাসঃ' আছে। ইহার অর্থ 'স্তুতিকারী স্তোতৃগণ ১০।৭১।৯ শ্লোকে আছে "যাহারা দেবস্তুতি করেনা এবং সোম যাগ করেনা, তাহারা পাপযুক্ত হইয়া কেবল লাঙ্গল চালনায় উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ যাহারা ইহকাল পর্য্যালোচনা করিতে ও স্তুতি অভ্যাস ও সোম যাগ করিত, তাহারাই স্তোতা হইত, জন্মগুণে স্তোতা হইত না। যাহারা ঐ ধর্ম্মক্রিয়া সাধনে অসমর্থ, তাহারা কৃষক বা তন্তুবায় হইত। জন্মদোষে কৃষক বা তন্তুবায় হইত না।

২। ঋগ্‌বেদে বর্ণ বিচার।

ঋগ্বেদে বর্ণবিচার সম্বন্ধে স্থূলতঃ কিছু বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বিষয়টীর

---

* "Hindu civilization under British Rule" by Mr. P. N. Bose. Vol II.

* Maxmuller's Chips from a German Workshop" Vol II.

† "Indian Literature" (translation) Weber. c.f. in the connection, 'Muir's sanscrit Texts.' Vol I.

বিশদ আলোচনা আবশ্যক। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে ঋগ্বেদের কেবলমাত্র একটি সূক্তের একটী শ্লোকে জাতিভেদ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আছে। আলোচ্য সূক্তে বিশ্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পুরুষ কল্পনায় যজ্ঞীয় পশুর স্বরূপ যজ্ঞীয় বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

"যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞ মতম্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমগ্রতঃ
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চয়ে॥"
ইত্যাদি।

"যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল।"

"যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুরূপে সেই বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন।"

এইরূপে সেই প্রথম পুরুষকে যজ্ঞীয় পশু কল্পনা করিয়া যে বলি দেওয়ার কথা আছে, সেই সূত্রে ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের বর্ণভেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অনুবাদ সহ সেই স্থানটী উদ্ধৃত করিতেছি।

"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরু পাদা উচ্যেতে
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ॥
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

অর্থাৎ "পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয় খণ্ড করা হইয়াছিল, ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত, দুই উরু, দুই চরণ কি হইল।"

"ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু ছিল তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।"*

ইহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূলভিত্তি। এই কথায় উপরই প্রাচীন সমাজের জাতিভেদ নির্ভর করে। এখন এই সূক্তের বিচারে অগ্রসর হওয়া যাউক।

"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ জায়ত।"

অর্থাৎ সেই সর্ব্বহোম সম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম সমূহ উৎপন্ন হইল, ছন্দ সকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল, যজুও তথা হইতেই জন্ম গ্রহণ করিল।" এই সমস্ত হইতেই বেশ দেখা যাইতেছে ঐ দেবযজ্ঞ হইতে সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিনটী বেদও প্রসূত হইয়াছে।

কিন্তু মহাভারতের কবি কর্ত্তৃক যে বেদ বিভক্ত হইয়াছিল এবং সেই সময় কিম্বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই যে ভারতে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপন করিবার বিশেষ যত্ন হইতেছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই এবং মহাভারতই তাহার অন্যতম প্রমাণ।

সেই ১০।১২ শ্লোকের টীকায় শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু লিখিতেছেনঃ—ঋগ্বেদের রচনা কালের অনেক পরে এই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে

* শ্রীযুক্ত রমেশ বাবুর বঙ্গানুবাদ।

তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই। এই শব্দগুলি শ্রেণী বিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণাদি পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে। ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। ঋগ্বেদে এই কুপ্রথার একটা প্রমাণ সৃষ্টি করিবার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।'

সেই প্রাচীনকালের শ্লোকগুলি সমস্তই মৌলিক কি তাহার ভিতর প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও আছে, এখন এতকাল পর ভাষার পরীক্ষা ভিন্ন তাহা স্থির করিবার আর অন্য উপায় নাই। প্রকৃতই উক্ত-সূক্তটীর ভাষা দেখিলেই মনে হয়, উহা আধুনিক-সংস্কৃতের মত। ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্র গুলির ভাষা আধুনিক-সংস্কৃতের মত নহে, তাহা অতিশয় কঠোর এবং তাহার ব্যাকরণও স্বতন্ত্র। শুধু ব্যাকরণ বিভিন্ন নহে, ছন্দও আবার অন্যরূপ। তাহাতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ শব্দই এখন একেবারে অপ্রচলিত—তাহাদিগের ব্যবহার আর নাই। ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। যাঁহারা শুধু আধুনিক-সংস্কৃতে অভিজ্ঞ, তাঁহারা যে টীকাকারের বিনা সাহায্যে উক্ত মন্ত্রটীর অর্থ সম্যক্ বোধ করিতে পারিবেন এরূপ মনে হয় না।

মন্ত্রটী এই:—

'অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্।' ইহাই ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের সর্ব্ব প্রথম ঋক্।

"There can be little doubt, for instance, that the 90th. hymn of the 10th Book...is modern both in its character and in its diction'.*

আবার অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই:—

"All that is found in the Veda at least in the most ancient portion of it, are the hymns in a verse in which it is said that the priest, the warrior, the husbandman and the serf, formed all alike part of Brahman. European critics is are able to show that even this verse is of later origin than the great mass of the hymns and that it contains modern words such as Sudra and Rajanya, which are not found again in the other hymns of the Rig-Veda." †

ইতঃ পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে, "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ" প্রভৃতি পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, "এই মন্ত্র যিনি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি বেদ বিভাগ করার পর অর্থাৎ বেদমন্ত্র সকল সংগৃহীত হইয়া ঋক্, সাম ও যজুঃ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার পর এই অংশটুকু রচনা ও প্রেক্ষপ করিয়াছিলেন।"

মন্বাদিসংহিতাকারদিগের অভ্যুত্থানের এবং মহাভারতাদি লিখিত হইবার পূর্ব্বেই যে এই সূক্ত রচিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ মহাভারত প্রভৃতিতে এবং

* Ancient Sanskrit Literature p. 570. c.f. Elphinstone's History of India—p. 286.

† Chips from a German worshop Vol II.

মন্বাদি গ্রন্থেও এই সূক্তের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।—

(১) "লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"*

(২) "বিধিনা পুরুষসূক্তস্য গত্বা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।" †

(৩) "পুরুরবা উবাচ। কুতশ্চিৎ ব্রাহ্মণো জাতো, বর্ণাশ্চাপি কুতস্ত্রয়ঃ। কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠস্তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি।"

"মাতরিশ্বোবাচ। ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম। বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এবচ। বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ, বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্ম্মিতঃ।" ‡

এখন বোধ হয় বেশ দেখা যাইতেছে যে, এই সকল বচন পূর্ব্বোক্ত পুরুষ সূক্তের বর্ণানুসারে লিখিত হইয়াছে। হিন্দুর গ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই ইহা দেখাইয়াছি যে, পুরুষ সূক্তের উক্ত অংশ ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্রের তুলনায় অতিশয় আধুনিক। ঋগ্বেদের পর আমরা আর যে সকল গ্রন্থ পাই, তাহাতেই জাতিভেদের কথা বিশেষরূপে বিবৃত আছে। অথচ ঋগ্বেদেই কেবল নাই। ইহা হইতেই বেশ প্রমাণিত হয় যে, সেই প্রাচীনকালের পুরাতন সমাজে জাতিভেদ ছিলনা।

"The Rigveda shows beyond the shadow of a doubt that until towards the very close of the Rig-vedic period, the Indo Aryans were strangers to any kind of caste distinictions among themselves."

"In writing a foot note to the above passage Mr. Bose says:—,We do indeed, in certain texts. meet with such expressions as PANCHA-JANA. But panchajana can no more be interpreted to allude to the four VARNAS and the Nishadas, than to Gandharvas, Pitris, Devas, Asuras and Rakshas. The very existance of these two interpretations of the term would show that thy were mere suppositions put forword by Brahmanaical writers long after the composition of the Vedic hymns." ¶

শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু লিখিয়াছেন :—'বিশ্বনিয়ন্তাকে বলি স্বরূপ অর্পণ করা অনুভবটীও ঋগ্বেদের আর কোথাও ইহা পাওয়া যায় না। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অনুভব।"

মুয়ার সাহেব বলেন যে, বলি প্রথা অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিলেই বর্ত্তমান কল্পনা সম্ভব হয়, নতুবা নহে। এই বলির প্রথার আনুসঙ্গিক ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে যাহার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে, যিনি এই প্রথার পবিত্রতা এবং সফলতা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, শুধু সেইরূপ পুরোহিত কবিই কল্পনা করিতে পারেন যে; পরম পুরুষ

* মনু। ১।৩১

† হারিত সংহিতা।

‡ মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

¶ Hindu civilisation under British Rule" by Mr. P. N. Bose.

cf. also 'Muir's Sanskrit Texts — Vol I.

পরমেশ্বরকেও বলি দেওয়া যাইতে পারে। অন্যের পক্ষে এরূপ কল্পনা ধর্ম্মবিগর্হিত।

"It was evidently produced at a period when the ceremonial of sacrifice was largely developed ... penetrated with a sense of the sanctity and efficacy of the rites, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purush himself as forming the victim." §

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ।

আহার।

ষষ্ঠ-অধ্যায়।

নিষেধ অন্ধবাতুলতা নহে।

প্রতিপদাদি তিথিতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারদিগের দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে অন্ধবাতুলতা নহে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিলে বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু এইস্থলে সকলেরই একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে তিথিতে যে দ্রব্য ভোজনে কোন ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা, তাহা যে সেই দিন বা সেই তিথিতেই হইয়া থাকে, তাহা নহে। তিথিবিশেষে ধাতু দূষিত হয়। সেই সময় যদি সেই দোষকে দমন না করিয়া তাহার পোষকতা করা যায়, তাহা হইলেই স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক নহে। এক কথায় বলিতে গেলে তাহা হইতেই স্বাস্থ্য মন্দ হয়— অর্থাৎ মানব-শরীরের যন্ত্র বিশেষ দুর্ব্বল এবং হীনতেজ হইয়া পড়ে এবং আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বা ক্রিয়া ভাল করিয়া করিতে পারে না। পূর্ব্ব কথিত সেই এক দিবার অত্যাচার শরীরের এরূপ অনিষ্ট করে এবং সহজে ব্যাধি আকর্ষণ করিবার এমন একটী বিষময়-বিষম-শক্তি শরীরকে প্রদান করে যে, তাহার ফল প্রাণান্তকারী হইয়া উঠে।

মানুষ চিরদিনই মানুষ—দেবতা নহে। যে ব্যক্তি খুবই সৎ, খুবই সাবধান, সেও কিছু না কিছু অত্যাচার করিয়া থাকে। আমি যে অত্যাচারের কথা কহিতেছি, তাহা শুধু শরীরেই নিবদ্ধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য এক দিনের অত্যাচারে কোন ব্যাধিই হয় না কিন্তু প্রতিদিন এইরূপ অত্যাচার করিতে থাকিলে, শরীরের একটী দূষিত-যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইতে না হইতেই আর একটী বা সেইটী পুনশ্চ দূষিত হইলে পীড়িত হইতেই হইবে। অপচার যে শুধু আহারেই নিবদ্ধ তাহা নহে। নানারূপে এবং বিবিধ-কার্য্যে শরীরের উপর কত প্রকারের অত্যাচার করা যাইতে পারে, এবং মানুষ তাহা করিয়াও থাকে। সুতরাং তিথিবিশেষে আহারের অত্যাচারের সহিত সেই দিনকৃত অন্য প্রকার অত্যাচার যুক্ত হইয়া অত্যাচারের অনিষ্টকারিণী শক্তি বাড়াইয়া দেয়। তাহা হইলেই ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা।

§ Muir's Sanskrit Texts—Vol V.

অনেক বৈজ্ঞানিক-যন্ত্র এমন আছে যে, তাহাদের সামান্য একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে আর সে সকল যন্ত্রের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না, তাহারা একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আমাদিগের এই শরীর-যন্ত্র সম্বন্ধেও সেই কথা। ইহার কোন একটি একটু বিগড়াইয়া গেলে তাহার সংশোধন করা কঠিন। এমন কি একটী যন্ত্রের দোষে অপরগুলিও ক্রমে ক্রমে দুষ্ট হইয়া উঠে। সেই জন্যই যতদূর সম্ভব সাবধান সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সেই জন্যই শাস্ত্রকারদিগের এত নিষেধ বাক্য এত শাখা ভাঙ্গাভাঙ্গি।

এইস্থানে আর একটী কথা বলা উচিত। আমি পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি যে, শরীরের সহিত মনের খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এবং মনের সহিত আত্মারও সম্বন্ধ বড় ঘনীভূত। খাওয়া অখাওয়াও এতদ্ উভয়েরই শরীরের মঙ্গলের জন্য; "আহারের তারতম্য বা ভিন্নতা অনুসারে আমরা কেবল যে শারীরিক অবস্থার ভিন্নতা অনুভব করি তাহা নয়, মানসিক-অবস্থার ভিন্নতাও উপলব্ধি করিয়া থাকি। ফলতঃ আমাদের মানসিক-অবস্থা যে বহুল পরিমাণে আমাদের শারীরিক অবস্থা অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আহারের ফলে উদরাময়, শিরঃপীড়া প্রভৃতি শারীরিক-অবস্থার নানাবিধ বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। ...... যে কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলেই মনের অবস্থারও ব্যত্যয় বা বিপর্য্যয় ঘটে, মনের শান্তি, স্থৈর্য্য প্রভৃতি স্বাভাবিক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। আহার বিশেষে রাগদ্বেষাদি বৃদ্ধি হয়, মনের শান্তি, স্থৈর্য্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। কিন্তু যেখানে রাগদ্বেষাদি প্রবল বা মনে শান্তি স্থৈর্য্য প্রভৃতির অভাব, সেখানে ধ্যান, ধারণা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মচর্য্যার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। চিত্তস্থৈর্য ও চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ধর্ম্মচর্য্যা হয় না। অতএব যে আহার চিত্তস্থৈর্য্য ও চিত্তশুদ্ধির বিরোধী, সে আহার ধর্ম্মচর্য্যারও আত্মারও বিরোধী। এইজন্যই আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।"*

নিষেধ প্রতিপালনার্থ শপথবাক্যের আবশ্যকতা কি?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেকালের সেই ভারতভূমির আর্য্য-সমাজে সকলেই শিক্ষিত ছিলনা। কেহবা শিক্ষিত, কেহবা অর্দ্ধশিক্ষিত, আর কেহবা একেবারেই মূর্খ ছিল। তখন যাহার যে কার্য্য সে তাহাই করিত। যে লাঙ্গল ধরিত সে বেদ পাঠ করিত না। শাস্ত্রকারদিগের এই সকল বিধিনিয়ম সেই সময়ের সরলচিত্ত ভারতবাসী হিন্দুদিগের জন্য। ইহা অবশ্য একটা সরল সত্য যে, শিক্ষার পুণ্যোজ্জ্বলকিরণ সম্পাতে মানুষের মনের অন্ধকার দূর হয়, কুসংস্কার পলায়ন করে, অন্ধবিশ্বাস লজ্জায় অন্ধকারে লুক্কায়িত হয়। আবার ইহাও সত্য যে, অশিক্ষিতের নিকট সকল কথার অর্থ বুঝাইয়া বলিতে গেলে, সে পরিশ্রমের কোন ফল হয় না। তাহারা যুক্তি চাহে না, তাহারা চাহে আদেশ। তাহারা বুঝিতে চাহে না, তাহারা কেবল

* সাহিত্য, ফাল্গুন ১২৯৮।

জানিতে চাহে, কিরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে সেই আদেশটির আগমন। ইহাই তাহাদিগের অনাবিল জীবন নদীর বাধা-বন্ধবিহীন ধীর স্রোতের পক্ষে যথেষ্ট। আবার ইহাও সত্য যে "ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পাঠতে বকঃ"। তাই শাস্ত্রকারগণ যুক্তি দিতেন না, কেবল আদেশ করিতেন। যাহারা শিক্ষিত ছিল, যাহারা বুঝিবার উপযুক্ত ছিল, তাহারা দেখিত বুঝিত সিদ্ধান্ত করিত।

ব্যাধিশয্যায় শায়িত হইলে আমরা ঔষধ খাইয়া থাকি। কোন ঔষধের কি প্রক্রিয়া, কোনটী হৃদয়ের উপকারক, কোনটী বা ফুসফুসে যাইয়া নিজশক্তি বিস্তার করিবে প্রভৃতি তত্ত্ব, ঔষধ খাইবার সময় কি আমাদের জানিবার আবশ্যকতা হয়? তাহা হয় না। তখন আমরা কি দেখি? আমরা কেবল দেখি যে একজন বিদ্বান বুদ্ধিমান; চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী চিকিৎসক আমাদিগকে ঔষধ দিতেছেন—আমরা তাঁহারই ব্যবস্থার অধীন। তাহাই কি আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট নহে?

পূর্ব্বকালেও তাহাই হইত। ঋষিগণ ব্যবস্থা করিতেন, সমাজ ব্যাধিপীড়িতের ঔষধ সেবনের ন্যায় তাঁহাদিগের সকল আজ্ঞা মানিয়া চলিত।

কিন্তু কেবলমাত্র আদেশেই কি সকল কার্য্য হয়? ইংরাজরাজ যদি কেবলমাত্র এই আদেশ করিতেন যে, কেহ চুরি করিওনা, তাহা হইলেই কি দেশের যত চোর হাত পা গুটাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিত? তাহা নহে। ইংরাজ আদেশ করিলেন চুরি করিলে ৩বৎসর কারাবাস। অমনি লোকের মনে ভয় হইল, মানুষ সাবধান হইল। যে হয়ত একবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, সে আর দ্বিতীয়বার চুরি করিল না—একবার দাগা পাইল। যে আপনার প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারিল, সে সাধু হইল। তাই বলিয়া কি সকলেই সাবধান হইয়াছে? দস্যুর রাজত্ব উঠিয়া গিয়া এখন কি কেবল হবিষ্যান্নভোজী সাধুর সংসার? তাহা নহে। সাধুও আছে, অসাধুও আছে। তার অনেকেই সাবধান হইয়াছে, অনেকে হইতেছে, ভবিষ্যতেও হয়ত অনেকেই হইবে। সুতরাং আদেশের সহিত আরও কিছু চাই। ঔষধের সহিত অনুপানের প্রয়োজন। অনুপানভেদে আবার ঔষধের ক্রিয়ার তারতম্য হয়।

সমাজের অবস্থা চিরদিনই এক রকম থাকে না। একই সমাজ, কখনও বা খুবই উন্নত হয়, কখনও সাধারণ ভাবে চলে, আর কখনও বা একেবারেই অধঃপতনের সর্ব্বনিম্ন-সোপানে আসিয়া দাঁড়ায়। সমাজের এই তিন অবস্থাতেই কি ঠিক একইরূপ শাসন বাক্যে স্বর্ণফল প্রসব করে। ব্যাধির তারতম্য অনুসারে ঔষধেরও তারতম্য হয়। সুতরাং সমাজের সকল অবস্থাতেই প্রয়োজ্য এমন একটী ঔষধ দিবার পূর্ব্বে এই সমস্ত কথাই সম্যক্ বিবেচনা করা উচিত। তত্ত্বদর্শী আর্য্যশাস্ত্রকারগণ তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, সকলকে যুক্তি তর্ক দিয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব, দিলেও হয়ত সকলে বুঝিবে না।

তাই তাঁহারা কতকগুলি কার্য্য করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন লোকে বা তাৎকালিক সমাজ তাঁহাদিগকে দেবতার মত ভয় ভক্তি করিত সুতরাং তাঁহাদিগের আদেশ অবশ্যই প্রতিপালিত হইত। তত্রাচ সাবধান হইবার জন্য ভবিষ্যতের কাল্পনিক উচ্ছৃঙ্খল সমাজের দিকে চাহিয়া তাঁহারা ঔষধের সহিত অনুপানের ব্যবস্থা করিলেন অর্থাৎ প্রত্যেক আদেশের সহিত একএকটী ভীতিমূলক শপথ বাক্যও সংযোজিত করিলেন, তাঁহাদিগেরই জয় হইল! আজ পর্য্যন্তও সেই শপথ বাক্যের ভয়ে সকলেই যথাসাধ্য তাঁহাদিগের আদেশ প্রতিপালন করিতেছে! সেই সকল আদেশের মূলে কোন যুক্তি আছে কিনা, বা থাকা সম্ভব কিনা, তাহা বিবেচনা করিবার আর দরকার হয় না।

দুগ্ধপানে অস্বীকৃত শিশু মাতৃক্রোড়ে বসিয়া যখন আবদার করিয়া কাঁদিতে থাকে, তখন স্নেহময়ী জননী পুত্রকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়া থাকেন—'দুধ খা দুগ্ধ না খেলে বাঘে ধরিবে"! ব্যাঘ্রের নাম শুনিয়াই বালক ক্রন্দনের কথা একবারে ভুলিয়া যায় এবং বিনা আপত্তিতে দুগ্ধ পান করিয়া থাকে! এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায়! সেই জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ সংযমী শান্ত আর্য্য ঋষিদিগের চরণমূলে দাঁড়াইয়া আমরাও শিশু মাত্র। তাই শপথ-বাক্য আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া দুগ্ধ পান করায়।

"এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কোন সমাজ রচিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে কেবল বিংশতিকোটি অধ্যাপক পুরোহিত এবং তপস্বীর প্রাদুর্ভাব হইলে অতি সত্বরেই সেই সুপবিত্র জন সংখ্যার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্যানশীল ব্রাহ্মণও ছিল এবং কর্ম্মশীল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও ছিল, মাংসও ছিল মাংসভোজীও ছিল; সুতরাং স্বাভাবিক আবশ্যক অনুসারে আমিষও ছিল, নিরামিষও ছিল, আচারের সংযমও ছিল, আচারের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতাও ছিল। যখন সমাজে ক্ষত্রিয়তেজ ছিল, তখনই ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইত। শক্তি থাকিলে যেমন ক্ষমা শোভা পায়, সেইরূপ। অবশেষে সমাজ যখন আপনার যৌবনতেজ হারাইয়া আগাগোড়া সকলে মিলিয়া সাত্ত্বিক সাজিতে বসিল, কর্ম্মনিষ্ঠ সকল বর্ণ ব্রাহ্মণের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল, এই বৃহত ভূভাগে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের পদানুবর্ত্তী একটী ছায়া মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন প্রাচীন ভারতবর্ষের বিনাশ হইল। তখন নিস্তেজতাই আধ্যাত্মিকতার অনুকরণ করিয়া অতিসহজে মন্ত্রাচারী এবং কর্ম্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠিল। ভীরুর ধৈর্য্য আপনাকে মহত্তের ধৈর্য্য বলিয়া পরিচয় দিল, নিশ্চেষ্টতা বৈরাগ্যের ভেকধারণ করিল এবং দুর্ভাগা অক্ষম ভারতবর্ষ ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণের গরুটি হইয়া তাহারি ঘানি-গাছের চতুর্দ্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া পবিত্র চরণতলের তৈল যোগাইতে লাগিল।"*

* সাধনা, ১২৯৮-৯৯।

ভারতের এই দুর্দ্দিনে পর্য্যন্ত ঋষিদিগের আদেশ প্রতিপালিত হইত। শপথবাক্য-ভীতি তখন ভারতহৃদয়ে তপ্ত অগ্নির মত দিবানিশি জ্বলিত। তখনকার সময়ে যদি প্রত্যেক আদেশের সহিত এক একটি করিয়া শপথবাক্য সংযোজিত না থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আচার নিয়মের এত বাঁধাবাঁধি আমরা দেখিতে পাইতাম না। এখনও হিন্দু সমাজের প্রায় সেই একই অবস্থা। অমুক কার্য্যটি করিতে হইবে—কিন্তু কেন করিতে হইবে, তাহা আমরা জানিনা। কেবল এই টুকুমাত্র জানি যে, না করিলে হয়ত সপ্ত জন্ম নরক হইবে—কি হয়ত পিতৃপুরুষ মোক্ষলাভ করিতে পারিবেন না, কি অমনি আর একটা কিছু হইবে। তাই আমরা সেই কার্য্যটী করিয়া থাকি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শপথ বাক্যের ভয়েই আদেশ প্রতিপালন করা হয়। অগ্নির উত্তাপে জল উষ্ণ হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়; আর সেই বাষ্পের শক্তিতে এন্‌জিন্ চলিয়া থাকে। শপথ-বাক্যের উত্তাপে আমরা ঋষিদিগের সেই সকল অনুশাসন প্রতিপালন করিয়া থাকি, আর সেই আদেশ প্রতিপালনের ফলেই আমাদিগের শরীরযন্ত্র বেশ নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত রহিয়াছে:—
"কুষ্মাণ্ডেচার্থহানিঃ স্যাদ্‌বৃহত্যাং নস্মরেদ্ধরিং
বহুশত্রুঃ পটোলেস্যাদ্ধনহানিস্তু মূলকে॥"
কলঙ্কী জায়তে বিম্বে তীর্থংগৃহোনিশ্চ নিম্বকে
তালে শরীর নাশঃস্যান্নারিকেলে চ মূর্খতা॥
তুম্বী গোমাংসতুল্যাস্যাৎ কলম্বী গোবধাত্মিকা
শিম্বী পাপকারী প্রোক্তা পুতিকা ব্রহ্মঘাতিকা
বার্ত্তাকৌ সুতহানিঃ স্যাৎচিররোগী চ মাষকে
মহাপাপকরং মাংসং প্রতিপদাদিষু বর্জ্জয়েৎ॥

আর্য্যজাতি চিরদিনই বড় ধর্ম্মভীরু। কোন একটী কার্য্য করিলে যদি অধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে প্রাণান্তেও তাহারা সে কার্য্য করিতে চাহেন না। সাধারণতঃ লোকচরিত্র আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাহাকেও শপথ-বাক্যে কোন কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলে বা করিতে নিষেধ করিলে, সে তাহা সম্পাদন করে বা সেই কার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকে। একটি অতিশয় সাধারণ উদাহরণ দিতেছি। মনেকর যদি তোমার ষোড়শী সুন্দরী গৃহিণী তাহার কোমল বাহুপাশে তোমাকে আবদ্ধ করিয়া বিষণ্নবদনে করুণনয়নে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া তোমাকে বলে "আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখ—এ কাজটা করো না"। তখন তুমি কর? সেই কার্য্যটি করিতে যদি তোমার একান্ত বাসনাও থাকে, তাহা হইলেও সেই কুঞ্চিত কৃষ্ণকুন্তল স্তবক শোভিত ক্ষুদ্র কচি মস্তক-টীকে তোমার নিষ্ঠুর কঠিন দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিবার ভয়ে, এবং তোমার হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, জীবন সঙ্গিনীর মৃত বদন খানি দেখিবার ভয়ে তুমি সেই কার্য্য হইতে বিরত থাক। সংসার ভাসিয়া যাউক, পৃথিবী রসাতল যাউক, তোমার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; তুমি সেই সুন্দর সুকোমল সরল মুখখানি, সেই গোলাপী-অধর সেই তাম্বুলরাগরঞ্জিত প্রোজ্জ্বলকুসুম-

কালকাবৎ ওষ্ঠদ্বয় মৃত্যুর কালছায়ায় আচ্ছন্ন দেখিতে পারিবে না! তাই তুমি তোমার ঈপ্সিত কার্য্যটী আর কর না। এ ক্ষেত্রে অবশ্য তোমার আরও একটি উদ্দেশ্য থাকে। তোমার গৃহিণীর মনোরঞ্জন। শপথবাক্যের এত শক্তি!

এখন ভাবিয়া দেখ আমাদের হিন্দু চিরদিনই বড় ধর্ম্মপ্রাণ। সেই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট ধর্ম্মের দোহাই যেন অগ্নিময়ী বাধা। কিছুতেই অতিক্রম করিবার যো নাই। এখন প্রতিদিন প্রতিহিন্দুর গৃহে ইহার লক্ষলক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রের প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ-পরিগ্রহে যাহারা অক্ষম তাহারা অন্ততঃ ধর্ম্মরক্ষার ভয়ে কখনও শাস্ত্রোক্ত বিধি নিয়ম মানিয়া চলে। আর সেই শপথবাক্য রক্ষা করিলেই শাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধ কার্য্য সকল করা হইল না। বর্ত্তমানযুগে যাহারা শিক্ষিত তাহাদিগের কথা ছাড়িয়া দি। যাহারা অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মের দোহাই বড় মূল্যবান্, তাহাদিগের জীবনপথের মধ্যস্থলে যেন পর্ব্বত প্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার মত শিক্ষা তখনকার যুগে ছিলনা। সুতরাং এখনকার হিসাবে দেখিতে গেলে সেই সকল বৃদ্ধ মুনিঋষিদিগের পরিশ্রম একেবারে পণ্ড না হইলেও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ নহে। কারণ আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিতের নিকট তাঁহাদিগের বিধি নিষেধ প্রভৃতির তত মূল্য নাই,--অনেকস্থলে বাতুলের অসংলগ্ন উন্মত্ত প্রলাপমাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি, এ।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

সীতারামের সময় ইহা প্রকৃত বৃন্দাবন সদৃশই ছিল, তখন কানাইনগর রাজধানী ভুক্ত ছিল। অনেক ধনী ও জ্ঞানী লোকের বাস ছিল। কানাই নগরের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ইত্যাদি দর্শনে মন স্বভাবতঃই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। সীতারাম যে এক জন ভক্তপ্রবর ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি স্বর্গধামে গিয়াছেন, তাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি মানব-মনকে ভক্তিপথে ধাবমান করাইতেছে। ব্রজধামে নন্দগোপ ইত্যাদি বৈশ্য শ্রেণীর আহীরিগোপ ছিলেন কানাই নগরের গোয়ালাগণ বর্ণসঙ্কর জাতি। শ্যামনগর, মথুরানগর, গোপালপুর, গোকুলনগর ইত্যাদি সীতারামের কানাইনগর বৃন্দাবনের তালবন, ভাণ্ডীবন সদৃশ এক একটী পাড়া। কালে সমস্ত সৌন্দর্য্যই অপহরণ করিয়াছে, এক্ষণ সমস্তস্থানেই প্রায় বনতুল্য জঙ্গলময় হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে লোকের বাস আছে।

সীতারামের গুরুবংশ টেঁয়ার ঠাকুরগণ। শ্রীবামনবদ্বীপ চন্দ্র ভগবান্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পার্শ্বদ দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের সন্তান!

পুণ্যশ্লোক সীতারাম একজন ভক্তাগ্রগণ্য স্বাধীনচেতা মহান্ পুরুষ ছিলেন।

সীতারামের রাজত্বকালে মহম্মদপুর নগরের মধ্যে কালীগঙ্গা নাম্নী একটি ক্ষুদ্রানদী প্রবাহিতা ছিল। এই কালীগঙ্গা নদীরতীরেই মেনাহাতীর কবরস্থান রহিয়াছে। সীতারাম তাঁহার পিতা উদয় নারায়ণের

নামানুসারে রাজবাটীর সন্নিকটে উক্ত কালীগঙ্গা নদীর তীরে একটী প্রধান গঞ্জ ও হাট স্থাপনা পূর্ব্বক তাহার নাম উদয়গঞ্জ রাখেন, বর্ত্তমানে সে গঞ্জ বা হাট নাই বটে কিন্তু অদ্যাপি লোকে উদয়গঞ্জের হাটখোলা বলিয়া থাকে। কালীগঙ্গা নদী এক্ষণে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে সামান্য অস্তিত্ব মাত্র রহিয়াছে।

বাগ্রৈজানী, ধুপড়িয়া, যুগলাইন, রায়পাশা, নৈহাটী, জাঙ্গালিয়া, ঘুঙ্‌ইচ্, মাণিকপুর, নারায়ণপুর, কোঠাবাড়ী, গোয়ালবাড়ী, বাজার রাধানগর বা পুরাতন বাজার, কানাইনগর, গোকুলনগর, মথুরানগর, শ্যামনগর ও গোপালপুর গ্রাম মহম্মদপুর রাজধানীর অন্তর্গত ছিল। মহম্মদপুরের পূর্ব্বদিকে মধুমতী নদী প্রবাহিতা ছিল ও আছে।

সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত ৺দশভুজা পিতল-নির্ম্মিত। কেহ কেহ অষ্টধাতু নির্ম্মিত বলেন, তাহা অমূলক। প্রবাদ আছে যে, মহম্মদপুরে অনেক শিল্পনিপুণ কর্ম্মকার বাস করিত। সীতারাম ৺দশভুজা মূর্ত্তি সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন রাজধানীস্থ একটী প্রাচীন কর্ম্মকারের নিকট তিনি শুনিতে পান যে, তাহার পুত্র কারুকার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে এবং এরূপ কৌশলে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে যে, সম্পূর্ণই চুরি করিবে অথচ জিনিষ দেখিয়া কেহ তাহার চুরি ধরিতে পরিবে না। তচ্ছ্রবণে সীতারাম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে বলেন যে, তিনি সেই কর্ম্মকারের দ্বারা স্বর্ণময়ী ৺দশভুজা-মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইবেন। যদি সে অজ্ঞাতসারে স্বর্ণ চুরি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করা হইবে নচেৎ, তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন। পরে সীতারাম সেই কর্ম্মকারকে ডাকাইয়া নিজ বাড়ীর উপর স্বর্ণের ৺দশভুজা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন এবং এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে, যতক্ষণ কর্ম্মকার কার্য্য করিবে, ততক্ষণ উপযুক্ত প্রহরিবর্গ সর্ব্বদা তাহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিবে, যাহাতে কোনরূপ চতুরতা না করিতে পারে। এবং তাহার দৈনিক কার্য্য অন্তে সেই গৃহ উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া প্রহরীর দ্বারা রক্ষণ করিতেন। কর্ম্মকার রাজ-বাড়ীতে রীতিমত কাঞ্চন-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে সে নিজ বাড়ীতে সুবিধামত অবকাশ সময়ে রাজ-বাড়ী অনুরূপ একটী ৺দশভুজা মূর্ত্তি পিতলের দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ যত্ন সহকারে উদ্যোগী হইল। ক্রমশঃ এক দিনেই দুই মূর্ত্তি প্রস্তুত শেষ হইল। তৎকালীন নিয়ম ছিল যে, বিগ্রহ উৎসর্গের পূর্ব্বে মূর্ত্তি প্রস্তুতকারীরই প্রতিমূর্ত্তি স্নান করাইয়া আনিতে হইত। তদনুসারে স্নানের দিন প্রথমেই কর্ম্মকার তাহার বাটীতে নির্ম্মিত পিতলের মূর্ত্তি পুষ্করিণী মধ্যে নিমগ্ন রাখিয়া পরে যথা সময়ে রাজবাটীর নির্ম্মিত সুবর্ণ মূর্ত্তি স্নান করাইতে গিয়া উক্ত পিতলের মূর্ত্তি উঠাইয়া সুবর্ণ মূর্ত্তি তথায় রাখিয়া আইসে। পিতলের মূর্ত্তি এরূপ রঞ্জিত করিয়া ছিল যে, দেখিলেই স্বর্ণ

বলিয়া প্রতীতি জন্মিত। সীতারাম ও অন্যান্য দর্শক মণ্ডলী পিতলের মূর্ত্তিই স্বর্ণ বলিয়া স্থির করিলেন। শেষে উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে সীতারাম কর্ম্মকারের পিতাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তাহার পুত্র কিছুই অপহরণ করিতে পারে নাই অতএব সে দণ্ডনীয় হইবে। প্রত্যুত্তরে কর্ম্মকার বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে, তাহার পুত্র সম্পূর্ণ চুরি করিয়াছে। মহারাজের অভয় পাইলে সমস্তই প্রকাশ করিতে পারে! সীতারাম বিস্ময়াতিশয় সহকারে তাহাকে অকুতোভয়ে বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিতে আদেশ দিলেন। তখন কর্ম্মকার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলে সভাস্থ সকলেই যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সীতারাম সহাস্য বদনে বলিলেন যে, মার পিতল নির্ম্মিতা হইতেই বাসনা, নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন? তদনুসারে তিনি পিতলের মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা করেন, স্বর্ণমূর্ত্তি কর্ম্মকারকে পুরস্কার স্বরূপ দান করিলেন।

৺ হরেকৃষ্ণ রায়ের কাষ্ঠ (নিম্ব) নির্ম্মিত সীতারাম কর্ত্তৃক স্থাপিত যুগল মূর্ত্তি ভগ্ন হইয়া যাওয়ার পরে নাটোর মহারাজের তত্ত্বাবধানে নূতন মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইয়াছে। সমস্ত বিগ্রহগুলিকেই দ্বিপ্রহরে অন্ন ও রাত্রিতে রুটির ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ৺ হরেকৃষ্ণ রায় ও ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের প্রাতে দৈধ, মুড়কী, চিড়াভাজা, ছোলাভাজা ইত্যাদি বাল্য সেবা ও বৈকালে সন্দেশ জল সেবার বন্দোবস্ত আছে।

৺ লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের প্রত্যহ রীতিমত উষাকালে মঙ্গল আরতি হইয়া থাকে। দেবসেবা আদির যেরূপ নিয়ম সীতারামের সময় প্রচলিত ছিল, অদ্যাপি সেইরূপ চলিতেছে কিন্তু সেবাইত মহারাজার সে সমস্ত বিষয়ে তত লক্ষ্য নাই। ভোগের বন্দোবস্ত ইত্যাদি অনেক কমিয়া গিয়াছে। কোন রূপে দেব সেবা চলিতেছে। মহারাজ অনেক ব্যয় কমাইয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে যে, ৺ হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর তিন পার্শ্বেই পাকা যোড় বাঙ্গলা ছিল, তাহা ভ্রমবশতঃ লেখা হইয়াছে। ৺ হরেকৃষ্ণ রায়ের প্রাঙ্গণের পশ্চিমের দিকে পঞ্চরত্ন মন্দিরে ৺হরেকৃষ্ণ রায় বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজিত। দক্ষিণের দিকে বৃহৎ পাকা শিবমন্দির, উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে পাকা যোড় বাঙ্গালা ছিল। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ইত্যাদি। পঞ্চরত্ন মন্দিরটী ব্যতীত অন্য মন্দির ইত্যাদি ভগ্ন হইয়াগিয়াছে। পঞ্চরত্ন মন্দিরটীরও ভগ্ন দশা। উত্তরের দিকের পাকা যোড় বাঙ্গলায় ৺ মহারাণী ভবানীর কন্যা ৺ তারা ঠাকুরাণী ৺ বলরামজী স্থাপনা করেন। শেষে যোড় বাঙ্গলা ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মহম্মদপুরে যখন দীঘাপতিয়ার রাজার সদর কাছারী ছিল, তখন দীঘাপতিয়ার রাজ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ স্থাপিত হয়। সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলির ন্যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের সেবা ও ভোগের উত্তম বন্দোবস্ত ছিল। পরে দীঘাপতিয়ার সদর কাছারী যশোহর জেলার অন্তর্গত বুনাগাতীতে স্থানান্তরিত হইলে বিগ্রহটী মহম্মদপুরেই রক্ষিত হইয়াছিল। কিছু দিন

পূর্ব্বে উক্ত বিগ্রহ দীঘাপাতিয়ার রাজবাটীতে নীত হইয়াছে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের পাকা মন্দির, প্রাঙ্গণ ইত্যাদি জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে।

৮ম প্রস্তাবে চিত্তবিশ্রামের পশ্চিমে ছত্রাবতী নদী প্রবাহিত ছিল লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নয়। দক্ষিণ দিকে উক্ত নদী প্রবাহিত ছিল।

সীতারামের শেষ জীবনী সম্বন্ধে তদীয় সহোদর লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের বংশধর বর্ত্তমান দেবনাথ রায় এবং সীতারামের প্রপৌত্র রাধাকান্ত রায়ের দৌহিত্র পুত্র উমাচরণ দাস মহাশয়ের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, শেষে নবাব সৈন্য মহম্মদপুর রাজধানী আক্রমণ করিলে সীতারাম অন্তঃপুর মধ্যেই থাকিতেন। তখন তাঁহার সৈন্য বল হ্রাস হইয়াছে, সম্মুখ যুদ্ধে নবাব সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে অসমর্থ, এজন্য কোন বিহিত উপায় স্থির করণাভিপ্রায়ে বিমর্ষচিত্তে অন্তঃপুরেই থাকিতেন। মুরসিদাবাদ গিয়া নবাব দরবারে সন্ধির প্রস্তাবনা করিবেন সংকল্প করিতে ছিলেন। এই সময়ে কনিষ্ঠারাণী তাঁহাকে বিদ্রূপ ব্যঞ্জক স্বরে রাজার এরূপ সময়ে অন্তঃপুরে থাকা নিতান্ত কাপুরুষতার লক্ষণ এবং ক্রমশঃ তাঁহারা বিপদ সাগরে নিমজ্জিত হইতেছেন ইত্যাদি বাক্য বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ নবাব সেনার সম্মুখীন হয়েন এবং বিপক্ষগণ তাঁহাকে বন্দীভাবে লইয়া যায়। সীতারাম নবাব দরবারে উপস্থিত হইলে নবাবের দেওয়ান রঘুনন্দন তাঁহাকে বলেন যে, দুইলক্ষ টাকা এক্ষণ দিলে তিনি মুক্ত হইতে পারেন এবং তাঁহার জমিদারী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, রঘুনন্দন উৎকোচ স্বরূপ উল্লিখিত টাকা প্রার্থনা করেন, কেহ বলেন যে, গত চতুর্দ্দশ বৎসরের করস্বরূপ উক্ত টাকা দিতে বলেন। যাহাহউক সীতারাম উল্লিখিত টাকার জন্য মহম্মদপুরে লোক প্রেরণ করেন। মহম্মদপুর হইতে দুইলক্ষ টাকা নৌকা পথে কতিপয় লোক সহ মুরসিদাবাদে প্রেরিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে মুরসিদাবাদ রাজধানীর অনতিদূরেই রঘুনন্দন চক্রান্ত করিয়া নৌকা আক্রমণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করেন। এদিকে সে সংবাদ সীতারাম বা মহম্মদপুরস্থ কেহই জানিতে পারেন নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীতারামের টাকা মুরসিদাবাদে উপস্থিত না হওয়া বশতঃ এবং রঘুনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতারাম মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, নবাবের সহিত সন্ধি বা তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভের কোন আশা নাই। যবন হস্তে অবমানিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর বিবেচনায় তিনি আত্মহত্যা করেন। সীতারামের পরিবারবর্গ তখন হরিহরনগরের বাটীতে ছিলেন। সীতারাম বন্দীভাবে মুরসিদাবাদে নীত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্যামসুন্দর রায় নৌকারোহণ পূর্ব্বক দিল্লীর সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক বাদসাহকে বলিয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা করেন। বাদসাহ সীতারামের কীর্ত্তি কলাপ ইত্যাদি অবগত হইয়া কৃপাপরবশ হইয়া শ্যামসুন্দর রায়কে আশ্বাস বাক্য প্রদান পূর্ব্বক সীতারামের রাজ্য প্রত্যর্পণ

করিতে মুরসিদাবাদে নবাবের নিকট আদেশ পত্র দান করেন এবং শ্যামসুন্দরকে মুরসিদাবাদ নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেন। শ্যাম সুন্দর মুরসিদাবাদে উপনীত হইয়া তাঁহার পিতা সীতারামের আত্মহত্যার সংবাদ শ্রবণ করেন। শ্যামসুন্দর যৎপরোনাস্তি দুঃখিত, শোকার্ত্ত ও মর্ম্মাহত হইয়া নবাব গোচরে উপস্থিত হয়েন। নবাব শ্যামসুন্দরের সহিত সীতারামের জমিদারী বন্দোবস্তের আদেশ প্রদানের ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু রঘুনন্দন তখন নবাবকে বলেন যে, সীতারামের তিনটী স্ত্রী, তাঁহার মধ্যমাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এই শ্যামসুন্দর, এরূপ স্থলে অন্য রাণীদের মত লওয়া আবশ্যক। রাজ্ঞীদের যদি মত হয়, তবে শ্যামসুন্দরের সহিতই জমিদারী বন্দোবস্ত করা যাইবে। নবাবও তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। শ্যামসুন্দর মুরসিদাবাদেই রহিলেন। এদিকে নাকি রঘুনন্দন মহম্মদপুরের রাজ্ঞীদিগের নিকট লোক প্রেরণ পূর্ব্বক সংবাদ প্রদান করেন যে, সীতারামকে নবাব হত্যা করিয়াছেন, শ্যাম সুন্দর মুরসিদাবাদে আছেন। যদি তাঁহারা জমিদারী প্রার্থনা করেন, তবে শ্যামসুন্দরকেও নবাব বধ করিবেন অতএব তাঁহারা যদি রঘুনন্দনের উপর সমস্ত ভারার্পণ করেন এবং লিখিয়া দেন যে, তাঁহাদের বংশধরগণ জমিদারী চালাইতে অক্ষম, রঘুনন্দনই সমস্ত জমিদারী নিজহাতে রাখিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহা হইলে শ্যামসুন্দর রায়ের জীবন রক্ষা হইতে পারে এবং তিনি মহম্মদপুরে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। রাজ্ঞীত্রয় সীতারামের হত্যা সংবাদ, রাজত্বনাশ ইত্যাদি কারণেই অত্যন্ত শোকার্ত্তা, ভীতা, দুঃখিতা ও কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া উন্মাদিনী তুল্যা হইয়াছিলেন। পরে এইরূপ সংবাদে পুত্র-স্নেহ বশতঃ রঘুনন্দনের আদেশ মত লিখিয়া পাঠান। তখন রঘুনন্দন নবাব গোচরে সীতারামের বংশধরগণের জমিদারী চালাইতে অক্ষমতা ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়া নিজে সমস্ত জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। শেষে সীতারামের বংশধরগণের কোন কষ্ট না হয়, এরূপ যৎসামান্য কিছু সম্পত্তি দান করেন। শ্যামসুন্দর রায় মুরসিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মহম্মদপুরের নিকট শ্যামগঞ্জের বাটীতে বাস করিতেন।

সীতারামের গুরুদেব ভবনে গুরুকুল-পঞ্জীতে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এতৎসহ পরিশিষ্টে লিখিত হইল। সীতারাম সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবাদ আছে এবং বিশেষ অনুসন্ধানে যত দূর জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে সমস্তই বর্ণিত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীবরদাকান্ত দেব।

বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচন

শুক্ল যজুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের অনেক পরে প্রণীত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তও ইহাতে দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, সেই সময়কার সামাজিক-অবস্থা

সম্বন্ধেও ইহা হইতে অনেকটা জানা যায়, ইহার শত রুদ্রীয় নামক ষোড়শ-অধ্যায়ে অনেক ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন জাতি বিভাগের উল্লেখ নাই। আদিম অধিবাসী নিষাদদিগেরও ইহাতে উল্লেখ আছে। আমরা আরও দেখিতে পাই যে, পরবর্ত্তীকালে এই নিষাদেরাই ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভজাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সূক্তে রুদ্রদেব সমস্ত ব্যবসায়াদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপ পূজিত হইয়াছে।

পুরুষমেধ নামক ত্রিংশৎ অধ্যায়ে আমরা ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য কতকগুলি ব্যবসায় এবং আদিম অধিবাসীর নামোল্লেখ দেখিতে পাই। পৌরাণিক সময়ে তাহাদিগকেই কতকগুলি বিভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরুষ মেধের অর্থ নরমেধ যজ্ঞ। অশ্বমেধ যজ্ঞের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অশ্বমেধে যেরূপ অশ্ব বলিদানের বিধান, পুরুষমেধে সেইরূপ প্রকৃত পক্ষে বা অনুকল্পভাবে নরবলি দেওয়ার বিধান এবং বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে পুরুষ ও স্ত্রীলোক আনিয়া যুগকাষ্ঠে বাঁধিয়া রাখা হইত। ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত ব্যবসা ও আদিম অধিবাসীর নাম দেখিতে পাই—স্থপতি, স্তেন, স্তায়ুঃ, তস্কর, মুষ্ণঃ, কুলঞ্চ (বিভিন্ন প্রকারের চোর ডাকাইতের নাম), সারথি, তক্ষার (সূত্রধর) রথকার, কুলাল, কর্ম্মার নিষাদ। এই সমুদায় ব্যবসায়ীরা স্মৃতি এবং পুরাণাদিতে সঙ্কর বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আর্য্য সমাজে কি বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ অবৈধ-প্রণয় করিবার পূর্ব্বে কুলাল, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি ব্যবসা আদৌ ছিল না?

(আদিম অধিবাসী), পুঞ্জিষ্ঠেয় (আদিম অধিবাসী) শ্বনিন (অনার্য্য জাতি বিশেষ) মৃগায়ু (অনার্য্য জাতি বিশেষ) মাগধ (অনার্য্য জাতি বিশেষ) পুরাণে এই জাতি বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সূত (সূত্রধর) সূতও ঐরূপ সঙ্করবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত আছে, কোন স্থানে ক্ষত্রিয় পিতা ব্রাহ্মণ মাতা ও কোন স্থানে বৈশ্য পিতা ক্ষত্রিয় মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অযোগ (খনিতে কার্য্যকারী) পুংশ্চলু (পরদার অভিমর্ষকা) শৈলূষ) (নট) মণিকার, বপ (কৃষক), ইষুকার, ধনুষ্কার, ভিষক, (জাতি প্রথা প্রচলিত হওয়ার পরেও ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু এখন চিকিৎসক ব্যবসায়ীকে ব্রাহ্মণ পিতা বৈশ্য মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া বলা হইয়া থাকে) নক্ষত্র দর্শ। হস্তিপ, অশ্বপ, গোপাল, সুরাকার, গৃহপ (দ্বারবান) বিত্তধ, (খাজাঞ্চী) অনুক্ষত্তা (চাকর) দার্ব্বাহার (কাঠুরিয়া) অগ্নেধ (আলোওয়ালা) অভিষেক্তা (পাচক) পরিবেশন কর্ত্তা, পেশিত, (চিত্রকর) প্রকরিতা (খোদাইকর) উপসেক্তা (স্নানকারক) উপমন্থিতা (তৈল মর্দ্দনকারী) বাসপুল্পলী (রজক) রজয়িত্রী (রঙ্গদার) স্তেন হৃদয় (নরসুন্দর), ক্ষত্তা (সারথি) চর্ম্মম্ন (চর্ম্মকার) ধৈবর, কৈবর্ত্ত (ইহাদিকেও পুরাণে বর্ণ সঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।) কিরাত (অনার্য্য জাতি বিশেষ) পৌল্‌কস অনার্য্য জাতি বিশেষ) দুর্মদ,

ভিমল (অনার্য্য জাতি বিশেষ)। উপরের লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি অনার্য্য জাতি এবং কতকগুলি ব্যবসায়ের নাম মাত্র ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গায়ক, কবি, বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক, বোবা, অন্ধ, কালা, এবং অন্যান্য নানারকম লোকের নামোল্লেখও আছে। মগধ, নিষাদ, ভীমল, মৃগয়ু এবং শ্বানীন্ প্রভৃতিরা অনার্য্য জাতি। যজুর্ব্বেদের ঐ দুই অধ্যায়ে যে সমস্ত ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে আর্য্য জাতির ঐ সময়ে সভ্যতার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবগত হই। কিন্তু সঙ্কর জাতি বিভাগের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। আদিম চারি জাতির স্ত্রী পুরুষের মিশ্র-সংযোগে শঙ্কর জাতির উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের মধ্যে কর্ম্মকার, কুম্ভকার সূত্রধর, রত্নাকর প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোক ছিল না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত ও অন্যায়। বৈদিক সময়ে যে কেবল কোন জাতি বিভাগ ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু সে সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যবসাও ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ে যদিও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, তথাপি তখনও বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী আর্য্যেরা একই জাতি ছিলেন। আদিম অধিবাসীরা তখন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ছিলেন বটে, কিন্তু পৃথক জাতি বলিয়া পরিচিত হইতেন না। কিন্তু স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক সময়ে বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী আর্য্যদিগের সহিত তাহারাও স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। প্রাচীন সময়ে পৌরহিত্য ও যুদ্ধব্যবসায়িগণ অবশ্য বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন কিন্তু জাতি শব্দে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন ভারতে সেরূপ কোন জাতি প্রথা প্রচলিত ছিল না। অনেক ব্যবসায় বংশগত হইয়া উঠিলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে জানিত যে, তাহারা একই জাতি। তাহারা একত্র পানাহার করিত, পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হইত, একই ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইত। তাহারা একই জাতীয় ইতিহাস ও একই পূর্ব্ব পুরুষের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিত। আপনাদিগকে তাহারা আর্য্য নামে অভিহিত করিত। প্রাচীন ভারতে কেবল বৈশ্যদিগের এক নাম ছিল আর্য্য, অন্যান্য জাতিকেও আর্য্য বলা যাইত, দেশের কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা বাণিজ্য ইহাদেরই হস্তে ছিল। এখন ইহারা নীচ জাতি মধ্যে গণ্য হইয়েছে। ইহাদিগকে আর্য্য জাতির চতুর্থ শ্রেণী শূদ্রদিগের দলভুক্ত করা হইয়াছে। আবার শূদ্রগণকে আদিম অধিবাসীর দলভুক্ত করা হইয়াছে। সমস্ত বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে আবার জারজ বলিয়া গণ্য করা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম জাবাল ঋষির উপাখ্যানে দেখা যায় যে, জাতি ভেদ প্রথা রীতিমত প্রচলিত হওয়ার পরও এখনকার মত সে সম্বন্ধে তত বাঁধা বাধি ছিল না।

জবলাপুত্র সত্যকাম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে "আমি কোন্ গোত্র? আমি ব্রহ্মচারী হইব"। মাতা বলিলেন যে, তোমার গোত্র আমি জানি না। যৌবন কালে আমি যখন বিভিন্ন লোকের দাস্যবৃত্তি করিতাম, তুমি সেই সময়ে হইয়াছিলে।

আমি তোমার গোত্র জানি না। আমার নাম জবলা, তোমার নাম সত্যকাম জাবাল।" পরে সত্যকাম গৌতম ঋষির নিকট যাইয়া ব্রহ্মচারী হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। ঋষি তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মায়ের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন তাহাই বলিলেন। তখন ঋষি বলিলেন যে "যথার্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত এরূপ সত্য কথা আর কেহই বলিতে পারে না। তুমি সমিধ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস, আমি তোমাকে দীক্ষিত করিব। তুমি সত্য ভ্রষ্ট হও নাই।"

এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, সত্যই ব্রাহ্মণত্ব লাভের একমাত্র উপায় ছিল। সত্যকামের জাতি কিম্বা বংশের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হয় নাই। বালক সত্য কথা বলিল; অমনি তাহাকে ব্রহ্মচারী করিয়া লওয়া হইল। পরে তিনি একজন মহর্ষি হইয়াছিলেন। অজ্ঞাত কুলশীল দাসী পুত্রও যখন ঋষি হইতে পারিয়াছিলেন, তখন প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে যে, পরবর্ত্তী কালের পুরোহিতগণ, সব জ্ঞান একচাটিয়া করিয়া লইয়া, সমস্ত জাতিকে অজ্ঞানান্ধকারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন? কোন উদ্দেশ্য কোন বিষয় একচাটিয়া করিয়া লইলে সে উদ্দেশ্য কখনও সফল হয় না পরিণামে সমস্তই নষ্ট হয়। পুরোহিতগণও এবিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ব্রাহ্মণেরা এখন আর তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের গুণে গুণবান নহেন এবং শূদ্রের বাড়ীতেও সামান্য চাকরের কার্য্য করিতেছেন। ভারতীয় সিভিলিয়ানদিগের কার্য্য যদি বংশগত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানে যে সমস্ত উপযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ কার্য্যকারক আছেন, তাঁহাদের বংশধরগণ অচিরে ঐ কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এবং এই অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণই এই সম্প্রদায়কে অবিলম্বে অতি হীন অবস্থায় উপনীত করিবেন। তাঁহাদিগকে আর কেহ সেরূপ মান্য করিবে না। তাহারা আপনাদিগকে এবং সমস্ত দেশকে সত্বরই ধ্বংশ করিয়া ফেলিবে। অবশ্য ব্রাহ্মণ নামেরও গৌরবের উপযুক্ত অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা হীন জাতি অপেক্ষাও হীনাবস্থাপন্নও শত শত ব্রাহ্মণ বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণও কৌশিতকি ব্রাহ্মণের কবস ঋষির উপাখ্যানে দেখা যায় যে, তিনি শূদ্রবংশজাত হইয়াও ঋষি হইয়াছিলেন। ইহাতে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, ভারতে জাতি প্রথা প্রচলিত হওয়ার পরও প্রাচীন কালে বর্ণ ভেদ প্রথার নিয়মাবলীর তত বাঁধা বাঁধি ছিল না। সে সময়ে অশ্বপতি রাজা, প্রবাহন জাবালি রাজা এবং জনক রাজাও আরও কতকগুলি ক্ষত্রিয় ব্রহ্মবিদ্যার পারদর্শী ছিলেন। অনেক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ঋষিও তাঁহাদের শিষ্য হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই সমস্ত উপাখ্যান আছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা দেখিতে পাই যে, জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে অনেক নূতন বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি

রাজর্ষিকে বর প্রদান করিতে চাহিলে রাজর্ষি বলিয়াছিলেন যে, যথেচ্ছ বিষয় আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করার অনুমতি আমাকে দিন। অতঃপর রাজর্ষি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

১০। ১। ৬। ২। ১ শতপথ ব্রাহ্মণ।

বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে মনুসংহিতাই প্রধান পুস্তক। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহা একখানি আধুনিক পুস্তক। পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। মনুসংহিতাই ভারতের প্রাচীনতম ব্যবহার শাস্ত্র নহে, আপস্তম্ভ, বৌদ্ধায়ন অশ্বালায়ন প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্র অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় শতাব্দীর ২০০ হইতে ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। পদ্য মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক। মনুসংহিতা অনুষ্টুপচ্ছন্দে রচিত। কিন্তু সূত্রশাস্ত্র রচনাকালে অনুষ্টুপছন্দ বিস্তৃত গ্রন্থ রচনাকালে ব্যবহৃত হইত না। এই পদ্যময় স্মৃতিগুলি প্রাচীন সূত্রশাস্ত্রের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আধুনিক সংস্করণ মাত্র। মনুসংহিতা কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত মৈত্রায়ণ শাখার উপবিভাগ, মানব সূত্রচারণের ধর্ম্ম সূত্র হইতে পদ্যে রচিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমানে মনুসংহিতা বলিয়া যে গ্রন্থ দেখিতে পাই তাহা ভৃগুর রচিত, কিন্তু তাহা মনুর রচিত বলিয়া উহাতে উল্লিখিত আছে। মনু বলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরুদেশ ও পদতল হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছেন। (১-৩১) এইটী তিনি পুরুষসূক্তাবলম্বনে লিখিয়াছেন।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, উহাতে জাতি প্রথা সৃষ্টির মূল কারণ কিছু পাওয়া যায় না, তবে সমাজে কোন্ জাতির কিরূপ অবস্থা ছিল তাহাই উল্লিখিত আছে। তিনি পরে বলেন যে, ব্রহ্মা আপনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অর্দ্ধেকে পুরুষ, অপরার্দ্ধে স্ত্রী হইলেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে বিরাজের উৎপত্তি হয় এবং বিরাজ হইতে মনুর উৎপত্তির হয়। তিনি দশ জন ঋষির সৃষ্টি করিয়াছিলেন যথা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ। এই দশ জন ঋষি দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সর্প, সুপর্ণ, কিন্নর এবং মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যদি ব্রহ্মাই চারি জাতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করার কি দরকার হইয়াছিল? শাস্ত্র সমূহে জাতি সৃষ্টির বিবরণ সম্বন্ধে নানাবিধ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। শত পথ ব্রাহ্মণে (২—১—৪) আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ দেখিতে পাই, প্রজাপতি "ভূঃ" এই কথা বলিয়া পৃথিবী, "ভুবঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণে বায়ু, "স্বঃ" উচ্চারণে আকাশ, 'ভূঃ উচ্চারণে ব্রাহ্মণ, ভুবঃ উচ্চারণে ক্ষত্রিয় এবং "স্বঃ" উচ্চারণে বিশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্য, যজুর্বেদ হইতে ক্ষত্রিয় এবং সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছেন (৩-১২-৯)। ইহার অন্যত্র (১-২, ৬, ৭) দেবতা হইতে ব্রাহ্মণ এবং অসুর হইতে শূদ্রের জন্ম হইয়াছে এরূপ বর্ণনাও আছে।

মুদ্রধৃত হরিবংশে দেখা যায় যে, বিষ্ণু দক্ষ প্রজাপতিরূপে এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি অক্ষর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষর হইতে ক্ষত্রিয়, বিকার হইতে বৈশ্য এবং ধূম-বিকার হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঋক্, সাম, যজুর ও অথর্ব্ব বেদের প্রধান ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মা তাহার মুখ ও বাহু হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও ব্রহ্মার শরীরের অপরাপর অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে ভৃগুমুনি বলিয়াছেন যে, তখন কোন জাতি বিভাগ ছিল না। একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। তাহা হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। আবার ঐ শান্তি পর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ চারি জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ মুখ হইতে একশত ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে এক শত ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে একশত বৈশ্য এবং পদতল হইতে একশত শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, শ্রীমৎ-ভগবদ্গীতায় ভগবান্ গুণ ও কর্ম্মানুসারে সমস্ত লোককে চারি জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন।

বায়ু পুরাণের অষ্টমাধ্যায়ে দেখা যায় যে, সে সময়ে কোন জাতি বিভাগ ছিল না। কেহ কাহাকেও ভালবাসা বা ঘৃণার চক্ষে দেখিত না। কৃত যুগে সব লোকের আয়ু ও আকৃতি একইরূপ ছিল। উচ্চ ও-নীচ ভেদ ছিল না।

এস্থলে একজন প্রাচীন গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিতেছেন যে, জাতি-ভেদ-প্রথা বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি করে। তবে যাঁহারা বলেন যে, উহাতে সদ্ভাবের উৎপত্তি হয়, তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতা অবশ্য স্বতন্ত্র ধরণের বলিতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণে (১—৬) জাতি ভেদ প্রথা সৃষ্টির এইরূপ বিবরণ আছে :—ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিলে সত্ত্বগুণাবলম্বী প্রাণিগণ তাঁহার মুখ হইতে, রজ প্রধান প্রাণিগণ তাঁহার বক্ষস্থল হইতে, তম এবং রজ উভয় প্রধান প্রাণিগণ তাঁহার উরুদেশ হইতে এবং অন্যান্য প্রাণিগণ তাঁহার পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ভাগবৎ পুরাণও দ্বিতীয়-ভাগে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে চারি জাতির উৎপত্তির বিবরণ দিয়া, দশম-ভাগে বলেন যে, প্রথমে এক বেদ, এক নারায়ণ দেবতা, এক অগ্নি এবং এক জাতি ছিল। ত্রেতা যুগের প্রারম্ভে পুরুরবা হইতে তিন বেদের সৃষ্টি হয়।

ভাগবৎ পুরাণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কতকগুলি গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং যাহার যেরূপ গুণ দৃষ্ট হয়, তাহার তদনুরূপ হইবে। মহাভারতে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র সংবাদে চীনবাসী, কিরাত, দ্রাবিড়বাসী এবং অন্যান্য জাতিকে বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনী হইতে উৎপন্ন হওয়ার কথা লিখিত আছে।

জাতি প্রথা সৃষ্টির বিবরণ অন্যান্য গ্রন্থ হইতে আর দেওয়া অনাবশ্যক। যাহা দেওয়া হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা

যাইতেছে যে, কোনটীর সহিত অন্য কোন-টীর আদৌ সামঞ্জস্য নাই। বরঞ্চ অনেক অনৈক্য আছে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে, নানা মুনির নানা মত।

মনুর লিখিত সঙ্কর জাতির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

পিতা	মাতা	জাতি
ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	অম্বষ্ঠ।
ঐ	শূদ্র	নিষাদ বা পারশব।
ক্ষত্রিয়	ঐ	উগ্র।
ঐ	ব্রাহ্মণ	সূত।
বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	মাগধ।
ঐ	ব্রাহ্মণ	বৈদেহ।
শূদ্র	বৈশ্য	অযোগব।
ঐ	ক্ষত্রিয়	ক্ষেত্রি।
ঐ	ব্রাহ্মণ	চণ্ডাল।
ব্রাহ্মণ	উগ্র	আবৃত।
ঐ	অম্বষ্ঠ	আভির।
ঐ	অযোগব	ধীগ্বান।
নিষাদ	শূদ্র	পুক্কস।
শূদ্র	নিষাদ	কুকুটক।
ক্ষত্রি	উগ্র	শ্বাপক।
বৈদেহিক	অম্বষ্ঠ	বেণ।
পিতা	মাতা	জাতি।
দস্যু	অযোগব	সৈরিন্ধ্র।
বৈদেহ	ঐ	মৈত্রায়ক।
নিষাদ	ঐ	মার্গব, দাস বা কৈবর্ত্ত।
ঐ	বিদেহিক	করবর।
বৈদেহিকা	করবর	অন্ধ্র।
ঐ	নিষাদ	মেদ।
চণ্ডাল	বৈদেক	বেণুসপক।
ঐ	নিষাদ	অন্ত্য বৈশ্যায়িন।

সংস্কার সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রথম তিন জাতি ব্রাত্য হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাত্য হইতে ভূর্জ্জকণ্টক, অবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ এবং শৈখ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ব্রাত্য হইতে ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছিভী, নট, করণ, খাশ এবং দ্রাবিড় জাতি হইয়াছে। এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে শুধন্বান, আচার্য্য, কুরুশ, বিজানমান মৈত্র জাতি হইয়াছে।

নীচ ক্ষত্রিয় জাতি—পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, পারদ, পহ্লব চীন, কিরাত দরদ। মনু বলেন, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে জাত জাতি-দিগের মধ্যে যে সমস্ত জাতিকে গণ্য করা হয় নাই, তাহারা ম্লেচ্ছভাষীই হউক, কি আর্য্যভাষীই হউক, দস্যু নামে পরিচিত।

মনুতে ইহার কোন কোন জাতির ব্যব-সায়েরউল্লেখও আছে। সূতগণের প্রতি গাড়ী ঘোড়ার তত্ত্বাবধারণের ভার থাকিত। অম্বষ্ঠের প্রতি চিকিৎসা রভার থাকিত। বৈদেহিকগণ স্ত্রীলোকের পরিচর্য্যা করিত। মাগধেরা ব্যবসায়ী ছিলেন। নিষাদেরা মৎস্য ধরিত। অযোগবেরা সূত্রধরের কার্য্য করিত। মেদ, কুঞ্চু, অন্ধ্র, মদ্গুগণ বন্য-জন্তু ধরিত। ক্ষত্রী, উগ্র, পুক্কশগণ গর্ত্তস্থ জন্তু ধরিত। ধীগ্বানেরা চর্ম্ম ব্যব-সায়ী ছিল, বিন্‌রা ঢাক বাজাইত। চণ্ডাল ও শ্বাপকদের ধনসম্পত্তি স্বরূপ কুকুর ও গর্দ্দভ ছিল। ব্রাহ্মণেরা অন্যের যজ্ঞাদি করিবে এবং দান গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়

অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বৈশ্য বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, গোপালন দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবে। শূদ্র অপর তিন জাতির দাসত্ব করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সেবা করাই শূদ্রের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে কোন ফল পাইবে না।

উপরোক্ত তালিকার মধ্যে কিন্তু আমরা বৈদ্য ও কায়স্থের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। নবশাখের ও কোন উল্লেখ নাই। আদিম বৈশ্যদিগের ব্যবসা ইহারাই চালাইত। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গবাসী বৈদ্যগণ বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হইয়াও মনুর উদ্দেশ্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। অম্বষ্ঠ একটী স্থানের নাম ছিল এবং ইহার অধিবাসীদিগকে অম্বষ্ঠ বলা হইত। বর্ত্তমান লাহোর জেলাকেই প্রাচীনকালে অম্বষ্ঠ দেশ বলিত। সম্ভবতঃ অম্বষ্ঠেরা চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত ছিল বলিয়া মনু চিকিৎসাই তাহাদের ব্যবসা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কলিকাতার চীনবাসীরা উৎকৃষ্ট সূত্রধর। যদি এখনকার কোন মনু তাহাদের সামাজিক অবস্থা নির্ণয় করিতে যান, তবে তিনি তাহাদিগকে অন্য জাতি হইতে উৎপন্ন এবং সূত্রধর বলিয়া পরিচয় দিলেও দিতে পারেন। বঙ্গদেশের বৈদ্য সম্প্রদায় যে আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও শোচনীয়। আর যদি তাঁহারা অম্বষ্ঠই হন, তবে তাঁহারা মনুর উল্লিখিত সঙ্কর জাতির অন্তর্ভুক্তই বা কেন হইতে যান?

নিষাদ জাতি ভারতের আদিম অধিবাসী ছিল। মৎস্য ও মৃগাদি শিকার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। মনু তাহাদিগকে সঙ্কর জাতির তালিকা ভুক্ত করিয়াছেন। নিষধ নামে একটী দেশ ও একটী জাতিও ছিল। নৈষধ চরিতের নলই তাহার রাজা ছিলেন। নিষাদ আর নিষধ একই জাতি কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ঐ দুইটী একই জাতির বিভিন্ন নাম বলিয়া বোধ হয়। সঙ্গীত শাস্ত্রের সপ্তম স্বরকে নিষাদ এবং নিষধ এই দুই নামই দেওয়া হইয়া থাকে।

উগ্র—বঙ্গদেশের আগুরীরা এই উগ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। কেরল অর্থাৎ আধুনিক মালাবার দেশের নাম উগ্র। মনু বলেন যে, উগ্রেরা উগ্রস্বভাবান্বিত ও নির্দ্দয়। যে দেশের লোকেরা উগ্র স্বভাববিশিষ্ট, তাহাদিগকে আর্য্যেরা এই উগ্র নাম দিয়া থাকিতে পারেন। গহ্বরস্থ জন্তুদিগকে বধ করাই ইহাদিগের ব্যবসায় ছিল, কিন্তু আগুরিদের অবশ্য সেইরূপ কোন ব্যবসায় নাই।

সুত—জাতি হয়ত গাড়ী চালাইতে সুদক্ষ থাকায়, জাতি বিভাগে ঐরূপ আখ্যা পাইয়াছে। ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না, যে এই সমস্ত ব্যবসায় কখনই মিশ্র বিবাহের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। কোন ক্ষত্রিয় কোন ব্রাহ্মণীর সহিত মিলিত হওয়ার পূর্ব্বে আর্য্যদিগের রথচালক কেহই ছিল না এরূপ অনুমান করা কি মূর্খতা নয়?

বৈদেহ—জাতির ব্যবসায় স্ত্রীলোকের পরিচর্য্যা করা। বিদেহ নামে একটী দেশ ছিল। নেপালের জনকপুরী ও ইহার রাজধানী মিথিলা একই নগর। প্রাচীন কালে আধুনিক ত্রিহুত ও নেপালের কতকাংশ লইয়া বিদেহ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। জনক ইহার রাজা ছিলেন। ইহাদিগকে এইরূপ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যেন, কোন বৈশ্য কোন ব্রাহ্মণীর সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে, ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকদিগের পরিচর্য্যা করার কোন লোকই ছিল না।

অযোগব—যজুর্ব্বেদে অযোগের উল্লেখ আছে। তাহারা খনিতে লৌহখননকারী অনার্য্য জাতি বিশেষ ছিল। কিন্তু মনুর অযোগবেরা সূত্রধর। বস্ত্রবয়নব্যবসায়ী আধুনিক যোগীদের সহিত ইহাদের তুলনা করা হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রী—আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ হয় যে, রাজপুতেরা যখন প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের সিংহাসনে অধিরোহণ করে, তখন গোঁড়া হিন্দু ধর্ম্ম হইতে পৃথক ভাবে থাকায়, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের বিরাগ-ভাজন হওয়ায়, তাহাদিগকে সমাজে নীচ অবস্থাপন্ন করিয়া সেইরূপ একটী নামও দিয়াছিলেন। পঞ্জাবে বহুতর ক্ষেত্রী আছে। বীরবর শিখজাতিদিগের গুরুকুলও ক্ষেত্রী। গুরুনানকও তৎপরবর্ত্তী অন্যতম নয় জন গুরু এবং তাহাদের বংশধরগণ, শিখদিগের বংশগত গুরু পঞ্জাবের বেদিও শোধিগণ, যদিও সাধারণতঃ ক্ষেত্রী বলিয়া পরিচিত, তাহা হইলেও তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, আবু পর্ব্বতের উপর বশিষ্ঠ ঋষি একটী যজ্ঞ করিয়া চারিটী বীর পুরুষের সৃষ্টি করেন, তাহা হইতে পরিহর, প্রমার, চালুক্য ও চোহার এই চারি জাতির উৎপত্তি হয়, পরে তাহাদিগের হইতে আর ৩৬টী রাজপুত জাতির উদ্ভূত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে রাজপুতগণ সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেয়। কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাজপুতদিগের কোন উল্লেখ নাই। ক্ষেত্রিগণ কেবল ব্যবসায়ী নহে। শিখদিগের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ক্ষেত্রী বংশীয় হরিসিংহ নলুয়া অপেক্ষা পঞ্জাবী সিংহদিগের মধ্যে অধিকতর সাহসী সেনাপতি আর কেহই ছিলেন না। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ এবং তাঁহার পুত্রগণ সকলেই সাহসী সৈনিক পুরুষ ছিলেন।

চণ্ডাল—অনার্য্য জাতি বিশেষ। বর্ত্তমানে তাহারা নমশূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। ১৮৯১ সালের আদমসুমারী বিবরণীতে তাহাদের সংখ্যা ১, ৭৬১, ৩৬৫ ছিল এবং তাহারা যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং ঢাকা এই কয় জেলাতেই তাহাদের অধিকাংশ বাস করে। তাহারা কঠিন পরিশ্রমকারী। এ প্রদেশে অধিকাংশ জমি তাহারাই চাষ করে। মনু বলেন শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি।

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার Ancient India নামক গ্রন্থে এই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"চণ্ডালদিগের পরস্পরের মধ্যে এরূপ একটী শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য আছে যে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাহারা একটী স্বতন্ত্র জাতি।

এই জাতি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে ? মনু বলেন, শূদ্রের ঔরষে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে তাহাদের জন্ম। প্রাচীনকালে দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গে কোন সময়েও ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশী ছিল না; এবং বর্ত্তমান সময়েও উপরোক্ত পাঁচ জেলাতে ২৫ লক্ষ ব্রাহ্মণও হইবে না ; এরূপ অবস্থায় ঐ সব জেলাতে এক নিযুত চণ্ডাল কিরূপে জন্মিল ? মনুর মতে এই প্রশ্নের কি সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে? আমরা কি অনুমান করিব যে সুন্দরী ব্রাহ্মণীগণ অনবরত কৃষ্ণকায় শূদ্র কৃষকের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছেন ? আমরা কি অনুমান করিব যে স্ফূর্ত্তিবান শূদ্রেরা একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে, সহস্র সহস্র সুন্দরী অথচ দুর্ব্বলচিত্ত ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুপথে আনয়ন করিয়াছে ? অথবা আমরা কি ইহাই অনুমান করিব যে, রাজানুগৃহীত ও পৌরহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ সন্তান অপেক্ষা এই চণ্ডাল দিগের বংশধরগণ মৎস্যবহুল জলাভূমি ও গণ্ডগ্রামে, নানারূপ দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও সংখ্যায় বেশী হইয়া পড়িয়াছিল ? ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই অনুমান গুলিও যেরূপ অসম্ভব, মনুর প্রচারিত সঙ্কর জাতির বিবরণও সেইরূপ অস্বাভাবিক। সাধারণ বুদ্ধিতেই সহজে বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশের চণ্ডালেরাই পূর্ব্ববঙ্গের আদিম অধিবাসী ছিল। ইহারা অসংখ্য নদী নালাতে মৎস্য ধরিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। পরে আর্য্যজাতি আসিয়া যখন বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন তখন তাহারা স্বভাবতঃ হিন্দুদিগের ভাষা, ধর্ম্ম এবং সভ্যতা অবলম্বন করিয়াছিল।

আমরা পুরাণে দেখিতে পাই যে, দেবী চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুইটী অসুর সেনাপতিকে বধ করিয়াছিলেন, তাহারা হয়ত এই চণ্ডাল ও ছোট নাগপুরের মুণ্ডাদিগের দলপতি ছিল।

হিন্দুদিগের মধ্যে চণ্ডাল এই শব্দটী বড়ই ঘৃণাব্যঞ্জক হইয়া পড়িয়াছে। এই কঠিন পরিশ্রমী অনার্য্য জাতি চণ্ডাল এই ঘৃণিত আখ্যায় অভিহিত হইতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া ছিল। ১৮৯১ সালের আদম সুমারীর সময় এসম্বন্ধে তাহারা সরকার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল যে, পূর্ব্বাপর তাহারা নমশূদ্র নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে সুতরাং তাহাদিগকে চণ্ডাল বলিয়া না লিখিয়া নমশূদ্র বলিয়া লেখা হয়। হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় তাহাদিগকে এসম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুর হইতে তাহাদের দলপতিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিল। চণ্ডাল দিগের শরীর খুব বলিষ্ট। তাহাদের সংখ্যা ১৭ লক্ষাপেক্ষাও অধিক। তাহারা কষ্ট-সহিষ্ণু এবং কঠিন পরিশ্রমী। তাহারা কোনরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে না। তাহাদিগকে নানারূপে উৎপীড়ন করা ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ তাহাদিগের বিষয় আর কখন কোনরূপ চিন্তাও করেন নাই। এক সময়ে তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া অন্যান্য জাতির সব রকম কাজ করা বন্ধ

করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। তখন উচ্চ শ্রেণীদের নরম হইতে হইয়াছিল। তাহাদিগকে উচ্চশ্রেণীরা আর কখন চণ্ডাল বলিবেন না এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলে সে ধর্ম্মঘট উঠিয়া গিয়াছিল।

মনু সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যকে হেয় করিয়া রাখিয়াছেন। চিকিৎসক, গায়ক, ধনুষ্কার, ইণ্ডকার, অট্টালিকানির্ম্মাতা, সংবাদ-বাহক, সূত্রধর, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, রজক, তৈলকার, ইত্যাদি সকলেই অপবিত্র ও হীনজাতি (৩-৪ অধ্যায়)। তিনি কৃষি-কার্য্যকেও ঘৃণিত বলিয়াছেন, কারণ লাঙ্গল ফলকে পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ জীবকে কষ্ট দেয়। (১০-৮৪), অতএব পৌরাণিক সময়ে হিন্দু জাতি যে কোন বিষয়ে কোনরূপ উন্নতি করিতে পারে নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সমস্ত পৃথিবীও যখন অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছাদিত ছিল, ভারত তখন সুসভ্য ছিল। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সেই ভারত এখন সমস্ত দেশ অপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন। দৈনিক ব্যবহারোপযোগী জিনিষের জন্যও তিনি এখন বিদেশীয় জাতির মুখাপেক্ষী। কোটী কোটী সন্তান থাকিতেও ভারতমাতা স্বাধীনতারত্ন হারাইয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। ভারতের অগ্য পুরোহিতগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল; তাঁহারা ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষি-কার্য্যকে ঘৃণিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আপনাদিগকে বড় দেখাইবার জন্য সমস্ত জাতিকে হীনাবস্থাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সমস্ত জাতির সমানভাবে অধঃপতন হইয়াছিল।

যদি সমস্ত দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, তবে রাজধানীতে কি করে? সমস্ত জাতি যদি মূর্খ থাকে, তবে তোমার নিজের বিদ্যা বুদ্ধিতে কি ফলোদয় হয়? সমস্ত জাতিকে অনবরত অবনত করিয়া রাখায় শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, যে বিপদের আশঙ্কা আছে, তৎসম্বন্ধে গোঁড়া হিন্দুদিগের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সমস্ত ব্যবসায়কে ঘৃণিত ও বংশগত করিয়া রাখা হইয়াছে। যে ব্যক্তি জাতিতে পরামাণিক কিংবা রজক নহে, সে কখনই ঐ ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিবে না। যদি এই সমস্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য জাতি, যাহাদিগের কার্য্য ব্যতীত আমাদিগের এক দিনও চলিতে পারে না, যদি তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া আমাদিগের কার্য্য করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তজ্জন্য কেহই তাহাদিগকে দোষী বলিতে পারেন না। এবং যদি তাহাদের বুদ্ধি থাকিত, তবে অনেক পূর্ব্বে তাহাদিগের অবনতকারীদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিত। দেশের আইন লঙ্ঘন না করিয়া, যাহার যেরূপ ইচ্ছা, সে সেইরূপ কার্য্য স্বাধীনভাবে করিতে পারে। সুতরাং সেরূপ একটী বিভ্রাট হওয়া এখন অসম্ভব নয়। এখনই নীচ জাতি অনেকটা উচ্চ জাতির বিদ্রোহী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা যদি আমরা ঠিক পর্য্যালোচনা করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় যে, যদি এখন হইতে নিম্নশ্রেণীর

জাতিদিগের প্রতি আমরা অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার না করি, তবে খুব ভয়ানক একটী সামাজিক বিদ্রোহে হিন্দু সমাজকে অচিরে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। এক জনে বংশপরম্পরা বাধ্য হইয়া, কষ্টস্বীকার করিয়া তোমাদের পাইখানা পরিষ্কার করিবে, আর তোমরা তাহার এই কার্য্যের জন্য তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিবে, এ বন্দোবস্ত অবশ্য অতি সুন্দর। আমদের দেশের অনেক জাতির প্রতি আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, তদপেক্ষা বিড়াল কুকুরের প্রতিও আমরা ভাল ব্যবহার করি। এবং এই সমস্ত লোক ইহাদের পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেছে, এই বলিয়া আমাদের বিবেককে সহজেই প্রবোধ দিয়া থাকি। তবে রাজনৈতিক সত্ত্বাধিকারের জন্যই বা এত আন্দোলন কেন? চুপ করিয়া বসিয়া থাক, এবং পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ী ফল সব ভোগ কর।

এইরূপে আর কতকগুলি অনার্য্য জাতি যে যে প্রদেশে বাস করিত, সেই দেশের নাম অনুসারে তাহাদের নাম হইয়াছে। আভিরা দেশের লোককে আভির, উত্তর বঙ্গের আদিম অধিবাসীদিগকে পুণ্ড্রক, উড়িষ্যা দেশবাসীকে উদ্র, দক্ষিণ ভারতের লোককে দ্রাবিড়, কাবুলবাসীকে কাম্বোজ, ব্যাকট্রীয়ান গ্রীকদিগকে যবন, চিউরেনিয়াবাসীকে শাক, পারস্যবাসীকে প্লভ, চীনবাসীকে চীন, আদিম পার্ব্বত্য জাতিকে কিরাত, উত্তর ভারতীয় পর্ব্বতবাসীকে খস জাতি বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের নিকটস্থ বর্ত্তমান দার্দিস্থানবাসীকে দারদ, পশ্চিম মালববাসীকে অবস্থা, দক্ষিণ নেপালবাসীকে লিচ্ছিভি এবং নেপালবাসীকে মাল্ল হইত। বর্ত্তমান তেলাঙ্গনাই প্রাচীন অন্ধ্রদেশ। অন্ধ্রগণ এ দেশবাসী ছিলেন। গোদাবরী নদীর প্রান্তস্থ ভূমি সকল তাহাদের দখল ছিল।

কৈবর্ত্ত—একটী স্বতন্ত্র জাতি ছিল।

উহারা সঙ্কর জাতি নহে। যজুর্বেদে কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশের কৈবর্ত্তগণের সংখ্যা দুই নিযুত অর্থাৎ বঙ্গের হিন্দুদিগের অষ্টমাংশেরও অধিক হইবে। মেদিনীপুর, হুগলী এবং হাবড়ায় তাহাদের অধিকাংশের বাস। এই জাতি সম্বন্ধে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন যে, "মনুর মতে একই আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং বঙ্গের একই নির্দ্দিষ্ট অংশের অধিবাসী এই অসংখ্য লোক, সহস্র সহস্র অযোগব স্ত্রীলোক স্বীয় স্বীয় স্বামী পরিত্যাগ করিয়া নিষাদ পুরুষের সহিত মিলিত হওয়ায় যে সব সন্ততি হয়, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ কথা কি কোন বিজ্ঞ পাঠক বিশ্বাস করিবেন? অযোগব স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নিষাদদিগের এই অস্বাভাবিক অত্যাচারের তুলনায়, সাবাইন স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের বিষয় অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এসম্বন্ধে আদৌ কোন কিম্বদন্তীও দেখিতে পাই না। আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে এই কঠিন পরিশ্রমী কৈবর্ত্তগণ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী ছিল। পরে বিজেতা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, ভাষা এবং সভ্যতা তাহারা অবলম্বন

করিয়াছিল। পূর্ব্বে তাহারা মৎস্যশিকার ও মৃগয়া দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত, পরে তাহারা আর্য্যদিগের নিকট কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল।”

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মনুর প্রদত্ত জাতির তালিকা ভিন্ন ভিন্ন বংশের তালিকা মাত্র। যে সমস্ত অনার্য্য জাতি আর্য্যদিগের অধীনে আসিয়া ছিল, তাহাদিগকে তাহাদের সেই সময়ের সামাজিক অবস্থানুসারে, সমাজে বিভিন্ন স্থান প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু মনুর মতে মানব সমাজ চারি জাতিতে বিভক্ত ছিল বলিয়া, এই সমস্ত জাতিকে এ চারি জাতির পরস্পর অথবা সম্মিলনে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। চীন বাসীদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা জানি যে, তাহারা একটী সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মনু যে সমস্ত জাতির বিষয় জানিতেন, তাহাদের উৎপত্তির বিবরণ দিবার উদ্দেশ্যেই, তাঁহার এই বর্ণ সঙ্করের প্রস্তাবনা।

মনুর তালিকায় আমরা বঙ্গের এবং অন্যান্য দেশের বর্ত্তমান জাতিদিগের নাম দেখিতে পাই না। বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ এবং অন্যান্য অনেক ব্যবসায়ী জাতিরও কোন উল্লেখ আমরা পাই না। মনুর সময়ে যে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার কি তন্তুবায় ছিল না এরূপ অনুমান করা অসম্ভব। এই সব ব্যবসায়ী লোক তখনও ছিল কিন্তু তখন তাহারা স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিল না। তখন তাহারা কেবল বৈশ্যদিগের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মাত্র ছিল কিন্তু পৃথক জাতি ছিল না। মনুর তালিকায় যে সব জাতির উল্লেখ নাই, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা কি এই অনুমান করিব যে, তখন তাহারা ছিল না পরে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর অথবা সম্মিলনে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে? মনুর সময়ে তাহা হইলে এই সব ব্যবসায় কে করিত? ব্রাহ্মণদিগের মতে সর্ব্বপ্রথমে কেবল মাত্র চারিটী জাতি ছিল কিন্তু বিভিন্ন অনার্য্য জাতিকে আর্য্য সমাজভুক্ত করায় এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করায় প্রকৃত পক্ষে সমাজে অনেক জাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। এই দুই বিষয়ের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্তই বর্ণ সঙ্কর-প্রস্তাবনার অবতারণা করা হইয়াছে। গোঁড়া হিন্দুদিগের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী মাত্র জাতি প্রথমে ছিল। আর কোন পঞ্চম জাতির অস্তিত্ব ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বর্ণসঙ্করের প্রস্তাবনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত

হিন্দু-পত্রিকা

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ। ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(তৃতীয় পটল)

(নবম খণ্ড)

অতঃপর গর্ভাধান ব্যাপারের স্থূলতঃ নিয়মাদি উল্লিখিত হইতেছে।

১। চতুর্থী প্রভৃত্যাষোড়শীং উত্তরামুত্তরাং যুগ্মাং প্রজানিঃশ্রেয়সং ঋতুগমন ইত্যুপদিশন্তি।

এই সূত্রে বেদশাস্ত্রপারগ মহামুনি আপস্তম্ব, মহর্ষি মন্বাদিপ্রাচীনআচার্য্যমণ্ডলীর গর্ভাধান বিষয়ক অভিমত ইঙ্গিতে প্রকাশ, ও ভঙ্গ্যন্তরে উহাই আপন মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন।

"রজঃ প্রাদুর্ভাবের চতুর্থ রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত পর পর যুগ্ম-রাত্রিতে ঋতুগমন নিষ্পন্ন হইলে তাহাতে সন্তানের আয়ুর্বৃদ্ধি ও সৌভাগ্যাতিশয় হয়, পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

প্রথম রজস্বলা হওয়া, স্ত্রীজাতির যৌবনোদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় না হইলেও, আর্যশাস্ত্রকারগণ নানাবিধ মঙ্গলময় উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া, প্রথম-রজস্বলাকে সঙ্গমার্থে আহ্বান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ভারতীয় আর্য্য মনীষী মহাশয়েরা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির যন্ত্ররূপে নারীজাতির ব্যবহার বা বিলাসবাসনার উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে ভাসিবার প্রধান সাধন অথবা উপকরণ ভাবিয়া রমণী গ্রহণের বিধান করেন নাই।

ভারতবর্ষের পুণ্যপুঞ্জস্বরূপ পবিত্রমূর্ত্তি মহাত্মাদের প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট ছিল। শয়নে, স্বপনে, বিচরণে, ভোজনে সততই তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের পরিপুষ্টি লাভের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, জগতে সকল পদার্থেরই ন্যায্য ব্যবহার আছে, সকল বস্তুই সময়ে আমাদের জীবাত্মার উৎকর্ষ সাধনে ন্যায়ত প্রযুক্ত হইলে সহায়তা করিতে পারে। যাহাকে আমরা পরম পবিত্র পূজার উপচার বোধে যত্ন করি, প্রয়োগ বিশেষে তাহাই আমা-

দিগকে কলুষিত করিতে পারে। আবার যাহাকে কুৎসিত কার্য্যের কদর্য্য উপকরণ মনে করিয়া ঘৃণা করি, তাহাই সময়ে পবিত্রতার আধার স্বরূপে আমাদিগের সৌন্দর্য্য পিপাসু প্রাণের কাছে উপস্থিত হয়। হলাহল ও প্রাণ বাঁচায়, সুধার জন্যও সময়বিশেষে মরণকে আলিঙ্গন করিতে হয়। জগতে প্রত্যেক বস্তুরই দুইটী পৃষ্ঠ আছে। কোনও কিছু একান্ত মন্দ বা একান্ত ভাল হইতে পারে না। বিধাতার পবিত্র অভিপ্রায় সর্ব্বত্রই বিরাজিত। আর্য্য মহাত্মাগণ এই মহারহস্য বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা গোপনীয় কার্য্যের দ্বারাও মহামহিম পরমেশ্বরের মঙ্গলময় অভিসন্ধির জয় ঘোষণা করিতেন।

হিন্দুজাতির প্রত্যেক সংস্কার কার্য্যে তাহাদের পবিত্রতার প্রসার বৃদ্ধি করে। এক একটী সংস্কার দ্বারা হিন্দুর সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে ক্রমশঃ উচ্চতর এক এক পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া, তাহাদিগের মনুষ্যত্ব সমধিক বিকাসিত হইবে; ইহাই পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অভিসন্ধি। এই অভিসন্ধি বলেই হিন্দুর জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মজীবন নানাসংস্কারকার্য্যের দ্বারা বারম্বার সংস্কৃত হয়।

বিবাহ একমাত্র অপত্যোৎপাদন দ্বারা ঈশ্বরের মঙ্গলকর অভিপ্রায়ের সমীপস্থ হইবার জন্য, এবং ধর্ম্মকর্ম্মে একজন নিয়তসঙ্গিনী লাভ করিবার জন্য। তাই হিন্দুর গৃহে পত্নীর নাম "সহধর্ম্মিণী"। হিন্দু পত্নীকে কেবল মাত্র "শয্যা সঙ্গিনী" মনে করেন না। স্ত্রীসংসর্গ কেবল মাত্র সন্তানকামনায়, ইহাই প্রকৃত হিন্দুর হৃদয়ের কথা! হিন্দু পরিব্রাজক বলেন, "রমণাধিকৃতির্নাস্তি জননাধিকৃতিং বিনা।" সন্তান জনন বাসনা ব্যতীত অন্য কারণে হিন্দুদের স্ত্রীসঙ্গমের ন্যায়তঃ অধিকার নাই, ইহাই পরিব্রাজকের মত।

অপত্যার্থে বিবাহ, ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য প্রার্থনায় বিবাহ, এইরূপ যাঁহারা ভাবিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা অবশ্যই অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া পৈশাচ প্রবৃত্তির অকাণ্ডতাণ্ডবে যোগদান করিতে পারিবেন না। যে পুরুষ সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম করিয়া, বিন্দুধারণ সংযত ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন, এবং যে নারী ব্রহ্মচর্য্য বলে কালোচিত রজোযোগপর্য্যন্ত পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম ঋতুতেই পবিত্রভাবে অপত্যার্থে সঙ্গত হইবেন, ইহা দোষের মনে হয় না। যাঁহারা আত্মধৈর্য্যে অবিশ্বাসী কলুষিত প্রকৃতির দাস, সেরূপ দম্পতি কখনও ইহার মাধুর্য্য চিন্তা করিতে পারিবেন না। প্রথম কথা হিন্দুরা, প্রত্যেক ব্যক্তির ত্রিবিধ অবশ্যপরিশোধ্য ঋণের উল্লেখ করেন,—দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ। এই তিনটী ঋণ পরিশোধ করা একান্ত আবশ্যক। সন্ততি না হইলে পিতৃঋণ শোধ হয় না, তজ্জন্যই অপত্যোৎপাদনে ইচ্ছা, ঐ ইচ্ছাবশেই সংসর্গ প্রবৃত্তি। সুতরাং দেখা গেল, পিতৃঋণ পরিশোধেচ্ছু পুরুষ স্বীয় সংযম বলে ও পত্নীর ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে সন্তান সম্ভাবনায় দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া প্রথম পুষ্পবতী পত্নীর সহিত সঙ্গত হন। পিতৃঋণ শোধের প্রতি শৈথিল্য করা হইবে, এইরূপ

শঙ্কায় হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন, ঋতুস্নাতাপত্নীকে উপেক্ষা করিলে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। কাজেই প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান ব্যবস্থা।

এই গর্ভাধানের সময় ঋতুকাল। ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত (প্রথম রজঃস্রাবের দিন হইতে) ঋতুকাল বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ইহার মধ্যে সকল তিথি নক্ষত্রে গর্ভাধান করিলে সুফল হইবে বলা যায় না।

মনুষ্য শরীরের সহিত গ্রহোপগ্রহ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও বৈদ্যুতিক-আদান প্রদান, আকর্ষণ বিকর্ষণ সংঘটিত হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা মানব দেহে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা অনেক সময়ে উপলব্ধি করি। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বালকজড়-বিজ্ঞানের হস্ত ধারণ করিয়া আমরা এই সকল তত্ত্ব নিঃশংসয় রূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক যুগের পরিবর্ত্তনের সহিত জগতের বক্ষের এই সকল লুকান রত্ন আবিষ্কৃত হইবে; তখন হিন্দুশাস্ত্রের অগাধ রহস্য মানব সমাজ বুঝিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। মোটের উপর, সকল দিন বা সকল সময়ে মানবশরীর সমানভাবে থাকে না, গ্রহ নক্ষত্রাদির আকর্ষণাদি দ্বারা উহা অবস্থান্তরিত হয় ইহা নিশ্চিত, সুতরাং সকল তিথি নক্ষত্র বা বার, সকল কার্য্যে উপযুক্ত হইতে পারে না।

ঋতুর প্রথম তিন রাত্রি রমণী অস্পৃশ্যা। প্রধান এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য সন্তানোৎপাদন ঐ সময়ে সুসম্পন্ন হইতেই পারে না। প্রবল-বেগান্বিত রক্তোধারাসংসর্গে গর্ভাশয়ের আবিলতাই উহার অত্যধিক প্রতি বন্ধক। চতুর্থ রাত্রি হইতে পর পর যুগ্ম রাত্রিতে গমন উচিত। তাহাতে সন্তান দীর্ঘজীবী ও গুণান্বিত হয়। আপস্তম্বের "উপনিশস্তি" বাক্য দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার আচার্য্যের মত এরূপ। সাধারণতঃ তৎকালে আচার্য্যের নিকটই উপদেশ পাওয়া যাইত।

অস্মদ্দেশীয় ফলিতজ্যোতিষ ভ্রম শূন্য কি না, তদ্বিষয়ে এ প্রসঙ্গে কিছু বলিবার আবশ্যক দেখা যায় না। তবে এ ফলিত জ্যোতিষ প্রথম ঋতুযোগের ও তিথি বার পার্থক্যে কিরূপ বিভিন্ন ফলের কথা বলিয়াছেন, এবং গর্ভাধান বিষয়ে কিরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে বলা বোধ হয় অনাবশ্যক নহে।

"আদিত্যে বিধবানারী সোমেচৈব পতিব্রতা। বেশ্যা মঙ্গলবারে চ বুধে সৌভাগ্যমেবচ। বৃহস্পতৌ পতিঃ শ্রীমান্ শুক্রে চাপত্যমেব চ, শনৌ বন্ধ্যাং বিজানীয়াৎ প্রথমংস্ত্রীং রজস্বলাং। এই বচনে অবগত হওয়া যায়, রবিবারে স্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হইলে ফল দুঃখকর বৈধব্য, সোমবারে পাতিব্রত্য, মঙ্গলে বেশ্যাত্ব, বুধে সৌভাগ্য, বৃহস্পতিতে পতির শ্রীবৃদ্ধি, শুক্রে সন্তান লাভ (অচিরকাল মধ্যে) ও শনিবারে বন্ধ্যাত্ব। এইরূপ তিথি ভেদেও ফলভেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, আর নক্ষত্রভেদে ও ফল পার্থক্যের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। ক্রমে উদাহরণ যথা,—প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী, সপ্তমী, একাদশী ও দ্বাদশীতে অ দ্য ঋতু হইলে রমণী পতিব্রতা হয়। তৃতীয়া অষ্টমী, ত্রয়োদশীতে সম্মানিতা ও পঞ্চমী

দশমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যায় পুত্র ও কন্যাবতী, চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশীতে আদ্য ঋতু হইলে নারী যমভবনে আতিথ্য গ্রহণ করে। পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্র পদ, পূর্ব্বফাল্গুনী, ভরণী, অশ্লেষা, আর্দ্রা নক্ষত্রে আদ্য ঋতু হইলে ফল বৈধব্য, মঘায় শোকান্বিতা, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কুলটা হয়, কৃত্তিকা ও জ্যেষ্ঠায় প্রথম ঋতু হইলে নারী দরিদ্রা হয়। এইরূপ বৈশাখ মাসে প্রিয়বাদিনী, জ্যৈষ্ঠে বিধবা, আষাঢ়ে ধনবতী, শ্রাবণে মৃতবৎসা, ভাদ্রে রোগিণী, আশ্বিনে স্বামি ঘাতিনী, কার্ত্তিকে কুলনাশিনী, অগ্রহায়ণে ধর্ম্মশীলা, পৌষে কামবিহ্বলা, মাঘে পতিব্রতা ফাল্গুনে বহুপুত্রবতী ও চৈত্রে আদ্যঋতু হইলে রমণী মদনমত্তা হয়। এবিষয়ে বিস্তর মতান্তর আছে, বিস্তরভয়ে শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইল না।

আমরা যদিও সর্ব্বদা এইরূপ আদ্য-ঋতু-ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না, তথাপি এই সকল প্রাচীনধারণার মূলে নিশ্চিত কোনও সত্য নিহিত আছে কি না, তাহা অবগত হইবার জন্য এই সব বিষয় সর্ব্বদা আলোচিত হওয়া আবশ্যক মনে করি। মহামান্য আর্য্যমহর্ষিগণ যে প্রভূতভ্রান্ত-ধারণার অধিকারী ছিলেন, একথা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। গণিতের আকরস্থান ভারতের ফলধারণা ভিত্তিশূন্য নয়, ইহা অন্যপ্রসঙ্গে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অনেক স্থানে কল্পনাতীত প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছি। পাঠক মহোদয়গণ যদি উপহাস করিয়া মনোযোগ করিতে অনিচ্ছুক না হন, তবে বলি, সেরূপ অবস্থায় পতিত হইলে, আপনারা ও আমার ন্যায় স্বাধীন "মানিনা" বাক্যের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে অবনত-মস্তকে অগ্রসর হইতেন। দীন লেখকের এ বিষয়ে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু যাহা এক একটু বিস্ময়ের স্থানে উপস্থিত হইয়া বুঝাগিয়াছে, তাহাতেই অনুরোধ করিতে প্রবৃত্তি হয়। অবজ্ঞা না করিয়া অনুসন্ধান করিলে হয়ত "মিলিলে মিলিতে পারে লুকান রতন।" আমরা কথা প্রসঙ্গে বহু দূরে আসিয়াছি। এখন প্রকৃত বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

জ্যোতিষ গর্ভাধানের কাল সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা এই, "পাপসংযুত মধ্যগেষু দিন-কৃল্লগ্নপক্ষপাস্বামিষু, তদ্দ্যূনেষশুভোজিঝতেষু নিকুঞ্জে ছিদ্রে বিপাশে সুখে, সদ্যুক্তেষু ত্রিকোণ কণ্টকবিধুব্যয়ত্রিষষ্ঠান্বিতে পাপে যুগ্মনিশাস্বগণ্ড সময়ে পুংশুদ্ধিতঃ সঙ্গমঃ।

অর্থাৎ সূর্য্য লগ্ন ও চন্দ্র পাপযুক্ত বা পাপ মধ্যগত না হইলে, ইহাদের সপ্তম স্থান শুভগ্রহ যুক্ত ও অষ্টম স্থান মঙ্গল গ্রহ হীন হইলে, সুখস্থান পাপ শূন্য হইলে, নবম, পঞ্চম, লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থান শুভ গ্রহযুক্ত এবং তৃতীয় ষষ্ঠ একাদশ স্থান পাপযুক্ত হইলে, যুগ্মদিবসে গণ্ড ত্যাগ করিয়া, চন্দ্রতারা শুদ্ধিযুক্ত পুরুষ গর্ভাধান-সঙ্গম করিবেন। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, জন্ম পত্রিকা দ্বারা এই সকল নির্ণয় করা এখানে একান্ত আবশ্যক, নচেৎ ইহার কিছুই সম্ভব নহে। গণ্ড ত্যাগ করিতে বলায় গণ্ডের উল্লেখ আবশ্যক। "মূলা মঘাশ্বিনীনাং আদ্যং জ্যেষ্ঠাস্বসর্পানাং, অন্ত্যং গণ্ডপদং ত্যক্ত্বা ষোড়শাহে ঋতৌ

ব্রজেৎ” মূলা, মঘা ও অশ্বিনী নক্ষত্রের আদ্যপাদে গণ্ড, জ্যেষ্ঠা, রেবতী ও অশ্লেষার শেষ পাদ গণ্ড, এই গণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ষোড়শাহ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দিবসই ঋতু গমনে প্রশস্ত কাল। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, একাদশ ও ত্রয়োদশ দিবস ত্যাগ করিতে অনেক জ্যোতিঃশাস্ত্রকার পরামর্শ দিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে জানা যায়, আর্য্য শাস্ত্রকারগণ অধিক সময় দেন নাই। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত বিশুদ্ধ সময় লাভ করা সতত সকলের পক্ষে দুষ্কর।

২। অর্থ প্রাধ্বস্য পরিক্ষবে পরিকাসনে চ অপ উপস্পৃশ্য উত্তরে যথালিঙ্গং জপেৎ॥

এই গর্ভাধান বিহিতকালে যদি কোনও ব্যক্তি স্বভবনে উপস্থিত থাকিতে না পারেন, প্রয়োজনবশে দূরতর স্থানে থাকিতে হয়, এবং তাঁহার ক্ষুবথু ও কাস উপস্থিত হয়, তবে তিনি "অমুহবং পরিহবং” ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রদ্বয় আচমনান্তে জপ করিবেন। ইহাই পূর্ব্বোক্ত দুর্নিমিত্তনিবন্ধন কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাঘাত হইলে প্রায়শ্চিত্ত। "যথালিঙ্গ” কথাটী দ্বারা বুঝা যায়, যে মন্ত্রে পরিক্ষব বাচক শব্দ আছে সেই মন্ত্র পরিক্ষবে এবং অপরটী কাসে জপ করিতে হইবে।

চকার দ্বারা বুঝা যায় অন্য অমঙ্গলেও যথোচিত মন্ত্রজপ আবশ্যক।

৩। এবমুত্তরৈর্যথালিঙ্গং চিত্রিয়ং বনস্পতিং শকুন্তীতিং সিগ্বাতং শকুনিমিতি।

ঐ প্রাধ্ব ব্যক্তি "আরাত্তে অগ্নিরস্ত” এই মন্ত্র দ্বারা চিত্রবনস্পতির উপস্থান করিবে। "নমঃ শকৃৎসদঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে শকৃৎ সমূহের উপস্থান করিবে, "সিগসীতি” এই মন্ত্র দ্বারা সিগ্বাত (কাপড়ের বাতাস) লাগাইবে। "উদ্‌গাতেব শকুনঃ” এই মন্ত্রে শুভ সূচক শকুনির উপস্থান করিবে। বনস্পতি শব্দের অর্থ যে বৃক্ষের ফুল নাই অথচ ফল হয়, তাদৃশ বৃক্ষ।

অতঃপর গর্ভাধান সংস্কারের বরবধূ প্রেমকামনায় প্রদত্ত বৈদিক আহুতি প্রণালীর বিষয় বিবেচিত হইতেছে।

৪। উভয়োর্হৃদয় সংসর্গেপ্সুঃ ত্রিরাত্রাবরং ব্রহ্মচর্য্যং চরিত্বা স্থালীপাকং শ্রপয়তি, শ্রপয়িত্বাগ্নেরূপ সমাধ্য নাদ্যাজ্য ভাগান্তে স্থারব্ধায়াং স্থালীপাকাহুত্তরা আহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যাতে পরিবেচনান্তংকৃত্বা তেন সর্পিষতা যুগ্মান্ দ্বাবরান্ ব্রাহ্মণাংন্ ভোজয়িত্বা সিদ্ধিং বাচয়ীত।

বর বধূর সমধিক প্রীতিকামী (বধূর পিতা প্রভৃতি) ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া, স্থালীপাক করণান্তর অগ্নির উপসমাধানাদি আজ্যভাগহোমান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া, স্থালীপাক হইতে সপ্ত আহুতি প্রদান করিয়া, জয়াদিহোম করিবেন। পরে পরিবেচন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া, ঐ স্থালীপাক (অন্ন) ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা দুইটীর অধিক ব্রাহ্মণ মিথুনকে ভোজন করাইয়া তাহাদের দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইবেন, এইরূপ করিলে বর বধূর প্রেম সুদৃঢ় হইবে। এই কার্য্য বরবধূর হিতার্থী ব্যক্তি করিবেন, বরবধূ কেবল ফলের ভাগ পাইবেন। এই সূত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, আপস্তম্বের সময়ে দাম্পত্য প্রেম দৃঢ় করিবার জন্য দৈবচেষ্টারও ক্রটী হইত না। সমাজের এই প্রকার ব্যাপার ক্রমশঃ বিলীন হইলেও স্থানে,

স্থানে স্মারক লাভ করা যাইতেছে। যুগলের ভোজনে ও আশীর্ব্বাদে যুগলের প্রেম বৃদ্ধি বেশ সুন্দর অনুষ্ঠান ফল বটে!

৫। স্বস্তিষোণেতি ত্রিঃসপ্তৈর্যবৈঃ পাঠাং পরিকিরতি যদি বারুণ্যাসি বরুণা ত্বা নিষ্ক্রীণামীতি যদি সৌম্যসি সোমাত্বা নিষ্ক্রীণামীতি।

অতঃপর পত্নী স্বামীর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া স্বামিকে বশীভূত করিবার জন্য যে সকল কার্য্য করিবে, তাহারই উপক্রম বলা হইতেছে। পরদিনে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তিষ্য-নক্ষত্রেই তাহার উপক্রম করিতে হইবে। বধূ যেখানে পাঠা (ওষধি বিশেষ) আছে, সেখানে গমন করিয়া "যদি বারুণ্যসি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা পাঠার চতুর্দ্দিকে পরি-বপণ করিবে অর্থাৎ পাঠার চারি পাশে যব ছড়াইয়া দিবে।

৬। শ্বোভূতে উত্তরয়া উত্থাপ্য উত্তরা-ভিস্তিসৃভিরভিমন্ত্র্য উত্তরয়া প্রতিচ্ছন্নাং হস্তয়োরাবধ্য শয্যাকালেভর্ত্তারং বাহুভ্যাং পরিগৃহ্লীয়াৎ উপধানলিঙ্গয়া।

এই পরিকিরণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া, উপবাস অবলম্বন পূর্ব্বক সেই দিন অতি-বাহিত করিয়া, পরদিনে খনিত্র দ্বারা সেই পাঠা ওষধি বিশেষকে খুঁড়িয়া উঠাইবে, তখন "ইমাংখনামি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে অনন্তর "উত্তানপর্ণ" ইত্যাদি তিনটী মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ পাঠাকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। "অহমস্মি" এইমন্ত্রে ঐ পাঠার মূলদেশ বিখণ্ড করিয়া, যাহাতে স্বামী সহসা না দেখিতে পায় এইরূপে হস্তদ্বয়ে বন্ধন করিয়া রাখিবে। পরে শয্যায় স্বামীকে "উপতে ধামা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিবে, তাহা হইলে স্বামী সর্ব্বাধিক বশীভূত হইবে। তান্ত্রিক বশীকরণ দেশে বড় বিরল নহে। প্রায়শঃ পুরাতন পল্লীতে বহু বিবাহের অনুগ্রহে গাছ গাছড়া, মাদুলি দ্বারা স্বামী বশীকরণ অনু-ষ্ঠিত হয়। নব্যশিক্ষালোকের ছটা অন্তঃপুরে উপস্থিত হইবার পর ঐ সকল কাণ্ড একটু কমিয়াছে। সহরে উহার প্রচার নাই, পল্লীতেও বড় নাই, তবে স্থানে স্থানে তন্ত্র মন্ত্র ছিটে ফোঁটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিককালেও ইহার বেশ আমদানি ছিল, গৃহসূত্র তাহার সাক্ষী দিতেছে। গৃহসূত্র আমাদের প্রাচীন আচার ব্যবহারের প্রকৃষ্ট পরিচয়। পূর্ব্বকালের অবস্থা জানা-ইবার জন্য আমরা তৎকালীন সমাজ চিত্র সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দেখিতে পাইলাম, বৈদিককালে যে বশীকরণ বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় তান্ত্রিক বশীকরণ বোধ হয় ইহারই অত্যধিক পরিণতি।

৭। বশ্যোভবতি।

এইরূপে ওষধিবন্ধন করিয়া পত্নী পতিকে যদি আলিঙ্গন করে, তবে পতি বশ্য হন। হরদত্ত মহাশয় ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, পাঠ করিলে একটু হাসির উদয় হয়। হর দত্তের বাক্য এই "বশ্যঃ পতির্ভবতি ভার্য্যায়াঃ ন ভার্য্যা ভর্ত্তুরিতি।" পতিই পত্নীর বশ্য হইবেন, পত্নী নিজে পতির বশ্যা হইবেন না। বেশ কথা! পত্নী উপবাস করিয়া ঔষধ সংগ্রহ করিল কি স্বামী ভুলাইয়া বাঁধিতে, না নিজে ভুলিতে বা বাঁধা

পড়িতে ! ইহা সহজে অবগত হওয়া যায়। হরদত্ত মহাশয় শুধু এই টুকু বুঝাইতে চইলে বোধ হয় ওরূপ লিখিতেন না। তাঁহার বাক্ কৌশল বেশ কার্য্যযুক্ত বটে।

৮। সপত্নী বাধনং চ।

কেবল যে স্বামীই বশীকৃত হইবেন এমন নহে, সপত্নীর প্রতিও স্বামীর ভালবাসা দূরীভূত হইবে। রমণী সমাজে সপত্নীর ন্যায় শত্রু বোধ হয় আর নাই। সকলই অকাতরে সহ্য করা সম্ভব, কিন্তু নারীজীবনের এক মাত্র অবলম্বন স্বামী অপরের হয়, ইহা সহ্য করা স্ত্রীলোকের অসম্ভব। সপত্নীবিদ্বেষ ও বহু বিবাহ আপস্তম্বের সময়ে সমাজশরীরে স্থান পাইত। তখন ভারতীয় সভ্যতার কোনও উন্নতযুগ চলিতেছিল কি না, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; তবে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, দেশের বা সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, সমাজের অবস্থাবিশেষে বহুবিবাহ দেশের উন্নতির নিমিত্তরূপে অবধারিত হইতে পারে; আবার সময় বিশেষে "একাভার্য্যা সুন্দরীবাদরী বা" এই বাক্যটী দেশের উৎকৃষ্ট আদর্শ উপদেশরূপে গণ্য হওয়ার দরকার হয়। সুতরাং বহুবিবাহ নিয়ম দ্বারা সভ্যতার স্তরকল্পনা সম্পূর্ণ যৌক্তিক নহে।

৯। এতেনৈব কাম্যেন উত্তরেণ অনুবাকেণ সদাদি ত্যমুপতিষ্ঠতে।

বধূ প্রতিদিনই সপত্নীবাধন কামনায় উত্তর অনুবাক (উদসৌ সূর্য্যা অগাৎ ইত্যাদি মন্ত্র সমূহ) দ্বারা আদিত্যের উপস্থান করিবে। সপত্নীবাধন কামনায় প্রত্যহ একটা অনুষ্ঠানের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

১০। যক্ষ্ম গৃহীতামন্যাংবা ব্রহ্মচর্য্যযুক্তঃ পুষ্করসন্বর্ত্তমূলৈরুত্তরৈর্যথালিঙ্গং অঙ্গানি সংমৃশ্য প্রতীচীনং নিরস্যেৎ।

যদি বধূর ক্ষয়কাশরোগ বা অন্য কোনও কুষ্ঠাদি রোগ থাকে, তবে তাহার হিতৈষী ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পুষ্কর সম্বর্ত্তমূল (পদ্মের গোলাকার মূলদেশ) সকল দ্বারা বধূর সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করাইবেন, তাহা হইলে নিরাময় ভাব দেখাদিবে। পরে ঐ পুষ্কর মূল প্রতীচীন ভাবে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। "অক্ষিভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ মার্জ্জনা করিতে হইবে। যে মন্ত্র নাসিকা বাচক শব্দ আছে তাহা দ্বারা নাসিকা এবং মুখবাচকশব্দযুক্তমন্ত্র দ্বারা মুখ মার্জ্জনা ইত্যাদি প্রকারে মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। বধূ রোগাক্রান্তা হইলে সে স্বামীর প্রেম লাভে সমর্থা হইতে না পারে, এই আশঙ্কায় বধূর হিতকামী ব্যক্তি মন্ত্রবলে রোগ সারিয়া দিবেন। আপস্তম্বের সময়ে পদ্মমূল গায়ে বুলাইয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্ষয়কাশ কুষ্ঠাদি রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা করা হইত এইরূপ বুঝা গেল।

১১। বধূবাস উত্তরাভিরেতদ্বিদে দদ্যাৎ।

যে বধূর পীড়া প্রশমন জন্য এই কার্য্য অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহার পারিহিত বসন "পরাদেহি" ইত্যাদি চারিটী মন্ত্র পাঠ করিয়া, এই তৈষজ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতকে প্রদান করিবে। ইহা ভৈষজ্য কার্য্যের দক্ষিণা স্বরূপ। গৃহসূত্রে অনেক স্থানে তত্তৎকর্ম্মাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দক্ষিণা দিবার কথা বলা হইয়াছে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য

কি, তাহা বুঝা দুরূহ। বোধ হয়, অভিজ্ঞকে দান করিলে অধিক ফল লাভ নিশ্চিত হয়। বৈদিকমন্ত্রচিকিৎসা প্রণালীর আভাগ এই স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গেল। বারান্তরে অপরাপর গৃহকর্ম্মের আলোচনা করা যাইবে।

নবম খণ্ড সমাপ্ত। তৃতীয় পটল সম্পূর্ণ।

তীর্থপদাশ্রিতস্য কস্যচিদ্ দীনস্য

যশোহর বেদ বিদ্যালয়।

(ক্রমশঃ)

সাধক-প্রার্থনা

যখন নানাবিধ অসার কার্য্যেই দিন রাত্রি বিফলে চলিয়া যায়, যখন শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য সময় বহুবিধ উপদ্রবেই নষ্ট হইয়া যায়, যখন এই দুর্ব্বল দেহ স্বভাবতঃই ক্ষণভঙ্গুর, তখন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র ভগবানের চিন্তায় নিরত থাকিয়া মোক্ষ লাভ করাই এই অসার মানব দেহের একমাত্র সার কর্ম্ম। ইহাই নিম্নলিখিত শ্লোক গুলির ফলিতার্থ :—

(১)

প্রাতর্মূত্রপুরীষাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া।
তৃপ্তাঃ কামেন বাধ্যন্তে প্রাণিনো নিশি নিদ্রয়া॥
মল-মূত্র-ত্যাগে প্রাতঃকাল নষ্ট হয়,
ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় নষ্ট মধ্যাহ্ন সময়,
নিদ্রা গিয়া কিংবা আর বিহার করিয়া
রাত্রকাল নষ্ট হয়, দেখ রে ভাবিয়া।
বিফলে সময় গেল, রে অবোধ নর!
বুঝে দেখ্, কিবা তোর হবে অতঃপর!

(১)

নির্বিবেকতয়া বাল্যং কামমদেন যৌবনম্।
বৃদ্ধত্বং বিকলত্বেন সদা লোপদ্রবং নৃণাম্॥
হিতাহিত-জ্ঞানাভাবে কাটে-বাল্যকাল,
মদন যৌবন-কালে ঘটায় জঞ্জাল,
বৃদ্ধকালে জীর্ণ শীর্ণ হয় কলেবর,
এক এক কালে এক বিঘ্ন ঘোরতর!
উদ্ঘাটিত নবদ্বারে পিঞ্জরে বিহগোঽনিলঃ।
যত্তিষ্ঠতি তদাশ্চর্য্যং প্রয়াণে বিস্ময়ঃ কুতঃ॥
অতি জীর্ণ শীর্ণ এই শরীর পিঞ্জর,
নবদ্বার খোলা তার আছে নিরন্তর।
প্রাণবায়ু পক্ষী এক ভিতরে তাহার
দিবানিশি ঘুরিতেছে এধার ওধার।
ইহাই আশ্চর্য্য সে যে থাকেও তথায়,
পলাইয়া গেলে আর বিস্ময় কি তায়!

(৪)

প্রচণ্ডবাসনাবাতৈ রুদ্ধতা নৌর্মনোময়ী।
বৈরাগ্য কর্ণধারেণ বিনা রোদ্ধুং ন শক্যতে॥
প্রচণ্ড-বাসনা-বায়ু বিষম প্রবল,
মনঃ-নৌকা খানি করে টল্ টল্ টল্।
হায়রে বৈরাগ্য-কর্ণধার না থাকিলে,
এ বিপদে কেবা রাখে এই ভূমণ্ডলে!

(৫)

শান্তিকন্থালসৎকণ্ঠো মনঃস্থালীমিলৎকরঃ।
ত্রিপুরারিপুরদ্বারি কদাহং মোক্ষভিক্ষুকঃ॥
হেন দিন ভাগ্য মোর ঘটিবে কখন,
যে দিন এরূপ কার্য্যে যাবে মোর মন;—
শান্তি কন্থা খানি আমি কণ্ঠে জড়াইয়া
মনঃ—ভিক্ষা-পাত্র করে ধারণ করিয়া
শিবের দুয়ারে এই বলিব বচন;—
"মোক্ষ-ভিক্ষা দাও মোরে ওহে ত্রিলোচন!"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর, বি, এ
২৬।২ বৃন্দাবন পালের গলি। শ্যামবাজার।
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

চতুর্থ শ্লোকের আলোচনা।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

জগদীশ! ধন-জন-সুন্দরী-কবিত্ব।
এ সকল কামনা না করে মম চিত্ত॥
তুমি হে ঈশ্বর—যেন তোমাতে নিশ্চয়।
জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি মোর হয়॥

জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ঐহিক আকর্ষণের বস্তু যা কিছু, তা কিছুই চাহিনা। সেগুলি আপাতচিত্তহারী হইলেও নিত্য নহে। ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী ও কাব্য-রস, এই চারিটির ন্যায় ঐহিক আকর্ষণী আর নাই; কিন্তু ভগবচ্চরণে অহৈতুকী পরাভক্তিপ্রার্থী ভক্তের চক্ষে একান্ত-পক্ষেই অকিঞ্চিৎকর। পার্থিব ধন-জনাদি সম্পদ ত সামান্য কথা, ভক্তের কাছে অপার্থিব সম্পদ কর্ম্মীর স্বর্গ ও জ্ঞানীর মোক্ষও তুচ্ছ! প্রথম শ্লোক-আলোচনা-প্রবন্ধে উদ্ধৃত একটি শ্লোক এস্থলে পুনঃস্মরণ করুন।

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা।
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ॥"
সান্দ্রানন্দা ভক্তি যদি হয় শ্রীমুকুন্দে।
মোক্ষ-রাজলক্ষ্মী লুটে চরণারবিন্দে॥

ভক্ত মোক্ষ চান না, কিন্তু মোক্ষ ভক্তকে চান! ভক্তিবাধ্য ভক্তারাধ্য ভগবান স্বয়ং প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"নকিঞ্চিৎসাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥"
মম ঐকান্তিক ভক্ত ধীর সাধু যারা।
মদ্দত্ত মোক্ষাদি কিছু নাহি চাহে তারা।
"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥"
কিবা সে ব্রহ্মত্ব—কিবা সে ইন্দ্রত্ব।
কি সার্ব্বভৌমত্ব—পাতালাধিপত্য॥
কিবা যোগসিদ্ধি—মুক্তি চতুর্ব্বিধ।
কিছুই ভক্তের নহে আকাঙ্ক্ষিত॥
আমাতে অর্পিত চিত্ত যে জনার।
আমা বিনা কিছু চাহেনা সে আর॥

সংসারের সকল সুখ সেই সুখসিন্ধুর বিন্দু মাত্র। যে সিন্ধু পায়, সে বিন্দু চাহিবে কেন? ভক্তের বণিগ্বৃত্তি বা "ব্যবসাদারী" নাই। ভক্ত ভগবানের বিনিময়ে কিছুই চাহেন না। ভক্ত ভগবানকে ভাঙ্গাইয়া স্বর্গ-মোক্ষাদি বিষয় ক্রয় করেন না। ভক্ত-প্রধান প্রহ্লাদ ভগবানকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন, যথা—"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।" ইত্যাদি।

আবার ভক্তি-বৃদ্ধ বয়ঃশিশু ধ্রুবও ভগবান বর দিতে চাহিলে, বলিয়াছিলেন,—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং।
ত্বাং প্রাপ্তবান দেব মুনীন্দ্র গুহ্যং॥
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্য রত্নং।
স্বামিন্! কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে॥"
স্থান-অভিলাষী হয়ে রহিনু তপ-সাধনে।

হে দেব মুনীন্দ্র গুহ্য! পেলাম যে তে মাধনে॥
খুঁজিতে খুঁজিতে কাচ, পেলাম রতন-সার।
স্বামিন্! কৃতার্থ আমি, বর নাহি চাহি আর॥

জগন্মাতার সিদ্ধভক্ত সর্ব্বানন্দও ঠিক এই ভাবেই দেবীকে বলিয়াছিলেন,—

"মাতঃ কিম্বরমপরং যাচে,
সর্ব্বং সম্পাদিতমিতি সত্যম্।
যত্বচ্চরণ খুরমতিগুহ্যং
দৃষ্টং বিধি-হর-মধুহর-জুষ্টম্॥"

জননি গো! তোর ঠাঁই, অপর কি বর চাই?
সমস্তই সিদ্ধ আজি মোর।
যেহেতু পরম গুহ্য বিধি-বিষ্ণু-শিব-পূজ্য
হেরিলাম পাদপদ্ম তোর॥

সে পাদপদ্ম-মধু ভিন্ন ভক্ত-ভৃঙ্গের তৃষা আর কিছুতেই মিটে না!

"গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী—
সাত সমুন্দর্ ভরপূর।
তুলসী চাতককে মতি—
সোঁয়াৎ বিন্ সব্ ধূর্॥"

আহা! ভক্ত তুলসীদাসের মতি-চাতকীর প্রাণের পিপাসা সেই নবজলধরের প্রেমবারি বিনে আর ঐহিক ভোগরূপ কোন বারিতেই বারিত হয় নাই। আর সব বারি তাঁহার নিকট বারি নহে—ধূরি (ধূলি) মাত্র!

আমাদের বঙ্গীয় ভক্তরাজ রামপ্রসাদও মুক্তি চান নাই; তিনি ভক্তির জোরে জগদম্বার পাদপদ্মই চাহিয়াছিলেন ও পাইয়াছিলেন। 'আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমীদারী।" ব্রহ্মময়ীর জমীদারীই তাঁহার পাদপদ্ম। তাই ভক্তির গৌরবে মুক্তির লাঘব ঘোষণা করিয়া শ্রীরামপ্রসাদের সেই সুপ্রসিদ্ধ সংগীত ঝঙ্কারিত হইয়াছিল।—

"সকলের মূল ভক্তি—মুক্তি তার দাসী।"
"চিনি হতে চাইনে মা! চিনি খেতে ভালবাসি॥"

এস্থলে মুক্তিলাভই চিনি-হওয়া, আর ভক্তিযোগে ভগবৎসেবানন্দ লাভই চিনি-খাওয়া। অবশ্য বিষয় বাসনা-বিমোচন রূপ যে মোক্ষ, তাহা অহৈতুকী পরা ভক্তিলাভের প্রধান উপাদান বা উপযোগিতা বটে, কিন্তু উপাস্য তত্ত্ব সহ একত্ব বা সমত্বরূপে কল্পিত যে মোক্ষ, তাহা ভক্তি-রাজ্যের বিদ্রোহ-বিপ্লব স্বরূপ; তাই ভক্তের তাহাতে বড় ভীতি—বিরক্তি। তবে মহাভাব-তন্ময়তা জনিত যথার্থ সোঽহংতত্ত্ব পরাভক্তিরই চরম ও পরম পরিণতি। ভক্ত বলেন,—

"চাইনা হরিত্ব-পদ—হরি-পদ চাই।
হরিদাস হয়ে যেন হরি গুণ গাই॥"

ভব-বন্ধন-মোচনই প্রকৃত মুক্তি—অর্থাৎ নিবৃত্তি-মার্গীয় মুক্তি এবং ভক্তের চরম সাধনার্থ তাহার পরম প্রয়োজন; কিন্তু সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি যে মুক্তি, তাহা প্রবৃত্তি মার্গের মুক্তি, অর্থাৎ তাহা ফলার্থী সকাম সাধকের চরম ও পরম পুরস্কার। তাহাতে যে না ভুলিল, তাহা যে না চাহিল, নিবৃত্তিমার্গের মুক্তি তাহারই জন্য। প্রেম-ভক্তি-নিপ্লাবনে, সর্ব্বাত্ম-সমর্পণে ও সেবানন্দ আস্বাদনে সে-ই ধন্য!

শাস্ত্রের ভক্তি মুক্তি-বিতর্ক-বাদে ইহাই সমন্বয়—ইহাই সিদ্ধান্ত। বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত "প্রমাতা"র যে সাধন-চতুষ্টয়ের অন্তর্তম মুমুক্ষুত্ব, তাহা বিষয়-বাসনা-পরিহারেরই তীব্র ইচ্ছা; নচেৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থফলভোগ-বিরাগ ও শম-দম-তিতিক্ষা-উপরতি-শ্রদ্ধা-সমাধান, এই ষট্

সম্পত্তিরূপ যে অপর সাধন-ত্রিতয়, তাহার সহিত সমধর্ম্মিতা থাকে না। ফলিতার্থে বেদান্তের সাধনচতুষ্টয়ের সিদ্ধি যে মুক্তি, তাহা সর্ব্বাত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বেদান্তের সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াই তদানীন্তন পণ্ডিত-সাধক-সমাজকে চমকিত, স্তম্ভিত ও মোহিত করিয়াছিলেন। ভজন-প্রয়োজন বিধ্বংসী স্থূল মায়াবাদের ব্যাখ্যা বেদান্তের অপব্যাখ্যা বা অপবাদ মাত্র।

সে যাহাহউক, এ হেন মোক্ষও যে ভক্তের কাছে তুচ্ছ, সামান্য ঐহিক ধন-জনাদিতে তাহার আসক্তির লক্ষ্য যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে কি না, শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টক সর্ব্বদেশিক-সাধারণেরই স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী শিক্ষাবিধায়ক ; এই জন্য সর্ব্বসাধারণ-সাধনান্তরায় ঐহিক ভোগ-বাসনার নিবৃত্তি ও বৈরাগ্য-পথে অহৈতুকী ভক্তি-ভজনে প্রবৃত্তি শিক্ষা দিতেই এই শিক্ষা শ্লোকটির অবতারণা।

"ন ধনং ন জনং"—ভক্ত বলিতেছেন, আমি ধনও চাই না, জনও চাই না। সংসারে সাধারণতঃ সকলেই ধন-জন চায়। সংসারে উহার প্রয়োজনও আছে। জন ভিন্ন সংসার শূন্য ; ধন ভিন্ন সংসার অচল। একা একা জনশূন্য সংসার-কথা অজিন-কৌপীন-দণ্ড-কমণ্ডলুরূপ পরিবার-পরিবৃত সন্ন্যাসীর সংসার মাত্র! স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে ভৃত্য-আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-কুটুম্ব প্রভৃতি "জন" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই সমস্ত প্রায় সকল সংসারীরই অল্প বিস্তর কিছু না কিছু আছে। স্ত্রী-পুত্রাদি হইতেই সংসার-সম্বন্ধে জনতার বৃদ্ধি হয়। এই জনতার বিভিন্ন প্রয়োজন-আয়োজনে সংসারীকে বিবিধ বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয়। ফলে সংসারী সাধিয়া এই বন্ধনরাজি ফুলমালার ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করে। একটি বন্ধন ছিঁড়িলে হয়ত কাঁদিয়া মরে! এমনই অবস্থা! সংসার মোহের এমনই ঐন্দ্রজালিক কুহক-বিস্তারের ব্যবস্থা! সংসারী লোকে কিন্তু এই ইন্দ্রজাল জালে বদ্ধ থাকিতে বড়ই ভালবাসে। জন এই জালের তন্তু, ধন এই জালের গ্রন্থি। এই ধন-জন-রচিত সংসার-স্বরূপ বেড়া-জাল এড়াইবার শক্তি কেবল ভগবদ্ভক্তি হইতেই লাভ করা যায়। ভগবদ্ভক্তি বিরহে বরং এই জালে চিরবদ্ধ থাকাই স্পৃহণীয় ও প্রার্থনীয় বোধ হয়। তাই ধন-জন সংসারাসক্তের পক্ষে সার, ভগবদ্ভক্তের পক্ষে ছার! ভক্তিই ভক্তের সর্ব্বস্বধন, কিন্তু ধন-জনাসক্তি সেই ভক্তির উন্মেষকেও নিমেষে নষ্ট করে। সুতরাং ধন-জন-প্রার্থনা ভক্তের আত্মহত্যা বিশেষ! কাজেই ভক্ত বলেন, "ন ধনং ন জনং—জগদীশ কাময়ে।"

"মা কুরু ধন জন-যৌবন-গর্ব্বম্।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্॥"
ধন-জন-যৌবনের করোনা গরব।
এক নিমেষেই কাল হরে লয় সব॥

"মোহমুদ্গরের" এই মৃদু আঘাতে জগতে কয়জন মূঢ়ের চৈতন্যোদয় হয়?

সকলেই কিন্তু সত্যের 'বিপশ্চিৎ,' ত্রেতার 'জনক', দ্বাপরের 'যুধিষ্ঠির' ও কলির 'রায়-রামানন্দ' হইয়া "বিকারহেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে—যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ" এই মহতী উক্তির উদাহরণস্থল হইতে পারে

না। দুর্ব্বলাধিকারীর পক্ষে সাধারণতঃ ধন-জনাদি সাধনের নিধন স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

"যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্॥"

যৌবন-ধনসম্পত্তি-প্রভুত্ব-অবিবেকত্ব;
একেই অনর্থ ঘটে, কি না ঘটে চারি যথা?

এক ধনসম্পত্তির সহিত কেবল যৌবন সর্ব্বদা বর্ত্তমান না থাকিলেও, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা প্রায় ইহার নিত্য সহচর; সুতরাং এক অনর্থরূপ ধন বা অর্থ তিন অনর্থে পরিণত হইয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করে; এহেন আধ্যাত্মিক-নিধন-সাধন ধনকে ভক্ত কেন চাহিবেন?

রাজা পরীক্ষিৎ কলিকে নিগৃহীত করিয়া, পরে তাহার শরণাগতি ও কাতরোক্তিতে তাহার জন্য, দ্যূত, মদ্য, স্ত্রী ও জীবহিংসা, এই চারিটী স্থলে স্থাননির্দ্দেশ করিয়া দেন; কিন্তু কলি চারি স্থানে অবস্থিতি অসুবিধাজনক বিবেচনায়, ঐ অনর্থকর চতুঃস্থানের ফল একস্থানে পাওয়ার মত স্থানের নির্দ্দেশপ্রার্থী হইলে, রাজা পরীক্ষিৎ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্বর্ণকে অর্থাৎ ধনকে সেই স্থানরূপে নির্দ্ধারণ করিলেন। অতএব ধনই কলির সর্ব্বশক্তির আকরস্বরূপ হইল। এই পৌরাণিক আখ্যায়িকার শিক্ষা-সারনিষ্কর্ষ এই যে, একমাত্র ধন বা অর্থই কলিকল্মষ-জনিত সকল অনর্থের হেতুভূত। অতএব এহেন পরমার্থ-প্রণাশিণী অর্থ-স্বার্থবুদ্ধি কি ভক্ত সাধকের শোভা পায়?

তবে কি না, "ধন চাই না"—এ কথার অর্থ অবশ্য এমন নয় যে, ভগবন্! এই স্ত্রীপুত্রাদি অবশ্য পোষ্য-পরিজন-পরিবৃত করিয়াও ধনাভাবে আমাকে পথের ভিখারী কর। এরূপ প্রার্থনা বাতুলতা মাত্র। গার্হস্থ্যাশ্রমে ধনার্জ্জন একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পোষ্যপোষণ গৃহীর নিত্য নিয়মিত ধর্ম্ম; তদুপেক্ষায় প্রবল প্রত্যবায় ও নিশ্চিত নিরয়। এই পোষ্য-পোষণ অবশ্য ধন-সাপেক্ষ। সুতরাং ধন চাই; কিন্তু চাই না ধনের আসক্তি। অতএব "ধন চাই না" কথার প্রকৃত অর্থ—আমার মন যেন ধন চায় না, অর্থাৎ ধনে আসক্ত হয় না। নিষ্কাম ভাবে—কেবল সংসার-ধর্ম্মের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিবশে ধনার্জ্জন ধর্ম্মার্জ্জন মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—"যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।" অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয়-ভোগ গৃহীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ধনই বিষয়ভোগের অনন্যসাধন; অতএব ধনের প্রতি মোহাসক্তি-মুক্ত চিত্তে ধনার্জ্জন প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয়; দারিদ্র্য কদাচ সাধনীয় বা প্রার্থনীয় নহে। তবে তপস্বী সন্ন্যাসীদের ধনবত্তা বিড়ম্বনা বটে। নীতিশাস্ত্রে ছয়টী বিড়ম্বিতের উদাহরণ প্রদর্শনে "ধনবান্ তপস্বী" তাহার অন্যতম, নির্দ্দেশিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীর সঞ্চয় নিষেধ ও গৃহীর অবশ্য সঞ্চয়ের বিধি বহুস্থানে বলিয়াছেন। "সঞ্চয়ী নাবসীদতি" এই আর্যনীতিবাক্যটী গৃহাশ্রমীরই জন্য। অতএব ধন অর্জ্জনীয়, কিন্তু ধনের আসক্তিই বর্জ্জনীয়।

কোন গৃহী পণ্ডিত বোধহয় মা লক্ষ্মীর সপত্নী-পুত্র বলিয়াই অর্থকষ্টে অবসন্ন হইয়া, যেন অর্থের প্রতি অভিসম্পাত স্বরূপে সখেদে বলিয়াছিলেন,—

"অর্থানামর্জ্জনে দুঃখমর্জ্জিতানাঞ্চ রক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্।

ধনের অর্জ্জনে দুঃখ,
রক্ষণেও ততোধিক্।
নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ,
দুঃখদ এ ধনে ধিক্॥

ভাবিয়া দেখিলে কথাগুলি ঠিক; অথচ সংসারীর এ অর্থ-সংস্রব অনিবার্য্য—অপরিহার্য্য। সংসারে যে অর্থের সদ্ভাবও এতগুলি দুঃখের কারণ, তাহার অভাবও আবার অনন্ত দুঃখময়; অতএব সংসারীর অর্থ আবশ্যক।

"টাকা দেখ্‌তেও গোল,
থাক্‌লেও গোল,
না থাক্‌লেও গোল!"

এ কথায় কোন গোল নাই; কিন্তু সংসারের সহস্র গোলের মধ্য হইতেও এই 'গোল' সংগ্রহ না করিতে না পারিলে সকল বিষয়েই গোল বাধিয়া যায়। তারপর "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী"——এটিও আমাদের চিরপ্রসিদ্ধ নীতিবাক্য। অর্থাভাবে পোষ্যপীড়ন অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন "নরকং পীড়নে তস্য"। পোষ্যবর্গের পীড়ন গৃহীর নিশ্চিত নরকের কারণ। ধন ও তাহার সদ্ব্যবহারই এই নরক-কারণের তারণ; অতএব ধন চাই, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ধনের আসক্তি চাই না; আসক্তিই বিষয়ের বিষাংশ; আসক্তি-আবর্জ্জনা ছাঁকিয়া, বিমল বিষয়-ভোগ বিপজ্জনক নহে।
"বাহিরে বিষয় রবে, আসক্তি ঈশ্বরে যাবে,
অনাসক্ত বিষয়ীরা বিষেই অমৃত পাবে।"

শাস্ত্র এই নির্লিপ্ত বিষয়-ভোগের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন,—

"পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ানুপসেবমানো
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং।
সংগীত-বাদ্যলয়-তান-বশংগতাপি
মৌলিস্থ কুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥"

বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ সেবিয়াও ধীর
মুকুন্দ-পদারবিন্দ হৃদে রাখে স্থির॥
গীত-বাদ্য-তান-লয়ে নেচে ঘুরে ফিরে।
নটী যথা শির-কুম্ভ স্থির রাখে শিরে॥

জগদাদৃত গীতাশাস্ত্রের সার উপদেশই নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই নিষ্কাম ধর্ম্মতত্ত্বানুসারে গৃহাশ্রমীর আসক্তিশূন্য ধনার্জ্জন অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কথা এই যে, ধন অর্জ্জনীয় হইলেও ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনীয় কি না? এ প্রশ্নের সারবত্তা নাই। যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই প্রার্থনীয়। মনে মনে প্রয়োজন-বোধ ও প্রার্থনা—ফলিতার্থে একই কথা। ভক্তের প্রয়োজন-চিন্তা-মাত্রকেই 'প্রার্থনা' বলা যাইতে পারে। তবে কিনা, ভক্তের মূল প্রয়োজন ভগবদ্ভজন; তাহারই সাধন বা বিঘ্ন-নিবারণ উদ্দেশে যে কোন বিষয়ের প্রয়োজন-বোধ, তাহাই প্রার্থনা। ধনাভাবে যদি গৃহী ভক্তের গার্হস্থ্য অভাব-অশান্তি উৎপন্ন হইয়া তাঁহার ভজনের ব্যাঘাত ঘটে, তবে সেই ধনেরই প্রয়োজনবোধ ও ধনপ্রার্থনা, ফলিতার্থে একই কথা। এ ভাবের ধন-প্রার্থনা ভক্তি-বিরোধিনী বা ভজন-পথ-পরিপন্থিনী নহে। সংসারাশ্রমী সাধুর পক্ষে এই সিদ্ধান্ত ধন সম্বন্ধে যেরূপ, অন্ন সম্বন্ধেও সেইরূপ; ফলে বিষয় মাত্রেরই সম্বন্ধে সমান।

তারপর, সকাম-বিষয়-প্রার্থনাও ভজনের নিম্নস্তরে—অর্থাৎ নিম্নাধিকারী সাধক-সমাজে অস্বাভাবিক নহে।

"আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ।"

গীতাশাস্ত্র এই যে চারিভাগে উপাসকের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে "অর্থার্থী" উপাসকেরা ভগবৎসকাশে সকাম-বিষয়-প্রার্থী হন। তাঁহাদের ভক্তি হৈতুকী। উপাসনা সকামা—প্রবৃত্তি-মার্গ অনুসারিণী। তাঁহারা ভগবানের জন্যই ভগবানকে না ভজিলেও বিষয়ের জন্যও ভগবানকে ভজেন বলিয়া "উপাসক" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন।

দুর্গোৎসবের প্রার্থনা মন্ত্র স্মরণ করুন,—

"রূপন্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহিমে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহিমে।"

ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্ববিধ ঐহিক অভ্যুদয়-প্রার্থনাই সর্ব্বশক্ত্যাত্মিকা বাঞ্ছাকল্পলতিকা জগদম্বিকা শ্রীদুর্গার চরণে নিবেদিত হইয়া থাকে। ইহাও উপাসনা, কিন্তু সকাম; এবং ইহাতেও ভক্তির প্রয়োজন, কিন্তু সে হৈতুকী ভক্তি। আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোক-টিতে ভগবৎসকাশে অহৈতুকী ভক্তি-প্রার্থনা করা হইয়াছে; সুতরাং ঐহিক ধন জনাদির কামনা এ ক্ষেত্রে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। তবে কিনা, ধন-জনাদি-বিষয়িণী সকামতা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিকী বৃত্তি বলিয়াই তাহার হাত এড়ান কঠিন; তাই শত জন্মের সুকৃতিমান সাধক যখন অহৈতুকী ভক্তির গোলকীয় সৌরভে পুলকিত হইয়া তল্লাভার্থই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন; তখন ধন-জনাদি ঐহিক অভ্যুদয় একান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হওয়া-তেই তিনি তাঁহার মনোমোহনের কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন,—"ন ধনং ন জনং———জগদীশ কাময়ে।"

"ন সুন্দরীং———জগদীশ কাময়ে।"

সুন্দরী কামিনীর কামনা মানব মনে সময়-বিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। এই সুন্দরী-ত্বের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নাই। দেশ ভেদে রুচিভেদে ও সংস্কার-ভেদে ইহার বিভিন্নতা বিশিষ্ট বৈচিত্র্যময়ী। বিড়ালাক্ষী বিদ্যুৎ-কুন্তলা বিলাতিনী বৃটেনের বীর-বক্ষ-বিলাসিনী। এদিকে ক্ষুদ্র খঞ্জন-চরণা খর্ব্বাঙ্গিনী চিনাঙ্গনা চৈনিক প্রেমিকের চিরচিত্ত-বিনোদিনী! আবার নীলোৎপলাক্ষী নীরদকেশী নিবিড়াঙ্গী অঙ্গনাই বঙ্গবাসীর অন্তরঙ্গিণী ও সুখ-সঙ্গিনী। সে যাহাহউক, ফলে সুন্দরী সঙ্গিনীর সাধ সংসারে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই স্বাভাবিক। এই "সুন্দরী" অর্থে যে কেবল বাহ্যিক আদর্শ-রূপে রূপসী বুঝায়, তাহা নয়। বাহ্যিক রূপের যে কোন সর্ব্বসাধারণ-স্বীকৃত নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বা আদর্শ নাই, তাহাত পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। এইস্থলে একটি কৌতুকাবহ প্রাচীন "মেয়েলী" মনে পড়িল,—

"লোকে বলে টিয়ে-ঠোঁটী টীকোলো নাক ভাল।
আমি দেখি আমার খেঁদীর রূপে জগৎ আলো॥"

ফলে যে যার মনোরমা, সেই তার কাছে সুন্দরতমা। জগন্মাতার কাছে এই জন্যই "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি" এই প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা।

এ সুন্দরীত্ব বয়সেরও অপেক্ষা রাখেনা।

"বলে কি রূপ রয়? রূপ রয় মনে;
অন্তরের রূপ ফোটে বয়নে নয়নে!"

বাস্তবিক রূপ অন্তরের সম্পত্তি। আমাদের সামুদ্রিক জ্যোতিষ-শাস্ত্র বলেন—"যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।" গুণবান-গুণবতীদের আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রায় স্থলেই প্রতীত হয়। যেখানে নিগুর্ণতা সত্ত্বেও রূপ বা রূপ সত্ত্বেও নিগুর্ণতা, সেখানে সে রূপ অসার—কিঁকে; তাহাতে পাকা লাবণ্য লক্ষিত হয় না। তাহার আকর্ষণী বা মোহিনী যেন "পলকে পলকে পুরাতনী।" 'নিতুই নব' ভাব সে সৌন্দর্য্যে সম্ভবেনা। সে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য নাই; কেবল কিঞ্চিৎ আপাত-প্রাখর্য্য আছে। যেমন ঝুঁটা মুক্তা, নকল-হীরা, গিল্টি-সোণা, ইত্যাদি, তেমনই সে রূপও যেন ঝুঁটা রূপ; দুদিন ব্যবহারেই তাহাতে বিরূপতার মালিন্য প'ড়িয়া যায়। "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি" সামুদ্রিক শাস্ত্রের এ সিদ্ধান্ত যেখানে ব্যভিচার-প্রাপ্ত, সেখানে তাহা প্রায়শঃ কুসঙ্গ-কুশিক্ষার ফল, সন্দেহ নাই। সেরূপ উদাহরণস্থলে অন্ত্রস্ত অনুসন্ধান লইতে পারিলেই, তাহার সত্যতা সুপ্রতীত হইতে পারে। সে যাহা হউক, ফলে আপন মনোরমতার আদর্শ অনুসারেই সুন্দরী সঙ্গিনার প্রার্থনা মানব-হৃদয়ে স্বাভাবিক।

তারপর, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্বভাবতঃ পরস্পর মোহের সম্বন্ধ। স্ত্রীজাতির চক্ষে পুরুষ জাতি সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সমষ্টি, আর পুরুষ জাতির নিকট স্ত্রীজাতি বিধাতার বিরলের সৃষ্টি! বুঝি বিশ্ব-প্রদর্শনাতে ব্রহ্মা রমণী-মূর্ত্তি গড়িয়াই বড় বাহাদুরী লইয়াছিলেন!

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে,
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধিবিদধে রমণী মুখং,
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥"
মলিনী নলিনী দিবা-অবসানে হয়।
শশীকলা বিকলা ক্ষপা পেলে ক্ষয়॥
গড়িলা রমণী-মুখ বিধি ইহা দেখে।
ক্রমে লোক বিজ্ঞতম হয় ঠেকে শিখে।

শ্লোকটি অবশ্য পুরুষের রচিত। ফলে সাধারণতঃ ও স্বভাবতঃ পুরুষের সিদ্ধান্তে নারী সুন্দরী।

স্ত্রীজাতির এই স্বভাব-সৌন্দর্য্য-মোহে জগৎ মুগ্ধ।

"গৌড়ী মাধ্বী তথা পৈষ্টী বিজ্ঞেয়া-
ত্রিবিধাঃ সুরাঃ।
চতুর্থী স্ত্রী-সুরা জ্ঞেয়া যয়েদং মোহিতং
জগৎ।"
গৌড়ী, মাধ্বী, পৈষ্টী আর—সুরা এই
ত্রিপ্রকার।
স্ত্রী-সুরা চতুর্থসুরা, যাহে মুগ্ধ এ সংসার।

স্ত্রীতে যে মত্ততা জন্মে, সর্ব্বপ্রকার মত্ততা অপেক্ষা সেই মত্ততাই সর্ব্বনাশিনী। অতএব জগতে তাহাই মহাসুরা। স্ত্রী-সৌন্দর্য্য-সুরার মত্ততায় রাবণ সবংশে মজিল। স্ত্রী-সৌন্দর্য্য শিখায় লঙ্কা পুড়িল, ট্রয় ভস্ম হইয়া উড়িল; কত দেশ, কত রাজা, কত জাতি কেবল স্ত্রী-রূপানলে অস্তিত্ব আহুতি দিল! তিলোত্তমার রূপে সুন্দ-উপসুন্দের সর্ব্বনাশ ঘটিল, বিশ্বরূপেশ্বরী দুর্গার রূপে শুম্ভ-নিশুম্ভের সংহার হইল। স্বয়ং মদনান্তক মহাদেব হরির মোহিনী মূর্ত্তির মোহনরূপে মত্ত হইয়া প্রচণ্ড তাণ্ডবকাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড বিকম্পিত

করিলেন! আর রাধা-রূপে বাধা স্বয়ং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ নাকি রাধার রূপ-সাগরে ডুব দিয়াই গৌর হইয়া উঠিলেন! স্ত্রী রূপের এমনই প্রভাব—এমনই স্বভাব! অতএব সামান্য কাঁচা জীব কাম-কিঙ্কর মানব যে সুন্দরী সঙ্গিনীকেই সংসারের সর্ব্বস্ব স্বরূপ বুঝিবে, তাহার আর কথা কি?

শাস্ত্র ও মহাপুরুষের উপদেশে জানা যায় যে, "কামিনী-কাঞ্চন" সাধনের স্বভাব-শত্রু। অবশ্য গার্হস্থ্যাশ্রমে সাধ্বীসহধর্ম্মিণীকে সাধন-শত্রু বলা শাস্ত্রাদির উদ্দেশ্য নহে; শাস্ত্র-প্রচারিত "সহধর্ম্মিণী" পদেই তাহার পরিচয়। সাধ্বী স্ত্রীকে শাস্ত্র পতির ধর্ম্ম-সহায়িনী—এমন কি, উদ্ধারকারিণী—অর্থাৎ পারলৌকিক সদ্গতিবিধায়িনী পর্য্যন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অসৎপতির সাধ্বী স্ত্রী কি করেন?

"ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তদ্বৎ ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥"
যথা গর্ত্ত হতে সাপ সাঁপুড়িয়া উদ্ধারয়।
পতিকে উদ্ধারি তথা তৎসহ আনন্দে রয়॥"

সাধ্বী স্ত্রী এইরূপে নরকের গভীর গর্ত্ত হইতে দুরাচার পতিকে সবলে টানিয়া তুলিবারে শক্তি ধরেন। মৃত্যুর পরে কর্ম্মানুসারে পারলৌকিক সুগতি-দুর্গতি ভোগের বিধান; কিন্তু দেখুন, সাধ্বীর জগদাদর্শরূপিণী সাবিত্রী পতিকে প্রকারান্তরে মরিতেই দিলেন না! একথা এখন কেহ২ পৌরাণিক উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিলে দিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞান এখন জড়সর্ব্বস্বতা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া, স্বীকার করিতে উদ্যত হইতেছেন যে, সাধ্বী-চিত্ত-বলের অধ্যাত্ম-তাড়িতে তাড়িত হইয়া মৃত্যুও ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতে পারে! আধুনিক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবাদ বা "থিয়সফী" এ সত্যের সাক্ষ্য দিতে সোৎসাহে দণ্ডায়মান। স্বস্ত্যয়ন, তুলসীদান, 'ধর্ণা' দেওয়া, মাথা-কোটা, 'মানসা' করা ইত্যাদির দ্বারা যে জীবন-সঙ্কট ব্যাধির বিমুক্তি হয়, তাহাও উক্ত তত্ত্বেরই দীপ্ত দৃষ্টান্ত-ফল! সে যাহা হউক, ফলে যথার্থ সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়-বলে প্রকৃতির অব্যাহত বিধানও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

"কুগ্নপতি লয়ে সতী প্রবেশিল ঘরে।
রজনী প্রভাত আর কার সাধ্য করে।
চন্দ্র-সূর্য্য লুকাইল সুমেরুর আড়ে।
সত্য-বাক্য রক্ষা হেতু বেদ-বাক্য নড়ে॥"

বাল্যকালে একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা পয়ারে রচিত পৌরাণিক গ্রন্থে এই কয়টী কথা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আর ভুলি নাই। উহাতে কেমন যে সত্যের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য, দার্শনিকতার গাম্ভীর্য্য ও কবিত্বের মাধুর্য্য মিশিয়া আছে, তাহা একটু বুঝা গেলও যেন বুঝাইবার যো নাই; তাই আর ভুলিতে পারি নাই।

যাঁহারা হাসিতে হাসিতে জীবন্ত দেহ পতির জ্বলন্ত চিতায় সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রবল চিত্তড়িৎ তরঙ্গিত অলৌকিক মনোবল স্বপ্রাণসর্ব্বস্ব সুদুর্ব্বলচেতা আমরা কিরূপে ধারণা করিতে সক্ষম হইব? পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে যে সমস্ত অত্যদ্ভুত বিভূতি বা যোগ-শক্তির বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা এই সুসংযত কেন্দ্রীভূত মনোবল বা ইচ্ছা-শক্তিরই ফলমাত্র। স্বতঃসিদ্ধা সতীগণ পতিকুলে

স্বীয় অস্মিত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিয়া, সেই কেন্দ্রীভূত আত্ম-শক্তির অলৌকিক প্রভাবে পতির জন্য অসাধ্য সাধনেও সমর্থা হন। পতির দেহনাশে দেহত্যাগ বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু পতির খ্যাতিনাশে (অর্থাৎ নিন্দা মাত্র শ্রবণে) দেহত্যাগ কেবল সেই সতীকুলেশ্বরী শিব-সিমন্তিনী সতীই দেখাইয়াছেন! পতির প্রতি সতীর এইরূপ ধারণাতীত—চিন্তাতীত—কল্পনাতীত প্রেমের পরিচয় কেবল সেই দক্ষযজ্ঞেই জগতের লক্ষ্য হইয়াছিল। তাই শাস্ত্র বলেন, পৃথিবীর সতীনারীগণ সেই আদর্শ সতী ভগবতীর অংশরূপিণী। শাস্ত্রমতে "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" অর্থাৎ জগতে সমস্ত স্ত্রীই সাধারণতঃ জগদম্বার অংশোদ্ভূতা, কিন্তু বিশেষতঃ সতীগণই সেই মহাশক্তি সতীশ্বরীর শক্ত্যংশস্বরূপিণী, সন্দেহ নাই। অতএব সংসারের সুদুর্লভ রত্ন সতীস্ত্রী কদাচ সাধন-ভজনের বিঘ্ন নহেন; বরং সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা সমধিক সহায়স্বরূপিণী। সাধ্বী স্ত্রী সম্বন্ধে শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন,—

"নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যা সমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে সহায়ো ধর্ম্ম-সংগ্রহে॥"

ভার্য্যার সমান বন্ধু নাহি আন,
গতি নাহি ভার্য্যা সম।
ভার্য্যাই ভুবনে ধর্ম্ম-উপার্জ্জনে
সহায় প্রধানতম॥

অবশ্য সাধ্বী ভার্য্যাই প্রকৃত ভার্য্যা, তিনিই যথার্থ "সহধর্ম্মিণী" পদবাচ্যা; সুতরাং ভজন-পথের উৎকৃষ্ট আনুকূল্যদায়িনী তিনিই যথার্থ মনোরমা—যথার্থ সুন্দরী। সে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য সেই শিব-সুন্দরীর সৌন্দর্য্য-সিন্ধুরই একটি লহরী-লীলা মাত্র! সে সুন্দরী যদি ভাগ্যবান ভগবদ্ভক্ত গৃহীর গৃহিণী হন, তবে তিনি তাঁহার পতির ভক্তি-ভজনে সমধিক শক্তিবর্দ্ধিনীই হইবেন, সন্দেহ নাই। এরূপ সাধন-সহায়িনী ভার্য্যাই তন্ত্রশাস্ত্রে "শক্তি" পদবাচ্যা।

আলোচ্য শিক্ষা শ্লোকে ভক্ত সাধক ভগবৎ সমীপে যে সুন্দরী চাহেন না, বলিতেছেন, সে "সুন্দরী" শব্দ কেবল বাহ্য-সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বা রাজস-ভোগ বিলাস-বিহ্বলা ইতরনারীকেই বুঝাইতেছে। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে স্ত্রীজাতিকে সমর্থা, সমঞ্জসা, সাধারণী, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলায় গোপীগণ সমর্থা, মহিষীগণ সমঞ্জসা এবং কুব্জা প্রভৃতিই সাধারণী। শুদ্ধ পতি-সুখাকাঙ্ক্ষিণীই সমর্থা; কিঞ্চিৎ স্বসুখসহ পতি-সুখাকাঙ্ক্ষিণী সমঞ্জসা এবং কেবল স্বসুখাভিলাষিণীই সাধারণী। সংসারে সামান্য গৃহী মনুষ্যগণের মধ্যে উন্নত অদৃষ্টবান ও সমধিক সুকৃতিমান্ না হইলে সমর্থার স্বামীত্ব লাভ ভাগ্যে ঘটে না। এরূপ পতিসুখৈকপরায়ণা সাধ্বী "সমর্থাই" যথার্থ সুন্দরী। এরূপ সুন্দরী গৃহিণী সুন্দর অদৃষ্টবান গৃহীরই গৃহ-ভূষণ। এইরূপ শুদ্ধ সাধন সাধিনী পতির প্রিয়ানুরঞ্জিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী কদাচ "কামিনী-কাঞ্চন"এর কামিনী নহেন। ইনি সহধর্ম্মিণী, ইনি শক্তি, ইনি গৃহলক্ষ্মী। ইনি শান্তি-প্রীতি-পবিত্রতা; ইনি দয়া-ক্ষমা-সেবা।

আর যে নারী স্বভাবতঃই "কামিনী" শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থানুসারিণী, সেই নারীই "কামিনী কাঞ্চনের" কামিনী। সাধারণতঃ অধিকাংশ নারীই 'কামিনী'। ভক্ত সাধকগণের মুখে এবং নীতিশাস্ত্রাদিতে যে নারীনিন্দা, তাহা বস্তুতঃ এই কামিনীকেই লক্ষ্য করে। এই ভাবে ভক্তপ্রবর তুলসীদাস, সাধারণতঃ বিবাহের উপরেই রাগ করিয়া বলিয়াছেন,—

"বেহা বেহা সব্ কোই কহে
মেরা মনমে ভার্।
চড়্কে চৌদোলী ধো ধো সগ্ড়ি,
জেহেল্ মে লে যার্॥"
'বিয়ে বিয়ে' বলে নিখিল সকলে,
আমি মনে ভাবি তায়,—
চড়ায়ে চৌদোলে, ঢাকে ঢোলে রোলে
জেলে দিতে নিয়ে যায়!

আবার একটি দোঁহায় সাধারণতঃ স্ত্রী মাত্রেরই উপর এই ভাবে রাগ করিয়া বলিয়াছেন,—

"দিন্কা মোহিনী, রাত্কা বাঘিনী,
পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয়া সব্ বাউরা হোকে
ঘর্ ঘর বাঘিনী পোষে॥"
দিনের মোহিনী, রেতের বাঘিনী,
পলকে ২ শোণিত শোষে।
সংসার সকল হইয়া পাগল,
প্রতি ঘরে ২ বাঘিনী পোষে॥

তন্ত্রশাস্ত্রীয় বিখ্যাত "দত্তাত্রেয় সংহিতা"র নারী-নিন্দায় ইহা অপেক্ষাও ভীষণউক্তি দৃষ্ট হয়; যথা—

"স্বর্গ-মোক্ষ-সুখঘ্নী চ সাক্ষাদিন্দ্রিয়রূপিণী।
প্রত্যক্ষ রাক্ষসী নারী দেহিনঃ পিশিতাশিনী॥"
স্বর্গ-মোক্ষ-সুখ সংহারিণী।
সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়স্বরূপিণী॥
প্রত্যক্ষ রাক্ষসী নারী হয়।
দেহি-দেহ-ভক্ষিণী নিশ্চয়॥

আর একস্থলে বলিয়াছেন,—"বিশ্বাসঘাতকী সিদ্ধি-স্বর্গ-মোক্ষ-সুখার্গলা।" ইহা অপেক্ষা কুশীল-কঠোর গালি-বর্ষণ আর কি হইতে পারে? তবে কিনা, নারীজাতি মাত্রেই সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বতত্ত্ববিৎ মহর্ষির এ গালির লক্ষ্য নহে; কেবল কাম-কিঙ্করী পুরুষ প্রলয়ঙ্করী প্রমোদারাই ইহার বিশদ-বিষয়ীভূতা। পাছে সাধনযোগ্য পুরুষেরা ইহাদের কাম কুহক-কবলিত হইয়া নিধনপ্রাপ্ত হন, এই জন্যই এমন নিদারুণ নারীনিন্দন।

সুবিখ্যাত নীতিশাস্ত্রকার শিহ্লন মিশ্র পুরুষের মিথ্যামোহকর কামকল্পিত নারী-যৌবন-সম্ভোগের অসারতা প্রতিপাদনার্থে বলিয়াছেন,—

"সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া।
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব॥
অমেধ্যো ক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো
মহামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি॥"

অর্থাৎ—

আশ্লেষয় ঘনমাংসপিণ্ড স্তনজ্ঞানে।
মুখ ক্লেদ-লালা পিয়ে মধুতুল্য মানে॥
ঘৃণিত ক্লেদার্দ্র পথে রমি হর্ষ পায়।
মহামোহে অন্ধদের কিনা রম্য তায়॥

তত্ত্ববিৎ আচার্য্যগণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেও,—বস্তুতত্ত্ব তন্ন ২ করিয়া

বুঝাইয়া দিলেও তাহা মহামোহান্ধ মনশ্চক্ষের লক্ষ্যে আসেনা। শাস্ত্রকারেরা নানারূপেই বুঝাইয়াছেন। ফলে ভাগ্যবানেরাই বুঝে; অভাগারাই মজে। এই অসার শরীরের স্বভাব-অপবিত্রতা ও তৎসম্ভোগের ঘৃণনীয়তা বুঝাইতে "যোগোপনিষৎ" বলিতেছেন,—

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজাল সঙ্কুলে,
স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্র পুরীষভাবিতে,
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥

অর্থাৎ—

অপবিত্রতায় পূর্ণ কৃমিকীটময়।
স্বভাবতঃ ক্লেদযুত দুর্গন্ধ-নিলয়॥
মল-মূত্র-পূরিত এ ঘৃণিত শরীর।
মূর্খই আসক্ত ইথে—বিরক্ত সুধীর॥

এই অসার মলসার শরীরের প্রতি আসক্তি-বিরক্তির বিচারেই যথার্থ মূর্খ ও পণ্ডিতের পার্থক্য প্রতীত হয়। যে শাস্ত্র জানেনা, সে-ই যে মূর্খ, তাহা নয়; কিন্তু যে শাস্ত্র মানেনা, সে-ই প্রকৃত মূর্খ। কেহ হয় ত শাস্ত্র জানিয়াও মানেনা, কেহ আবার না জানিয়াও মানে; সুতরাং ফলিতার্থে পূর্ব্বোক্তই মূর্খ, পরোক্তই পণ্ডিত।

এই অসার শরীরের শেষ পরিণামইবা কি? শ্মশানের অস্থিসার নর-মুণ্ড-মালার কোনটিতে পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য কিছু মাত্র অনুভূত হইতে পারে কি? একটি সুন্দরী যুবতীর মুণ্ড-কঙ্কাল এক শ্মশান-খট্টাঙ্গে আটকিয়া ছিল। সেই কপাল-কুহরে বায়ু-প্রবাহ প্রবিষ্ট হইয়া শুণ্ ২ ধ্বনি হইতেছিল। আমাদের নীতিবিজ্ঞানাচার্য্য শিহ্লন কবিবরের মনে এই ভাব আসিল, যেন বায়ু সুন্দরীর মুণ্ড-কঙ্কালটি সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে,—

"ক্বৈতদ্বক্ত্রং ক্বাধরবিম্বং ক তদধর মধু
ক্বায়তাস্তে কটাক্ষাঃ।
ক্বালাপাঃ কোমলাস্তে ক্ব চ মদন-ধনু-
র্ভঙ্গুরো ভ্রূবিলাসঃ॥"

অর্থাৎ—

কোথা সেই মুখপদ্ম—সে অধর-সুধা?
নয়নে বিশাল সেই কটাক্ষ বা কোথা?
কোথা সেই মৃদু মিষ্ট বাণী বদনের?
কোথা সে ভ্রূভঙ্গ রঙ্গ ধনু মদনের?

যে মুখ দেখিবার জন্য দুদিন আগে কত মুখ উন্মুখ হইত, সে মুখ দেখিয়া আজ লোকে ঘৃণায় বিমুখ হয়! সংসারের শারীর রূপজ মোহের অসারতা এখানে যেন খিল ২ করিয়া হাসিয়া মুগ্ধকে মর্ম্মান্তিক উপহাস করিতেছে!

মুগ্ধের চৈতন্য নাই। সে নরককে স্বর্গ ভাবিতেছে; শ্মশানকে নন্দনকানন দেখিতেছে; আস্তাকুড়কে দেবায়তন মনে করিতেছে। নারী-রূপজ মোহের এমনি বিশাল বিক্রম! ইহারই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, পরমাত্মা হরির চরণে অহৈতুক ভক্তিভরে আত্মসমর্পণই জীবের একান্ত প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয়। যত প্রকার জাগতিক মোহের আকর্ষণ ও প্রলোভন সাধককে ভজন-পথভ্রষ্ট করে, তন্মধ্যে স্ত্রী-সৌন্দর্য্য-সংসক্তিই সর্ব্বপ্রধান। বড় বড় মুনি-ঋষিরাও এই টানে অনেক উচ্চ হইতে পড়িয়া গিয়াছেন; ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস স্পষ্টরূপে তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। ফলে সাধুগুরু-কৃপায় এই একটির উপরে বিজয়

লাভ করিতে পারিলে সঙ্গে ২ অনেক শত্রুই বিজিত হয়।

অতঃপর আমরা মূল শ্লোকালোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হইব। আলোচ্য শ্লোকটিতে ভগবদুদ্দেশে যে "সুন্দরী চাহিনা" বলা হইয়াছে, সে অবশ্য সেই সুন্দরী, যাহার সৌন্দর্য্য কেবল কামজ মোহের প্রবল পরাক্রমে পুরুষ চিত্ত প্রমথিত করে। "দত্তাত্রেয়" প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণশাস্ত্রে, যোগবাশিষ্টে, যোগোপনিষদে; শান্তিশতক, বৈরাগ্য-শতক প্রভৃতি নীতি-শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে যে ভাবের নারী নিন্দা নিবেশিত হইয়াছে, সেই ভাব বিবর্ত্তীভূতা নারীই এই শিক্ষা-শ্লোকোক্ত "সুন্দরী।" মহাত্মা তুলসীদাসের "বাঘিনী" ও ভব-কারাগার-শৃঙ্খলরূপিণীই এই সুন্দরী। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের "কামিনী-কাঞ্চন"এর কামিনীই এই সুন্দরী। আহা! সর্ব্বসৌন্দর্য্যসারস্বরূপিণী ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধিকার সৌন্দর্য্য-সাগরে সানন্দে সন্তরমান শ্রীশ্যামসুন্দরের সেই সৌন্দর্য্যেও মূঢ়াতিমূঢ় জীবের মনোনয়ন মুগ্ধ হয় না; কিন্তু সাধুজন ঘৃণ্য জঘন্য পার্থিব কাম-কলুষ-কল্পিত কৃত্রিম কামিনী-সৌন্দর্য্যের কুহকে তাহা অন্ধীভূত হয়! কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অতুল-সৌন্দর্য্য-বিলাসের সম্মুখে যে অসার নারী-সৌন্দর্য্য মোহ-যবনিকা প্রসারিত করে, তাহা এই আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোকের সুন্দরীরই সৌন্দর্য্য। তাই ভক্ত বলিতেছেন, ভগবন্! আমি সুন্দরী চাই না; অর্থাৎ এই অনিত্য পার্থিব স্ত্রী-সৌন্দর্য্য-মোহে মজিয়া যেন আমি অপার্থিব নিত্যধন সর্ব্বসৌন্দর্য্য-নিকেতন তোমার চরণ না হারাই। যেন নারী-সৌন্দর্য্য-বিষে আধ্যাত্মিক নিধন প্রাপ্ত হইয়া তোমার সাধন-সুধাস্বাদনে বঞ্চিত না হই।

ভক্ত বলিতেছেন, ভগবন্! আমি ধন চাই না; কেন না দেব-দুর্লভ—বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত—শিব-সর্ব্বস্বধন তোমাধনে সাধনের আশা তুমিই এ হৃদয়ে উদয় করিয়াছ; সুতরাং অনিত্য ছার অসার ধনের আশা আর আসিবে কেন? বিষয়ের জন্যই ধনের প্রয়োজন; যাহাকে তোমার প্রেমসুধার পিপাসী করিয়াছ, বিষয় তাহার বিষ; অতএব বিষের মূল্যের জন্য সুধার্থী ব্যগ্র হইবে কেন? তবে তোমারই ভজনের বিঘ্ন বিমোচনের জন্য যদি সংসারাশ্রমে ধনের প্রয়োজন হয়, তবে আমাকে "নিমিত্ত মাত্র" করিয়া তুমিই তাহা পূরণ করিবে; তদর্থে আমার ব্যগ্রতা কেবল ভুল ও ভজন-ভ্রষ্টতার মূল মাত্র।

তারপর ভক্ত বলিতেছেন, আমি জন চাই না। অর্থাৎ জন-সঙ্গ বা জনসঙ্গাসক্তি আমি চাই না। আমি নির্জ্জনে—অর্থাৎ জন-নিঃসঙ্গ-নিশ্চিন্ততায় তোমাধনে সেবা করিতে চাই। কি জানি, যদি জনসঙ্গাসক্তিবশে সুজন-সঙ্গ হারাইয়া দুর্জ্জন-সঙ্গে পতিত হই, তবে হয়ত তোমাতে পতিত্ব-বুদ্ধি বিরহে পাতিত্যই ভাগ্য ঘটিবে। কেন না, তুমি নিত্য সুজনেরই চিত্ত-পুরে, কিন্তু দুর্জ্জনের দূরাতিদূরে। অপর, সংসার তোমারই; আমি সেবক মাত্র। "নাহং কর্ত্তা, ঈশ্বরায় ভৃত্যবং করোমি" আমাকে এই স্বতঃসত্যপূত আত্মপ্রতীতিতেই পরিচালিত করিতেছ; অতএব যদি তোমারই

সংসারের সেবার্থই আমার জনের প্রয়োজন তুমি বিধান কর, তবে স্ত্রী-পুত্র-মিত্র-ভৃত্যাদির জনতা প্রয়োজনানুরূপ প্রদান কর, তাহাতেই বা আমার এই অকিঞ্চন অহংজ্ঞানের আপত্তি কি? তুমি আমার যত দিন অহংজ্ঞান বা আমিত্ব-বোধ রাখিবে, ততদিন অবশ্য আমাতে ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্বও থাকিবে। তাই নিবেদন, পার্থিব ধনে আমার অনিচ্ছা; কেবল তোমার নাম-ধনে—প্রেমধনে—চরণধনেই ইচ্ছা। সাংসারিক জন-সঙ্গে আমার অনিচ্ছা; কেবল তোমার নিজ জনের শুভ সাধু-সঙ্গেই আমার ইচ্ছা। কেননা বিবিধ শাস্ত্রবাক্যে তুমিই কৃপা করিয়া জগতে জানাইয়াছ যে, সাধুসঙ্গ ভিন্ন জীবের সর্ব্বার্থসাধিনী অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তির ভাবানুভবও সম্ভব নয়। ফলে তোমাতে অহৈতুকী ভক্তিই আমার মূল ইচ্ছা, এবং তাহারই সাধনার্থ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইচ্ছা বা অনিচ্ছা।

অপিচ, ভক্ত বলিতেছেন, সুন্দরীতে আমার অনিচ্ছা। রিপুর মধ্যে কামই প্রথম ও প্রধান; আর পৃথিবীতে প্রলোভনের বস্তুর মধ্যেও কামিনীই প্রথম ও প্রধান। কামীর চক্ষে কামিনী বিশ্বসৌন্দর্য্যসারভূতা। অধিক কি, যাহাকে পাইয়া মূঢ় জীব তোমাকে চাহে না; আহা! যাহার অসার সৌন্দর্য্যের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া, ভুবন-ভুলানোধন—ভোলানাথের মন ভুলানো ধন যে তুমি, তোমাকেও জীব ভুলিয়া থাকে, সে সর্ব্ব-নাশিনী সুন্দরী আমি চাই না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

ধর্ম্মপদ।

মনঃ পূর্ব্বঙ্গমা ধর্ম্মা মনঃ শ্রেষ্ঠা মনোময়াঃ
মনসা চ প্রদুষ্টেন ভাসতে বা করোতি বা,
ততস্তং দুঃখমন্বেতি চক্রং চ বহতঃ পদং ১।
মনঃ পূর্ব্বঙ্গমাঃ ধর্ম্মা মনঃ শ্রেষ্ঠা মনোময়াঃ।
মনসা চ প্রসন্নেন ভাসতে বা করোতি বা।
ততস্তং সুখমন্বেতি ছায়েব হ্যনুগামিনী ॥ ২ ॥

আমাদের সংজ্ঞা, সংস্কার ও বেদনা মনের দ্বারা শাসিত, মনই তাহাদের পরিচালক, তাহারা মনোময়। যদি প্রদুষ্ট মনের দ্বারা কোনও কর্ম্ম করা যায়, তাহাহইলে চক্র যেমন বহনকারী বলীবর্দ্দের অনুগামী হয়, দুঃখও তদ্রূপ প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তির অনুগমন করে। ১

---

* ধর্ম্মপদ প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ। ইহা পালীভাষাতে লিখিত। এই গ্রন্থে যেরূপ গভীর ও মনোহর ভাবে, অথচ কবিত্ব সহকারে মূল্যবান্ উপদেশগুলি লিপীবদ্ধ করা হইয়াছে, সচরাচর অন্যত্র প্রায় সেরূপ হয় নাই। আমরা পালীকে কদাচিৎ সংস্কৃতে পরিণত করিয়াছি, কদাচিৎ বা মূলই রাখিয়াছি। সংস্কৃতবিশুদ্ধি আমাদের লক্ষ্য নহে। যাহাতে আমাদের পাঠকগণ ইহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন, এই জন্যই মূলে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। জানি না ইহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে। কিন্তু পাঠকবর্গের উপর গুণ-দোষ বিচারের ভার অর্পণ করিয়া আমরা কেবল মাত্র কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতে চলিলাম। ধর্ম্মপদ ক্রমশঃ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে। আশা করি পাঠকগণ ইহার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

হিঃ পঃ সঃ।

আমাদের সংজ্ঞা, সংস্কার ও বেদনা মনের দ্বারা শাসিত, মনই তাহাদের পরিচালক, তাহারা মনোময়। যদি প্রসন্ন বা বিশুদ্ধ মনের দ্বারা কোন কার্য্য করা যায়, তাহাহইলে ছায়া যেমন শরীরের অনুগমন করে, সুখ তদ্রূপ বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির অনুসরণ করে। ২

অক্কোচ্ছি মং অবধিমং অজিনিমং অহাসিমে-
যেচ তং উপনয়্হন্তি বৈরং তেষাং ন শাম্যতি।৩
অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসিমে
যে তং ন উপনয়্হন্তি বৈরং তেষূপশাম্যতি।৪

তিনি আমার প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে প্রহার করিয়াছিলেন, তিনি আমার ধনাদি অপহরণ করিয়াছিলেন, এইরূপ যাহারা সর্ব্বদা চিন্তা করে, তাহাদের বৈরভাব কখনও শমতাপ্রাপ্ত হয় না ৩

তিনি আমার প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে প্রহার করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে জয় করিয়াছিলেন, তিনি আমার ধনাদি অপহরণ করিয়াছিলেন, এইরূপ যাহারা সর্ব্বদা চিন্তা করে না, তাহাদের বৈরভাব প্রশমিত হয়।

নহি বৈরেণ বৈরাণি শাম্যন্তীহ কদাচন
অবৈরেণ চ শাম্যন্তি এস ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।৫
পরে চ নবিজানন্তি মযং এত্থ যমামসে
(যমামসে)
যে চ তত্থ বিজানন্তি ততঃ শাম্যন্তি
মেধগাঃ।৬

বৈরভাব দ্বারা বৈরভাব কখনও নষ্ট হয় না, অবৈরভাব অর্থাৎ প্রেমের দ্বারা বৈরভাব নষ্ট হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।৫

এখান হইতে আমরা যমসদনে গমন করিব, ইহা মূর্খেরা জানে না। যে সমুদায় পণ্ডিতগণ ইহা অবগত হন, তাঁহাদের সংসারে কলহ থাকে না।৬

শুভানুপস্সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবুতং
ভোজনম্হি অমত্তঞ্ঞুং কুসীতং হীনবীরিয়ং
তং বৈ পসহতি মারো বাতো রুক্খং বৈ
দুর্ব্বলং।৭

"অশুভানুপস্সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু সুসংবুতং
ভোজনম্হি চ মত্তঞ্ঞুং শ্রদ্ধং আরদ্ধবীরিয়ং
তং বৈ ন পসহতি মারো বাতঃ শৈলং বৈ
পর্ব্বতং।৮

যিনি সাংসারিক সুখ অন্বেষণ করিয়া অসংযতেন্দ্রিয় হইয়া, ভোজনে অসংযত ও অলস এবং হীনবীর্য্য হইয়া বিচরণ করেন, বায়ু যেরূপ দুর্ব্বলবৃক্ষকে বিনাশ করে, তদ্রূপ মারও তাহাকে অভিভব করে।

যিনি সংসার সুখ অন্বেষণ না করিয়া ইন্দ্রিয়ার্থে সংযত হইয়া ভোজনে সংযত শ্রদ্ধাবান্ বীর্য্যবান্ হইয়া বিচরণ করেন, মার তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না; যেমন সামান্য বায়ু শিলাময় পর্ব্বতের কোনও ক্ষতি করে, না তদ্রূপ।

অনিক্কাবায় কাষাবং যো বত্থং পরিদহেস্সতি
অপেতো দমসচ্চেন ন সঃ কাষাবমর্হতি।৯
যশ্চ বান্তকষায়ঃ স্যাৎ শীলেষু সুসমাহিতঃ
উপেতো দমসচ্চেন স বৈ কাষায়মর্হতি।১০

যিনি নিষ্কাষায় অর্থাৎ পাপশূন্য হইতে পারেন নাই, তিনি যদি কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন, তাহাহইলে তিনি দম ও সত্য হইতে বিযুক্ত হইয়া কাষায় বস্ত্রের অনুপযুক্ত হইয়া থাকেন। মহাভারতে এইরূপ একটী শ্লোক আছে, যথা,—

অনিক্কাষায় কাষায়ং যোহার্থং ইতি বিদ্ধি যম্
ধর্ম্মধ্বজানাং মুণ্ডানাং বৃত্ত্যর্থং ইতি মে মতিঃ।

ইহার অর্থ এই, যে ব্যক্তি অপবিত্র কিন্তু কাষায়বস্ত্র পরিধান করে, তাহা তাহার বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য করে বলিয়া জানিবে। এই সকল ধর্ম্মধ্বজী মুণ্ডিতকেশেরা অর্থোপার্জ্জনের জন্যই এইরূপ বেশ ধারণ করে বলিয়া আমার মনে হয়।

যিনি কাষায় অর্থাৎ পাপ বিমুক্ত হইয়াছেন, (বমন করিয়া ফেলিয়াছেন) যিনি শীলতায় সুসমাহিত আছেন, তিনি দম ও সত্য দ্বারা যুক্ত হইয়া কাষায় বস্ত্রের উপযুক্ত হইয়া থাকেন। ১০

অসারে সার মতয়ঃ সারে চাসার দর্শিনঃ
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিথ্যাসংকল্প গোচরাঃ।১১

সারঞ্চ সারতো জ্ঞাত্বা অসারঞ্চ অসারতঃ
তে সারমধিগচ্ছন্তি সম্যক্ সংকল্প গোচরা।১২

যাহারা অসারে সার বলিয়া মনে করে, এবং সারকে অসার মনে করে, তাহারা সার কখনও প্রাপ্ত হয় না, তাহারা মিথ্যা সঙ্কল্প অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।১১

যাহারা সারকে সার বলিয়া জানেন এবং অসারকে অসার বলিয়া জানেন, তাহারাই সার প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের সম্যক সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হয়।১২

যথা অগারং দুচ্ছন্নং বৃষ্টিঃ সমতি বিজ্ঝতি
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগঃ সমতি বিজ্ঝতি ১৩
যথা অগারং সুচ্ছন্নং বৃষ্টিঃ ন সমতি বিজ্ঝতি
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগঃ ন সমতি বিজ্ঝতি ॥১৪

যেমন দুশ্ছন্ন (যাহা ভাল রূপে ছাওয়া হয় নাই অর্থাৎ যাহাতে ছিদ্র আছে) গৃহে অতি বেগে বৃষ্টি প্রবেশ করে, সেইরূপ চিন্তাবিহীন চিত্তে রাগ (অনুরাগ বা তৃষ্ণা) প্রবল বেগে প্রবিষ্ট হয়।

আর যেরূপ সুচ্ছন্ন (ভালরূপে ছাওয়া) গৃহে বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ চিন্তাশীল চিত্তে রাগ অর্থাৎ তৃষ্ণা প্রবিষ্ট হইতে পারে না॥

ইহ শোচতি প্রেত্য শোচতি পাপকারী উভয়ত্র শোচতি।
স শোচতি স বিহঞ্ঞতে দৃষ্ট্বা কর্ম্ম কিলিষ্ট-মাত্মনঃ ।১৫

ইহ মোদতে প্রেত্য মোদতে কৃতপুণ্য উভয়ত্র মোদতে—
স মোদতে স প্রমোদতে দৃষ্ট্বা কর্ম্ম বিশুদ্ধি মাত্মনঃ ।১৬

পাপ কার্য্যকারী ব্যক্তি ইহকালে শোক করে, পরকালে শোক করে, উভয়ত্রই সে শোক করে। সে নিজের কিলিষ্ট কর্ম্ম—অর্থাৎ কলুষিত কার্য্য দর্শন করিয়া শোক করে এবং সেই শোকাবেগ কষ্টে সহ্য করিতে থাকে।

পুণ্যকারী ব্যক্তি ইহলোকে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, পরলোকেও আনন্দ প্রাপ্ত হয়, উভয় লোকেই সে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, সে নিজের কর্ম্মবিশুদ্ধি দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, প্রমুদিত হয়।

ইহ তপ্যতে প্রেত্য তপ্যতে পাপকারী উভয়ত্র তপ্যতে,
পাপং মে কৃতমিতি তপ্যতে ভূয়ং তপ্যতে দুর্গতিংগতঃ।১৭

ইহ নন্দতি প্রেত্য নন্দতি কৃতপুণ্য উভয়ত্র নন্দতি,
পুণ্যং মে কৃতমিতি নন্দতি ভূয়ং নন্দতি সুগতিংগতঃ। ১৮

পাপানুষ্ঠানকারী ইহলোকে পরলোকে উভয়ত্রই তাপ প্রাপ্ত হয়। "আমি পাপ করিয়াছি" এইরূপ ভাবিয়া তাপ প্রাপ্ত হয়, দুর্গতি (নিকৃষ্ট নরকাদি কিম্বা নীচজন্মাদি) প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় পরিতপ্ত হয়।

পুণ্যকারী ইহলোকে পরলোকে উভয়ত্রই আনন্দিত হয়। আমি পুণ্য করিয়াছি" মনে করিয়া আনন্দিত হয়, সদ্গতি (উচ্চজন্ম অথবা ঊর্দ্ধ লোক গমনাদি) প্রাপ্ত হইয়া আরও আনন্দিত হয়।

বহ্বপি চেৎ সংহিতাং ভাষমানঃ ন তৎকরো ভবতি নরঃ প্রমত্তঃ।
গোপো ব গাঃ গণয়ন্ পরেষাং ন ভাগবা শ্রামণ্যস্য ভবতি। ১৯
অল্পমপি চেৎ সংহিতাং ভাষমাণঃ ধর্ম্মস্য ভবত্যনুধর্ম্মচারী।
রাগঞ্চ দ্বেষঞ্চ প্রহায় মোহং সম্যক্ প্রজানন্ সুবিমুক্তচিত্তঃ।
অনুপাদিয়ান ইহবাদুরংবা স ভাগবা শ্রামণ্যস্য ভবতি। ২০

প্রমত্ত ব্যক্তি যদি বহুল পরিমাণে সংহিতা (মূলে সহিত' আছে; বুদ্ধদেবের উপদেশকে পালিভাষায় ঐ নাম দেওয়া হয়, ত্রিপিটক গ্রন্থেরই উহা নামান্তর।) উচ্চারণ করে, তথাপি কখনই সে ধর্ম্মকারী হইতে পারে না। যেমন গোপ অপরের গোরু গণনা করে, নিজে তাহার ফলভাগী হয় না, তদ্রূপ প্রমত্ত ও পঞ্চস্কন্ধ ধর্ম্মের ভাগী হয় না।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে, ধর্ম্মের অনুগমন করে, রাগ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগ করিয়াছে, সম্যক জ্ঞানে সুবিমুক্ত চিত্ত হইয়াছে, ইহলোকে বা পরলোকে যাহার গ্রহণ লালসা নাই, সে যদি অল্প মাত্রও সংহিতা উচ্চারণ করে, তথাপি সে পঞ্চস্কন্ধ ধর্ম্মের ভাগী হয়।

যমকবর্গঃ প্রথমঃ।*

(ক্রমশঃ)

দশম মণ্ডল।

১৪ সূক্ত। (১)

১-৫, ১৩—১৬ যম। ৬ নিম্নোক্ত দেবতা। ৭—৯ নিম্নোক্ত দেবতাগণ বা পিতৃগণ। ১০—১২ শ্বাদ্বয়।

যম ঋষি।

যিনি মন সাধুগণে লয়ে যান সুখধামে
অনেকের পথ সাফ্ কৃপায় যাঁহার;
যাঁহার নিকটে সবে অবশ্য যাইতে হবে,
তিনি বৈবস্বত যম হোম কর তাঁর। ১

---

* এই যমকবর্গ পরিচ্ছেদে দুই দুই শ্লোক দ্বারা এক একটী বিষয়ের উভয় দিক প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্যই ইহাকে "যমকবর্গ" বলা যায়।

(১) এই সূক্তে ধার্ম্মিক লোকদিগের পরকালে সুখলাভের বিবরণ আছে। স্বর্গের সুখবিধান কর্ত্তাকে যম নাম দিয়া স্তব করা হইত। সুতরাং পৌরাণিক যমের ন্যায় বৈদিক যম দণ্ডদাতা নহেন। তিনি মাত্র সুখবিধাতা। পাঠক দেখিবেন, এই সূক্তের কুত্রাপি যমের মুহুরি চিত্র গুপ্তের কথা নাই। ১০ম মণ্ডলের আরও অনেকটী সূক্তে যমের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার কোথাও চিত্রগুপ্তের কথার উল্লেখ নাই।

কোথায় থাকিতে হবে তিনিই দেখান আগে
সে পথের নাহি হয় কখন অন্যথা ;
আমাদের পিতৃগণ করিলা যত্র গমন
কর্ম্ম অনুসারে লোক যাইবেক তথা।২
মাতলী কব্য সকলে, অঙ্গিরনিকরে যম,
দেব বৃহস্পতি ঋক্‌কগণে সম বর্দ্ধিত ;
যাঁহাদিগে দেবগণ, যাঁহারা বা দেবগণে
সম্বর্দ্ধনা করে, হয় সকলে বর্দ্ধিত ;—
কেহ বা 'স্বাহায়' কেহ 'স্বধা'য় হ্লাদিত।৩
এই যজ্ঞে এসে যম বস তুমি মন্ত্রবিৎ
অঙ্গিরা নামক পিতৃ লোকের সহিত।
কবিদের মন্ত্র সব তোমাকে করুক স্তব
হোম পানে হে রাজন্ হও আমোদিত।৪
সে অঙ্গিরা পিতৃগণ যজ্ঞীয় বিরূপানন
তাঁহাদের সহ বসে আমোদ করহ।
তব পিতা বিবস্বতে করিতেছি আবাহন
এই যজ্ঞে এসে সবে কুশেতে বসহ ৫ ॥
অঙ্গিরা, অথর্ব্বা, ভৃগু আমাদের পিতৃগণ
এই মাত্র সবে উপস্থিত সোমপানে।
যজ্ঞীয় সে পিতৃগণ করিয়া শুভ মনন
প্রসন্ন হইয়া যেন রাখেন কল্যাণে ॥৬
যাও যাও সেই পথে পূর্ব্ব পিতৃগণ যাতে
বিগত সে পথে তুমি করহ গমন।
স্বধায় হ্লাদিত হয়ে আছেন রাজা উভয়ে—
যম ও বরুণে গিয়া করহ দর্শন (১)।৭
পিতৃগণ সহকারে যমে কর্ম্মে মিলিবারে
যাও স্বর্গে যাও সেই ধামে চমৎকার।
অবদ্য (২) ত্যাগ করিয়া পুনরস্ত (৩) প্রবেশিয়া
উজ্জ্বল তনু ধরিয়া যাও পর পার ।৮

(১) মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র। (২) অবদ্য-পাপ। (৩) অস্ত, অস্তনামক গৃহ।

দূরে যাও, যাও, সর এই লোক মনোহর
পিতৃলোক ইঁহাকেই করিছেন দান।
দিবা দ্বারা জল দ্বারা শোভিত আলোক দ্বারা
প্রদান করেন যম মৃতকে সেস্থান ॥৯
চতুরক্ষ সারমেয় শবল কুকুর দ্বয়
সাধু পথে তাহাদিগে অতিক্রমি যাও।
মৃত! বিজ্ঞ পিতৃগণে যেখানে যমের সনে
আমোদে নিয়ত রত সেইখানে যাও ॥১০
প্রহরী স্বরূপ তব যাহারা নেহারে সব
চতুরক্ষি পথরক্ষী সে যুগ্ম কুকুর,
তাহাদের কোপ হ'তে যম! রক্ষ এই মৃতে
রাজন্ কল্যাণ কর, রোগ কর দূর ॥
সেই দুই যমদূত বৃহন্নাসা অতদ্ভুত,
অতৃপ্ত—সবার করে পশ্চাদে ধাবন ;
আমাদিকে অদ্য তারা দেয় যেন বল বাড়া
করে যেন ভদ্র, পাই সূর্য্যের দর্শন।১২
যমের জন্যেতে সোম কর অভিষব ;
হোম কর তাঁর জন্যে হোম দ্রব্য সব।
এই সুসজ্জিত যজ্ঞ অগ্নি দূত যার,
যম অভিমুখে তাহা করে অভিসার।১৩
সেবা কর যমরাজে হোম কর তার,
ঘৃতযুক্ত দ্রব্য তাঁকে দেও উপহার ;
দেবগণ মাঝে তিনি দিয়ে দীর্ঘ আয়ু,
আমাদিগে, যেন যম করেন চিরায়ু।১৪
যমরাজে সুমধুর হব্য কর হোম ;
যে সকল ঋষি পূর্ব্বে লভিল জনম,
যাঁহারা করিলা ধর্ম্মপথ আবিষ্কার,
তাদিগেও আমাদের এই নমস্কার।১৫
(১) ত্রিকদ্রুক নামে যজ্ঞ পান যমরাজ,
ষড়েক বৃহত স্থানে তাঁহার বিরাজ ;
ত্রিষ্টুপ গায়ত্রী আদি ছন্দ আছে যাহা,
যম প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা।১৬
শ্রীমধুসূদন সরকার।

(১) ষট্ ও এক বৃহৎস্থান, ছয় স্থান যথা ; দ্যুলোক, ভূলোক, জল, উদ্ভিজ্জ, ঋক্ ও সুনৃত।

সামবেদ সংহিতা।

———o———

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অথ চতুর্থ খণ্ডে।

সেয়ং প্রথমা।

(শংযুঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা ব দক্ষসে।
১ ২ ১ ২৩১২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩১র
প্র প্র বয়মমৃতং জাত বেদসং প্রিয়ং মিত্রং
২র
ন শংসিষম্

যজ্ঞা যজ্ঞা—যজ্ঞে যজ্ঞে সর্ব্বেষু যাগেষু।১॥

বঃ—যূয়ং। অগ্নয়ে—অগ্নির বৃদ্ধির জন্য (কর্ম্মণি চতুর্থী) গিরা গিরা—স্তুতিরূপয়া বাচা।

দক্ষসে—প্রবৃদ্ধায়।

প্র প্র শংসিষম্—(প্র শব্দের দ্বিরুক্তি পাদ পূরণার্থ) প্রশংসামঃ।

অমৃতং—মরণ রহিতং।

জাত বেদসং—জাতানাং বেদিতারং; জাত প্রজ্ঞানং জাতধনং বা জন্তুগণের জ্ঞাতা

মিত্রং ন—সখি ভূতমিব প্রিয়মনুকূলম্—বন্ধুর ন্যায় প্রিয় ও অনুকূল।

হে স্তোতাগণ! তোমরা স্তুতিরূপ বাক্যে অমর, প্রাণিগণের জ্ঞাতা, ও বন্ধুর ন্যায় অনুকূল অগ্নিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য প্রতি যজ্ঞে তাঁহাকে প্রশংসাকর এবং আমরাও প্রশংসা করিতেছি।১।

অথ দ্বিতীয়া।

(ভর্গ ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ২
পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যুত দ্ব
৩ ১ ২
দ্বিতীয়য়া।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
পাহি গীর্ভি স্তি সৃভিরূর্জাম্পতে পাহি
২ ৩ ১ ২
চতসৃভির্বসো (ক)॥২॥

হে অগ্নে! নঃ—অস্মান্।

একয়া—ঋচা গিরা—স্তুতিবাক্য দ্বারা।

পাহি—রক্ষ। উত—অপিচ।

দ্বি তীয়য়া—ঋচা—দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা।

পাহি—পালয়।

তিসৃভিঃ গীর্ভিঃ—স্তুতিভিঃ।

উর্জাম্—অন্নানাং বলানাং বা।

হেপতে!—স্বামিন্!

চতসৃভিঃ—গীর্ভিঃ।

হেবসো—বাসক!—গার্হপত্যাগ্নে!

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে একটী স্তুতি বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া রক্ষা কর; এবং দ্বিতীয় স্তুতিবাক্য দ্বারা রক্ষা কর। অন্ন-স্বামিন্! তুমি আমাদিগকে তৃতীয় বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া রক্ষা কর; হে গার্হপত্যাগ্নি! তুমি আমাদিগকে চতুর্থ বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া পালন কর।২॥ (খ)

অথ তৃতীয়া

(শংযুঋষিঃ)

৩ ২ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃহদ্ভিরগ্নে অর্চিভিঃ শুক্রেণ দেব শোচিষা।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ভরদ্বাজে সমিধা নো যবিষ্ঠ রেবৎ পাবক
দীদিহি॥৩॥

হে দেব!—দাপদি গুণযুক্ত! যবিষ্ঠ—যুবতম!

(ক) এই মন্ত্রটি উত্তরার্চ্চিকে ৭।২।৪।১।

(খ) স্তব করিতে হইলে চারি প্রকার শব্দের আবশ্যক হয় যথা বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট ও অখণ্ড বাক্যস্ফোট।

পাবক—শোধক ! অগ্নে !
শুক্রেণ—নির্ম্মলেন।
শোচিষা—তেজসা।
ভরদ্বাজে—অস্মাভ্রাতরি।
সমিধানঃ—সমিধ্যমানস্বং—তুমিকাষ্ঠ যুক্ত হইয়াছ।
বৃহদ্ভিঃ—মহদ্ভিঃ।
অর্চিভিঃ—তেজোভিঃ।
নঃ—অস্মদর্থং।
রেবৎ—ধনযুক্তং যথা ভবতি তথা।
দীদিহি—দীপ্যস্ব—প্রদীপ্ত হও।

হে দেব ! হে যুবতম ! হে শোধক ! হে অগ্নি ! তুমি কাষ্ঠযুক্ত হওয়াতে বৃহৎ তেজের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ; তজ্জন্ত তুমি (আমার ভ্রাতা) ভরদ্বাজে স্বীয় নির্ম্মল তেজের সহিত ধনশালী হইয়া আমাদের জন্ত প্রদীপ্ত হও।৩।

অথ চতুর্থী।

(বসিষ্ঠ ঋষিঃ)

১ ২ ১ ১ ২ ৩ ১ ২
যে অগ্নে স্বাহুতঃ প্রিয়াসঃ সন্তু সূরয়ঃ।
৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
যন্তারো যে মঘবা নো জনানা নূর্ব্বং দয়ন্ত
১ ২
গোনাম্॥

হে অগ্নে ! স্বাহুত—যজমানৈঃ সুষ্ঠুভিঃ হুত ! যজমানগণ কর্ত্তৃক শোভনরূপে আহুত !
যে—তব। সূরয়—প্রেরকাঃ—স্তোতারঃ—স্তোতাগণ;
প্রিয়াসঃ—প্রিয়াঃ সন্তু ভবন্তু।
যে মঘবানঃ—ধনবন্তঃ।
যন্তারঃ—প্রদাতারঃ—প্রদাতাগণ।

জনানাং—অস্মদীয়ানাং—অস্মদীয় জন সকলকে।
উর্ব্বং—সমূহং।
দয়ন্ত—প্রযচ্ছন্তি।

হে অগ্নি ! হে সম্যক আহুত ! তোমার স্তোতাগণ প্রিয় হউন ও যাঁহারা ধনবান ও অস্মদীয় জন সকলকে ও গো সকলকে দান করিতেছেন, তাহারাও তোমার প্রিয় হউন।

অথ পঞ্চমী।

(ভারদ্বাজ ঋষিঃ)

১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে জরিত বিশ্‌পতি স্তপানো দেব
৩ ১ ২
রক্ষসঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
অপ্রোষিবান্ গৃহপতে মহা ৺ অসি
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দিব্যপায়ুর্দ্দুরোণযুঃ ৫॥

হে অগ্নে !
জরিতঃ—স্তোতঃ—স্তুত্য !
বিশ্‌পতিঃ-প্রজানাং পালকঃ—প্রজাসকলের পালক।
রক্ষসঃ তপান—রাক্ষসানাং সন্তাপকঃ অসি—রাক্ষসগণের সন্তাপক হও।
হে গৃহপতে ! যজমান গৃহস্য পালকাগ্নে ! ত্বং অপ্রোষিবান্—যজমানস্য গৃহমত্যজন্—যজমানের গৃহ ত্যাগ করিয়া।
মহান্ অতিশয়েন পূজ্যো হসি—অত্যন্ত পূজ্য হও, দিবঃ—দ্যু লোকস্য।
পায়ুঃ—পাতা—রক্ষক।
দুরোণযুঃ—যজমান গৃহস্য মিশ্রয়িতা—সর্ব্বদা বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ॥

হে অগ্নি! হে স্তুতা! তুমি প্রজাগণের পালক ও রাক্ষসগণের সাস্তপক। তুমিদ্যু-লোকের রক্ষক; তুমি যজমান গৃহে সর্ব্বদা থাক, তজ্জন্য হে যজমান গৃহপতে! তুমি যজমান গৃহ পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহাদের অত্যন্ত পূজ্য হও।৫॥

অথ ষষ্ঠী।

(প্রাকণ্ব ঋষি)

২ ৩ ১ ২ ৩১২৩১র ২র
অগ্নে বিবস্ব দুষস শ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩২ ৩১
আদাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবা উ
২৩ ১ ৩
উষর্বুধঃ ॥৬।

হে অগ্নে!
ত্বং উষসঃ—উষো দেবতায়াঃ সকাশাৎ।
রাধঃ—ধনং।
দাশুষে—হবি র্দাতবতে যজমানায়—হবি র্দানকারী যজমানকে।
আবহ—আনীয় প্রাপয়—আনিয়া দাও।
অমর্ত্ত্য—মরণ রহিত। হে জাতবেদ!—জাতানাং বেদিতঃ!—প্রাণিগণের জ্ঞাতা।
বিবস্বৎ—বিশিষ্ট নিবাসোপেতং।
চিত্রং—নানাবিধং। অদ্য—অস্মিন্ দিনে।
উষর্বুধঃ—উষঃ কালে প্রবুদ্ধান্। দেবান্—দেবতা সকলকে।

হে অগ্নি! তুমি হবির্দানকারী যজমানকে উষাদেবতার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট নিবাসোপেত নানাবিধ ধন আনিয়া দাও হে অমর! হে প্রাণিগণের জ্ঞাতা! অদ্য উষাকালে যে সকল দেবতা জাগরিত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে আনিয়া

অথ সপ্তমী।

(ভৃগু বারুণি ঋষিঃ)

১ ২ ৩১ ২উ ১উ ৩ ১২
ত্বং নশ্চিত্র ঊত্যা বসো রাধাংসি চোদয়।
৩ ২ ৩১র ২র ৩ ১ ১ ৩২ ৩১ ৩১র
অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং তুচে
২র
তু নঃ ॥৭।

হে বসো!—বাসকারিন্!
চিত্রঃ—বিচিত্র দর্শনীয় ত্বং।
ঊত্যা—রক্ষয়াসহ—সাবধানের সহিত।
রাধাংসি—ধনানি। নঃ—অস্মভ্যং।
চোদয়—প্রেরয়।
অস্য—লোকে পরিদৃশ্যমানস্য। রায়ঃ—ধনস্য।
ত্বং রথীঃ অসি—রংহিতা নেতা ভবসি।
অতঃ কারণাৎ অস্মভ্যং ধনানি প্রেরয়েত্যর্থঃ।
নঃ—অস্মাকং। তুচে—অপত্যায় অপত্য হেতু ভূতায় পুত্রায়।
গাধং—প্রতিষ্ঠাং। তু—ক্ষিপ্রং—শীঘ্রং।
বিদাঃ—লম্ভয়—দাও।

হে বাসকারিন্! তুমি বিচিত্র দর্শনীয়। তুমি লোকে পরিদৃশ্যমান ধনের নেতা হও; তজ্জন্য আমাদিগের জন্য সাবধানে ধন সকল প্রেরণ কর ও আমাদিগকে পুত্রোৎপাদন জন্য শীঘ্র ক্ষমতা দাও।৭।

অথাষ্টমী।

বিরূপ ঋষিঃ।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
ত্বমিৎ সপ্রথা অস্যগ্নে ত্রাতর্ঋতঃ কবিঃ।
১র ২ ৩ ১ ২
ত্বাং বিপ্রাসঃ সমিধান দীদিব আ বিবাসন্তি
৩ ১২
বেধসঃ ॥৮।

হে অগ্নে!

ত্রাতঃ—রক্ষক! ঋতঃ—সত্যভূতঃ।

কবিঃ—ক্রান্ত প্রজ্ঞঃ—বহুদর্শী।

ত্বমিৎ—ত্বমেব—তুমিই।

সপ্রথাঃ—সর্ব্বতঃ পৃথুঃ—সকলদিকে ব্যাপিয়া আছ।

অসি—ভবসি।

হে সমিধান—সমিধ্যমান! যিনি কাষ্ঠ পাইয়াছেন, তৎসম্বোধনে হে প্রাপ্ত কাষ্ঠ!

হে দীদিবঃ—দীপ্যমে!

বিপ্রাসঃ—বিপ্রাঃ বিধাতারঃ।

আবিবাসন্তি—বিচরন্তি।

বেধসঃ—মেধাবিনঃ স্তোতারঃ।

হে অগ্নি! হে রক্ষক! তুমি সত্য স্বরূপ, বহুদর্শী ও তুমিই সকলদিক ব্যাপিয়া আছ। হে সমিধ্যমান! হে দীপ্ত! তোমার বিধাতা মেধাবী স্তোতা সকল তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সেবা করিতেছেন ৮॥

অথ নবমী।

(শুনঃ শেপঋষি)

১ ২ ৩ ১২ ৩১ ৩১
আ নো অগ্নে বয়ো বৃধং রয়িম্পাবকশং

২
সং স্যম্।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১২৩
রাস্বা চন উপমাস্তে পুরুস্পৃহং সুনীতী

১২
সুয়শস্তরম্ ॥৯॥

হে অগ্নে!—পাবক!—শোধক!

বয়োবৃধং—অন্নস্য বর্দ্ধকং

শংস্যং—স্তবস্থং। রয়িং—ধনং।

নঃ—অস্মভ্যং আভরেতি শেষঃ—আমাদিগকে আনিয়া দাও।

হে উপমাস্তে!—উপাস্মাৎ সমীপে মাতি ঘৃতমিত্যা পমাতিঃ—যিনি নিকটে ঘৃত রাখিয়া মাপিয়া গ্রহণ করেন।

চ—আহ্রতাচ।

নঃ—অস্মভ্যং।

সুনীতী—সুনীত্যা—শোভন নয়নেন—নিয়ম দ্বারা।

পুরুস্পৃহং—বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং।

সুয়শস্তরং—অত্যন্ত স্বকৃতং কীর্ত্তিমনং।

রাস্ব—দেহি।

হে অগ্নি! হে শোধক! তুমি আমাদের জন্য অন্নের বর্দ্ধক লোকের প্রার্থিত ধন আনিয়া দাও। হে উপমাস্তে! তুমি এরূপ ধন আনিয়া দিয়া এরূপ সুনিয়ম করিয়া দাও, যাহাতে ঐ ধন অনেক লোকের স্পৃহনীয় ও অত্যন্ত কীর্ত্তিযুক্ত হয়।৯॥

অথ দশমী।

(সোভরি ঋষি)

১উ ৩ ১২১ ২১ ১ ২ ৩১র ২র
যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতার মন্দ্রোজনানাম্।

৩১র ২র ৩ ১২ ৩ ১র ২র
মধোর্ন পাত্রা প্রথমান্যস্মৈ প্র স্তোমা

৩ ১২
যন্ত্বগ্নয়ে ॥১০॥

হোতা—দেবানামাহ্বাতা।

মন্দ্রঃ—মোদনঃ...আনন্দদাতা।

বিশ্বা—সর্ব্বাণি।

বসু—বসূনি—ধনানি।

জনানাং—জনেভ্যঃ।

দয়তে—প্রযচ্ছতি—দান করিতেছেন।

তস্মৈ অস্মৈ অগ্নয়ে—সেই সকল অগ্নিকে।

মদোঃ ন—মদকরস্য সোমস্যেব—মদক
বস্তু সোমের ন্যায়।

প্রণমানি—মুখ্যানি।

পাত্রা—পাত্রাণি।

স্তোমাঃ—স্তোত্রাণি।

প্রঋন্তি—গচ্ছন্তি—যাইতেছে।

দেবগণের আহ্বান কর্ত্তা আমাদের আনন্দদাতা অগ্নি, সকল জনকে সমস্তধন দান করিতেছেন। আমাদিগের এই মাদক বস্তু সোমের ন্যায় মুখ্য পাত্র সকল এবং মুখ্য স্তোত্র সকল সেই এই অগ্নি দেবে যাইতেছে।১০॥

চতুর্থ দ্ব শতি সম্পূর্ণ।

পঞ্চম খণ্ড।

সেয়ং প্রথমা।

(বামদেব ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩১র ২র ৩ ১র ২র৩
এ না বো অগ্নিং নম সোর্জ্জো নপাত
১ ২
মাহুবে।
৩ ১র ২র ৩১ ২ ৩১র ২র
প্রিয়ং চেতিষ্ঠ মরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য
৩২৩১২
দূতমমৃতম্ ॥১॥

ঊর্জ্জঃ—বলস্য। নপাতং—পুত্রং (অগ্নি বলের পুত্র কারণ অরণী মন্থন করিলে অগ্নি নির্গত হয় উহা বলের প্রয়োজন)

প্রিয়ং—অস্মাকং প্রিয়মিত্যর্থঃ—আমাদের প্রিয়।

চেতিষ্টং—অতিশয়েন জ্ঞাতারং—প্রজ্ঞাতারং—প্রজ্ঞাপকং বা—অতিশয় প্রকাশক।

অরতিং—গন্তারং স্বামিনং বা স্বধ্বরং—সুযজ্ঞং বিশ্বস্য দূতং—সর্ব্বস্য যজমানস্য দূতং।

অমৃতং—নিত্যং অগ্নিং।

এনা—এনেন ("ইদং" শব্দের "এন" আদেশ ছন্দঃজন্য)

আহুবে—আহ্বয়ামি।

অগ্নি বলের পুত্র তিনি আমাদের প্রিয়, তিনি আমাদের স্বামী ও অতিশয় প্রকাশক। তিনি সকল যজ্ঞে গিয়া যজমানগণের দূত হইয়া থাকেন, তিনি নিত্য অর্থাৎ তাঁহার বিনাশ নাই হে স্তোতৃগণ! আমি তোমা-দের জন্য সেই অগ্নি দেবকে এই স্তোত্র দ্বারা আহ্বান করিতেছি।১॥

অথ দ্বিতীয়া।

(ভর্গ ঋষি)

২ ৩ ১২ ৩২৩ ২ ৩ ১২
শেষে বনেষু মাতৃষু সং ত্বা মর্ত্তাস ইন্ধতে।
১২ ৩১ ২ ৩২১ ২উ ৩১২
অতন্দ্রো হব্যং বহসি হবিষ্কৃত আদিদ্‌দেবেষু
রাজসি ॥২॥

বনেষু মাতৃষু চ ত্বং-শেষে স্বপিষি বর্ত্তসে—বনে ও মাতা সকলের ক্রোড়ে তুমি শুইয়া আছ (অরণী কাষ্ঠ হইতে যখন অগ্নি না নির্গত হন, তখন তিনি যেন মাতৃ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকেন)

ত্ব—ত্বাং। মর্ত্তাসঃ—মনুষ্যাঃ—অধ্বর্য্যাদয়ঃ।

সংইন্ধতে—মন্থনেনোৎপাদ্য সমিন্ধতে—মন্থনদ্বারা উৎপন্ন করিয়া প্রবৃদ্ধ করিতেছে।

অতন্দ্র—অনলসঃ সন্।

হবিষ্কৃতঃ—যজমানস্য।

হব্যং—হবিঃ। বহসি—দেবান্ প্রতিইত্যর্থঃ।

আদিদ্—অনন্তরমেব।

দেবেষু—দেবৈষু মধ্যে ইত্যর্থঃ—অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে।

রাজসি—দীপ্যসে—দীপ্তি পাইতেছ।

হে অগ্নি! তুমি বনে ও মাতা সকলের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছ; অধ্বর্য্যুগণ মন্থন দ্বারা তোমাকে প্রবুদ্ধ করিয়া কাষ্ঠ সকল দ্বারা প্রবৃদ্ধ করিতেছে। তুমি প্রবৃদ্ধ হইয়া আলস্যশূন্য হইয়া যজমানের হবি বহন করিতেছ ও অনন্তরই ঋত্বিকগণের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছ।২॥

অথ তৃতীয়া।

(সোভরি ঋষিঃ)

১২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ২

অদর্শি গাতু বিত্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ।

৩ ২৩১র ২র ৩ ১২ ৩১ ২

উপো সুজাতমার্য্যস্য বর্দ্ধনমগ্নিং নক্ষন্ত

৩ ১ ২

নো গিরঃ॥৩।

যস্মিন্—অগ্নৌ ইত্যর্থঃ। ব্রতানি—কর্ম্মাণি। আদধুঃ—যজমানাঃ আহিতবন্তঃ—যজমানগণ রাখিয়াছেন।

গাতুবিত্তমঃ—অতি শয়েন মার্গাণাং জ্ঞাতা।

আদর্শি—প্রাদুরভূৎ।

সুজাতং—সম্যক্ প্রাদুর্ভূতম্।

আর্য্যস্য—উত্তমবর্ণস্য। বর্দ্ধনং—বর্দ্ধয়িতারং।

নঃ—অস্মাকং।

গিরঃ—স্তুতিরূপা বাচঃ।

উপোনক্ষন্ত—উপগচ্ছন্ত—উপগত হউক।

যে অগ্নিতে যজমানগণ কর্ম্ম সকল রাখিয়াছেন, সম্যকরূপে উত্তমরূপ জ্ঞাতা সেই অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। আর্য্যগণের উন্নতি-কারক সেই অগ্নি-প্রাদুর্ভূত অগ্নিদেবে আমাদিগের স্তুতিবাক্যগুলি উপগত হউক। (আর্য্যগণ অগ্নি লইয়া যজ্ঞ করিতেন, অন্য কার্য্য করিতেন না, সুতরাং তাহাতে তাঁহারা নিজের উন্নতি করিতেন; ফলতঃ সংসারের ও উন্নতি-সাধন হইত। ব্রাহ্মণের জীবন ক্ষুদ্র কামনার জন্য নহে—তাঁহাদের জীবন তপস্যার জন্য;—

"ব্রাহ্মণস্য দেহোঽয়ং ক্ষুদ্র কামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে, ২৪ অধ্যায়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

আনন্দোচ্ছ্বাস!

(বর্ত্তমান ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট দিবসে আমাদের রাজরাজেশ্বর সপ্তম্ এডোয়ার্ডের শুভরাজ্যাভিষেক-উৎসব উপলক্ষে।)

পৃথিবী ব্যাপিয়া, উঠিল ছাপিয়া
উত্তাল-আনন্দ-তরঙ্গ-ভঙ্গ!
রাজরাজেশের রাজ্যাভিষেকের
মহাউৎসবের মহান্ রঙ্গ!
গ্রেট্‌বৃটানিয়া, এ ভারতদেশ,
ব্রহ্মদেশ, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ,
প্রকাণ্ড কানাডা, প্রায়ার্দ্ধ-আফ্রিকা,
সিন্ধু-ক্রোড়ে শতদ্বীপা সাগরিকা,
রাজভক্তি-রসে প্লাবিত কায়!
পঞ্চমাংস-পৃথ্বীরাজ-অধিরাজ
শুভক্ষণে রাজসিংহাসনে আজ
বসিলেন নব শুভ-ছবিরাজ,
নিরখিতে ভক্ত প্রকৃতিসমাজ—
উৎসবে উল্লাসে উন্মত্ত প্রায়!

শুভ অভিষেক আজি শুভক্ষণে,
কি আনন্দ তায় মর্ত্ত্যের 'নন্দনে'!
সুবিপুল-সমারোহ-সমীরণে
উৎসব উদধি উথলে কিবা!

প্রদেশে প্রদেশে প্রবাহ-প্রসার;
নগরে নগরে নিদর্শ যাহার;
সদনে সদনে শোভার বাহার;
বদনে বদনে বিজলি-বিভা!

ভারতের কথা কি কহিব আর?
ভারতে ভূপাল ঈশ্বরাবতার!
অষ্টদেবতার অষ্ট-শক্তি সার,
সৃষ্ট ভারতের ভূপতি তায়!
"নরাণাঞ্চ নরাধিপ" এই বাণী—
গীতায় গোবিন্দ গেয়েছেন জানি;
সে ধ্বনির আজ শত প্রতিধ্বনি
ভারত হৃদয়-গগনে ধায়!
ভারত ঈশ্বরী ভিক্টোরিয়া মাতা
ছিলেন ভারতে আরাধ্যা দেবতা;
ঈশ্বরেচ্ছা-বশে এবে স্বর্গগতা;
সে শোকাশ্রু মুছে ফেলেছি আজ।
তাঁরি সে প্রসাদী সিংহাসন-পর,
তাঁরি প্রিয়তম পুত্র গুণধর—
বসিলেন হয়ে রাজরাজেশ্বর,
ধরি জন মন-মোহন সাজ।
ভারতের সেই মহামণিরাজ
কোহিনুর করে কিরীটে বিরাজ!
বসন-ভূষণ-আসনের সাজ—
ভূতলে অতুল শোভার সেরা।
বিরাজিতা বামে রাজেশ্বরী অই,—
শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা শোভাময়ী!
ও যুগলরূপ দরশনে হই—
মানস নয়নে মোহিত মোরা!
সূর্য্য নাহি অস্তে যান রাজ্যে যাঁর,
ছয় মহাদেশে যাঁর অধিকার,
আজি শুভরাজ্য-অভিষেক তাঁর,
পৃথিবী ব্যাপিয়া উৎসব তাই!
বিংশ শতাব্দীর শুভ সমুদ্ঘাটন,
ভাবী-ইতিহাস-অঙ্গ সুশোভন,
এডোয়ার্ড সপ্তমের সিংহাসন
শুভসংস্থাপন আজি ধরায়!
বাজাও আনন্দে ঢক্কা-তুরী-ভেরী,
বাজাও বিগল্ বেহালা-বাঁশরী;
সাজাও রে পল্লী-নগর-নগরী;
উৎসব-উল্লাসে নাচাও দেশ।
গম্ভীর গরজি উঠুক কামান,
উৎসব-নির্ঘোষে ফাটুক বিমান,
ছুটুক প্রমোদ-তরঙ্গ-তুফান,
টুটুক প্রজার বিষাদ-ক্লেশ।
কর জয়ধ্বনি মাতায়ে মেদিনী;
"জয় রাজরাজ—জয় রাজেন্দ্রাণী!"
এডোয়ার্ড সপ্তমের জয়ধ্বনি—
সপ্তমে চড়িয়া ছুটুক নভে।
মাতা ভিক্টোরিয়া স্বর্গাসনে বসি,
পিতা এল্বার্ট সহ সুখে ভাসি,
দেখুন পুত্রের প্রজা উল্লাসী
রাজ্য অভিষেক-উৎসব ভবে।
"স্বর্গে হ'ক জয় শ্রীমহারাণীর,
মর্ত্ত্যে হ'ক জয় নবভূপতির"
এ বাসনা দীন ভারতবাসীর—
পুরাও দয়ায় দয়াল হরি!
আমাদের রাজরাজেশ্বরে পদে
রেখো চিরদিন সম্পদে বিপদে;
এ প্রার্থনা অই অভয় শ্রীপদে
সদা সর্ব্বান্তরে কাতরে করি।
কর "হিপ্ হিপ্ হুর্রে হুর্রে" ধ্বনি—
কাঁপায়ে ছাপায়ে গগন-মেদিনী!
কর পরে বিশ্বরাজ-জয়ধ্বনি—
'হরিধ্বনি' সর্ব্বধ্বনির সার!
উৎসবে উল্লাসে হইয়ে বিভোর,
প্রেমানন্দে সবে বোল্ হরিবোল!
বোল হরিবোল! হরিহরিবোল!
হরিবোল হরিবোল আবার!

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(যশোহর)

শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

জাতিভেদ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

৩। ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত-শ্লোক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদ-প্রণয়ন অল্প দিনে হয় নাই। ঋগ্বেদ-প্রণয়নে প্রায় ছয় শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং ঋগ্বেদের প্রণেতা যে একজন নহেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা মৎস্য পুরাণেও ৯১ জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ইঁহারাই ঋক্ সমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।*

"ঋগ্বেদের মন্ত্র দশমণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশমমণ্ডল ভিন্ন অপর আট মণ্ডল ৮ জন ঋষির রচিত। একজন ঋষি বলিতে বোধ হয়, সেই ঋষির বংশীয় ব্যক্তি অথবা তদনুসারী শিষ্য পরম্পরা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা গৃৎসমিৎ। এই গৃৎসমিৎ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতীয় মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিত্র, চতুর্থ-মণ্ডলের প্রণেতা বামদেব; পঞ্চম-মণ্ডলের প্রণেতা অত্রি; ষষ্ঠ-মণ্ডলের প্রণেতা ভরদ্বাজ; সপ্তম মণ্ডলের প্রণেতা বশিষ্ঠ; অষ্টম-মণ্ডলের প্রণেতা অঙ্গিরা। প্রথম-মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত; ১০ম মণ্ডলেও ১৯১ সূক্ত। তাহা নানা কাল্পনিক ঋষির প্রণীত বলিয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে।"†

যাঁহারাই ঋগ্বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়া থাকিবেন যে, ইহার দশম মণ্ডল অন্যান্য নয় মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহা যেন সেই মহাগ্রন্থের পরিশিষ্ট মাত্র। এই দশম মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তই অপ্রাচীন। এই সূক্ত হইতেই তাৎকালিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ, ন্যায়-

* মৎস্যপুরাণ। ১৩২ অধ্যায়।

† শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

মিক উন্নতি, সমাজান্তর্গতঃ নানাবিধ জটিল অবস্থা প্রভৃতির সমূহ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবাহ প্রভৃতির বর্ণনা ও মন্ত্র এবং পরলোকের বর্ণনা এই দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অংশ।

সকলেই অবগত আছেন যে, অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদের তুলনায় তত প্রাচীন নহে। এই অথর্ব্ববেদে রোগ প্রতিকারের উদ্দেশ্যে রচিত অনেক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদেও তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বলিয়াছেন:—"আবার দশম মণ্ডলের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া মন্ত্র গুলি দেবতাদের নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রায়।"

অন্য এক স্থানে তিনি বলিতেছেন—"যে সময় মন্ত্রগুলি মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হয়, সেই সময় দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে, সেই সময়েই তাহা সঙ্কলিত ও ঋগ্বেদের শেষ ভাগে সংযুক্ত হইয়া যায়।"

বর্ত্তমান যুগের ন্যায় বৈদিক যুগে সাহিত্য চর্চ্চা এত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল না। ঋগ্বেদের সময়ে বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই, তাই লিখন প্রণালী তখন ছিল না। আর্য্যগণ লীলাময়ী প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বিচিত্র দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া আপন আপন সরল হৃদয়ের সাময়িক ভাবানুযায়ী গীত রচনা করিতেন, মন্ত্র রচনা করিতেন; কখনও বা সামাজিক অভাব অভিযোগ, রীতিনীতি সম্বন্ধেও শ্লোকাবলী রচিত হইত—আর সেই সকল গীত বা মন্ত্র বা শ্লোক আবহমান কাল পর্য্যন্ত শ্রবণ মাত্রেই আবদ্ধ ছিল। পিতার নিকট পুত্র তাহা শিক্ষা করিত, গুরুর নিকট শিষ্য তাহা শিক্ষা করিত।

এই সকল হইতেই বেশ অনুমিত হইতে পারে যে, ঋগ্বেদের মত একখানি অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থে—যে গ্রন্থের রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন এবং সংগ্রহ কর্ত্তাও তাহাই, যে গ্রন্থ প্রণয়নে প্রায় ছয় শতাব্দীকাল ব্যয়িত হইয়া থাকিবে, যে গ্রন্থের শ্লোকগুলি সর্ব্ব প্রথমে কেবল মাত্র শুনিয়াই শিখিয়া রাখিতে হইত, কারণ লিখিত ভাষার বা অক্ষরের সৃষ্টি তখনও হইয়াছিলনা—সেই প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদের অনেক শ্লোক সংগ্রহকারক কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। এরূপ হওয়া অসম্ভবও নহে। প্রথমতঃ শ্লোকগুলি শুনিয়া শুনিয়া শিক্ষা করিবার পর হয়ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে স্মরণ শক্তির দৌর্ব্বল্য বশতঃ বা নিয়ত আবৃত্তি না থাকিবার জন্য তাহাদিগের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ঘটা অসম্ভব নহে। সুতরাং প্রথম যুগের পরবর্ত্তী যুগসমূহে অনেকে হয়ত একেবারে মৌলিক শ্লোকগুলি শিক্ষা করিবার আদৌ সুযোগ পান নাই। তাহার পর, যিনি যখন যে শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন (এখনও আমরা অনেক পুস্তকে পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া থাকি), এবং যিনি যখন যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া, তাহা সেই ঋগ্বেদের যুগের প্রাচীন আর্য্যদিগের রচিত শ্লোক বলিয়া ঋগ্বেদের কলেবরে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেই নবরচিত-

শ্লোক সমূহে নিশ্চয়ই তাৎকালিক অভাব, অভিযোগ, এবং সামাজিক চিত্রের ছায়া থাকিবেই থাকিবে। কারণ সমাজ মানব-হৃদয় গঠন করে, আর ভাষাও ভাব সেই হৃদয়ের অবিকৃত চিত্র।

আমরা পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদ-প্রণয়নের যুগে আর্য্যভূমে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বিস্তার করিবার একটী বিশাল তরঙ্গ রঙ্গে ভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া গ্রামে গ্রামে জনপদে জনপদে বাত্যাসংক্ষুব্ধ লবণাম্বুরাশিবৎ ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপয়িতৃগণের যত্নে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভট্ট মোক্ষমূলর, মিঃ ওয়েবর, মিঃ কোলব্রুক, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে আর তিলমাত্রও সন্দেহ করেন না। রমেশ বাবু এবং মুয়ার সাহেবের মত ও পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। শুধু ঋগ্বেদ বলিয়া নহে, হিন্দুর গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাব নাই। অধুনা রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহুদিন পূর্ব্বে সাহিত্য পারিষদ পত্রিকায়' এই বিষয়ের একবার আলোচনাও হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কেবল ভারতবর্ষে কেন, পাশ্চাত্য জগতেও এরূপ ঘটনা দুর্ল্লভ নহে। একবার ইংরাজের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলকেও নাকি উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল! তাহারই সমালোচনায় Distaeli সাহেব বলিতেছেনঃ—

"He (Selastian castillion) fancied he could give the world a more classical version of the Bible and for this purpose introduces phrases and entire sentences from profane writers into the text of the holy writ. His whole style is finically quaint, overloaded with prettinesses and all the ornaments of false tastes. Of noble simplicity of the "scripture he seems to have not had the remotest conception."* বলা বাহুল্য যে ফরাসি লেখক Pere Berrenyer ও একবার এই প্রকার উদ্যম করিয়াছিলেন, Disraili সাহেব তাহারও সমালোচনা করিয়াছেন।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বর্ণ-ভেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা ঋগ্বেদের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের যে নজীরের শক্তি কিছু নাই—আমরা অনায়াসে সে নজীর অবহেলা করিতে পারি।†

৪। পুরুষ সূক্তের ছায়া।

ঋগ্বেদে চতুর্ব্বর্ণ মনুষ্যের উৎপত্তি-সম্বন্ধে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা স্থূলতঃ তাহা দেখাইয়াছি। হিন্দুর গ্রন্থ একখানি নহে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি মন্থন করিলে আরও অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে। মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের ৩১

---

* "Curiosities of Literature"—Disraeli; VolII.

† "In the Rigveda the caste system of later times is wholly unknow." Elphinstone's History of India—Appendix VIII; p. 286,

শ্লোক পুরুষ সূক্তাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ-
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

অর্থাৎ "সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর প্রজা বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ-মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন।" কিন্তু মনুসংহিতার তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য শ্লোক সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত ৩১ শ্লোকের সহিত তাহাদিগের সামঞ্জস্য নাই। বরং মুখ্য লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থের মানবসৃষ্টি প্রকরণের সহিত পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে বর্ণিত মানব-সৃষ্টি প্রকরণের অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজসনেয় সংহিতা (৩১।১১) এবং অথর্ব্ববেদেও (১৯।৬।৬) আমরা এই পুরুষ সূক্তের ছায়া দেখিতে পাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় "পুরুষসূক্ত" অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে আছে "বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমূর্ত্তি সহস্র শিরা পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় তাঁহার ভুজ, বৈশ্য তাঁহার উরু এবং কৃষ্ণবর্ণ-শূদ্র তাঁহার পদ।" অন্যত্র—

"বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মচার
লক্ষণাঃ॥"*

আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাইঃ—

"সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণো
জগৎ।
... ...
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরু বক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥
যজ্ঞ নিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মা চকার বৈ।
চতুর্ব্বর্ণ্যং মহাভাগ যজ্ঞ-সাধন মুত্তমম্॥"†

মহাভারতেও যে এই পুরুষসূক্তের আভাস আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।*

"বিধিনা পুরুষসূক্তস্য গত্বা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ"

প্রভৃতি শ্লোক হইতে জানিতে পাইতেছি যে, হারিত সংহিতাতেও পুরুষসূক্তের ছায়া আছে। এতদ্ভিন্ন বিবিধ হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থে এমন আরও অনেক শ্লোক আছে, যাহা পুরুষ-সূক্তাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

কিন্তু ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেই ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তও যে প্রক্ষিপ্ত মধ্যে গণ্য, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং সেই পুরুষসূক্তের ছায়া লইয়া পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ যে সকল শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল শ্লোকও জাতিভেদের প্রাচীনত্ব সমর্থন করিতে নিতান্ত অক্ষম। পুরুষসূক্ত আলোক—পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারদিগের রচিত শ্লোক তাহার ছায়া মাত্র। যদি আলোকই না থাকিল, তবে ছায়ার অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইবে?

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন আর্য্যসমাজের জাতিগত পার্থক্য।

প্রাচীন আর্য্যসমাজের যে জাতিগত কোন পার্থক্য ছিল না, তাহার প্রমাণ

* শ্রীমদ্ভাগবত।৩১।১৭।১১
† শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।২

* মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।
† বিষ্ণুপুরাণ।১।৬

নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। আমরা সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিব, কারণ আলোচ্য-বিষয়ের সত্যতা অনেক দিনই নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

(১) "ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং॥"*

অর্থাৎ বর্ণ-ভেদ নাই, সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল, তৎপরে কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান জাতিভেদের প্রথা জাতিগত বা জন্মগত নহে—ইহা কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃই অভ্যুদিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন মন্ত্র সকল পাঠ করিলেও কেবল "আর্য্য" ও "দস্যু" এই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) পূর্ব্বে একমাত্র জাতিই বর্ত্তমান ছিল, তাহা হইতেই ক্ষত্র প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"ব্রহ্মবা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং।"*

অর্থাৎ—অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ বর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন।

বর্ত্তমান শ্লোকে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারাই বেদ বা স্মৃতির সামান্যও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে 'ব্রাহ্মণ' অর্থে "ব্রহ্ম" শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই আছে। যিনিই ব্রহ্মকে জানেন বা ধারণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ইহাই "ব্রাহ্মণ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে "ব্রহ্ম" শব্দের অনেক অর্থ দৃষ্ট হই থাকে যথা—

১। ঈশ্বর।	৪। দেব।
২। ব্রাহ্মণ জাতি	৫। তপঃ।
৩। বেদ মন্ত্র।	৬। ব্রহ্মতেজ।

ইত্যাদি।

ঋক্‌সংহিতায় ১।৮০।১; ১। ১৬৪। ৩৫; ২।৩৯।১; ২।১২। ৬; ৫। ১০। ৮; ৯।১১৩।৬ প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তোতা বা ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

"উপরোক্ত ঋক্ সংহিতার প্রমাণ দ্বারা বোধ হইবে, যাঁহারা বেদের মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিতেন বা বেদমন্ত্রের প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের অপত্যগণই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋষিগণই বেদ মন্ত্রের প্রকাশক ও স্তোতা, কাজেই ঋষি বা ঋষিপুত্রগণই ব্রাহ্মণ পদলাভ করেন। যখন নির্ম্মল চেতা আর্য্য ঋষিগণ শীতপ্রধান হিমালয় প্রদেশে সাত্বিক ভাবে বনবাস করিতেন, যখন তাঁহাদের উপাসনা বা আরাধ্য দেবগণের স্তোত্র উচ্চারণই তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল, যখন

---

* মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব। শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ এবং ১৮৯ অধ্যায়ে বর্ণভেদের আলোচনা আছে। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র। "ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ" দ্রষ্টব্য।

* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

শীতাতিশয্যে তাঁহাদের শ্বেত-মূর্ত্তি বিকৃত ভাব ধারণ করে নাই, যখন তাঁহাদের মধ্যে সমাজ বন্ধনের জন্য শ্রেণীবিভাগরূপ বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, যে সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য বর্ব্বরদিগকে মানব মধ্যেই গণ্য করিতেন না, সেই অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ সম্ভবতঃ কেবল ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত ছিলেন ... ...।"*

বেদমন্ত্র যাঁহারা ধারণ করেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। মনু বলিয়াছেন:—

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাৎ জ্যৈষ্ঠ্যাৎ ব্রাহ্মণ শ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥"

অর্থাৎ—উত্তমাঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হওয়াতে, জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন এবং বেদ মন্ত্রের ধারণ নিবন্ধন, ব্রাহ্মণ এই সমুদয় সৃষ্টির প্রভু।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে..." প্রভৃতি শ্লোকে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ জাতি করা অসঙ্গত নহে।

(৩) "একএব পুরাবেদ প্রণব সর্ব্ব বাঙ্ময়ঃ।
দেবনারায়ণোনান্য একাগ্নি র্বর্ণ এবচ॥*

(৪) "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥†"

(৫) "এক বর্ণ মিদং পূর্ণং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।*
ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা হইয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, গুণানুসারেও আবার বর্ণের বিভাগ হইয়াছিল। এমন কি গুণের দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর লোকও উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিত।

(৬) যে মনু শূদ্রের উপর একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন, যিনি শূদ্রদিগকে সর্ব্ব প্রকার সামাজিক সুখাস্বাদন হইতে চির দিনের জন্য বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন—যিনি ধর্ম্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বোপার্জ্জিত ধনের অধিকার প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার হইতেই তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন, তিনিই আবার বলিতেছেন:—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণ শ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈবচ॥*

(৭) শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন:...

নজাত্যা ব্রাহ্মণাশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব বা
ন শূদ্রো নচ বা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ।†

(৮) তিনিই আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

জ্ঞান কর্ম্মোপাসনাভি র্দেবতারাধনে রতঃ
শান্তো দান্তো দয়ালুশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ গুণৈঃ কৃতঃ।†

(৯) চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।*

(১০) ভট্ট মোক্ষমূলের ধৃত ধর্ম্ম সূত্র বচনে আমরা দেখিতে পাই:—

* বিশ্বকোষ প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"।

* শ্রীমদ্ভাগবত।

† পদ্মপুরাণ-স্বর্গ খণ্ড-২৫ অ

* মহাভারত।

* মনু, ১০। ৬৫;

† শুক্রনীতি।

* ভগবদ্গীতা।

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যেত জাতি পরিবৃত্তৌ, অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যেত জাতি পরিবৃত্তৌ।"

মহর্ষি আপস্তম্ব শূদ্রের প্রতি কঠিন বিধি বিধান করিতে ত্রুটি করেন নাই, তথাপি তিনিও বলিতেছেন যে "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পর পর বা একেবারে অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ক্রিয়াবান হইলে পর পর বা একেবারে উচ্চ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

(১১) শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সমূহ বর্ণনার পর আমরা দেখিতে পাই :—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

অর্থাৎ—"যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বলিলাম, অন্য বর্ণেও যদি সেই লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকেও ঐ বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে।"

(১২) আজিও যে গায়ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব রক্ষিত হইতেছে, সেই বেদমাতা গায়ত্রীর রচয়িতা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ সন্তান নহেন—ক্ষত্রিয়ের সন্তান। তিনি স্বীয় তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"Gayatri itself, the most sacred symbol in the universe, is a verse in a hymn by an author not a Brahman by birth, but a Kshatriya, who is represented in later legends as extorting his admission into the Brahman caste"......*

(১১) "করূষাৎ মানবাৎ আসন্ কারূষাঃ ক্ষত্র জাতয়ঃ।
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্ম্ম বৎসলাঃ॥†

মনুর পুত্র করূষ হইতে কারূষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, ইহারা ক্ষত্রজাতীয়। ইহারা উত্তরাপথের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য এবং ধর্ম্মবৎসল ছিল।

(১২) পৃষধ্রস্তু হিংসয়িত্বা গুরোর্গাং জনমেজয়। শাপাৎ শূদ্রত্বমাপন্নঃ॥*

পৃষধ্র রাজা গুরুর গো হত্যা করিয়া শাপ বশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১৩) "নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ-দ্বৌ-বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"* নাভাগারিষ্ট পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১৪) ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ঋষভের একশত পুত্রের মধ্যে একাশীতি জন কর্ম্ম-তন্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং কবি হবিঃ প্রভৃতি নয় জন পরমার্থ নিরূপক মুনি হইয়াছিলেন।†

(১৫) গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।*

(১৬) দুরিত ক্ষয়ের তিনটী পুত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন

* Exphinstones Histroy of India—p. 282.
† শ্রীমদ্ভাগবত। ৯। ২
* হরিবংশ। ৯ম অধ্যায়।
* হরিবংশ। ১১। ৬৫৮
† শ্রীমদ্ভাগবত ১১। ২
* শ্রীমদ্ভাগবত ৯। ২১

(১৭) অজমীঢ়ের বংশে প্রিয় মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন।*

(১৮) কক্ষিবান বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি। তিনি কলিঙ্গ দেশীয় রাজপুত্র এবং ক্ষত্রিয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২৫ এবং নবম মণ্ডলের ৭৪ সূক্ত তাঁহার রচিত।

(১৯) কবষ ঐলুষ ঋষি একজন শূদ্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ এবং ৩৪ সূক্ত এই ঋষির প্রণীত। যে শূদ্রের বেদ প্রণয়ন দূরে থাকুক বেদ পাঠ শ্রবণের অধিকারও ছিল না, বলিয়া বর্ণিত আছে সেই শূদ্রই বেদের শ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদের প্রণেতা !* এই ঋষি ব্রাহ্মণদিগের সহিত কলহ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

(২০) প্রধান প্রধান পুরাণ মতে বিতথের পঞ্চ পুত্র—সুহোত্র, সুহোত্ম, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র কাশক ও রাজা গৃৎসমিত। এই গৃৎসমিতের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ছিলেন।

(২১) একই পিতার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রদর্শিত হইতে পারে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য হইলাম †

(২২) মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গতঃ অজগার পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে :—"শূদ্রবংশজ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয় না, তাহারাই শূদ্র।"

(২৩) পরশুরামের সাহায্যে যে কেরল দেশীয় ধীবরগণও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন।*

(২৪) মৌদ্গল্য ও কাত্যায়ণ গোত্রজ সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বংশজাত। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুদ্গল হইতে ব্রাহ্মণ জাতির মৌদ্গল্য গোত্র সম্ভূত হইয়াছিল †

(২৫) কর্ম্মদ্বারাই যে সঙ্কীর্ণ বর্ণ প্রভৃতিও বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ তাহা না হইলে বশিষ্ট, ব্যাস, শুক, মন্দপাল, কণাদ প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত ঋষিগণ কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না। ইঁহাদিগের মাতাগণ সকলেই নীচ জাতীয়—শূদ্র কুক্ষি সমুৎপন্না।

দার্শনিক মহর্ষি কণাদের জননী অনার্য্য জাতীয়া—তাহার নাম ওলকী। এই জন্যই কণাদ দর্শনের অপর নাম ঔলক্য দর্শন। বশিষ্ঠ পত্নী অক্ষমালা শূদ্রী হইয়াও পরে ব্রাহ্মণী হইয়াছিলেন। ম্লেচ্ছ রমণী শুকীর গর্ভে অসাধারণ জ্ঞানী ভারত বিখ্যাত শুকদেবের জন্ম। মহর্ষি বেদব্যাসের জননী সত্যবতী ধীবর কন্যা। সত্যবতী পরাশরের ঔরসে যে সন্তান প্রসব করেন, তিনিই ক্ষমতা বলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ যযাতি ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানির গর্ভে

* ঐতরেয় এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণ

† শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

* স্কন্দপুরাণ।

† শ্রীমদ্ভাগবত ৯। ২১

যে দুইটী সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারত-বিখ্যাত-ক্ষত্রিয়-বংশের আদি পুরুষ।

(২৬) মনু তাঁহার গ্রন্থে সংকীর্ণ-বর্ণের উৎপত্তি অতিশয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই বর্ণনার শেষ ভাগে তিনি বলিয়াছেন—

"সঙ্কর জাতয় স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥*

অর্থাৎ—পিতা মাতার নাম নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক এই সকল জাতি বলিলাম, যাহাদিগের পিতা মাতার নাম জানা যায় না, এরূপ গূঢ় কিম্বা প্রকাশ্য বর্ণের কর্ম্ম দ্বারা জাতির নির্ণয় করিবে।"

(২৭) আমরা মন্বাদি গ্রন্থ হইতে এতক্ষণ যাহা দেখাইতেছিলাম, ঋগ্বেদেও সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ঋগ্বেদে সরল ভাবে একজন ঋষি বলিতেছেনঃ—দেখ আমি স্তোত্রকার, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা প্রস্তরের উপর যবভর্জ্জন-কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে তৃণ-কামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন-কামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

তাই রমেশ বাবু বলিতেছেন—"যাঁহারা বৈদিক-সময়ে জাতিভেদ-প্রথা ছিল মনে করেন, তাঁহারাই বলুন, যে পারস্করের পুত্র মন্ত্রপ্রণেতা ঋষ, পিতা বৈদ্য এবং মাতা সত্যবাদী, তাঁহারা কোন্ জাতি ভুক্ত?"

(২৮) 'ব্রহ্মা সমন্তুতানাং দৃষ্ট্বা সিদ্ধিন্তু কর্ম্মজাম্।
[illegible]।"*
ইত্যাদি।

"ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সেই কল্পমূল সৃষ্ট-প্রজারূপে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রজা-দিগের বৃত্তি উপায় স্থির হইলে স্বয়ম্ভু তাহা-দিগের মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রজাসমূহ মধ্যে যাহারা পরিগ্রহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয় নির্ভর করিয়া কেবলমাত্র 'সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান' এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহা-দিগকে বৈশ্য এবং যাহারা শোকদুঃখে পলায়ন, নিস্তেজ, অল্পবীর্য্য এবং অন্যজাতি জনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত, তাহা-দিগকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন।"

(২৯) "বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, কৃত-যুগে বা সত্যযুগে অর্থাৎ বৈদিক-যুগে বর্ণ-ভেদ ছিল না! পরে গুণ ও কর্ম্ম বিচার করিয়া ব্রহ্মা বর্ণভেদ সৃষ্টি করেন। যাহাদের আদেশে সকলে চলিত, এবং যাঁহারা সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন, অপরকে রক্ষা করিতে পারিতেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় শ্রেণী-ভুক্ত করিলেন। যে সকল সত্যবাদী,

* মনু ১০।৪০

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। পূর্ব্বভাগ। ৮। ১৫৪-১৬০ মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণেও ঠিক এইরূপ বর্ণনাই প্রাপ্ত হওয়া যায়"।

বেদাধ্যায়ী, নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের সহচর ছিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিলেন। যে সকল দুর্ব্বল ব্যক্তি কৃষি ও বাণিজ্যে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা বৈশ্য হইল। যে সকল দুর্ব্বল ব্যক্তিরা পরসেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাঁহারা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইল।"*

(৩০) "রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ৭৪ম সর্গে লিখিত আছে 'কৃতযুগে শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তপস্যা করিতেন। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের প্রথম উৎপত্তি হয়, তখন বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়।' ইহার অর্থ এই যে, বৈদিক সময়ে আর্য্যেরা এক জাতি ভুক্ত ছিলেন, এবং সকলেরই আচার ব্যবহার একরূপ ছিল। দ্বিতীয় যুগে ব্রাহ্মণ ও রাজন্যেরা পৌরহিত্য ও রাজ্য শাসন কার্য্যে একাধিকার লাভ করিয়া আপনাদিগকে সাধারণ লোক হইতে স্বতন্ত্র জাতিরূপে বন্ধনের চেষ্টা করেন।"*

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ আচার্য্য, বি এ।

(ক্রমশঃ)

আহার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যাহাহউক, পূর্ব্বেও এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ঋষিরা এত শপথ-বাক্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কোন একটী কার্য্য করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও সেই সকল শপথ-বাক্যের দিকে চাহিলে আমাদিগের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠে—মনে হয়, বুঝি এ সমস্তই দেবতার নিষ্ঠুর অভিসম্পাত। আমরা আর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। মন্ত্রবদ্ধ সর্পের মত আমাদিগের উন্নত গর্ব্ব-স্ফীত-মস্তক ধীরে ধীরে ভূমি চুম্বন করে। এই সকল শপথ-বাক্যও আবার এমন যে, তাহাদিগের অধিকাংশ ফলাফলেই মৃত্যুর পর সেই অন্ধকার অজ্ঞাত রাজ্যে গিয়া ভোগ করিতে হইবে—এজন্মে নহে। মৃত্যুর পর কাহার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু হিন্দু মৃত্যুর পর জন্মান্তর বিশ্বাস করে—পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করে, স্বর্গ বিশ্বাস করে—নরকও বিশ্বাস করে; সুতরাং পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মও তাহার নিকট প্রহেলিকাপূর্ণ-কল্পনা নহে—সরল সত্য। তাই সেই ভয়াবহ জন্মান্তরের কথা স্মরণ করিয়াই আর্য্য হিন্দু শপথ-বাক্য লঙ্ঘন করে না।

যদি আজ আমরা বঙ্গ কুলললনাদিগকে বুঝাইতে চাহি যে, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে ব্রণাদি ক্লেদ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা,—তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাতুল মনে করিবেন আর বলিবেন যে—"ক্লেদ রোগ হয় না, অর্থ-হানি হয়"। শত সহস্র চেষ্টা করিয়া লক্ষ লক্ষ যুক্তি দেখাইলেও তাঁহারা তাহা বুঝিবেন না—অনেক স্থলেই বুঝিতে পারিবেন না এবং বিশ্বাসও করিবেন না। যখন এই সকল বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনও রমণী ছিল—তখনও তাহারাই সংসারের গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিত—তখনও তাহারা এইরূপেই বিশ্বাস করিত।

---

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই।
* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই।

কেবল স্ত্রীলোক কেন, সাধারণ লোকেরও এইরূপই বিশ্বাস যে, তিথি বিশেষে পটোল ভক্ষণে শত্রু বৃদ্ধি হয়, মূলা ভক্ষণে ধন-হানি হয়, ইত্যাদি। কুষ্মাণ্ড, মূলা প্রভৃতি তিথি বিশেষে ভক্ষণ না করা সম্বন্ধে ইহাই তাহাদিগের যুক্তি; আর এই সকল শপথ-বাক্য লঙ্ঘন করিলে পাছে প্রকৃতই ধনহানি বা পুত্রহানি হয়, এই জন্যই তিথি বিশেষে হিন্দু পটোল খায় না, বেগুণ খায় না, শাক খায় না।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, এই সকল শপথ-বাক্য বা শাসনের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে।

নিষিদ্ধ দ্রব্যের নাম।	তিথির নাম।	উক্ত দ্রব্য ভক্ষণে কি ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা।	শপথ-বাক্য।
পূতিকা	দ্বাদশী	যক্ষ্মাকাশ।	ব্রহ্মবধ তুল্য পাপ।
অলাবু	নবমী	বাতশ্লেষ্মক পীড়া।	গোমাংস বৎ।
কলম্বী	দশমী	অম্লপিত্ত।	গোবধ তুল্য পাপ।
বৃহতী	দ্বিতীয়া	অর্ব্বুদ রোগ।	হরিস্মরণে অযোগ্য
মাংস	অমাবস্যা ও পূর্ণিমা	শ্লৈষ্মিক পীড়া।	মহাপাপ।
নিম্বুক	ষষ্ঠী	জলব্যাধি (কোষবৃদ্ধি, গণ্ডমালা প্রভৃতি)।	পশুযোনি প্রাপ্ত হওয়া
বার্ত্তাকী	ত্রয়োদশী	কণ্ডুরোগ।	সুতহানি।
মাষকলায়	চতুর্দ্দশী	অজীর্ণাদি উদরাময়।	চিররোগী।
শিম্বী	একাদশী	জ্বর।	পাপকারী।
নারিকেল	অষ্টমী	অজীর্ণ।	মূর্খতা।
তাল	সপ্তমী	রক্তপিত্ত।	শরীর নাশ।
বিল্ব	পঞ্চমী	পিত্ত সম্বন্ধীয় পীড়া।	কলঙ্কী।
মূলক	চতুর্থী	আমব্যাধি	ধনহানি।
পটোল	তৃতীয়া	রক্তবাত	বহুশত্রু।
কুষ্মাণ্ড	প্রতিপদ	ব্রণাদিক্লেদ রোগ।	অর্থহানি।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, যে স্থানেই কোন কঠিন পীড়া হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থানেই শপথ বাক্যও তত গুরুতর। দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে যক্ষ্মাকাস হইবার সম্ভাবনা। যক্ষ্মাকাস যে কি ভয়ানক ব্যাধি, তাহা আর বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। তাই যাহাতে, আর্য্য-হিন্দু দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ না করে, সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, দ্বাদশীতে পূতিকা ভোজনে ব্রহ্মবধ তুল্য পাপ হয়। হিন্দুমাত্রই এই কথা জানিলে শিহরিয়া উঠিবে। পূতিকা ভক্ষণ করা দূরে থাকুক, কেহ পূতিকার আঘ্রাণ পর্য্যন্তও লইবে না। নবমীতে অলাবু ভক্ষণে বাতশ্লেষ্মিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। তাই শপথ বাক্য আছে, অলাবু ভক্ষণে গোমাংস ভক্ষণ করা হইবে। ইহা শুনিয়া কোন্ হিন্দু নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হইবে?

সকল তিথি সম্বন্ধেই এইরূপ বলা যাইতে পারে। যে স্থানেই ব্যাধির কাঠিন্য, সেই স্থানেই শপথ-বাক্যও তত গুরুতর, আর যে স্থানে ব্যাধি তত কঠিন বা মারাত্মক নহে, সেই স্থানে শপথ-বাক্যও তত গুরুতর নহে।

তবে "মূর্খতা" "শরীর-নাশ" বা "চির-রোগী" এই তিনটী শপথ বাক্য সম্বন্ধে অন্য কথা বলিলেও বলা যাইতে পারে।

অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণে অজীর্ণ-রোগ জন্মে। অজীর্ণ-রোগ অধিক দিন স্থায়ী হইলে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলেই অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটে। ধারণা শক্তি কমিয়া যায়, চিন্তা করিবার ক্ষমতা তেমন থাকে না, ইহাকেই মূর্খতা বলা যাইতে পারে।

সপ্তমীতে তাল ভক্ষণে রক্তপিত্ত ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। এই ব্যাধি হইলে ধীরে ধীরে শরীর ক্ষয় হইতে থাকে এবং অবশেষে মৃত্যুকে ডাকিয়া লইয়া আইসে। ইহাইত শরীর নাশ।

চতুর্দ্দশীতে মাষকলায় ভক্ষণে উদরাময় হইবার সম্ভাবনা। পাকস্থলীর এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিলেইত ধীরে ধীরে সকল প্রকার ব্যাধিই জন্মিতে পারে। যাহাই ভোজন করা যায়, তাহাই যদি জীর্ণ না হয়, তাহা হইলে শরীর সুস্থ এবং সবল হইতে পারে না, সেই ভুক্ত সামগ্রী শরীরের আরও প্রভূত অনিষ্ট ঘটায়, সেই জন্যই ব্যাধিও ছাড়িতে চাহে না, ভাঙ্গা শরীরে বাসা বাঁধে।

যে সকল শপথ-বাক্য প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, কয়েকটী মাত্র ভিন্ন তাহাদিগের ভিতর অধিকাংশ হিন্দু আর্য্যের নিকট বড় গুরুতর—বড় ভয়ঙ্কর। হিন্দু জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে—ধর্ম্ম দিতে পারে না, আহারের লোভে ধর্ম্ম নষ্ট করিতে বড়ই ব্যাকুল। তাই এই শপথ-বাক্য লঙ্ঘন করিতে হিন্দু আর্য্য অশক্ত, শপথ মানিয়া চলিলেই শাস্ত্র নিষিদ্ধ দ্রব্য সকল ব্যবহার করাও হয় না। তাহা হইলেই শাস্ত্রকারদিগেরও উদ্দেশ্য সফল হইল। তাঁহাদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য—লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা, সমাজের মঙ্গল বিধান। হিন্দু-শপথ বাক্য লঙ্ঘন না করিলেই—এতদুভয় উদ্দেশ্যই সফল হইল, সকল দিক বজায় রহিল।

ইহা ভিন্ন শপথ বাক্যগুলির যে কোন বিশ্বাস সার্থকতা আছে, তাহা আমার বোধ হয় না, যদি প্রত্যেক দ্রব্য সম্বন্ধেই একই রকম শপথবাক্য দেওয়া হইত, তাহা হইলে শপথবাক্যের মূল্য কমিয়া যাইত, লোকে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিত না, সেই জন্যই এত ভিন্ন ভিন্ন শপথ-বাক্যের অবতারণা। সাধারণ লোকে এই শপথবাক্যগুলিকেই, ভিন্নিভেদে নিষিদ্ধ দ্রব্য সকল ভক্ষণ না করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করে, কিন্তু শপথবাক্যের উদ্দেশ্য কেবল লোকের মনে, সমাজের মনে, একটা ভীতি উৎপাদন করা এবং ভীতি উৎপাদন করিয়া অন্যায় বা অনিষ্টকর কার্য্য হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখা।

ধর্ম্মই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। মানবজীবন ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য এবং জ্ঞান লাভের জন্য। আত্মার উন্নতিই জীবন-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠফল। শরীর রক্ষা না হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পারে না। তাই শরীর রক্ষা ধর্ম্ম্য—তাই স্বাস্থ্য রক্ষা জীবনযজ্ঞানুষ্ঠানের একটী অতি মহৎ, অতি পবিত্র, অতি গুরুতর অঙ্গ। সেই জন্যই আহার বিহার সম্বন্ধে এত তীক্ষ্ণ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

যখন ভারতে মুসলমান শাসন ছিল—যখন মোগল সম্রাটগণ ভারতবর্ষের অধীশ্বর ছিলেন, তখনও তাঁহারা যে সকল রাজবিধি প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত কোন প্রকার হেতুবাদ সংযুক্ত হইত না। "আবুল ফজেল" পাঠ করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

রাজার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবার যো নাই। "কেন ইহা করিব" তাহাও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস নাই—ক্ষমতা নাই। তাই সকলে সকলবিধিই মানিয়া চলিত। মুসলমান রাজাগণ হেতুবাদ দিতেন না আবার মুসলমানের "কোরাণে," খ্রীষ্টানের "বাইবেল" যত কথা লিখিত রহিয়াছে, তাহাদিগের কোনটীর সহিতই হেতুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান, "কোরাণকে" ভক্তির সহিত মস্তকের উপর স্থাপন করে—হেতু জিজ্ঞাসা করে না পূর্ব্বেও করিত না।

এখন ইংরাজ-রাজত্ব। যে বিধিই প্রচলিত হইতেছে, তাহার সহিত হেতুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজ আমাদিগের রাজা। "কেন অমুক রাজাজ্ঞা মানিয়া চলিব" এ কথা আমরা কহিতে পারি না। রাজ-আজ্ঞা সর্ব্বদাই প্রতিপাল্য, তাই আমাদিগকে মানিয়া চলিতে হয়—তাই আমরা সকল বিধিই মাথায় করিয়া বহিয়া থাকি।

পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুর রাজত্ব ছিল—ব্রাহ্মণ শাসন ছিল। তখনও কেহ হেতুবাদ জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না। তাই যে কোনরূপ বিধির প্রচলন করিলেও সঙ্গে সঙ্গে তাহার হেতুবাদ দিবার আবশ্যক হইত না। রাজার আজ্ঞা—ধর্ম্মের আজ্ঞা——দেবতার আজ্ঞা বলিয়া সকলে তাহা মানিয়া চলিত। যে অবজ্ঞা করিত, সে শাসিত হইত। সমাজ তখনকার শাসন কর্ত্তা ছিল—রাজা তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,

ওঁ তৎসৎ

অথর্ব্ববেদীয়া।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

(মূলম্)

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥১
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥২
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণ-
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩
প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-
নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৪
সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥৫
সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৬
বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥৭
ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা-
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব—
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৮
এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো-
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥৯
যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥১০

ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে
প্রথম খণ্ডঃ সমাপ্তঃ

তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ১
কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্ত কামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥২
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥৩

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্ম ধাম॥৪
সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥৫
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥৬
গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি॥৭
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥৮
স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি।
নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥৯
তদেতদৃচাভ্যুক্তম্——
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্॥১০
তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ
নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো
নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥১১
ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ
ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা

(অনুবাদ)

তৃতীয় মুণ্ডক-প্রথম খণ্ড

সতত একত্র স্থায়ী, সখ্যভাবাশ্রিত
দুই পক্ষী এক বৃক্ষ করেছে আশ্রয়;
তাহাদের এক জন খায় মিষ্ট ফল
অন্যে অনশনে থাকি দেখয়ে কেবল।১
একই বৃক্ষে নিমগন হইয়া পুরুষ,
মুহ্যমান হ'য়ে শক্তি হীনতা বশতঃ
করে শোক; কিন্তু যবে সাধক সেবিত
দেখে সে ঈশ্বরে, আর মহিমা তাঁহার
তখন তাহার শোক নাহি র'য় আর।২
দ্রষ্টা যবে, জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা ও ঈশ্বর,—
ব্রহ্ম যোনি পুরুষেরে করে বিলোকন,
পুণ্য পাপ দূর করি বিদ্বান্ তখন.
পরম সমতালাভ হ'য়ে নিরঞ্জন॥৩
প্রাণ তিনি, যিনি, সর্ব্বভূতে প্রতিভাত
তাঁহারে জানেন যিনি; সে বিদ্বান্ জন
নাহি হ'ন অতিবাদী; আত্ম ক্রীড় আর
আত্ম রতি, ক্রিয়াবান্ হ'ন সেই জন
ব্রহ্মবিদ্গণ মাঝে শ্রেষ্ঠ তিনি হ'ন॥৪
এই আত্মা লভ্য সত্য তপস্যার বলে,
সম্যক্ জ্ঞানেতে; নিত্য ব্রহ্মচর্য্যে পুনঃ।
তাঁহারে নেহারে ক্ষীণ-দোষ যতিগণ-
কায় মধ্যে, যিনি জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র হ'ন॥৫
সত্যেরই জয়লাভ, না হয় মিথ্যার;
সেই পথে আপ্তকাম ঋষিগণ যা'ন
সেথা, যথা সত্যের সে পরম নিধান,
সত্যেই বিস্তৃত সেই পথ দেব যান॥৬

সে দিব্য অচিন্ত্যরূপ হয়েন বৃহৎ
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর তিনি পুনরায় ;
দূরে—অতি দূরে—পুনঃ নিকটেও স্থিত
হেথাও দর্শক হৃদে আছেন নিহিত ॥৭
চক্ষু কিম্বা বাক্য গ্রাহ্য নাহি হ'ন তিনি ;
অন্য অন্য ইন্দ্রিয়েও গ্রাহ্য তিনি ন'ন
তপস্যা বা কর্ম্মলভ্য নহেন কখন ;
হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানের প্রসাদে
সে নিষ্কলে দেখা যায় ধ্যান যোগে শুধু ॥৮
এই সূক্ষ্ম আত্মা বেদ্য জ্ঞানেতে কেবল
পঞ্চধা—প্রবিষ্ট যথা রহিয়াছে প্রাণ ;
প্রাণেতেই প্রাণি সর্ব্ব-চিত্ত ব্যাপ্ত রয়
সে চিত্ত বিশুদ্ধ হ'লে আত্মা প্রকাশয় ॥৯
শুদ্ধ সত্ত্ব জন যে যে লোক মনে মনে
চিন্তা করে ; চাহে পুনঃ কামনা যে সব ;
পায় সেই সেই লোক, সে সব কামনা
করিবে ইষ্টার্থীতাই আত্মজ্ঞ'র্চ্চা ॥১০

ইতি তৃতীয় মুণ্ডক
প্রথম খণ্ড

তৃতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ড।

সে পরম ধাম ব্রহ্মে, আত্মজ্ঞ পুরুষ
জানেন, যাঁহাতে বিশ্বনিহিত থাকিয়া
প্রতিভাত শুভ্ররূপে ; যে ধীমদ্গণ—
অকাম হইয়া তাঁর করে উপাসনা—
তারা শুক্র অতিক্রমে ; ভবে জনমে না ॥১
যেই জন চিন্তা করে কাম্যবস্তু চয়,
সে সব কামনা সহ জনমে সেজন
সে কাম ভোগোপযোগী ভিন্নং লোকে ;
যে জন পর্য্যাপ্ত কাম আত্মবিৎ আর
হেথাই সকল কাম বিলীন তাহার ॥২
এই আত্মা নহে লভ্য বেদ-অধ্যাপনে
মেধা কিম্বা বহুশাস্ত্র জ্ঞানে লভ্য নয় ;
এ আত্মা আপনি যারে করেন বরণ—
সে লভে ইঁহারে, ইনি সমীপে তাহার,
প্রকাশ করেন নিজে তনু আপনার ॥৩
বলহীন জন লভ্য নহে আত্মা এই,—
প্রমাদে বা অসন্ন্যাস জ্ঞানে লভ্য নয়।
এ সব উপায়ে যত্ন করে যে বিদ্বান
প্রবেশ করয়ে তার আত্মা ব্রহ্ম ধাম ॥৪
ইঁহারে পাইয়া জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিগণ
কৃত কৃত্য, বীতরাগ, প্রশান্ত হৃদয় ;
যুক্তাত্মা সে ধীরগণ সে সর্ব্বগামীরে
সর্ব্বতঃ পাইয়া তাহে করেন প্রবেশ ॥৫
বেদান্ত-বিজ্ঞান-অর্থে সুনিশ্চিত করি,
সন্ন্যাস যোগেতে শুদ্ধ সত্ত্ব যোগিগণ,—
লভিয়ে পরমামৃত, পরমান্ত কালে,
সম্যক্ রূপেতে মুক্ত হয়েন সকলে ॥৬
পঞ্চদশ কলা যায় কারণে তাদের,
সকল ইন্দ্রিয় যায় নিজ নিজ দেবে ;
সমুদয় কর্ম্ম, আর আত্মা জ্ঞানময়,
সে শ্রেষ্ঠ অব্যয় সহ একীভূত হয় ॥৭
বহমান্ নদীচয় স্ব স্ব নাম রূপ—
ত্যজিয়া, সমুদ্রে যথা যায় মিশাইয়া,
তথা নামরূপ হ'তে বিমুক্ত বিদ্বান্
পরাৎপর পুরুষেতে যায় মিশাইয়া ॥৮
যে জন জানেন সেই পরম ব্রহ্মেরে
হয়েন ব্রহ্মই তিনি ; কুলেতে তাঁহার
ব্রহ্মজ্ঞান হীন কেহ নাহি হয় আর ;
হয়ে শোক পাপোত্তীর্ণ, হইয়া বিমুক্ত
হৃদয়ের গ্রন্থি হ'তে হয়েন অমৃত ॥৯
প্রকাশিত ঋকে ইহা——
ক্রিয়াবান্, শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম নিষ্ঠ যাঁরা,
শ্রদ্ধাবান্ হয়ে নিজে করেন প্রদান
অগ্নিতে আহুতি ; আর বিধি অনুসারে

করেন যাঁহারা শিরো ব্রত অনুষ্ঠান,
তাঁহাদিগে ব্রহ্ম-বিদ্যা করিবে প্রদান ॥১০
এ সত্য, অঙ্গিরা ঋষি ক'ন পুরাকালে
এই গ্রন্থ পড়িবেনা কভু সেই জন,
করে নাই যেই জন ব্রত আচরণ,—
সে পরম ঋষিগণে করি নমস্কার।
সে পরম ঋষিগণে করি নমস্কার ॥১১

ইতি তৃতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ড।
মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্ত—
শ্রীমনোরঞ্জন সরস্বতী।
বারৈখালী (যশোহর)

বর্ণভেদ-তত্ত্ব।

(বর্ণ ও জাতি শব্দ।)

বেদাদি প্রাচীন ও পুরাণাদি পরাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণ ও জাতি এই উভয় শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। শাস্ত্রীয় পুস্তকের পর্য্যালোচনায় প্রতীত হয়, এই শব্দদ্বয় একার্থক। শব্দের প্রকৃতিগত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে, ইহাদের কথঞ্চিৎ পার্থক্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে ইহাদের অর্থ অভিন্ন, এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণ শব্দের অর্থ রঙ্। দৃষ্টান্ত স্বরূপে সিত, অসিত, লোহিত, পীত ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বর্ণ কোনও সময়ে সামাজিক সম্প্রদায় বিভাগের কারণরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বিভিন্নবর্ণবিশিষ্টব্যক্তিগণ বিভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে, তাহা দ্বারা অনুমিত হইতে পারে যে, বর্ণ-ভেদই তাৎকালিক শ্রেণীবিভাগের কারণ। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হয়—

ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা ॥৫॥

ব্রাহ্মণগণের বর্ণ শুভ্র, ক্ষত্রিয়ের বর্ণ লোহিত, বৈশ্যগণ পীতবর্ণ ও শূদ্রের বর্ণ কৃষ্ণ। সুতরাং শারীরিক-বর্ণানুসারে যে কোনও কালে ব্রাহ্মণাদি বিভাগ সংস্থাপিত হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্র-সঙ্গত। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইল, বর্ণ শব্দের অর্থ শরীরের রঙ্।

অতঃপর জাতি শব্দ। জাতি শব্দ "জন" ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৈয়াকরণপদ্ধতি পরিত্যাগ না করিলে, জাতি বলা মাত্রই যেন জন্মের সহিত ইহার সম্পর্ক সমধিক সন্নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। জাতি শব্দে বিভিন্নভাবাপন্ন দার্শনিক মহোদয়েরা বিভিন্ন বস্তু বুঝিয়াছিলেন, সকল অর্থের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি না থাকিলেও, উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল কয়টী মত এ প্রসঙ্গে অল্পাধিক আলোচিত হইলে অসঙ্গত হইবে না, এই আশায় আবশ্যকীয় মতবাদ বিচার করা যাউক্।

শব্দশাস্ত্রের পারদর্শনকারী প্রাচীন বৈয়াকরণকুল বলিতেন, "আকৃতিগ্রহণা জাতিঃ।" তাঁহাদের লক্ষণ আরও বিস্তৃত, আমরা আবশ্যকানুরোধে এই অংশের আলোচনা করিব।

আকৃত্যা গ্রহণং যস্যাঃসা আকৃতিগ্রহণা, এইরূপ তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন। আকৃতির দ্বারা যাহার গ্রহণ অর্থাৎ প্রতীতি হয়, তাহাই জাতি। মনুষ্যাকৃতি দর্শন মাত্রেই ইহা মনুষ্য জাতি বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

আকার প্রকারের বিভিন্নতায় মানব জাতি গবাদি জাতি হইতে পৃথক্। তজ্জাতীয় আকৃতি দর্শনেই আমরা তজ্জাতির জ্ঞান লাভ করি। শাস্ত্রীয়-জাতিশব্দ বুঝিতে এই লক্ষণের আবশ্যকতা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। দার্শনিক সম্প্রদায় সমস্বরে ঘোষণা করেন, "মীমাংসকগণ জাতি শক্তিবাদী"। মীমাংসক গুরু আচার্য্য-চূড়ামণি মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে বলিয়াছেন,—"আকৃতিঃ শব্দার্থঃ"। ইহাদ্বারা অনায়াসে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, আকৃতির সহিত জাতির সম্বন্ধ নিকট।

মীমাংসাদর্শনের প্রথমাধ্যায়চতুর্থপাদ-চতুর্বিংশতিতম সূত্র—"জাতিঃ"। ভাষ্যকার পরমপূজনীয় প্রজ্ঞাপুঞ্জ শবরস্বামী কণ্ঠতঃ সূত্র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন "অগ্নি ব্রাহ্মণয়োরেকা জাতিঃ"। অগ্নি ও ব্রাহ্মণের জাতি এক, এই কথা প্রতিপাদন প্রয়াসে তিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে অগ্নি ও ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিল, এতৎপ্রমাণক একটী বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে সেই বাক্যের বিচার করিব। আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ, এই শ্রুতি বাক্যে আগ্নেয় শব্দ ব্রাহ্মণের স্তুতি বুঝাইতেই ব্যবহৃত, ইহাই ঐ অধিকরণের রহস্য। আগ্নেয় শব্দ ব্রাহ্মণ-স্তুতি বুঝাইবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ঐ সূত্রে দেওয়া যাইতেছে। অগ্নি ও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি এক স্থানে, সুতরাং এক অপরের স্তাবক হইতে পারে। বস্তুতঃ এই সূত্রে ভাষ্যের আশয় যে, জাতি অর্থ জন্ম।

বেদবাক্য বিচারধুরীণ অশেষবিধিণ আচার্য্য মাধব ও ন্যায়মালায় ঐ অধিকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া "অগ্নিব্রাহ্মণয়োর্মুখজন্মাত্বং কস্মিংশ্চিদর্থবাদে সমাম্নায়তে" লিখিয়াছেন। তৎপরে ভাষ্যোদ্ধৃত অর্থবাদ বাক্যটীরও বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতেও ঐ সূত্রে জাতি অর্থে জন্মই বিবেচিত হইয়াছে; অতএব সম্প্রতি আমরা জাতি অর্থাৎ জন্মানুসারে সমাজের যে শ্রেণী-বিভাগ সমর্থিত হইয়াছিল, তাহাই জাতিভেদ বুঝিয়া রাখি। শব্দ শাস্ত্রের সাহায্য এইস্থলে বিশ্রাম লাভ করিল, অতঃপর আমরা বেদাদি শাস্ত্রের ভূয় আলোচনায় "শাস্ত্রীয় জাতিভেদ কি?" বুঝিতে প্রয়াস পাইব।

(শাস্ত্রীয়-বর্ণভেদ)

জাতি শব্দ যৌগিক কি রূঢ়, তাহা বিচার করিবার অবসর আপাততঃ উপস্থিত হইয়াছে। যদি আমরা ব্রাহ্মণাদি জাতির জাতিতত্ত্ব জন্মের সহিত সংসৃষ্ট, ইহা প্রমাণ করিতে পারি, তবে ঐ শব্দ যৌগিক শব্দ, ইহা সঙ্গত হইবে না। শব্দ শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যোদ্ভেদ এ প্রসঙ্গে অসম্ভব, সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে হইবে, যৌগিক শব্দের যোগার্থ চিরদিনই সমান, উহার প্রকৃতি প্রত্যয় লভ্য অর্থ আবহমানকাল একভাবে চলিতেছে। রূঢ় শব্দের অর্থে একটু বিশেষত্ব আছে। যে গুণ বা ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া প্রতিপাদ্য পদার্থে রূঢ়শব্দ পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইত, পরবর্ত্তী কালে সেই গুণ ক্রিয়া লক্ষ্য করা হয় না বটে, কিন্তু প্রতিপাদ্য পদার্থে পূর্ব্বকার মত প্রযুক্ত হয়। প্রাচীন ব্যুৎপত্তি উহার মধ্যে আছে, আপাততঃ গৃহীত হয় না, এই জন্য নাম 'রূঢ়'। প্রত্যুক্ত কোনও শব্দ ব্যুৎপত্তি পুষ্ট ভাবে কোনও বুদ্ধিন

ব্যবহৃত হইত না, বা হয় না। জাতি শব্দ যৌগিক। বেদে এবং অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থে ব্রাহ্মণাদির জন্মের বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতি অর্থাৎ জন্ম বিভিন্ন, সুতরাং ইহারা ভিন্নজাতি। মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন দেখা যায়।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসত্ত্বানাং বর্ণাস্তাংশ্চাপি নির্ম্মমে ॥৪

ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য ভূত সত্ত্বের বর্ণ সকল ও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নির্ম্মাণ প্রণালী সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানারূপ লিখিত আছে, আমরা ক্রমে ক্রমে সকলগুলির অল্পাধিক অনুশীলন করিব;

যজুর্ব্বেদ সংহিতার সপ্তমকাণ্ডে দেখা যাইতেছে। প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ-সৃজেয়মিতি, স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দেবতা অন্বসৃজ্যত, গায়ত্রীছন্দঃ, রথন্তরংসাম, ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং অজঃপশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যাঃ মুখতোহি অসৃজ্যন্ত। উরসো বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত, তং ইন্দ্রো দেবতা অন্বসৃজ্যত। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ বৃহৎসাম রাজন্যো মনুষ্যানাং অবিঃপশূনাং তস্মাত্তে বীর্য্যবন্তঃ বীর্য্যাদ্ধি অসৃজ্যন্ত। উরুভ্যাং মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত, তং বিশ্বদেবা দেবতা অসৃজ্যন্ত, জগতীচ্ছন্দঃ বৈরূপং সাম বৈশ্যো মনুষ্যানাং গাবঃ পশূনাং ইত্যাদি। "প্রজা সৃজন করিব" মনে করিয়া প্রজাপতি মুখ হইতে ত্রিবৃৎগুণ, অগ্নিদেবতা, গায়ত্রীছন্দ, রথন্তর সাম, মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ ও পশুর মধ্যে অজ এই গুলি নির্ম্মাণ করিলেন; এই অর্থবাদ বাক্যে উরু হইতে বৈশ্য ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়াদির ও উৎপত্তি কীর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। এই উৎপত্তিবাক্য অর্থবাদ, সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য বিশেষ বিবেচ্য; কিন্তু বেদশাস্ত্রে এই ভিন্ন প্রকার ভিন্ন স্থান হইতে উৎপত্তি কীর্ত্তিত হওয়ায়, উহাদের জাতি অর্থাৎ জন্ম ভিন্ন, ঈদৃশ অভিপ্রায়েই প্রাচীন সময়ে ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন জাতি বলা হইত। বর্ত্তমান যুগে ঐ শব্দে যাহাই কেন বুঝি না; প্রাচীন প্রতীতি ঐ প্রকার ছিল, সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে "মুখং কিমস্যাসীৎ কৌ বাহূ?" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ "ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহ জায়ত।" এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী ও পূর্ব্বতনটীকাকারগণ ঐ মন্ত্রে ও ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি, উরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্রের জন্ম বুঝিয়াছিলেন। "মুখং কিমস্য" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমেই সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন, "প্রশ্নোত্তররূপেণ ব্রাহ্মণাদি সৃষ্টিং বক্তুং ব্রহ্মবাদিনাং প্রশ্না উচ্যন্তে।" ইহা হইতে প্রতীত হয় সায়ণ ঐ মন্ত্রে ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উৎপত্তিই বুঝিয়াছেন। "ব্রাহ্মণোহস্য মুখং আসীৎ" এই টুকুর ব্যাখ্যায় সায়ণ বলিতেছেন "ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণত্বজাতি-বিশিষ্টপুরুষো মুখমাসীৎ মুখাদুৎপন্নঃ" ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির বেলায় ও ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের (অর্থবাদের) সহিত এক বাক্যতা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। এস্থ

উত্তর, উভয়ই ঐরূপে ব্যাখ্যা করিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। বস্তুতঃ মূলে "ব্যকল্পয়ন্" পদ আছে, তাহা দ্বারা কল্পনা করার কথাই বুঝা সঙ্গত। "মুখং কিং?" অর্থ "মুখ কি?" ভাষ্যকারের মতে "মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল কি?" এরূপ শত শত নূতন অর্থ ভাষ্যকার শুনাইয়াছেন। "পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" এই অংশের দিকে নয়ন নিঃক্ষেপ করিয়াই তাঁহাদের এরূপ মতবাদ প্রচারে প্রবৃত্তি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "পদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল," এই চতুর্থ পাদ এখানে বড় বিপজ্জনক ও ভ্রান্তি-নিদান। বাক্যশেষের অনুরোধে সকল স্থানে অন্যার্থ করা অপেক্ষা "বহূনাং অনুগ্রহো ন্যায়ঃ" এই ন্যায়ানুসারে "অজায়ত" পদের অন্যার্থ করাই সঙ্গত, এরূপ অনেক পণ্ডিতের অভিপ্রায়। এই সকল বাক্য অর্থবাদ। এই বাক্যে মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি কথিত হইলেও তাহা দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে না। অর্থবাদ বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা পরে আলোচ্য। আপাততঃ বুঝা গেল, ভাষ্যকার সায়ণ-আচার্য্যের মতে ব্রহ্মার মুখ এবং বাহু প্রভৃতি ভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির ভিন্ন জাতি অর্থাৎ জন্ম বেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে ঐরূপ দেখা যায়। "পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষেত্রমেতস্য বাহবঃ। ঊর্ব্বো বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত," ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় ইঁহার বাহু, ইঁহার ঊরু বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এ শ্লোকে পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ না বুঝিয়া মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিল এইরূপ বুঝিতে হইবে। টীকাকার পরম-পণ্ডিত শ্রীধর স্বামী এই শ্লোক ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "বর্ণানাং তত উৎপত্তিং দর্শয়তি মুখমস্যেতি।" ৩৭ শ্লোকে মূলে আছে "যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।" মূলে কল্পনার কথা রহিল, টীকাকার পরার্দ্ধ অনুসারে পূর্ব্বার্দ্ধেরও 'উৎপত্তি'ই অর্থ করিয়াছেন। যাহাহউক, ঐ শ্লোকের যদি উৎপত্তিই অর্থ হয়, তাহাও অবসরে আন্দোলিত হইবে।

শ্রীধর স্বামী দ্বিতীয়স্কন্ধ ষষ্ঠাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদি ঋক্‌ত্রয়স্যার্থঃ পূর্ব্বাধ্যায় এব দর্শিতঃ।" এইরূপ লিখিয়াছেন। সুতরাং পুরুষ সূক্তের অর্থ সায়ণাচার্য্যের মতই শ্রীধর স্বামী বুঝিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার সকলেই এমতের পোষক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থাধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যে দেখিতে পাই, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া ঈশ্বরেণ সৃষ্টং উৎপাদিতং ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদি শ্রুতেঃ।" চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির প্রমাণরূপে শঙ্করাচার্য্য ও পুরুষ সূক্তের "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" এই বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন। সায়ণাচার্য্য এবিষয়ে শঙ্করের সহিত একমত ই হইলেন।

মনুসংহিতায় "মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়োবহিঃ" এই শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণকে "মুখবাহূরু-পজ্জ" বলা হইয়াছে। মুখবাহূরুপদ্ভ্যঃ জায়ন্তে এই অর্থেই ঐরূপ শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে; সুতরাং প্রকারান্তরে মহর্ষি মনু ও ব্রাহ্মণ মুখজ অর্থাৎ মুখ হইতে উৎপন্ন একথা স্বীকার করিয়াছেন। পুরাণান্তরে ও মুখতো

ব্রাহ্মণো মুখে বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ো বিরাট। উরুভ্যামূদ্ভূতো বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত।" ইত্যাদি প্রমাণ পাওয়া যায়। এতাবৎ বেদাদি পুরাণান্ত শাস্ত্রের সমালোচনায় বুঝা গেল, জাতি ভিন্ন হইবার তাৎপর্য্য জন্ম-বিভিন্নতা।

মন্বাদিসংহিতা শাস্ত্র এবং পুরাণাদিতে যে বহুবিধ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সে জাতি বৈচিত্রে জন্মবৈচিত্র একমাত্র কারণ-স্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুও স্পষ্ট বলিয়াছেন।

লোকানাং তুবিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

লোক বৃদ্ধির জন্য প্রজাপতি স্বীয় মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মনু আরও বলিতেছেন,—

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠোনামজায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং য পারশব উচ্যতে॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচার বিহারয়াম্।
ক্ষত্র শূদ্র বপুর্জন্তুরুগ্রোনাম প্রজায়তে॥
ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতোভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তাচাণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্য বিপ্রাসুজায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
একান্তরেত্বানুলোমাদম্বষ্ঠোগ্রৌযথাস্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যাপিজন্মনি॥
ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতোনামজায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠ কন্যায়ামায়োগব্যাংতুধিগ্বণঃ॥
আয়োগবশ্চক্ষত্তা চ চণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ॥
বৈশ্যান্মাগধ বৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎসূত এবতু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তেপরেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥
জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতিপুক্কশঃ॥
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যাং তু সবৈকুক্কুটকঃস্মৃতঃ।
ক্ষত্তুর্জ্জাত স্তথোগ্রায়াং শ্বপাকইতিকীর্ত্তিতঃ॥
বৈদেহকেনত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্ন বেণ উচ্যতে।
দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তুযান্॥
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যানিতিবিনির্দ্দিশেৎ॥
ব্রাত্যাত্তুজায়তেবিপ্রাৎ পাপাত্মাভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এবচ॥
ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রাবিড় এবচ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এবচ।
কারুষশ্চ বিজন্মাচ মৈত্রসাত্বত এবচ।
সূতো বৈদেহিকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এবচ॥

হারীতসংহিতায় দেখা যায়—

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তস্তু ক্ষত্রিয়ায়ামজায়ত,
বৈশ্যায়ান্তু তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রয়া তথা।
রাজন্যাদ্ বৈশ্যশূদ্রাস্তু মাহিষ্যোগ্রৌতু তৌ স্মৃতৌ।
শূদ্র্যাং বৈশ্যাত্তু করণ এত এবানুলোমজাঃ।
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ বৈশ্যাদ্বৈদেহিক স্তথা
চণ্ডালস্তু তথা শূদ্রাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ।
মাগধঃ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈ বৈশ্যা ক্ষত্তাস্তু শূদ্রতঃ
শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্যোজনয়ামাস বৈ সুতম্।
রথকারঃ করণ্যাস্তু মাহিষ্যেণ প্রজায়তে,
অসৎ সন্তত্যো জ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
প্রতি লোমস্তু বৈ জাতা গর্হিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে জাত্যুৎপত্তি প্রক্রিয়া যথা—

শূদ্রায়াং বৈশ্যতোযজ্ঞে করণো নামসঙ্করঃ।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোঽপ গান্ধি-
কোবণিক্।
কাংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ।
উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং ক্ষত্রাৎ বভূবতুঃ॥
কুম্ভকারস্তন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ।
কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাং তস্যাং বভূবতুঃ॥
বৈশ্যাদ্বভূব ভুরঙ্গো মাগধো গোপ এব চ।
ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ নাপিতমো-
দকৌ॥
ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রকন্যায়াং বারুজীবী বভূবহ।
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো মালাকারস্তথা মুনে॥
বৈশ্যাত্তু দ্বিজকন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলিতৈ-
লিকৌ।
বিংশতি সঙ্করা এতে জাবালে কথিতাস্তব॥
উত্তমা সঙ্করা এতে মধ্যমাধমে শৃণু।
বৈশ্যায়াং করণাজ্জাতৌ তক্ষা রজক এব চ॥
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক তস্যামম্বষ্ঠসম্ভবৌ।
বৈশ্যায়াং গোপতোজাত আভীরতৈলকারকৌ।
গোপাৎ শূদ্রাগর্ভজাতৌ ধীবরশৌণ্ডিকৌ।
মালাকারাম্মুসম্ভূতৌ নটঃ শাবক এবচ॥
মাগধাদপি শূদ্রায়াং শেখরজালিকৌ।
এতে বৈ মধ্যমাঃ প্রোক্তা অন্ত্যজানপি মেশৃণু॥
বৈশ্যপত্ন্যাং স্বর্ণকারান্ মলেগ্রাহিরজায়ত।
কুড়বঃ স্বর্ণবণিজো বৈশ্যপত্ন্যাং বভূবহ॥
শূদ্রাচ্চ ব্রাহ্মণীগর্ভাচ্চণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ।
আভীরাদ্গোপকন্যায়াং বরুড় সমজায়ত॥
তক্ষোঽভূদ্বৈশ্যকন্যায়াং চর্ম্মকারশ্চ শিল্পবিৎ।
ঘটজী বীতুরজকাদ্বৈশ্যায়াং সংবভূবহ॥
বৈশ্যায়াঞ্চ তৈলকারা দোলবাহী বভূবহ।
ধীবরাদপি শূদ্রায়াং মল্লজাতির্বভূবহ॥
ইত্যাদয়ো হ্যন্ত্যজাঃ প্রোক্তা বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃতাঃ
ষট্‌ত্রিংশজ্জাতকর্ম্মাণি সাধিকাঃ কথিতাস্তব।

* * * * *

দেবলাদ্গণকোজাতো বৈশ্যায়াং বান্নকোঽ-
পিচ।
বৈশ্যস্যাঙ্গাত্তু সম্ভূতো ম্লেচ্ছো নাম সুতোধরঃ,
পুলিন্দঃ পুক্কশ শ্চৈব খসো বৈ যবনস্তথা।
শুক্ক কম্বোজশবরাঃ খরশ্চৈতাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
বিংশতি সংহিতাকারের অন্যতম উশনা জাতি
সম্বন্ধে বলিতেছেন,—
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি জাতিবৃত্তবিধানকং
অনুলোম বিধানঞ্চ প্রতিলোম বিধিস্তথা।
সাবর্ণ্যেনক সংযুক্তং সর্ব্বং সংক্ষিপ্য চোচ্যতে,
নৃপাদ্ ব্রাহ্মণকন্যায়াং বিবাহেষু সমন্বয়াৎ
জাতঃ সূতেত নির্দ্দিষ্টঃ প্রতিলোমবিধের্দ্বিজঃ
বেদানর্হস্তথা চৈষাং ধর্ম্মানামনু বোধকঃ।
সূতাদ্বিজ প্রসূতায়াং সুতো বেণুক উচ্যতে।
নৃপায়ামেব তস্যৈব জাতো যশ্চর্ম্মকারকঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতশ্চণ্ডাল উচ্যতে।
চণ্ডালাদ্বৈশ্যকন্যায়াং জাতঃ শ্বপচ উচ্যতে।
নৃপায়াং বৈশ্যসংসর্গাদায়োগব ইতি স্মৃতঃ।
আয়োগবেন বিপ্রায়াং জাতাস্তাম্রোপজীবিনঃ।
তস্যৈব নৃপকন্যায়াং জাতঃ সুণিক উচ্যতে,
সুণিকস্য নৃপায়াস্তু জাতা উদ্বন্ধকাঃ স্মৃতাঃ।
নৃপায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ পুলিন্দঃ পরি-
কীর্ত্তিতঃ।
নৃপায়াং শূদ্র সংসর্গাজ্জাত পুক্কশ উচ্যতে॥
পুক্কশাদ্বৈশ্যকন্যায়াং জাতো রজক উচ্যতে।
নৃপায়াং শূদ্রতশ্চৌর্য্যাজ্জাতোরজ্জুক উচ্যতে॥
বৈশ্যায়াং রজকাজ্জাতো নর্ত্তকো গায়কো
ভবেৎ।
বৈশ্যায়াং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতো বৈদেহিকঃ
স্মৃতঃ॥
বৈদেহিকাত্তু বিপ্রায়াং জাতশ্চর্ম্মোপজীবিনঃ।

নৃপায়ামেব বৈশ্যাৎ স্বচিকঃ পাচকঃ স্মৃতঃ।
বৈশ্যায়াং শূদ্রতশ্চৌর্য্যাজ্জাতশ্চক্রী উচ্যতে।
বিধিনা ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্য নৃপায়ান্তু সমন্ত্রকম্॥
জাতঃ সুবর্ণইত্যুক্তঃ সানুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ।
নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ সংজাতোভিষকস্মৃতঃ
নৃপায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো নৃপইতি স্মৃতঃ।
নৃপায়াং নৃপসংর্গাৎ প্রমাদাদ্‌গূঢ়জাতকঃ॥
সোঽপিক্ষত্রিয় এব স্যাদভিষেকেচবর্জ্জিতঃ।
অভিষেকং বিনা প্রাপ্য গোল্ল ইত্যভিধায়কঃ॥
বৈশ্যায়াং বিধিনাপ্রাপ্য বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে
বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকারঃস উচ্যতে
কুলালবৃত্ত্যা জীবেৎ নাপিতো বা ভবস্যাতঃ।
সূতকে প্রেতকে চাপি দীক্ষাকালেঽথবাপনম্॥
নাভেরূর্দ্ধন্তু বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে।
কায়স্থ ইতিজীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ॥
কাকাল্লৌল্যং যম্‌ৎক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থইতি কীর্ত্তিতঃ॥
শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতঃ পারশবোমতঃ।
তস্যাং বৈ চৈরশো বৃত্ত্যা নিষাদো জাত উচ্যতে।
নৃপাজ্জাতো হথ বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনা স্মৃতঃ।
তস্যাং তস্যৈব চৌরেণ মণিকারঃ প্রজায়তে,
শূদ্রস্য বিপ্রসংসর্গা জ্জাত উগ্রইতি স্মৃতঃ।
তস্যৈবচাবসৎ বৃত্ত্যা জাতঃ শুণ্ডিক উচ্যতে।
শূদ্রায়াং বৈশ্যসংসার্গাদ্বিধিনা সূচকঃ স্মৃতঃ।
সূচকাদ্বিপ্রকন্যায়াং জাতস্তক্ষক উচ্যতে।
নৃপায়ামেব তৈতস্য জাতো যো মৎস্যবন্ধকঃ।
শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কটকার ইতি স্মৃতঃ
বশিষ্ঠ শাপাৎ ত্রেতায়াং কেচিৎ পারশবস্তথা॥
বৈখানসেন কেচিত্তু কেচিদ্ভাগবতেন চ।
বেদশাস্ত্রাবলম্বাস্তে ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥

পদ্ম পুরাণ মতে জাতির উৎপত্তি যথা,—

কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ।
বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ॥
অট্টালিকাকার বীর্য্যেণ কুম্ভকারস্যযোষিতঃ
বভূব কোটকঃসদা পতিতো গৃহকারকঃ॥
কুম্ভকারস্য বীর্য্যেন সদ্যঃ কোটকযোষিতঃ।
বভূব তৈলকারশ্চ কুটীলঃ পতিতোভুবি॥
সদ্যাক্ষত্রিয় বীর্য্যেণ রাজপুত্রস্যযোষিতঃ।
বভূব পতিতো দস্যু লেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
লেটতীবরকন্যায়াং জনয়দষ্টজাতীন্।
মালং মল্লং মাতরশ্চ ভড়ং কোলং কলন্দরং॥
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ।
সদ্যোবভূব চাণ্ডালঃ সর্ব্বস্মাদধমোঽশুচিঃ॥
তীবরেণ চাণ্ডাল্যাং চর্ম্মকারো বভূবহ।
চর্ম্মকার্য্যাঞ্চ চাণ্ডালাং মাংসচ্ছেদী বভূবহ।
মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কোচস্ত্রিয়াস্তু কৈবর্ত্তাৎ কাণ্ডারঃপরিকীর্ত্তিতঃ॥
সদ্যশ্চণ্ডাল কন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক!
বভূবতু স্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ দুষ্টৌ হড্ডি ডোমৌ তথা।
ক্রমেণ হড্ডি কন্যায়াং সদ্যশ্চণ্ডাল বীর্য্যতঃ।
বভূবুঃ পঞ্চপুত্রাশ্চ দুষ্টা বনচরাশ্চ তে।
লেটাত্তীবর কন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক!
বভূব সদ্যো আবালো গঙ্গা পুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
গঙ্গা পুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ—
বভূব বেশধারীচ পুত্রো যোগী প্রকীর্ত্তিতঃ।
বৈশ্যাত্তীবর কন্যায়াংসদ্য শুণ্ডী বভূবহ।
শুণ্ডীযোষিতো বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রকশ্চ বভূবহ॥

ক্ষত্রাৎ করণ কন্যায়াং রাজপুত্রো বভূবহ।
রাজপুত্রাত্তু করণাদাগুরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্রমৌ তীরব সংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতোভুবি।
তীবর্য্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব রজকঃ স্মৃতঃ।
রজকাং তীবরা চৈব কোদালীতি বভূবহ॥
নাপিতাদ গোপ কন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য
যোষিতঃ।

শ্রীনির্ম্মলানন্দ ভারতী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

চতুর্থ শ্লোকালোচনার পরিশিষ্ট।

কবিতাংবা (ন কাময়ে)—আমি কবিতাও চাই না। কবিতা মানুষের আর একটি বিশেষ ঐহিক প্রিয় বস্তু। রস বা প্রিয়তাই মানবাত্মার স্বাভাবিক প্রীতির নিদান। এই জন্যই স্বয়ং ভগবানকেও শাস্ত্রে রসস্বরূপ বলা হইয়াছে। স্বয়ং শ্রুতি তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন। আবার বাক্যই জীব-জগতে মানুষের সুবিশিষ্ট সম্পদ। মহাবাক্য স্বরূপ বেদই মানুষের "শব্দ ব্রহ্ম।" ইহাই বাক্যের বিশেষ গৌরব; যাহাহউক, সাধারণতঃ বাক্য ও রসের একত্র সমাবেশই কাব্য বা কবিতা। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং।" রসাত্মক যে বাক্য, তাহাই কাব্য। এই জন্যই কাব্য বা কবিতা মানুষের স্বতএব প্রিয়।

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।" বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাব্যশাস্ত্র-রসাস্বাদনেই কালক্ষেপ করেন। অর্থাৎ যিনি কাব্যশাস্ত্রে উদাসীন, তিনি জগতের একটি সার রসে বঞ্চিত; সুতরাং তিনি সুবুদ্ধিমান জীব মানব হইয়াও এ বিষয়ে বুদ্ধিহীন।

কাব্য এই সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃত-ফল।
"সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে অত্র রসবৎ ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

অর্থাৎ—

সংসার বিষের তরু; সুধা ফল দুটি তার।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদ, সুজন-সঙ্গম আর॥

সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে কাব্যের এইরূপ অসাধারণ গৌরব প্রথিত আছে। স্বয়ং বেদই আদি কবি লোকপিতামহ ব্রহ্মার আদি কাব্য; অধিক কি, আজ বেদের মাত্র আধিভৌতিক অর্থেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অসাধারণ কবিত্ব দেখিতেছেন! ভারতের সর্ব্ব শাস্ত্রেই কবিত্ব, সর্ব্ব শাস্ত্রেরই কথা কবিতা-সূত্রে গাঁথা। আমাদের ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে পাঠশালার "শিশুবোধ" পর্য্যন্ত কবিতাচ্ছন্দে গ্রথিত। মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত হইতে আমাদের মেয়েলী শিশুর সোহাগ পর্য্যন্ত কবিতাময়। ফলে কবিত্ব ভাব স্বভাবতই ভারতের চির-ধাতুগত বা মজ্জাগত বস্তু; সুতরাং ভারতবাসীর কবিত্বপ্রিয়তা একান্ত স্বাভাবিক।

সত্বাদি গুণত্রয়-ভেদে কবিতাও ত্রিবিধা। কবিতাশ্রিত নয়টি রস যথাক্রমে ত্রিতয়রূপে এই ত্রিগুণ-বিভাগে বিভক্ত। আদি, শান্ত, করুণ, এই তিন রসে সাত্বিকী কবিতা; বীর,

রৌদ্র, হাস্য, এই রসত্রয়ে রাজসী কবিতা; এবং ভয়, বিস্ময়, বীভৎস, এই ত্রি-রসে তামসী কবিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে এ সম্বন্ধে বিচারগত মতভেদ আছে। আদিরস কিরূপে সাত্ত্বিক রস হইতে পারে, হাস্য ও ভয়ানক রসের কোন্‌টি রাজস, কোন্‌টি তামস, এ সব কথা লইয়া অনেক আলোচনা চলিতে পারে; কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মূল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ও বিষয়ে অধিক অগ্রসর হওয়া অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয়।

যাহাহউক, কাব্য বা কবিতার আকর্ষণ, আমাদের সাধারণতঃ এক প্রধান আকর্ষণ, সন্দেহ নাই। ভোগের যত কিছু বাছা বাছা পার্থিব প্রলোভন আছে, সুকবির কবিতাও তাহার মধ্যে সুগণ্য; এমন কি, স্থলবিশেষে অগ্রগণ্য। একটি প্রাচীন ব্যক্তিগত রুচির ঐহিক ভোগ্য-তালিকা দেখুন।—

"কালিদাস-কবিতা নবং বয়ঃ,
মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ।
এণ-মাংসমবলাচ কোমলা
সম্ভবন্তু মম জন্ম জন্মনি॥"

অর্থাৎ—

কবিতা কালিদাসের, নবীন বয়স।
মহিষের দধি, আর চিনির পায়স॥
হরিণের মাংস, আর সুকুমারী নারী।
জনমে জনমে লাভ হউক্ আমারি॥

এই জাতীয় একটি মৌলিক বাঙ্গালা-পদ্য এইরূপ,—

"গব্য-কাব্য-নব্যকাল আর নব্যা নারী।
মরতে স্বরগ-সুখ সঞ্চারে এ চারি॥"

এ সব রুচির ভাব অবশ্য অনেকটা ব্যক্তিগত, কিন্তু কাব্য-কবিতা সাধারণতঃ সকলেরই বিষাদভঞ্জিনী ও চিত্তরঞ্জিনী, সুতরাং একান্ত আকর্ষিণী, সন্দেহনাই; অতএব ভক্ত বলিতেছেন,—হে জগদীশ! এমন যে সর্ব্বমানব-মোহিনী কবিতা, তাহাও আমি চাই না। অর্থাৎ শুদ্ধ কেবল কাব্য-রসপ্রিয়তার বশেই কবিতা-কামনা যেন আমার হয় না। তবে কি না, যে কবিতায় তোমার কথা, তাহা আমার হৃদয়ের স্তরে২ গাঁথা থাকুক্। তাহা ত কবিতা বলিয়াই আমার প্রিয় নয়, কিন্তু তাহা স্বয়ং আগম-নিগমের কবি শিব-ব্রহ্মার হৃদি-বাঞ্ছিত-নিধির কথা বলিয়া! বস্তুতঃ ভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্যতীত যদি শিব-ব্রহ্মার কথিতও অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ অন্যবিধ শাস্ত্র-পুরাণাদি থাকে, তবে তাহাতেও ভক্তের রুচি-মতি যায় না।

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণেবা হরিভক্তির্ন-দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"

অর্থাৎ —

যে শাস্ত্রে বা পুরাণেতে হরিভক্তি নাহি র'ন॥
শুনিবেনা—মানিবেনা, যদি ব্রহ্মা নিজে ক'ন॥

তবে সুখের বিষয় এই যে, ব্রহ্মাদি কেহই ফলিতার্থে হরি-কথা ছাড়া অন্য কথা ক'ন নাই। তবে কোন কথাবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হরি-কথা, কোন কথাবা পরোক্ষ-পরম্পরাভাবে হরি-কথা। স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বা ব্রহ্মর্ষি-সিদ্ধর্ষি-মহর্ষিনিকর, সকলেই ভগবদ্ভজনকেই মুখ্য লক্ষ্য করিয়া সকল শাস্ত্র কহিয়াছেন। যিনি যত দূরই আপাত-ঐহিক আলাপে অগ্রসর হইয়া থাকুন, সকলেরই বিষয়ের মূলগতি-পরিণতি স্থূলতঃ না হইলেও সূক্ষ্মতঃ ভগবদভিমুখিনী, সন্দেহ নাই। ফল-কথা, মর্ম্মগত ভাবে যে ভাগবতধর্ম্ম চায়,

সে সকল শাস্ত্রেই তাহার অনুকূলতা পায়; কারণ প্রায় ভারতীয় শাস্ত্র মাত্রই ভাগবত-ভিত্তিমূলে গঠিত বা গ্রথিত। তারপর ভক্তের আর কথা কি? তিনি হয়ত ভূগোল পড়িয়াও কাঁদেন; প্রাণীবিদ্যা উদ্ভিদ্‌বিদ্যা পড়িয়াও ভাব-রসে ভাসেন; জ্যোতিষ পড়িয়াও ধ্যানানন্দে মজেন! তাঁহার হয়ত "টপ্পা" শুনিয়াও অশ্রু ঝরে; মাঝীর 'সারী'তেও শরীর শিহরে! সুতরাং সেরূপ নিত্য ভাগবতী নেশায় বিভোর ভক্তের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আহা! তথাপি আমাদের দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গের সুধাময় শিক্ষা-শ্লোক সাধককে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, কেবল কিঞ্চিৎ কাব্যরসপ্রিয়তার বশেই যেন সেই শিব-সেব্য পরম রসে বঞ্চিত না হইতে হয়। তাই কেবল মাত্র অনিত্য কাব্য-রসের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া ভক্ত-প্রার্থনা-বাক্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে—"কবিতাং বা (ন) জগদীশ কাময়ে।"

তবে কামনা কি কিছুই নাই? আছে বৈ কি। যতক্ষণ আমিত্ব বা অহংতত্ত্ব, ততক্ষণই মনের অস্তিত্ব। মন কেবল ইচ্ছাত্মক চিত্তত্ত্ব মাত্র। জীবের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা বৃত্তিই মন, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত; অতএব মন যতদিন, সঙ্কল্প-বিকল্পরূপা ইচ্ছা-অনিচ্ছাও ততদিন। তবে ভক্তের ইচ্ছা অনিচ্ছা কখনও বাহ্যতঃ ও স্থূলতঃ বিবিধ ঐহিকবিষয়িণী হইলেও মূলতঃ ও সূক্ষ্মতঃ সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছারই একান্ত অনুবর্ত্তিনী। ভক্তের এই ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তিতা একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিরই ফল। সুতরাং ভগবচ্চরণে অহৈতুকী ভক্তিই ভক্তের একমাত্র সাধনা ও কামনার বিষয়।

"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"

জগদীশ! আমার জন্মে ২ ঈশ্বরে,—অর্থাৎ তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়।

অহৈতুকী ভক্তির মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়। অহৈতুকী ভক্তিই ভক্তি। হৈতুকী ভক্তি ত বণিগ্‌বৃত্তি মাত্র। তবে যদি বলা যায় যে, হেতু অর্থাৎ কারণ ভিন্ন কদাচ কার্য্যোৎপত্তি সম্ভবেনা; আর অহৈতুকী ভক্তির ভগবদাকর্ষিণী ক্রিয়া বা কার্য্যশক্তির ব্যাপারও অতি অসাধারণ, সন্দেহ নাই; অতএব এতবড়—এমন কি—সর্ব্বাপেক্ষা বড় কার্য্যটীর কারণ বা হেতু নাই, ইহাও অসম্ভব। তদুত্তরে নিবেদন এই যে, যেখানে বিষয়ই ভগবদ্‌ভজনের হেতু, সেখানে সেই ভজন-শক্তিমূলা ভক্তিই হৈতুকী ভক্তি; আর যেখানে ভগবানই ভগবদ্ভজনের হেতু, সেইখানে সেই ভজন-শক্তিমূলা যে ভক্তি, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি।

অহৈতুকী ভক্তিই, প্রকৃত রাগানুগা ভক্তি—মুখ্যা ভক্তি—পরাভক্তি—নির্গুণা ভক্তি। আর হৈতুকী ভক্তিই "প্রবৃত্ত" সাধকের বৈধীভক্তি,—গৌণীভক্তি—সগুণা ভক্তি—ভক্ত্যাভাস মাত্র। যেখানে কেবল বিষয় আদায় করিবার জন্যই ভগবানকে ভজন, সেখানে সেই ভজনের ভক্তিকে 'ভক্তি' না বলিয়া তোষামোদবিশেষ বলিলেও বলা যায়। যেখানে ভগবান কেবল 'মাৎফৎদার' অথবা আরও প্রগল্‌ভ-ভাষায় বলিলে বলা যায়, "মুটে-মজুর"—সেখানে ভক্তির ভজন-ধর্ম্মের নমনীয়তা আর থাকিল কৈ? কেবল পরমধনকে খাটাইয়া—তাঁহার দ্বারা পরি-

বেশন করাইয়া, বিষয়-ভোজে বসা গেল মাত্র! যেন কোহীনুর বিনিময়ে কাচক্রয় হইল; যেন সোণার থালে ছাই ভক্ষণ হইল! যেখানে ভজনের কোন ঐহিক হেতু বর্ত্তমান, সেখানে সেই ভজনের ভক্তিই (ভক্তি ভিন্ন ভজন হয় না) হৈতুকী ভক্তি, এবং ঐহিক হেতু-পরিশূন্য ভজনের যে ভক্তি, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই চারিভাগে ভজনাধিকারী ভক্তের বিভাগ বিবৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকার ভক্তই হৈতুকভক্তিমান। আর শেষোক্ত 'জ্ঞানী' ভক্তই অহৈতুকভক্তিমান।

"জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়,
মিছে মায়ায় ঘুরে মরে, নানাযোনি ভ্রমণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।"

জ্ঞান ও কর্ম্মের এইরূপ যে সব ভীষণ নিন্দা, ইহা কোন্ জ্ঞান ও কর্ম্মের? শ্রীভগবানের মুখপদ্ম-মধুচক্র শ্রীগীতায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা। অতএব উহা অবশ্য সেই ভগবদভিনন্দিত জ্ঞান-কর্ম্ম হইতে পারে না। যে জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তিশূন্য শুষ্ক তত্ত্বপ্রতীতি-মূলক ও অস্থায়ী ফলাভিসন্ধায়ী, তাহাই বস্তুতঃ উক্ত নিন্দার লক্ষিত জ্ঞান-কর্ম্ম। "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ" পূর্ব্বক কেবল "শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম" যে নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহাই গীতার আদর্শ কর্ম্ম, এবং উহারই ক্রিয়া-শক্তিস্বরূপিণী যে ভক্তি, তাহা অবশ্য অহৈতুকী ভক্তি; সুতরাং তাহা "বিষের ভাণ্ড" না হইয়া দেব-দুর্লভ অমৃতভাণ্ডই বটে। সত্যের ধ্রুব-প্রহ্লাদ, পরে ক্রমে জনকাদি হইতে কলির রায় রামানন্দ পর্য্যন্ত সংসার-ধর্ম্মী হইয়াও অনাসক্ত, সুতরাং ভগবানের গীতোক্ত প্রিয় কর্ম্মী ভক্ত। ইহাঁরা নিষ্কাম-কর্ম্মী হইয়া গীতার চতুর্ধা-বিভক্ত উপাসকের মধ্যে "জ্ঞানী ভক্ত" বিভাগেরই জগদুজ্জ্বল আদর্শ। খুব সোজা কথায় বলা যায়, জ্ঞান অর্থে জানা। গীতোক্ত এই 'জ্ঞানী' ভক্ত কি জানেন? তিনি জানেন,—ভগবানই সর্ব্বস্ব। ভগবানই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা। ভাষা আর কি বলিবে? ভাষা সে ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া যায়!

"তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ।"

সে যে তার কি যে ধন,
যে যাহার প্রিয় জন!

ভগবান যে ভক্তের কাছে কি, তাহা অপূর্ণ মানুষের ভাষা আর কি বুঝাইবে? তবে আমাদের স্থূল নিম্নাধিকারের উপযোগী-ভাবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, জীবের যদি কিছু সাধ্য থাকে, প্রাপ্য থাকে বা ভোগ্য থাকে, তাহা কৃষ্ণ-দাস্য; অর্থাৎ ভগবানে আত্মসমর্পণ; ইহা জানাই গীতোক্ত ঐ জ্ঞানী ভক্তের জ্ঞানের 'জ্ঞা' ধাতুর সার্থকতা। ইহা জানিলে, ভগবত্তত্ত্বে যে ভজনা-সক্তি-প্রবাহ সতত স্বতঃপ্রসারিত হয়, ঐহিক হেতুর একান্ত অভাব থাকায়, উহাই অহৈতুকী ভক্তি। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর ভজন-শক্তিরূপিণী যে ভক্তি, তাহা হৈতুকী। পদ্মানদীর তুফানে পড়িয়া যখন ভগবানকে "পরিত্রাহি" ডাকিতেছি, তখন আমি "আর্ত্ত" উপাসক হইয়াছি। কিন্তু মন বলিতেছে, "এই উপাসনার গুণেই এই উপাসনার

বিদ্যুৎ-ত্রস্ত হস্ত হইতে নিস্তার পাইলে বাঁচি! এই দুর্গানাম-জপ ও "ত্রাহি মধুসূদন" রব, মা দুর্গা ও মধুসূদনের কৃপায় শীঘ্র২ শেষ করিয়া, খালে নৌকা নিয়া, একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি" ইত্যাদি। কালী-দুর্গা-মনসার জন্ত হয়ত অনেক 'পাঁঠা মানসা' হইল। হরিরও অনেকগুলি বাতাসা পাওনা হইল। কিন্তু ইহাও উপাসনা। ইহাতেও পূর্ব্বোক্তরূপা ভক্তি আছে এবং সে ভক্তিরও উপাসকের অভীষ্ট-প্রদায়িনী শক্তি আছে। সাধারণ সংসারী মাত্রকেই এই রোগ-শোক-দুঃখ-দুর্ভোগ ও বিবিধ বিঘ্নবিপদ-সঙ্কুল সংসারে অনেক সময়েই "আর্ত্ত" ভক্ত হইতে হয়। বিপন্ন বিলাতী নাস্তিকও বলেন—"O God ! Save me, if there is any God." দয়াময়ের কি বিধান, বিপদে ফেলিয়াও আস্তিকতা ও আর্ত্ত উপাসকতা দান করেন! যাহাহউক, আর্ত্ত উপাসকের এই ভক্তি বিপদ্মুক্তিরূপ হেতুমূলকতায় হৈতুকী। আর দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব বুঝিবার জন্য যিনি সাধনা করিতেছেন, তিনি 'জিজ্ঞাসু' উপাসক। সাধারণতঃ জ্ঞানমার্গীয় তপস্বীদের সাধন এই জাতীয়। এই সাধনের ভাব-শক্তিরূপিণী ভক্তি তত্ত্বজিজ্ঞাসারূপ হেতুবশে হৈতুকী। অপর, ধন-জন-পুত্র-বিত্তাদি কামনায় যিনি ভগবদারাধনাপরায়ণ, তিনি "অর্থার্থী" উপাসক। ঐহিক স্বার্থের হেতুত্ব-বশে তৎক্রিয়াশক্তিরূপিণী ভক্তিও হৈতুকী। ফলে চরম-পরমার্থ-প্রদায়িনী অহৈতুকী ভক্তির ভাগ্যবান অধিকারী শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্ত সেই 'জ্ঞানী'-ভক্ত। তাঁহার ভগবদ্গত চিত্তের বিশুদ্ধ বিষয়বৈরাগ্য জন্ত ঐহিক হেতুত্ব অভাবে বা একমাত্র ভগবতত্ত্বগত হেতুত্ব-প্রভাবে তাঁহার ভক্তি সাধন-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। তিনি সেই মন-চোরা ধনের পায়ে প্রেম-ডোরের বাঁধন দিয়া হৃৎকারাগারে রাখিতে সমর্থা। অধ্যাত্মলীলায় তিনিই কৃষ্ণপ্রিয়া 'সমর্থা।' মহাভাবময়ী হইয়া তিনিই রাধাতত্ত্বে পরিণতা! যদি বিষয়-বিতৃষ্ণ উপাসকের কোন তৃষ্ণা থাকে, তবে সে এই অহৈতুকী ভক্তির তৃষ্ণা। যদি নিষ্কাম-সাধকের কোন কামনা থাকে, তবে এই অহৈতুকী ভক্তির কামনা। তাই শিক্ষা-শ্লোকোক্ত ভক্ত সংসারের সর্ব্বপ্রধান কামনা-কলাপে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল সেই "কামনা-সাগর" কৃষ্ণের কৃপা-সাগরে অহৈতুকী-ভক্তি-রত্নেরই ভিখারী হইয়াছেন।

এই ভক্তির লক্ষণ-বর্ণনে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দস্বরূপা চ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥"

অর্থাৎ—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকারিণী।
সুদুর্লভা নিত্যানন্দা কৃষ্ণ-আকর্ষিণী ॥

শুদ্ধ ভক্তির সুশীতল ছায়ায় ক্লেশের প্রবল তাপও পরাস্ত। ভক্ত সেই ভক্তির শক্তিতেই অক্লেশে ক্লেশজয়ী। অহৈতুক ভক্ত ঐহিক সুখ-দুঃখের কোন ধারই ধারেন না। ভজনেই তাঁহার সুখ; ভজন-ভঙ্গেই তাঁহার দুঃখ। এমন কি, বরং দুঃখে ভগবানকে ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকা যায় ভাবিয়া কোন ভক্ত বা সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখেরই প্রার্থী! আহা! সেই তুলসী-বিলাসীর প্রিয় দাস তুলসীদাসজী বলিয়াছেন'—

"সুখ-শের্‌মে বাজ্‌ পড়ুহো,
দুখে বলিহার্‌ যাই।
আসা দুখ্‌ আওয়ে মো,
ঘড়ী ২ (হরি) নাম সোঁরাই॥"

অর্থাৎ—

বজ্রাঘাত হ'ক্‌ সুখের মাথায়,
দুঃখে বলিহারি যাই।
হেন দুঃখ মোর হউক্‌, যাহায়—
ঘড়ী ২ 'হরি'বলে' চেঁচাই॥

দেখুন অহৈতুকী ভক্তির ক্লেশনাশিনী শক্তির কি চারুচিত্র! তারপর, অশুভের লেশ থাকিতে যে ভক্তির উদয়ই হয় না, সে ভক্তি যে 'শুভদা,' তাহা বলাই বাহুল্য। আর সে ভক্তি যে 'মোক্ষলঘুতাকৃৎ', তদ্বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন, "ভক্তস্য পদপদ্মস্য মুক্তির্হি মধু-লুব্ধিকা"—

অর্থাৎ—

ভক্ত-পাদ-পদ্ম-মধু আশা করি।
লালায়িতা সদা মুক্তি-মধুকরী॥

ইহার উপরে আর কথা কি? অতএব এ হেনভক্তি যে 'সুদুর্ল্লভা'—বহুসুকৃতি-সাধন-সম্ভবা, তাহা বুঝাইতে আর বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। অপর, সুখের প্রতিশব্দ সাধারণতঃ "আনন্দ" হইতে পারে; কিন্তু সুখ-দুঃখ ত পরস্পর সাপেক্ষ; সুতরাং সুখ-দুঃখের অতীত যে আনন্দ, তাহাই 'সান্দ্রানন্দ'; ভগবানে অহৈতুকী ভক্তির ফল এই সান্দ্রানন্দ; কেননা, এই ভক্তির ভগবদ্বিজয়িনী মহাশক্তিতেই আনন্দময় ভগবান্‌ অবশে আকৃষ্ট! তাই ইহা কৃষ্ণোক্তিতে কবি গাহিতেছেন,—

"অখিল আকৃষ্ট করি নাম মোর 'কৃষ্ণ,'
ভক্তি-আকর্ষণে আমি আপনি আকৃষ্ট!
'কৃষ্‌' আকর্ষণ-অর্থে আমি শুধু কৃষ্ণ।
আমারে আকর্ষি মোর ভক্ত কৃষ্ণ-কৃষ্ণ!"

হৈতুকভক্তের ভক্তি বা অনুরক্তি বিষয়ে। তবে "যাবৎফলদায়ী" সূত্রে উক্ত বিষয়ের বিধানকর্ত্তা ঈশ্বর যেটুকু ভালবাসা পাইতে পারেন, তাই পান। ভক্তি-দর্শন শাণ্ডিল্য-সূত্রের "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" সূত্রে যে ভালবাসা সূচিত হয়, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি বা ভালবাসা। হৈতুক ভক্তের প্রকৃত পরানুরক্তি বিষয়ে; আর ভগবানে সেই পরানুরক্তির অনুরোধেই বড় জোর অনুরক্তি; এবং উহা কেবল কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম-বুদ্ধি-সঞ্জাত। অনন্যমমতা ভিন্ন অহৈতুকী ভালবাসা হইতেই পারে না।

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥"

ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি অহৈতুক ভক্তগণ ভগবানে প্রেম-সঙ্গতা অনন্যমমতাকেই ভক্তি বলিয়াছেন। ভগবানে অনন্যমমতাযুক্ত অন্যাভিলাষিতামুক্ত ভক্ত কেবল তাঁহারই সেবার্থ তাঁহাকে ভজেন; তাঁহারই রূপ-গুণে তাঁহাতে মজেন! ভগবান ঠিক যেন অহৈতুক ভক্তের "কৃপণের ধন!" সুতরাং সে ধন ব্যয়ের বা বিনিময়ের জন্য নহে; কেবল হৃদয়-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত রাখার ধন। "কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে" ভক্তের প্রার্থনাই এই।

কোন বঙ্গ-কবি বলিয়াছেন, "ভালবাসার অর্থ ভাল বাস।" বাঞ্ছিত ধনকে হৃদয়-

মধ্যে ভাল বাসা—অর্থাৎ উত্তম বাসস্থল না দিয়া লাঞ্ছিত করা প্রেমের ধর্ম্ম নহে।

"ভালবাসা দেও যারে, দেও তারে ভাল বাসা। ভাল যার হৃদাগার, তারি সার ভালবাসা॥"

কামনা-কর্দ্দম-ক্লেদিত, আকাঙ্ক্ষার আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত, বিষয়-বিষজীর্ণ, মোহমলাকীর্ণ হৃদয়ে প্রেমাস্পদকে কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রীত হইতে পারে? যে পারে, সে প্রেমিক নহে—কামুক মাত্র। আমাদের মানসাগার সাধারণতঃ দুর্গন্ধ অন্ধকূপতুল্য। অহৈতুকতার আলোক-বিস্তার ও স্বার্থশূন্যতার সমীর-সঞ্চার ভিন্ন তাহা 'ভাল বাসা' বা ভালবাসার যোগ্যতা পায় না। কোন ভক্ত ভগবদুদ্দেশে বলিতেছেন,—

"ক্ষীর সারমপহৃত্য শঙ্কয়া
যদি পলায়নং স্বীকৃতং ত্বয়া।
মানসে মম নিতান্ত-তামসে,
নন্দনন্দন কথং ন লীয়সে॥"

অর্থাৎ—

হরি ক্ষীর-ননী, শঙ্কা মনে গণি,
পলাইতে যদি চাও,
নন্দসুত! মম চিত অন্ধতম,
তাহে কেন না লুকাও?

ইহা কেবল ভক্তের ভাব-বিকাশ ও দৈন্যপ্রকাশ মাত্র। বাস্তবিক উক্ত ভক্ত-হৃদয় অবশ্য অন্ধতমসাচ্ছন্ন নহে; বরং ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভালবাসার গোলোকীয় আলোকে উহা সতত সমুদ্ভাসিত। সুতরাং উহাই ভাল বাসা এবং উহাতে যাঁহার বাসা, সর্ব্ব ভালবাসার সারই তাঁহাকে ভালবাসা!

সতীস্ত্রীর পতি-প্রেম অহৈতুকী ভালবাসার একটি অলৌকিক লৌকিক উদাহরণ। পতিব্রতার প্রেমে কোন ঐহিক স্বার্থের হেতু নাই। যাঁহার স্বার্থেরই সার্থকতা নাই, যাঁহার পরার্থই পরম স্বার্থ, সেই উৎসর্গিতাত্মিকা রমণী মণির প্রেমের খনি হেতুর কলঙ্কপরিশূন্য। আহা! একটি মধু হইতে মধুর "নিধুর টপ্পা" বা প্রেমসঙ্গীত মনে পড়িল। উহাতে পরম পদার্থ 'পিরীতি'র অমিয়-অহৈতুকতার কি চমৎকার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে! গানটি পুরাতন ও বহুজন-বিদিত বটে, কিন্তু ভাবোৎকর্ষে উহা নিত্য-নূতন ও রসাস্বাদ-রহস্যে অনেকের অবিদিত।

"ভালবাসিবে বলে' তোমায় ভালবাসিনে॥
আমার স্বভাব এই—তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু-মুখে মধুর হাসি দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি,
দেখা দিতে আসিনে॥
বাস বা না বাস ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল;
তোমার ভালই আমার ভাল;
(আমি) অন্য ভাল বুঝিনে॥" (ইত্যাদি)

বলিতে কি, ইহার তুলনা কোন ভাষার কোন সাহিত্যে আছে কি না, সন্দেহ। বুঝি এই এক গানেই বঙ্গসঙ্গীত-সাহিত্য ধন্য! আজ্‌কাল্‌কার প্রেমসঙ্গীতে "আমি নিশিদিন ভালবাসিব তোমায়, তুমি অবসর মত বাসিও"—এই সব গানেরই বড় বাহার; কিন্তু উহার কাছে ইহা কোথায় লাগে? উহাতে 'বাসিও' নাই—কেবল 'বাসিব'! সুতারং উহার কাছে ইহা চন্দ্রোদয়ে নক্ষত্রভাতিবৎ অভিভূত। আসলের কাছে নকল যেমন, ওস্তাদের কাছে সাক্‌রেদ্‌ যেমন, পাকার কাছে কাঁচা যেমন, উহার কাছে

ইহা তেমন। আহা! কি মাহেন্দ্রক্ষণেই নিধু বাবুর মধুময়ী লেখনী এই অমিয়-ধারাটি উদ্গীরণ করিয়াছিল! এই ভাবের আর একটি আধুনিক গানও অতি উপদেয় লাগিয়াছিল। এই গীতিদ্বয় প্রায় পরস্পর জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায়।

"হায়রে হায়! প্রেমিক যে জন,
সে কেন চায় ভালবাসা?
দিলে—নিলে, বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিপাসা!
প্রেম চায় ভালবাসি, পরাব না,—পর্‌ব ফাঁসি;
চায়না প্রেম কেনা-বেচা;
ভালবেসেই পূরায় আশা।" (ইত্যাদি)

যে বঙ্গে শত-সহস্র সতী অলৌকিক প্রেম-রঙ্গে পতির চিতার জ্বলন্ত অনল-তরঙ্গে জীবন্ত দেহ আহুতি দিয়াছেন, সে বঙ্গের কবি-কল্পনায় অহৈতুকী প্রীতির এরূপ আলোক-চিত্র বিচিত্র কি? অহৈতুক প্রেম প্রেমের "রাজ-সংস্করণ।" ইহা নিখুঁত, নির্ম্মুক্ত, নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ। ইহাতে প্রতিদানের প্রতীক্ষা নাই। ইহাতে কেবল দান—প্রেমিকের আত্মসর্ব্বস্ব দান; আর সেই দানই ইহার প্রাণ। অপর পক্ষে, হৈতুক প্রেম সাধারণ 'বাজার-চল' প্রেম। ইহা সংকীর্ণ, স্বার্থসীমাবদ্ধ, সমল ও সাপেক্ষ। প্রতিদানে ইহার পরমায়ু। ইহা প্রেমের বেণেগিরি বা দোকানদারী। সংসার-সম্বন্ধে এই সকাম প্রেমের প্রায় একাধিপত্য। ভগবৎসম্বন্ধেও পৃথিবীতে ইহারই প্রবল প্রসার। তবে ইহার অবশ্য উন্নয়ন (Promotion) আছে; সে কথা পরে বলিব। এক্ষণে নিবেদন এই যে, ভারতে অহৈতুকী প্রেম-ভক্তির পূর্ণ পরিণতি ও প্রকৃত পরিচয় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামে বা ব্রজলীলায়।

"নিহেতু ব্রজের-প্রেম—ব্রজেই উপমা।
অনুপমা রতি সে আপনি আত্মসমা॥
যে ভজেছে, সেই বুঝেছে, বুঝাবে কে কারে?
সে বুঝেছে. সেই মজেছে ব্রজ প্রেম-পাথারে!"

বাস্তবিক সে প্রেম অতুল্য। তাহার অতুল-তাকে ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টাবাতুলতা মাত্র। ব্রজধামের প্রেমের উপমা ধরাধামে নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, এ ত্রিধামেই নাই; বুঝি বৈকুণ্ঠধামেও নাই! বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-প্রেম, আর ভৌমগোলোক বৃন্দাবনে মাধুর্য্য-প্রেম। মাধুর্য্য-প্রেমেই অহৈতুকতার পূর্ণ পরিণতি। তাই বুঝি ব্রজরসাস্বাদমত্ত অহৈতুক ভক্ত তুলসীদাস ব্রজ-গৌরব-ভাবে 'গর গর' হইয়া গাইয়াছিলেন,—

"বৃন্দাবন ঔর্ বৈকুণ্ঠকো তৌলে তুলসীদাস।
ভারিযো, সো ভূতল্ বৈঠে হাল্কা চঢ়ু আকাশ!'

চমৎকার! বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠকে তুলসীদাস তৌল করিয়া দেখিলেন, ভারি যিনি, তিনি (অর্থাৎ বৃন্দাবন) ভূতলে পড়িলেন; আর হাল্কা যিনি, তিনি (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ) কাজেই আকাশে চড়িলেন! প্রেম-গৌরবেই ব্রজের এ গৌরব।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণাত্মিকা গোপিকারা কৃষ্ণ-সুখেই সুখিনী! কৃষ্ণ-সুখেচ্ছা যেন মূর্ত্তি-মতী হইয়া গোপ যুবতী সাজিয়াছেন!

"আত্মসুখে ভুঞ্জে রতি, তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই কৃষ্ণরস-জীবিকা গোপিকার যথাসর্ব্বস্ব। তাই

তাঁহারাই ভূলোকে ও গোলোকে অহৈতুক প্রেমের একাধীশ্বরী। তবে যে শ্রীকৃষ্ণের মাথুর লীলা-বিলাসে গোপিকার বিষম বিরহ-বিকার; তাহাও তত্ত্বতঃ কৃষ্ণসুখেচ্ছাবৃত্তির বিরোধী নয়; কেন না সে যে অপূর্ব্ব বিরহ, তাহা এক ভাবে আবার মিলনের চূড়ান্ত! এ চূড়ান্ত কিন্তু সে চূড়াধারীর পক্ষেও বটে; শুধু কেবল গোপাপক্ষেই নয়; আর গোপীদের তাহা অবিদিতও নয়। গোপীকান্তের গুপ্ত মর্ম্ম গোপীর ন্যায় আর কে জানিবে? যে বিরহে বিরহের মহাপ্রলয়—ত্রিভুবন তন্ময়, সে বিরহ কি মহামিলনময়!

"সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে,
বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা,
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

অর্থাৎ—

মিলন-বিরহ, এই উভয়-মাঝারে,
বিরহই শ্রেষ্ঠতর বিহিত বিচারে;
যেহেতু মিলনে মাত্র মিলে একজন,
বিরহেতে ত্রিভুবন তন্ময়দর্শন!

মিলনের কৃষ্ণ কিরূপ? না—কৃষ্ণ যখন সম্মুখে, তখন আর পশ্চাতে নহেন। কৃষ্ণ যখন গুরুজন-বেষ্টিত গৃহ-প্রকোষ্ঠে, তখন আর সখাগণ-সম্মিলিত গোচারণ-গোষ্ঠে নহেন। কৃষ্ণ যখন নন্দের বক্ষে, তখন আর যশোদার কক্ষে নহেন। আর যখন কৃষ্ণধন শ্রীমতীর হৃদে, তখন আর শ্রীদামের কাঁধে নহেন। মিলনের এক কৃষ্ণ এইরূপ; কিন্তু বিরহের অনন্ত কৃষ্ণ যুগপৎ দূরে—অদূরে, অন্তরে—বাহিরে; জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে! যুগপৎ কক্ষে, বক্ষে, গোষ্ঠে, প্রকোষ্ঠে, হৃদে, কাঁধে, সর্ব্বত্র! তাই "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।"

প্রেম যেখানে অহৈতুক, সেখানে বিরহেও স্থূল মিলনাধিক সূক্ষ্ম সুখ। কারণ তখন বাহ্যিক সসীম বিরহে আন্তরিক অসীম মিলন! কিন্তু হৈতুকতার সীমার মধ্যে এ অধিকার একান্তই অসম্ভব। হৈতুক প্রেমের বিরহে স্বার্থহানি-জন্য এক আপাত-তীব্র রাজস দুঃখ। আর অহৈতুক প্রেমের বিরহে সমাধিময় সাত্ত্বিক শোকেও সাক্ষাৎ-সূক্ষ্ম স্মরণানন্দ! কিন্তু তাহা চিনিবার জহুরী এ জগতে বড় কম।

"যে জন চিনিতে জানে, বিষ হতে সুধা আনে,
শীতের সন্ধ্যায় আনে শরতের শতদল!
মরুভূমি হতে আনে নিদাঘ-মধ্যাহ্নে জল!
খোদিয়া অঙ্গার-খনি, লভে সে হীরক-মণি,
মহানিম্বে মধুরত্ব—দ্রবত্ব পাষাণে!
নন্দনের পারিজাত পায় সে শ্মশানে!"

ব্রজগোপমণ্ডলে ঘরে ঘরে নারী-নরে অন্তরে বাহিরে এই অপূর্ব্ব অধিকার। তাই বিচ্ছেদে আচ্ছাদিত বিরাট মিলন!

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্টরীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজজনের সম-সুখ-দুঃখতার যে আপাত-বিরোধ এই মাথুর বিরহে প্রতীয়মান হয়, সেই অপূর্ব্ব রসময় দুর্ভেদ্য রহস্যটির আর এক প্রকার পরিস্ফূর্ত্তির প্রয়োজন। কবি বলিতেছেন,—

"ব্রজের নির্হেতু-প্রেম কৃষ্ণ-সুখে সুখী ;
সুখী কৃষ্ণ মথুরায়;—ব্রজ কেন দুখী ?
হৃষ্ট মধুপুর কৃষ্ণ-অভিষেক ধূমে ;
হাহাকার—অশ্রুধার সার ব্রজভূমে !
কৃষ্ণানন্দে মথুরায় মহামহোৎসব।
নিরানন্দ বৃন্দাবনে সব যেন শব !
সুখে সুখ দুখে দুখ পিরীতের রীত ;
হাসে কৃষ্ণ, কাঁদে ব্রজ, একি বিপরীত !
আনন্দিত বাসুদেব বসুদেব-কোলে ;
পিতা নন্দ কেঁদে অন্ধ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে !
শ্রীঅধরে রাজভোগ দেন দেবকিনী ;
মূর্চ্ছাগতা মা যশোদা হাতে লয়ে ননী !
কুব্জাপানে চেয়ে বঁধু মৃদু মধু হাসে ;
রাধা-বধূ-নেত্র-নীরে যমুনা উচ্ছ্বাসে !
মথুরা-মোহিনী-মোহে কৃষ্ণ কুতূহলী ;
'হরি' স্মরি করে সখী রাধা-অন্তর্জ্জলী !
নব সখা সহ শ্যাম সুখ-সম্মিলিত ;
শ্রীদাম সুদাম হায় ধূলায় লুণ্ঠিত !
অশ্ব গজে এসে পশু-পালন-বিলাস ;
শ্যামলী ধবলী ত্যজে অন্ন-জল-ঘাস !
সুখী কৃষ্ণ সূত-বন্দী-স্তুতি-গীতিকায় ;
ব্রজে শুক-পিক-অলি মূক—মৃতপ্রায় !
সিংহাসনে কুব্জা-কান্ত বিলাসে বিলীন ;
কাঁদেরে কদম্ব তলা—কালিন্দী-পুলিন !"

কবির এই বিস্ময় আপাততঃ কাব্য-শোভায় সুন্দর ; কিন্তু অহৈতুক-ব্রজ-প্রেম-রস রহস্যবিৎ ভক্ত ইহাতে বিস্মিত হন না। কে বলে ব্রজ-বিরহী কৃষ্ণ মথুরায় সুখী ? শ্রীমতী রাধা, মা যশোদা, পিতা নন্দ, গোপ-সখা-সখীবৃন্দ, কাহারই সে বিশ্বাস নাই। কৃষ্ণ মথুরায় রাজা হইয়াছেন বটে, কিন্তু

তিনি যে ব্রজের হৃদয়-রাজ্যের রাজা। সেই মধুর রাজত্বে তাঁর যে সুখ, মাথুর রাজত্বে কি সেই সুখ? আত্মসর্ব্বস্ব-ঢালা অহৈতুকী কৃষ্ণসেবার মর্ম্ম মথুরায় কে জানে? হউক্ তাঁহার ষোড়শোপচার-সজ্জিত রাজভোগ, কিন্তু মা যশোদার সেই "ক্ষীর-ননী" সে চাঁদবদনে তেমন করিয়া আর কে দিবে? থাকুক্ তাঁহার জরী-জহরৎ-জড়িত জামা-যোড়া, কিন্তু মা যশোদার স্বহস্তের সাধের সজ্জা সেই পীত-ধড়া-মোহন চূড়া ভিন্ন সে অঙ্গ কি সাজিবে? আহা! সঙ্কেত-কুঞ্জে, নব-কিশলয়-কুসুম-পুঞ্জে বিরচিত সেই বিলাস-শয্যায় রসিক-শেখরের যে রসোল্লাস, তাহা কি রাজপ্রাসাদের স্বর্ণ-পালঙ্কের দুগ্ধফেণনিভ শয়নে সম্ভবে? আবার শ্রীদাম সুবলের কাঁধে চড়িয়া রাখালরাজের যে আনন্দ, গজ-বাজি-বাহনে বা চতুর্দ্দোলে সানন্দে সে নন্দনন্দনের সে আনন্দ কি মিলিবে? অধিক কি, প্রাণনাথকে পায়ে ধরাইয়াও যে রাধা কৃষ্ণসেবার চূড়ান্ত করিয়াছিলেন, কংস-দাসী দিবানিশি বুকে রাখিয়াও কি তাহা পারিবে? আহা! বিলাস-বিহ্বল প্রেম-ঢল-ঢল গোপাল কৃষ্ণের যে সুখাস্বাদন, শত-বিষয়-চিন্তা-বিধ্বস্ত ব্যতিব্যস্ত ভূপাল-কৃষ্ণের বুঝি তাহা নিশার স্বপন! তাই কৃষ্ণ সুখে নাই। ক্রূর অক্রূর তাঁহাকে ভুলাইয়া নিয়া, কংস বধিয়া, রাজ্যভার ঘটাইয়া, বাপ্-মা যোটাইয়া, নানা বাধায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছে; তাই ব্রজের জীবন কৃষ্ণ মথুরার রাজভবনেও ব্রজবনের জন্য ব্যাকুল, গোকুলের বিচ্ছেদে আকুল! কে বলে কৃষ্ণ সুখী? এখন ব্রজের ধনকে আবার ব্রজে আনিতে পারিলে, সেই ধনেরই সুখ-সাধন হয়; আর তাতেই ব্রজের সর্ব্বসুখোদয়। কৃষ্ণ-সুখে সুখভাগী অহৈতুক কৃষ্ণানুরাগী ব্রজের এই ভাব, এই বিশ্বাস। তবে কৃষ্ণ যে রথ-যাত্রাকালে বিধুমুখে মধুর হাসি হাসিয়া "আবার আসিব" বলিয়া গিয়াছেন, এই বিরহ-বিষাদ-রাশি বহিয়াও ব্রজবাসীর কথঞ্চিৎ জীবনধারণের সেই একমাত্র আশ্বাস। এস্থলে অবিকল এই ভাবের দীনদাসের একটি পদ-গীতিকায় ভক্ত পাঠকের কর-কমলে উপহার দিতেছি।—

"কি হ'ল! ব্রজে কি হ'ল!
কাষ্ঠ-হাস মুখে, কষ্ট চেপে বুকে,
কৃষ্ণ মথুরায় গেল!

বধি ব্রজপুর, ক্রূর সে অক্রূর
হরিল ব্রজ জীবনে।
ঐশ্বর্য্যে রঞ্জিত, মাধুর্য্যে বঞ্চিত,
করিল সে হরি-ধনে।

কৃষ্ণ যে রতন, তাহার যতন
যতন কেইবা জানে?
হায়! কৃষ্ণ-সেবা- মর্ম্ম জানে কেবা
নির্ম্মম মথুরাধামে?

ষোড়শোপচারে রাজভোগাহারে
হয় কি কৃষ্ণের সুখ?
মা যশোমতীর ননী-সর ক্ষীর
চায় যে সে চাঁদ-মুখ!

কেলি-কুঞ্জ-বনে কুসুম-শয়নে,
কি সুখে যামিনী যায়!
ভূপতি-ভবনে পালঙ্ক-শয়নে,
নয়নে কি ঘুম পায়?

হৃদপদ্মাসন যাহার আসন,
সিংহাসন তার সয় কি?
সেই সকৌতুক কাঁধে-চড়া-সুখ
গজ-বাজি-রথে হয় কি?
সে পীতধড়ায় কি শোভা ছড়ায়!
জামায় যোড়ায় সাজ কি?
নয়ন জুড়ায় মোহন চূড়ায়,
কনক-কিরীটে কাজ কি?
মানের দায়েতে প্রিয়ার পায়েতে,
কেঁদেও কত না সুখ!
এবে রাজপদে শত প্রজা পদে,
তাতে সুখ কতটুক্?
'গোপাল—ভূপাল! কি জোর-কপাল!'
ভাবে ভাবহীন ভ্রান্ত।
দীনদাস কহে, ব্রজের বিরহে
দীনহীন ব্রজকান্ত॥"

সোঝা বুদ্ধিতে কিন্তু এ রহস্য বোঝা একটু কঠিন। সোঝা বুদ্ধি সোঝা ভাষায় বলে—"কৃষ্ণ রাজা হয়েছেন, রাজভোগে রয়েছেন, সোনার থালে খাচ্চেন, চাপর খাটে শুচ্চেন, জামাযোড়া পর্‌ছেন, হাতী-ঘোড়া চড়্‌ছেন, শত সেবা থরে থরে, শত দাস দাসী যোড়্‌করে! এত সুখ কি ব্রজে ছিল? বরং ব্রজে কত কষ্ট পেয়েছেন, কত বিপদ-বিভ্রাট সয়েছেন। কতবার কত সঙ্কট হয়েছে; প্রাণ যেতে যেতে রয়েছে! আর কাজটাই বা কি ছিল? গরু চরাতে যেতেন, এঁটো ফল খেতেন, কদম গাছে ঝুল্‌তেন, লুকোচুরী খেল্‌তেন, যমুনার জল ঘোলাতেন, আর যুবতীর মন ভোলাতেন! অবস্থাই বা কি ছিল? ননী চুরী করে, নন্দরাণীর কাছে মার খেয়েছেন, নিশি-শেষে কুঞ্জে এসে বৃন্দা-দূতীর কাছে গাল খেয়েছেন! নন্দের বাধা মাথায় করে মোহন চূড়া খসে গিয়েছে; গোয়ালার মেয়ের পায়ে ধরে চাঁদ-বদন ভেসে গিয়েছে! এই ত দশা! তবু বলিবে মথুরায় কৃষ্ণ সুখী নহেন? হয় ব্রজবাসী বড় বোকা, নয় বড় স্বার্থপর; নচেৎ আজ কৃষ্ণের এত সুখে ব্রজবাসী কেঁদে মরে! প্রচলিত প্রবাদের সুরে বলা যায়, আজ "কৃষ্ণের জ্যৈষ্ঠ মাস, ব্রজবাসীর সর্ব্বনাশ!" 'সোঝা বাঙ্গালী'র সোঝা সমালোচনা এই রকম বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যেভাবে ব্রজের এ ভাব, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত দীনদাসের পদ্যগীতির ভাবেই পরিব্যক্ত। আমরা অধিক আর কি বলিব? বলিবার অধিকারইবা কোথায়? বৈষ্ণব-জগতে "মাথুর" যে কি বস্তু, কি যে তাহার সুগূঢ় রস-রহস্যতত্ত্ব, তাহা ভাগ্যবান রাগানুগ বা অহৈতুক ভক্তেরই ভোগ্য; কিন্তু অস্মদ্দৃশ ভাগ্যহীন ভক্তিহীন ভজন-বিহীন অভাজন জনাস্মাদনের একান্তই অযোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তিমানুষী অন্ত্য-লীলা এই মাথুরভাবেরই মহোন্মাদিনী শক্তিতে সুপ্রকাশিত। প্রকৃত অহৈতুক প্রেমের বিরহ কিরূপ, তাহা মধুপুরগত-মাধব-বিরহহত ব্রজের দশায়, এবং পরে গৌরাঙ্গ প্রভুর চরম লীলায় পরম পরাকাষ্ঠায় পরিব্যক্ত। গৌরাঙ্গ প্রভু তাঁহার মধ্যলীলায় অর্থাৎ গার্হস্থ্যলীলার সময়েও নিজ নবদ্বীপ-ধামে ভক্তমণ্ডলী-মণ্ডিত হইয়া, একদিন মাথুর-বিরহ-বিকলা শ্রীরাধার ভাবাবেশভরে

গদগদশ্রু-লোচনে গদগদবচনে বলিয়াছিলেন "কৃষ্ণ আমার কত যতনের ধন। মথুরা স্বার্থপর স্থান; সেখানে তাঁহার যত্ন হইবেনা। আমার কৃষ্ণের মনটি ভালবাসায় গড়া, ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় তিনি মর্ম্মাহত হইবেন।" (অমিয় নিমাই-চরিত) অতএব মহামাথুর বিরহেও কৃষ্ণসেবা-সর্ব্বস্ব ব্রজের অপূর্ব্ব অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেম-রহস্য স্বয়ং রাধা-ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখেই সুব্যক্ত।

অতঃপর আর একটি তত্ত্ব একটু বিচার্য্য। ব্রজের কৃষ্ণ ব্রজেই থাকিলে আর বিরহ কি? "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" এই যে প্রসিদ্ধ পৌরাণিক উক্তিটি বৈষ্ণব-সমাজে অনেক সময়েই আলোচিত হইয়া থাকে, ইহার তাৎপর্য্য-বিচারে অনেক বিতর্ক চলে; কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইবনা; তবে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র নিবেদন যে, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, এই দুই ভাবের মধ্যে বৈকুণ্ঠে নারায়ণরূপে ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভাব এবং গোলোকে কৃষ্ণরূপে মাধুর্য্য-প্রধান ভাব। ব্রজলীলায় মাধুর্য্যই মুখ্য, কিন্তু ঐশ্বর্য্য গৌণ। আর মথুরা-লীলা ও দ্বারকা-লীলায় ঐশ্বর্য্য-ভাবই মুখ্য, মাধুর্য্য গৌণ। এখন যমুনা-জীবনে ঐশ্বর্য্য-কৃষ্ণের মাধুর্য্যরূপ ধারণ অথবা নন্দ-নিকেতনে যুগল কৃষ্ণের একীভবন বা একই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-গত রূপ, লীলা ও ধাম-ভেদে দ্বিধা-বিভাজন, ইত্যাদি যে সব পৌরাণিক জটিল বিতর্ক-বিচার বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত আছে, আমাদের তাহার মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা নাই, অধিকারও নাই। আমরা দেখিতে পাই, বিবিধ পুরাণশাস্ত্রে ভগবানের ঐশ্বর্য্য-লীলা বর্ণনেও তাঁহাকে গোলোকেশ্বর বলা হইয়াছে এবং অনেক স্থলে মাধুর্য্য-লীলা-বর্ণনেও (এমন কি, মাধুর্য্য-লীলার সারাৎসার রাস বর্ণনেও) তাঁহাকে বৈকুণ্ঠেশ্বর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ফলে এ সব লইয়া খুঁটিনাটি কেবল আসল কাজ মাটি করা মাত্র। যাঁর গোলোক, তাঁরই বৈকুণ্ঠ; যাঁর মাধুর্য্য, তাঁরই ঐশ্বর্য্য; তবে লীলা-ভেদে লোক-ভেদ এবং উপাসনা-ভেদে নাম-রূপ অর্থাৎ ধ্যান-মন্ত্রাদির ভেদ অবশ্য শাস্ত্রসম্মত; কিন্তু মূল সেই "অবতারাবলীবীজং" এক ভগবত্তত্ত্ব! তবে মূলতঃ যার যে ভজন, অধিকারানুসারে তার তাই উত্তম। অনধিকার-চর্চ্চায় হয়ত স্বাধিকারও হারাইতে হয়, হয়ত হাতের—পাতের, দুইই যায়। বৈধী বা হৈতুকী ভক্তিযোগে ঐশ্বর্য্যতত্ত্বে ভগবদ্ভজনের অধিকার ক্রম-সাধনোন্নয়নে উত্তীর্ণ হইলে, পরে শনৈঃ শনৈঃ রাগানুগা বা অহৈতুকী ভক্তিযোগে মাধুর্য্যতত্ত্বে ভগবদ্ভজনের অধিকার জন্মে। শনৈঃ শনৈঃ জন্ম-জন্মান্তর-ক্রমে এই অধিকার পুষ্ট হইতে থাকে। যতদিন গোপ্যানুগত্য লাভে মধুরভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজনানন্দের অণুমাত্র আস্বাদনও ভাগ্যে না ঘটে, ততদিন স্বয়ং ভগবানের হ্লাদিনীশক্ত্যাত্মিকা অহৈতুকী ভক্তির পূর্ণ দর্শন কোথায় পাওয়া যাইবে? ব্রজের মাধুর্য্য-ভজনে এই হ্লাদিনী শক্ত্যাত্মিকা অহৈতুকী ভক্তির পূর্ণ পরিণতিই স্বয়ং তত্ত্বতঃ "মহাভাবস্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী"; সুতরাং যেখানে

মহাভাবস্বরূপা রাধা, সেইখানেই রসরাজরূপী কৃষ্ণ। কাজেই তত্ত্বতঃ 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি' এ বাক্য সিদ্ধ! "রস-রাজ মহাভাব দুয়ে একরূপ"—শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনরূপ এই যে যুগলরূপ দর্শন-বর্ণন, ইহা উক্ত তত্ত্বেরই সুমহান্ সাক্ষ্য। বস্তুতঃ অহৈতুকী প্রীতির প্রকৃত পূর্ণ স্বরূপই রাধা-তত্ত্ব, তাহা কৃষ্ণ-তত্ত্ব সহ চিরঅবিচ্ছিন্ন; তবে লীলায় যে বিরহ, তাহা কেবল রস-পুষ্টির নিমিত্ত মাত্র। গোমুখী-মুখ-মুক্তা গঙ্গার পূত প্রবাহ যদ্রূপ প্রচণ্ড শিলাখণ্ড-বাধায় ব্যাহত হইয়া, উর্দ্ধিত বেগে উচ্ছ্বসিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণাভিমুখিনী অহৈতুকী ব্রজ-প্রীতির ভুবন-পাবন প্রবাহ 'জটিলা' 'কুটিলা', লজ্জা, ভয়, মান, বিরহ প্রভৃতি বহু শিলাখণ্ডে ব্যাহত হইয়া উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে সাধন-জগৎ প্লাবিত করিয়াছে! ফলে বিরহ প্রেম-লীলার প্রধান সহায়, প্রধান উপকরণ ও প্রধান পোষণ। পরমার্থতঃ গোলোক-মিলনে বিরহ নাই, কিন্তু লীলার্থতঃ ব্রজ-মিলনে বিরহ আছে। অতএব ব্রজের যাহা গোলোকত্ব, তদবলম্বনেই "পাদমেকং ন গচ্ছতি" শ্লোকের প্রতিষ্ঠত্ব।

শাস্ত্র, সংস্কার ও অন্তরঙ্গ-সমাচার, এই সর্ব্ব বিষয়েই ভক্ত বৈষ্ণবের বিশ্বাস, শ্রীগৌরাঙ্গ একাধারে রাধা-কৃষ্ণের যুগল তত্ত্বরূপী! রসাস্বাদন-ভেদে তাই তাঁহাতে রাধা-কৃষ্ণ উভয় ভাবেরই বিকাশ! রাধার ভাব-কান্তি-বিলাসরূপী শ্রীকৃষ্ণই গৌরাঙ্গ হইলেও, তত্ত্বতঃ তিনি রাধা ছাড়া নহেন। "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয় বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরূপা"। কৃষ্ণের প্রেমরূপা হ্লাদিনী শক্তিই মহাভাবময়ী রাধারূপে মূর্ত্তিমতী! অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-বৃন্দাবনে যেমন 'পাদমেকং ন গচ্ছতি'ভাবে অবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব থাকিলেও, তাহাতে লীলারস পোষণ ও প্রসারণ জন্য উৎকট কৃষ্ণবিরহ, তজ্জনিত দিব্যোন্মাদ ও পর্য্যায়ক্রমে দশ দশারই অলৌকিক প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পূর্ণ-মাধুর্য্য-লীলা-ক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে "পাদমেকং ন গচ্ছতি"ভাবে অবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব তত্ত্বতঃ প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, লীলারসের পোষণ-প্রসারণার্থই এই মহামাথুর-বিরহ! অতএব লীলার্থতঃ প্রভাসে রাধা-কৃষ্ণের পুনর্ম্মিলন হইলেও, পরমার্থতঃ উহা মাধুর্য্য-কৃষ্ণের সহিত ঐশ্বর্য্য-কৃষ্ণের পূর্ণমিলন মাত্র! কৃষ্ণ-হৃদয়ে রাধার অন্তর্দ্ধান এই তত্ত্বেরই ব্যাখ্যান মাত্র! সে যাহা হউক, অহৈতুকী ভক্তি ভিন্ন আর কোন মতেই স্বয়ং কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-সেবিত এই অতুলামৃত ব্রজলীলা-রসের কণিকাস্বাদনেও অধিকার হয় না। এই জন্যই এই শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে কেবল সর্ব্বসিদ্ধিস্বরূপিণী অহৈতুকী ভক্তিরই ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

এক্ষণে ব্রজের অহৈতুক প্রেমের দু-চারিটি উদাহরণ নিবেদন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহারে উপনীত হইব। যাহা আপাত দৃষ্টিতে কৃষ্ণকে কেবল কষ্ট দেওয়া মাত্র, তাহাও ব্রজের স্বাভাবিকী কৃষ্ণসুখৈক-পরায়ণতায় কেবল অহৈতুক প্রেমের কার্য্য মাত্র। মনে করুন, ছার একটুকু ননীর জন্যে হয়ত যশোদা কৃষ্ণকে কখনও তাড়ন-পীড়ন, কখনও বা ভৎর্সন-বন্ধনও করিতেছেন; কিন্তু তাহাও বাৎসল্য-প্রেমে

ডগমগ হইয়া! যশোদা জানেন, "কৃষ্ণ আমার চুরী করে খেতে ভালবাসে; সাধা-ননী অপেক্ষা যেন চোরা-ননী কৃষ্ণের বেশী ভাল লাগে।" ভর্ৎসন-বন্ধনাদিতে যে সে চৌর্য্যের পর্য্যবসান হইবে, নন্দরাণীর অবশ্য সে আশা ছিল না; কারণ শ্রীমান তেমন ছেলেই নয়! তবে তদ্দ্বারা কৃষ্ণের চৌর্য্য-চাতুর্য্য—সাবধান-সঙ্গোপন আরো বাড়িবে, এবং তল্লব্ধ নবনীত কৃষ্ণকে বেশী প্রীত করিবে, এ বিশ্বাস থাকায়, নন্দরাণীর কৃষ্ণ-বন্ধনাদি ফলিতার্থে কৃষ্ণসুখান্বেষী অহৈতুক স্নেহেরই লীলা-বিলাস! কৃষ্ণও তাই চোর-চূড়ামণি। ননী-চুরী, বসন-চুরী, সঙ্গে সঙ্গে মন-চুরী! চুরী কৃষ্ণের ব্যবসায়। আহা! ভক্ত কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী কৃষ্ণের এই মন-চুরী বর্ণনে কি মন-চোরা গানই গাহিয়াছেন!—

"(ও তার)
বাঁশীটি না সিঁধ-কাঠি!
নারীর বুকে সিঁধ কাটি,
মরমের গাঁটি কাটি,
নিয়েছে সব লুটিপাটি।"

"কৃষ্ণ" নামের "কৃষ্" ধাতুর অর্থই আকর্ষণ; তবে আকর্ষণটি একটু গোপনে হয়, কাজেই চুরী! বিগ্রহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াও কৃষ্ণ চুরী-স্বভাব ছাড়িতে পারেন নাই; "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ! যাহা হউক, আমরা মূল প্রসঙ্গ হইতে একটু অধিক আসিয়াছি। তবে কিনা, কৃষ্ণকথার 'ফাও' দিতেও সুখ, নিতেও সুখ।

তারপর, নন্দের একটি কার্য্য দেখুন। কৃষ্ণের মস্তকে নিজের "বাধা" (পাদুকা বিশেষ) বহাইতেন। কৃষ্ণ নিজেই জগৎকে পিতৃভক্তি শিখাইতে পিতৃবাধা মাথায় বহিতেন। নন্দ সে বাধা-বহনে বাধা দিতেন না। নন্দ জানিতেন যে, তাঁর প্রাণ-নন্দন কৃষ্ণ তাঁহার বাধা-বহনে বড়ই আনন্দিত; সুতরাং সে আনন্দে নন্দের আনন্দ শত-ধারায় উছলিত। অতএব কৃষ্ণানন্দপরায়ণতাই মূল বলিয়া, অহৈতুক-কৃষ্ণ-বাৎসল্য-বিভোর নন্দের এ কার্য্য নিন্দনীয় নহে; বরং ব্রজভজন ভক্তের সানন্দ-বন্দনীয়।

আবার শ্রীদাম-সুবল প্রভৃতি কৃষ্ণ-সখা ব্রজবালকগণ কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইতেন, কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতেন কৃষ্ণের সঙ্গে ঝগড়া ঝগ্ড়ি, রগ্ড়া রগ্ড়ি, হুড়াহুড়ি জড়াজড়ি করিতেন। সৌভাগ্য আর কাহাকে বলে?

"কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে প্রেম-রণ।
কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥"

ফলে এ সমস্তই কেবল কৃষ্ণ-সুখাভিসন্ধিমূলক অহৈতুক সখা-প্রেমের ফল। কৃষ্ণকে কাঁধে করিয়া ব্রজবালকেরা অতুলানন্দে অমৃতাভিষিক্ত হইত; কিন্তু তাহারা ত কৃষ্ণকে না দিয়া কোন আনন্দ ভোগ করিতে পারে না। কৃষ্ণের অনাস্বাদিত আনন্দ তাহাদের পক্ষে নিরানন্দ মাত্র। তাই শ্রীর অধিক ভাগ্যধর শ্রীদামাদি ভাবিত, "কাঁধে চড়ার সুখ ত কৃষ্ণকে দিলাম, কিন্তু কাঁধে চড়াইয়া যে সুখ, সে অতুল্য সুখ কি ভাই কানাইকে দিব না? অতএব চড় কানাইর কাঁধে!" আর

উচ্ছিষ্ট ফল কি সাধে খাওয়ায়? মিষ্ট লাগিলে যে আর মুখে যায় না! আর কৃষ্ণকে না দিয়া নিজেদের খাওয়া চলে না।

"বড় সুমিষ্ট ফল, খাওরে কৃষ্ণ!
আমরা পেয়েছি॥
মধুর পেয়ে, আর না খেয়ে,
(ধড়ায়) বেঁধে এনেছি॥"
(ইত্যাদি।)

আর একটি গানে আছে,—

"(ও ফল) খেতে খেতে যখন মিঠো লাগে,
বলে আর খাবনা, কানাই খাবে।"

আহা! এই সব গান যেন ব্রজের অহৈতুক সখ্যপ্রেমের মধুর 'মোরব্বা'!

ভক্ত পাঠক! তবে একবার "দেহি পদপল্লবমুদারম্" পালায় আসুন। মান বস্তুটি কি? প্রেমের মান অবশ্য লৌকিক সম্ভ্রমার্থক মান নহে। উহা প্রেম-সিন্ধুরই তরঙ্গ-রঙ্গ বিশেষ। রসশাস্ত্র বলেন,—

"কার্য্যকারণভাবোনামতঃ প্রণয়মানয়োঃ"

অর্থাৎ প্রণয় ও মান, উভয়ই উভয়ের কারণ ও কার্য্য। প্রণয়েই মানের আবির্ভাব, আবার মানেই প্রণয়ের প্রভাব! তাই শ্রীমতীর সেই মানও শুধু শ্রীকৃষ্ণসুখৈষণা বৃত্তিরই ফল। চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ-সেবার মর্ম্ম জানেনা। তাহার 'সাধারণী' নারীর ন্যায় নির্দ্দয় কৃষ্ণ-সম্ভোগ শ্রীরাধার অসহ্য। 'রাধ্' ধাতুর মূর্ত্তিমতী অর্থরূপিণী রাধা ভিন্ন সেই জগদারাধ্য কৃষ্ণধনের আরাধনা বা সেবা জগতে আর কে জানে? তাই ব্রজ-সখীগণ রাধাকৃষ্ণের মিলন করাইয়াই কৃতার্থা। যুগল-সেবার ভজনেই তাঁহারা চরমচরিতার্থা। তাই কৃষ্ণৈকাত্মরূপিণী কৃষ্ণাত্মিকা রাধিকা মহাসাথুর বিরহে মরিতে যাইয়াও যেন সাহস করিয়া মরিতে পারিতেছেন না। বলিতেছেন—"মরিব মরিব আমি নিচয় মরিব"। অমনি তখনি আবার ভাবিতেছেন "কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?" তবে যদি এই অসহ্য বিরহ-বিষে নিতান্তই মরণ হয়, তবু কৃষ্ণ-সেবার এই অদ্বিতীয় উপাদান রাধা-অঙ্গ যেন নষ্ট না হয়। তাই সখীদিগকে উপদেশ করিতেছেন—

"না পোড়ায়ো রাধা-অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে।
মরিলে বাঁধিয়ে রেখো তমালেরি ডালে॥"

অর্থাৎ এ কুঞ্জে তমালতরুই শ্যামসুন্দরের ন্যায় শ্যামাঙ্গ। তাই অন্ততঃ শ্যামানুকৃতি-তনু শ্যামল তমাল-ডালেই শ্যাম সোহাগিনীর শ্যাম-সেবাঙ্গ বাঁধিয়া রাখার অনুরোধ। আর একটি আশাও আছে। সেটি কৃষ্ণের আসার আশা।

'যদি কভু পিয়া মোর আসে বৃন্দাবনে।
মৃতদেহে প্রাণ পাব পিয়া-পরশনে॥"

ইহার আর ব্যাখ্যায় কাজ নাই; রসভঙ্গ হইবে। কেবল নয়ন-নীরে নীরব আস্বাদনই এখানে প্রার্থনীয়। যাহাহউক, এহেন রাধার যে কৃষ্ণসেবা, চন্দ্রা তাহা কোথায় পাইবে? তাই হয়ত চন্দ্রার স্বসুখবাঞ্ছী কৃষ্ণসেবায় বা সম্ভোগে কৃষ্ণসুখৈকপ্রাণা রাধার এই প্রণয়-কোপ বা মান। তদ্ভিন্ন রাধার প্রেম-পাথারে হয়ত আরও কত ভাব-পবনোচ্ছ্বাসে যে এই মান-তুফান উঠিয়াছিল, তাহা তিনিই জানেন। পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান, বিরহ, পুনর্মিলন, এসব প্রেম-তরঙ্গেরই বিচিত্র রঙ্গ ভঙ্গ মাত্র। এই

জনাই শাস্ত্র বলেন, "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ" অর্থাৎ প্রেমের গতি-রঙ্গ ভুজঙ্গবৎ। অতএব এই মান প্রেমের একটি মোহন অঙ্গভঙ্গি। কষ্টার্জ্জিত বস্তু বড় প্রিয়; সুতরাং মানভঞ্জনার্জ্জিত মিলনে কৃষ্ণের বড় লোভ। ক্ষুধায় খাওয়া, গ্রীষ্মে হাওয়া, পিপাসায় পান, আর শীতভয়ে দান, বড় প্রিয়—বড় আরাম; তদ্রূপ প্রিয়-সুখৈক-পরায়ণা প্রিয়ার "স্মরগরল-খণ্ডন" চারু চরণ ধারণেও মান-ভঞ্জনান্ত-মিলন প্রেমিকের পরমানন্দ-প্রস্রবণ; আর সেই লোভেই বুঝি রাধার নব নটবর প্রেমিক নাগর কৃষ্ণচন্দ্রের চন্দ্রার মন্দিরে নৈশ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ! অতএব কৃষ্ণসুখৈষণা-সঞ্জাত রাধার মানও অহৈতুক প্রেমের এক মহার্হ দান। উহা কৃষ্ণের পক্ষে বাহিরে প্রচণ্ড দণ্ডবিধান হইলেও, অন্তরে অখণ্ড আনন্দ-নিদান! ফলে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র ব্রজলীলা কেবল মাধুর্য্যরসের মেলা—অহৈতুক প্রেমের খেলা! ব্রজভূমির প্রত্যেক অণু-পরমাণুও বুঝি অহৈতুক প্রেমমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত! আহা! স্বয়ং অহৈতুক প্রেমের অতল অনন্ত উচ্ছ্বসিত সিন্ধু জীবের বন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে কৃপা করিয়া ব্রজ-রসাস্বাদনে অধিকারী করিবার জনাই এই শিক্ষা-শ্লোকে সেই দেব-দুর্লভা অহৈতুকী ভক্তির প্রার্থনীয়তা শিখাইয়াছেন।

আমাদের পক্ষে এই শিক্ষা-শ্লোকের শিক্ষা হৃদয়ের সম্মুখে উচ্চতম ও পূর্ণতম আদর্শরূপে রাখিয়া ভজনপথে অগ্রসর হওয়ার উপায় বটে; কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক সাধনাধিকার-সম্ভাবনা প্রথমতঃ বৈধী বা হৈতুকী ভক্তিমার্গে। শাস্ত্র বলেন,—

"বৈধী ভক্ত্যধিকারীতু ভাবাবির্ভাবনাবধি।
তত্রঃ শাস্ত্রং তথাতর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥"

অর্থাৎ--

ভাব-আবির্ভাবাবধি বৈধীভক্তি-অধিকার।
শাস্ত্র আর অনুকূল তর্কের অপেক্ষা যার॥

অতএব অনুকূল শাস্ত্র-যুক্তির আশ্রয়ে ভাবের আবির্ভাবনা করা বৈধী বা হৈতুকী ভক্তির অধিকার। ভাবোদয়ে রাগানুগা বা অহৈতুকী ভক্তির স্বতঃসঞ্চার। অধিকারের ক্রমোন্নতি অবশ্য অব্যাহত সাধনশক্তিতে শনৈঃ শনৈঃ সিদ্ধ হয়। ফলে কাহারই নিরাশ হইবার কথা নহে। দুরাশাই নিরাশার জননী। স্বাধিকারগত গুরু-প্রদর্শিত পথে চলিলে, আর অনধিকার-চর্চ্চামূলক দুরাশার ভয় থাকেনা: গুরু-কৃপায়, আজ যাহা দুরাশা, কাল তাহা সুআশায় পরিণত হইতে পারে। হৈতুকী ভক্তি হইতেই ক্রমে অহৈতুকী ভক্তি লাভ। পূর্ব্বনিবেদিত ধ্রুবচরিত্রের উদাহরণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হৈতুকী ভক্তিযোগে কোন ফলাভিসন্ধিমূলক সকাম কৃষ্ণভজন করিলেও, কৃষ্ণ স্বয়ং কৃপা করিয়া ক্রমে সেই উপাসককে নিষ্কাম ভজনাধিকারী করিয়া অহৈতুক-ভক্তি-ধন দানে কৃতার্থ করেন। শ্রীভাগবতে কৃষ্ণকৃপাময়ের সেইরূপ কৃপা-ভঙ্গী স্পষ্ট পরিব্যক্ত; যথা—

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্।"

আমরা আর এ শ্লোকের অবিকল

পদ্যানুবাদ করিলামনা। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" ইহার ভাষারূপে যে মধুর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।—

"কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয়-সুখ।
সুধা ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥"

কাম—অর্থাৎকামনা ছাড়িতে পারিলেই কৃষ্ণ-দাস্য প্রদায়িনী অহৈতুকী ভক্তি লাভের অধিকার হয়। তাই আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোকে প্রধান পার্থিব কামনার বিষয় ধন-জন-সুন্দরী-কবিত্ব প্রভৃতির নিষ্কামনা বা নিবৃত্তি জানাইয়া, ভগবচ্চরণে অহৈতুকী ভক্তি-প্রার্থনাই করা হইয়াছে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐরূপ ভক্তিপ্রার্থীর কাছে কি আর প্রয়োজনীয় ধন-জনাদি আসিবেনা? তাহা আসিবার বাধা কি? বরং অবাধে আসিবে। ভগবান নিজে তাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয় বহন করিবেন। গীতায় ভগবান স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন;—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

অর্থাৎ—

যারা মোরে ভজে নিত্য একচিত্তে রহি।
সে নিত্যযোগীর বিত্ত নিজে আমি বহি॥

আর কথা কি? ধান পাওয়ার আশা পাইলে আর নাড়ার ভাবনা ভাবে কে? নাড়ার জন্য কেহত ধান বোনে না; ধানের জন্যই ধান বোনে। তথাপি প্রয়োজনানুরূপ নাড়া অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবেই পাওয়া যায়। অতএব অহৈতুকী ভক্তিযোগে ভগবানের জন্যই ভগবানকে ভজিতে হইবে বিষয়বাঞ্ছা না থাকিলেও, প্রয়োজনীয় বিষয়-সিদ্ধি ভগবদ্বিধানেই স্বভাবতঃ সম্পন্ন হইবে। অতএব যে দিক্ দিয়াই দেখুন, যে ভাবেই বিচার করুন, বুঝিতে হইবে যে, অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র সাধনীয় ও প্রার্থনীয়। যতদিন সকাম ভজনা, ততদিনই হৈতুকী ভক্তির ক্রিয়া। ক্রমে যখন ভক্তি মাত্র থাকেন, কিন্তু কামনা উড়িয়া যায়, তখনই সেই ভক্তি অহৈতুকী হন। একটা অতি স্থূল লৌকিক উদাহরণ দেখুন। যেমন কেহ কাশ, বাত, শূল বা উদরাময় প্রভৃতি রোগা-রোগ্য কামনায় আফিং খায়, এবং ক্রমে রোগ হয়ত সংপূর্ণ সারিয়া যায়; কিন্তু আফিং আর সে ছাড়িতে পারে না। তখন সে আফিঙ্গের নেশায় পড়িয়া আফিঙ্গের জন্যই আফিং খায়। তদ্রূপ সাধক বিষয়-কামনায় হৈতুকী ভক্তিযোগে ভগবানকে ভজিলেও, ভগবানেরই কৃপা-বিধানে সে বিষয়-কামনা তিরোহিত হয়, কিন্তু সে ভজনের নেশা সারিয়া যায়, ভজন আর সে ছাড়িতে পারে না। বিষয়ের জন্য যে ভগবানকে ভজিত, সে-ই তখন ভগবানের জন্যই ভগবানকে ভজে। ভগবানকে না ভজিয়া তখন আর সে থাকিতে পারেনা; ভগবান ভিন্ন তাহার তখন অন্য কিছুই ভাল লাগে না। কোন বিবিধ

বিষয়-বিলাস-বেষ্টিত ভোগী ভোগকামনাঃমূলক হৈতুক ভজন করিতে করিতে ক্রমে ভগবৎ কৃপায় অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিয়া, তাঁহার সকল বিলাসই তখন সেই ব্রজবিলাসী হরিতে বিলসিত বা পরিণামিত দেখিতেন! তাই ভাবভরে বলিয়াছিলেন,—

"হরি মেরা ধনদৌলৎ, হরি মেরা জান।
হরি মেরা তাম্বাকু, হরি মেরা পান॥
হরি মেরা গোলাব-পাশ, হরি আতরদান।
হরি মেরা সঙ্গত্ ঔর্ সঙ্গীত্ কি তান্॥"

অনুবাদ অনাবশ্যক। ফলে হরিতে মন মজিলে, জগতের আর কোন মজাই সাধককে মজাইতে পারে না। অথবা সকল মজাই সে হরিতে পায়। সংসারের সারাৎসার 'আসল মজাদার' জিনিস পাইলে বাজে মজায় আর কে মজে? একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিতেই সেই আসল মজার আস্বাদন লাভ হয়। অতএব সেই বাঞ্ছাঃকল্পতরু হরির চরণে জীবের যদি কোন বাঞ্ছা নিবেদন করিবার থাকে, তবে বিষয়-বাঞ্ছা বর্জ্জনেই সেই বাঞ্ছা,—আর অহৈতুকী ভক্তিযোগে সেই বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন অর্জ্জনেই বাঞ্ছা। বলিয়াছি ত, যতদিন জীবের আমিত্বধর্ম্ম থাকে, ততদিন বাঞ্ছারও অস্তিত্ব থাকে; অতএব আমিত্বধর্ম্মী জীবের সর্ব্ব-বাঞ্ছার সারনিকর্ষ বা চরমোৎকর্ষ যাহা হইতে পারে বা হওয়া উচিত, তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গোক্ত এই চতুর্থ শিক্ষা-শ্লোকে চিত্রিত। কিন্তু কেবল ভগবানে বাঞ্ছা নিবেদন করিয়া রাখিলেই হইবেনা; জীবেরও তৎসম্পূরণার্থে একটি ভগবদাদিষ্ট কর্ত্তব্য আছে; সেটি ভগবন্নাম-গ্রহণ। নামই জীবের অহৈতুকী ভক্তি-বাঞ্ছা পূরণের ঐকান্তিক উপায়—বিশেষতঃ কলির জীবের একমাত্র উপায়। তাই সন্দর্ভ-শেষে ভক্তপাঠককে একটি ভগবন্নাম-কীর্ত্তন উপহার দিয়া এবারের মত সাভিবাদন বিদায় গ্রহণ করিলাম।

(কীর্ত্তন-গীত)

"হরে কৃষ্ণ হরি বল্‌রে ভাই।
হরিনাম বিনে আর গতি নাই॥
যদি অহৈতুকী ভক্তি-লতার
বীজ দিলেন গুরু গোসাঁই;
(দিয়ে) নয়ন-আসার, হরিনাম-সার,
আয় দেখি তায় ফুল ফুটাই॥
ও তার উৎকৃষ্ট ফল কৃষ্ণ-সেবার
মিষ্টতার তুলনা নাই॥
হরি বল্‌রে—
(হরিনামে প্রেমে যুগল-মিলন!)
হরি বল্‌রে—
(আহা!) হ-কারে শ্রীমতী রাধা,
রি-কারে শ্রীকৃষ্ণ পাই॥
(ওরে) আর কিছু ত লাগ্‌বেনারে ভাই!
(নিলে) নামটি শুধু, পরাণ-বঁধু
পায়ে দিবেন ঠাঁই।
(ও সেই ভবার্ণবের)
নায়ে দিবেন ঠাঁই।
(জীবের) দুঃখ দেখে, গোলোক থেকে
নাম এনেছেন গৌর-নিতাই॥
(হরি) নাম এনেছেন গৌর-নিতাই॥
(ধর) নেও হরিবোল, দেও হরিবোল,
হরি-হরি-বোল গাও সবাই॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(যশোহর)

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

প্রথম অধ্যায়।

চতুর্থ-পাদ।

প্রথমাধ্যায়ের এই চতুর্থ পাদে ২৮টী সূত্র আছে। ইহার প্রথম সপ্তসূত্র-রচিত একটি অধিকরণে কঠোপনিষদুক্ত "অব্যক্ত" শব্দে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত "প্রধান" অথবা "সূক্ষ্মশরীর" সূচিত হয়, তাহাই বিচারিত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী তিন সূত্রে (৮ম হইতে ১০ম) দ্বিতীয় অধিকরণ গঠিত। তাহাতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত "অজা" পদে যে সাংখ্যোক্ত প্রধানকে বুঝায়না, পরন্তু ব্রাহ্মীশক্তি অথবা আদি-কারণ-শক্তিকেই যে বুঝায়, তাহা সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। তৎপর আর তিন সূত্রে—অর্থাৎ ১১শ হইতে ১৩শ সূত্রে তৃতীয় অধিকরণ অধিষ্ঠিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত "পঞ্চ-পঞ্চজন" পদে যে সাংখ্যদর্শনোক্ত পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব বুঝায় না, এই অধিকরণে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। চতুর্থ অধিকরণটি ১৪শ ও ১৫শ, এই সূত্রদ্বয়গত। এই অধিকরণের বিচারিত বিষয়, ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপতাই যে বিশ্বের কারণস্বরূপ, এ তত্ত্বে সর্ব্বোপনিষদের সিদ্ধান্তই অবি-সংবাদে সমন্বিত। ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ সূত্র-সংগঠিত পঞ্চম অধিকরণে ইহাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে যে, কৌশিতকী উপনি-ষদের কল্পিপর শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মই বিজ্ঞেয়, কিন্তু প্রাণবায়ু বা জীবাত্মা নহে। ১৯শ হইতে ২২শ সূত্র পর্য্যন্ত ষষ্ঠ অধিকরণ; তাহাতে বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম-তত্ত্বই বিজ্ঞেয়, পরন্তু জীবাত্মতত্ত্ব কদাচ নহে, ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত। তৎপর ২৩শ সূত্র হইতে ২৭শ সূত্র পর্য্যন্ত সপ্তম অধিকরণ কল্পিত; তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেবল মাত্র "নিমিত্ত কারণ" নহেন, কিন্তু "উপাদান কারণ"ও বটে। অবশেষে ২৮শ সূত্রাত্মক অষ্টম অধিকরণের সিদ্ধান্ত এই যে, সাংখ্যমতের খণ্ডন বিশ্ব-সৃষ্টির মূলকারণনির্ণায়ক অপর মতবাদের প্রতিও প্রয়োজ্য, যথা পরমাণুবাদ।

বৈদান্তিকগণের সহিত সাংখ্যমতবাদি-গণের অবিশ্রান্ত বিচারসংগ্রাম চলিয়া-ছিল। এই অধ্যায়ের অধিকাংশ কেবল সাংখ্যদর্শনের 'প্রধান'বাদের খণ্ডনেই প্রায় পর্য্যবসিত। বৈদান্তিকগণ বলেন যে, বিশ্বের কারণ একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মা; পরন্তু সাংখ্যোক্ত 'প্রধান'কে বিশ্বের কারণ বলিয়া উপনিষৎ অর্থাৎ বেদান্তের কুত্রাপি কোন শ্রুতিতে স্বীকৃত বা বিবৃত হয় নাই। ফলে সাংখ্যোক্ত প্রধানই বেদান্তোক্ত ব্রাহ্মী-শক্তি বা মায়ারূপে বৈদান্তিকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত। তবে পার্থক্য এই যে, বৈদান্তিক-গণের মতে ঐ মায়া ব্রহ্মের শক্তি বিধায়, উহা শক্তিমান ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অধীন, কিন্তু সাংখ্যবাদিগণের সিদ্ধান্তে জড়জগতে প্রধানই হেত্বন্তর-নিরপেক্ষ স্বাধীন ও সর্ব্বে সর্ব্বা। জড়জগতের হেতু যে মায়া, তাহা বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন, কিন্তু উহা ব্রহ্মের শক্তি মাত্র জানিয়া, উহাকে আত-

ক্রম করিয়া, তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হন। পক্ষান্তরে, সাংখ্যবাদিগণ প্রধানকে অতিক্রম করেন না; পরন্তু সৃষ্টিমূলতত্ত্ব-সিদ্ধান্তে উহাতেই উপসংহৃত হন।

বাস্তবিক কতিপয় উপনিষদে এই উভয় মতেরই সমীকরণ দৃষ্ট হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈদান্তিকগণ স্বমতদার্ঢ্যে এই স্থির সিদ্ধান্তে সমাগত যে, কোন উপনিষদের কোন শ্রুতির কুত্রাপি সাংখ্যোক্ত 'প্রধান-বাদ' প্রশ্রয় পায় নাই। ফলে যেখানে যেখানে যে কোন উপনিষদা শ্রুতির যে কোন উক্তিতে সাংখ্যমত সমর্থনের সন্দেহ হইয়াছে, সেই স্থানেই তাঁহারা সেই শ্রুতির সেই উক্তির বেদান্ত-মতানুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন।

বাস্তবিক ভারতের ষড়দর্শন পরস্পর সমাহিতভাবে অতীত ও আধ্যাত্মিকধীষণা সহযোগে সূক্ষ্মভাবে বিচারিত হইলে, তাহাদের স্ব স্ব মতসিদ্ধান্তে পরস্পর কোন বিরোধ বা বিসম্বাদিতা দৃষ্ট হইবে না। বাস্তবিক ছয়টি দর্শন যেন একটি সোপানেরই ছয়টি পদ্ধতি বা ধাপ। ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন যেন তাহার সর্ব্বোচ্চ বা শেষ ধাপ। ক্রমশঃ পদ্ধতি-পরম্পরায় এই সোপান অতিক্রম করিয়া, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান-সৌধে সমারোহণ করা যায়। একেবারেই কেহ সর্ব্বোচ্চ ধাপে উঠিয়া সৌধপ্রবেশে সমর্থ হয়না; সুতরাং উদ্দেশ্যের অভিন্নতায় প্রকৃতপক্ষে দর্শনশাস্ত্রগুলি পরস্পরে অবিরোধী। এই মূল সত্য বিস্মৃত বা উপেক্ষিত হইলে, আমরা চিরকাল দর্শনশাস্ত্রের 'গোলোক ধাঁধায়' পড়িয়া ঘুরিব; কদাচ সর্ব্বমতসমন্বিত সারসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া স্বাধ্যায়ের প্রকৃত সুফললাভে সমর্থ হইব না; অথবা কোন একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের মৌলিকত্ব অনুভবে অধিকারী হইতে পারিবনা।

কোন একটি সত্য হইতে অধিকার-ক্রমানুসারে তদুচ্চতর সত্যে আরোহণ স্বাভাবিক নিয়ম; অতএব নিম্নস্থ সত্য সত্যই নহে, অথবা উচ্চতর সত্যের অস্তিত্বই নাই, এরূপ কোন সিদ্ধান্ত দার্শনিক বিচারে স্বতই অনুপপন্ন ও অসঙ্গত। যাহাহউক, এক্ষণে বেদান্তসূত্রের চতুর্থপাদের সূত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১ম। আনুমানিক মপ্যেকেষা-মিতি চেন্ন শরীররূপক বিন্যস্ত গৃহীতের্দর্শয়তি চ।

২য়। সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ।

৩য়। তদধীনত্বাদর্থবৎ।

৪র্থ। জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ।

৫ম। বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞোহি প্রকরণাৎ।

। ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাস প্রশ্নশ্চ

৭ম মহদ্বচ্চ।

৮ম চমসবৎ বিশেষাৎ।

৯ম। জ্যোতিরুপক্রমাত্তু তথা হ্যধীয়ত একে।

১০ম। কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বা-

(ভাষ্যানুবাদ।)

১। কতিপয় ঔপনিষদী শ্রুতিদ্বারা যে সাংখ্যোক্ত প্রধানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ; যেহেতু আপাততঃ প্রধান-লক্ষণ-প্রতিপাদক শ্রৌত বাক্য যে প্রকৃত পক্ষে সূক্ষ্ম শরীরের রূপক রূপেই বিন্যস্ত, তাহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

২। লক্ষণের উপযোগিতা হেতু "অব্যক্ত" শব্দে সূক্ষ্ম শরীরই সূচিত হইতেছে, কিন্তু "প্রধান" নহে।

৩। শাস্ত্রযুক্তিমতে অব্যক্ততত্ত্ব ব্রহ্মের অধীন বিধায়, তদ্দ্বারা সাংখ্যোক্ত স্বাধীন "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৪। অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব শাস্ত্রে উক্ত না হওয়ায় "অব্যক্ত" পদে "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৫। সাংখ্যোক্ত "প্রধান" অপ্রাজ্ঞ বিধায়, শাস্ত্রোক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হয় না; পরন্তু প্রাজ্ঞ আত্মাই প্রতিপাদিত হন।

৬। প্রশ্নানুসারে তিনটি তত্ত্বমাত্রের উপন্যাস হইয়াছে। সুতরাং তন্মধ্যে অব্যক্ত স্বরূপে প্রধান সূচিত হয়নাই।

৭। "অব্যক্ত" পদ "মহৎ" পদের ন্যায় প্রযুক্ত হওয়াতে, তদ্দ্বারা প্রধান পরিব্যক্ত হইতে পারে না।

৮। "চমস" পদের প্রয়োগবৎ "অজা" পদ রূপকার্থে প্রযুক্ত হওয়ায়, তদ্দ্বারা প্রধান প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৯। কতিপয় শাখাতে ভূত-সৃষ্টির উপক্রম স্বরূপ জ্যোতিস্তত্ত্ব "অজা" পদে অধীত হওয়ায়, "অজা" পদে "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

১০। শ্রুতিবিশেষে রূপকভাবে "মধু" শব্দে সূর্য্য সূচিত হওয়ায়, এবং শাস্ত্রে ঐরূপ আরও রূপকোক্তি থাকায়, ছাগী-অর্থ-প্রকাশক "অজা" শব্দ দ্বারাও রূপক-রূপে সৃষ্টির মূল ভৌতিককারণত্ব অবিরোধীভাবেই সূচিত হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা সাংখ্যোক্ত "প্রধান" সূচিত হয় নাই।

বৈদান্তিকেরা বলেন যে, সাংখ্যমতের কোন বেদানুমোদিত প্রামাণিকতা নাই। এতৎপ্রতিবাদে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ কঠোপনিষদুক্ত (১-৩।১১) একটি শ্রুতি নির্দ্দেশ করেন, যথা—"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ"। অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ। সাংখ্যশাস্ত্রেও এই ত্রিতত্ত্ব স্বীকৃত; সুতরাং উক্ত ঔপনিষদী শ্রুতি দ্বারা সাংখ্যমতের মূলতত্ত্ব বেদ-প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে, ইহাই সাংখ্য-বাদিগণের সিদ্ধান্ত। মূল জ্ঞানতত্ত্ব বা অনুভূতিই মহৎ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতত্ত্বই অব্যক্ত। এই অব্যক্তস্বভাবিকা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই মূলতঃ ও মূলতঃ সর্ব্বজগতের সৃষ্টিশক্তিস্বরূপিণী; আর পুরুষ জীবাত্মা। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ। বেদান্তবাদীরা বলেন, "সাংখ্যবাদীরা শ্রৌতবাক্যের সহিত কেবল তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কতিপয় শব্দ-সাম্য পাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত প্রকৃতঅর্থসাম্য অবগত পান নাই। ফলে ঐ সমস্ত শব্দগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য বা অর্থ কি, তাহা প্রকৃত পক্ষে অবধারণ

করিতে হইলে, মূল আলোচ্য বিষয়টি কি, তাহা বুঝিতে হইবে, এবং সমগ্র উপনিষদ খানি অধ্যয়নপূর্ব্বক প্রকরণ ও উপক্রম-উপসংহার বিচার করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে ; কিন্তু শুধু এখানকার ওখানকার দুচারিটা ছুটা ছুটা উক্তির শাব্দিক অর্থের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আলোচ্য শ্রুতিটির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে একটি রূপকোক্তির শ্রুতি দৃষ্ট হয়। উহাতে আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলা হইয়াছে, ইত্যাদি। শ্রুতিটি এই,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

অর্থাৎ—

'আত্মাকে জানিবে রথী, রথ জান দেহ।
বুদ্ধিকে সারথি জান, মনকে প্রগ্রহ॥
ইন্দ্রেয়েরা অশ্ব তার বিষয়ের পথে।
দেহ-মনযুক্ত আত্মা 'ভোক্তা' জ্ঞানী-মতে॥

তৎপরে উক্ত হইয়াছে যে, যে সাধক ইন্দ্রিয়-সংযম-সিদ্ধ, সে-ই সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব পরমাত্ম-তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভে অধিকারী। শ্রুতি যথা—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরমর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥"

অর্থাৎ—

ইন্দ্রিয়ের পরে অর্থ ; অর্থ-পরে মনস্তত্ত্ব।
মনের পরেতে বুদ্ধি, বুদ্ধি-পরে মহত্তত্ত্ব॥
মহৎ-পরে অব্যক্ত, পুরুষ পরেতে তার।
সেই কাষ্ঠা, পরাগতি, তারপর নাহি আর॥

আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রৌত বাক্যটির ন্যায় পরোদ্ধৃত শ্রৌত-বাক্যটিতেও ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পাইলাম। আবার পরোদ্ধৃত বাক্যটিতে পূর্ব্বোদ্ধৃতের ন্যায় 'আত্মা' শব্দটিও পাইলাম। কিন্তু পার্থক্য মাত্র এই যে, প্রথমোক্ত বাক্যটির আত্মা জীবাত্মা ও পরবর্ত্তী বাক্যোক্ত আত্মা পরমাত্মা। ফলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে পরমার্থতঃ অভিন্ন এ সিদ্ধান্তে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তবে কেবলমাত্র প্রথমের ন্যায় দ্বিতীয় বাক্যটিতে শরীরের উল্লেখ নাই। অতএব ইহার সমাধান এই যে, দ্বিতীয় উক্তির "অব্যক্ত" পদেই প্রথমোক্তিস্থ 'শরীর' সূচিত হইতেছে। সুতরাং এ স্থলে অব্যক্ত পদে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত বিশ্ব-মূল-কারণরূপে প্রধানকে বুঝায় না। তবে কি প্রকারে এই স্থূল সুব্যক্ত ভৌতিক শরীর "অব্যক্ত" শব্দে সূচিত হইতে পারে? তদুত্তরে (২য় সূত্র) বলা যায় যে, উক্ত বাক্যে "কারণ-শরীর" বা "লিঙ্গশরীর"কে বুঝাইতেছে। এই 'লিঙ্গশরীর' হইতেই ভৌতিক স্থূলদেহ সম্প্রাত। কখন কখন কারণবাচক শব্দ কার্য্যবাচকরূপে গৃহীত হয়। যথা স্বয়ং ঋগ্বেদ (৯-৪৬৪) বলিতেছেন,—"গোভিঃ শ্রেণীত মৎসরং"—অর্থাৎ গরুর সহিত সোম মিশাও। এস্থলে 'গরু' অর্থেই গরুর দুগ্ধ। ফলে দুগ্ধসহ সোমমিশ্রণেরই বিধি। অতএব "অব্যক্ত" পদ প্রয়োগে ভৌতিক স্থূল শরীর-সূচনারইবা বাধা কি?

"বৃহদারণ্যক উপনিষদ" (১।৪।৭)

বলেন,—"তদ্বেদম্ তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিতি।" অর্থাৎ এ সব কিছুই ছিল না; সমস্ত অব্যক্ত ছিল। তাৎপর্য্য এই যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নামরূপউপাধিযুক্ত বহুভেদ-বিশিষ্ট সুব্যক্ত জগৎকেও অব্যক্ত বলা যায়; যেহেতু ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাদির সর্ব্ববিধ ভেদশূন্য হইয়া বীজশক্তিরূপে অবস্থিত ছিল। অতএব যেমন এই সুব্যক্ত জড়-জগতের একটি অব্যক্ত বীজীভূত অবস্থা আছে, তদ্রূপ এই সুব্যক্ত স্থূল শরীরেরও একটি অব্যক্ত অবস্থা বা কারণ-শরীর আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, (৩য় সূত্র জগতের অব্যক্ত কারণাবস্থাই সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রধান কিনা? ইহাতে সাংখ্যবাদিগণ বলেন যে, "হে বৈদান্তিকগণ! নাম-রূপ-উপাধি প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব্বে যে এই জগতের অব্যক্তাবস্থা ছিল, তাহা তোমরা স্বীকার করিলে, তদ্দ্বারা আমাদেরই মত সমর্থন করা হয়।" তদুত্তরে বৈদান্তিকেরা বলেন যে, "না, তাহা নহে। যদি আমরা জগতের আদি অব্যক্ত অবস্থাকে ব্যক্ত জগতের স্বাধীন কারণ-রূপে স্বীকার করিতাম, তবে তোমাদের মত সমর্থন করা হইত বটে, নচেৎ নহে।" বাস্তবিক বৈদান্তিকেরা জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী অব্যক্ত কারণাবস্থা স্বীকার করিলেও, সেই অব্যক্ত তত্ত্বকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন না; পরন্তু তাহা পরমাত্মা ব্রহ্মেরই অধীন বলেন। ফলে যদি এই ভৌতিক জগতের কারণস্বরূপ একটা পূর্ব্ববর্ত্তী বীজীভূত অব্যক্তাবস্থা স্বীকার না করা যায়, তবে ঈশ্বর 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিয়াই অভি-হিত হইতে পারেন না। তবে ঈশ্বরের কোন কার্য্যই থাকে না; সুতরাং কার্য্যের কারণরূপিণী বীজশক্তির অভাবে কার্য্য-রূপ সৃষ্টিও থাকে না। অতএব ঐ কারণ-রূপা বীজশক্তিই বৈদান্তিকগণের মতে মায়া। 'আকাশ' 'অক্ষর' এবং ঐরূপ সমতাৎপর্য্যবোধক পদেও মায়াই সূচিত হইয়া থাকে। "এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যা-কাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতেঃ।" (বৃঃ উঃ ৩।৮।২) অর্থাৎ—হে গার্গি! এই অক্ষরে নিশ্চয় আকাশ ওতঃপ্রোতঃ ভাবে থাকে, ইহাই বেদবাক্য। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ উঃ, ২—১।২) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠতর। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি, মায়িনন্তু মহেশ্বরং" (শ্বেঃ উঃ—৪।১০) অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি জানিবে এবং মায়া যাঁহার, তাঁহাকেই মহেশ্বর জানিবে। কঠোপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিস্থ 'মহৎ' শব্দে যদি জীবাত্মা বুঝায়, তবে "অব্যক্ত" শব্দেও বেদান্তদর্শনের "মায়া" বুঝাইবে। অতএব "অব্যক্ত" শব্দের অর্থ যেরূপই গৃহীত হউক; অর্থাৎ উক্ত শব্দে জীবের সূক্ষ্ম কারণ-দেহকেই বুঝাউক্ বা এই স্থূল ভৌতিক জগতের বীজীভূত সূক্ষ্ম কারণাবস্থাই বুঝাউক্, ফলে তদ্দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জগতের স্বাধীন আদিকারণরূপে কথিত প্রধানকে কখনও বুঝাইবেনা।

৪র্থ সূত্র।—কঠোপনিষদুক্ত ঐ 'অব্যক্ত' পদে সাংখ্যদর্শনের "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না। যেহেতু পুরুষের মুক্তি লাভার্থ প্রকৃতিকে জানা আবশ্যক; কিন্তু কঠ শ্রুতির "অব্যক্ত" কোনরূপেই জ্ঞের

বা' খোররূপে উক্ত হয় নাই; অতএব এই "অব্যক্ত" ও সাংখ্যের প্রকৃতি বা "প্রধান" কদাচ এক তত্ত্ব হইতে পারে না।

৫ম সূত্র।—এক্ষণে সাংখ্যপক্ষ এক নবতর্কে অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন যে, "প্রধান" জ্ঞানবিষয়ীভূত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে বৈদান্তিকেরা বলেন যে, সাংখ্যপক্ষের প্রামাণ্য শাস্ত্রোক্তিতে প্রধান সূচিত হয় নাই; পরন্তু পরমাত্মাই সূচিত হইয়াছেন।

সাংখ্য পক্ষীয় সেই প্রামাণ্য শ্রুতিটি এই, যথা কঠোপনিষদ্ (১।—৩।১৫)—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্
তথারসংনিত্যমগন্ধবচ্চয়ৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃপরংধ্রুবং
নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ—

অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপঅব্যয়।
অরস-অগন্ধ-নিত্যসত্ত্বময়॥
অনাদ্যন্ত-ধ্রুব মহতের পর।
যাঁরে জেনে মৃত্যু-মুখ-মুক্ত নর॥

সাংখ্য পক্ষীয় সিদ্ধান্ত এই যে, এই শ্রুতি তাঁহাদের "প্রধান"কে প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্তু বেদান্তপক্ষীয়েরা বলেন যে, না, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু সমগ্র অধ্যায়টির মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব; সুতরাং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া প্রধানকে বুঝাইলে, স্পষ্টতঃ বিষয়বিপর্য্যয় দোষ ঘটে; অতএব অমীমাংসিত আরব্ধ বিষয় বন্ধ করিয়া, এক নব বিষয়ের অবতারণা হইয়া পড়ে। সমগ্র অধ্যায়টিতে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, মানব ব্রহ্মকে জানিলেই—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই মুক্তিলাভে সমর্থ হয়; কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রমতে কেবল প্রধানকে জানিলেই জীবের মুক্তি হয়না, পরন্তু সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত 'পুরুষ'কেও জানিতে হইবে; অর্থাৎ পুরুষের আত্মজ্ঞান ভিন্ন মোক্ষলাভ সম্ভাবিত নহে। বৈদান্তিক মতে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান পরমার্থতঃ এক; যেহেতু আত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ এক; মায়া-মুক্তাবস্থায় সেই একত্বানুভূতি এবং একত্ব পরিণতিই মুক্তি।

৬ষ্ঠ সূত্র।—এ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, আলোচ্য "অব্যক্ত" পদে কদাচ "প্রধান" ব্যক্ত হইতে পারে না। যেহেতু কঠোপনিষদেই উক্ত হইয়াছে যে, যম নাচিকেতাকে মাত্র তিনটি তত্ত্বের বিষয় বলিয়াছেন, যথা—অগ্নিচয়ন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। নাচিকেতা কর্তৃক "প্রধান" সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন উত্তরও সম্ভাবিত নহে; অতএব 'অব্যক্ত' কদাচ 'প্রধান' হইতে পারেনা। তদুত্তরে সাংখ্যপক্ষ বলেন যে, নাচিকেতা প্রকৃত পক্ষে অগ্নিচয়ন, এবং আত্মা, এই দুই বিষয়ে মাত্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তোমরা বেদান্তপক্ষীয়েরাই স্বীকার করিতেছ যে, যম তিনটি তত্ত্ব বলিয়াছিলেন; সুতরাং নাচিকেতা কর্তৃক প্রধানতত্ত্ব জিজ্ঞাসিত না হইলেও, যমকথিত ঐ অতিরিক্ত তত্ত্বটিকে 'প্রধান' বলিয়া বুঝিতে বাধা কি? এতৎ প্রত্যুত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন যে, যদিও জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দুইটি বিষয়ই যম কর্তৃক কথিত হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে

হয়, উহা আপাততঃ গণনায় দুইটি বিষয় হইলেও, ফলিতার্থে একটি বিষয়ই বটে; কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ এক বা অভিন্ন।

৭ম সূত্র।—সাংখ্যদর্শনে 'মহৎ' পদটি যে অর্থে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, বেদান্তের দার্শনিক পরিভাষায় তাহা তদর্থে গৃহীত বা প্রযুক্ত হয় নাই। সাংখ্যমতে 'মহৎ' বুদ্ধি বা জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম বিকাশ; কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে তদ্দারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য; যথা—"বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পর" (কঃ উঃ ১—৩।১০) অর্থাৎ মহৎ আত্মা বা পরমাত্মা বুদ্ধিতত্ত্বের অতীত তত্ত্ব। 'মহান্তং বিভুমাত্মানং"। (কঃ উঃ ১—২।২৩) সর্ব্বব্যাপী আত্মাই মহৎআত্মা। 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং' (শ্বেঃ উঃ, ৩।৮) অর্থাৎ এই মহৎ পুরুষ কিনা পরম পুরুষ পরমাত্মাকে আমি জানি; ইত্যাদি। যাহাহউক, "মহৎ" শব্দের তাৎপর্য্য সাংখ্যে যেরূপ, বেদান্তে তাহাহইতে ভিন্নরূপ; এবং তদ্রূপ "অব্যক্ত" শব্দের তাৎপর্য্য সাংখ্যে যেরূপ, বেদান্তে তাহাহইতে ভিন্নরূপ; সুতরাং বেদান্ত-মতে "অব্যক্ত" পদে কদাচ সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারেনা।

৮ম সূত্র।—যে শ্রুতিটি মূল আলোচ্য বিষয়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ, তাহা এই,—

অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং।
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ॥
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে।
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

অর্থাৎ—

এক অজা রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণ ধরে।
স্ব-রূপ বিবিধ প্রজা প্রসব সে করে॥
এক অজ ভালবেসে তার পাশে থাকে।
অন্য অজ উপভোগি ত্যাগ করে তাকে॥

এই আপাতপ্রতীয়মান রূপকরূপী শ্রৌতবাক্যটির শাব্দিক অর্থ অবশ্য পরিষ্কার, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্যার্থের রহস্য-ব্যাখ্যায় সাংখ্য-সম্প্রদায় বলেন যে, 'অজা' পদে প্রধানই প্রতিপাদ্য; যেহেতু ইহাই জগতের আদিকারণ। লোহিত, কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই তিন বর্ণ প্রকৃতি বা প্রধানের রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব গুণের লক্ষণ। এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রধানের স্বরূপ। ইহা হইতে ত্রিগুণাত্মক জগতের সৃষ্টি। আর বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে পুরুষ (তত্ত্বতঃ এক হইয়াও) দ্বিবিধ। ইহাই দুই অজ। প্রকৃতিও স্বয়ম্ভূতা বলিয়া অজা এবং এই আত্মারূপী পুরুষও স্বয়ম্ভূত বা স্বয়ম্ভু, সুতরাং অজ। এই দুয়ের মধ্যে বদ্ধ পুরুষ প্রকৃতির প্রেমাধীন হইয়া প্রকৃতিতেই লাগিয়া থাকে; সুতরাং মুক্তি লাভ করিতে পারেনা। আর মুক্ত পুরুষ প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিয়া, অর্থাৎ তাহার তত্ত্ব জানিয়া, তাহাকে ত্যাগ করে। বদ্ধজীব তত্ত্বজ্ঞানাভাবে আপনার স্বরূপ চিনিতে না পারিয়া প্রকৃতির ভোগে ভুলিয়া থাকে; আর তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ আত্মতত্ত্ব লাভে অনাসক্ত ও বলবন্ত হইয়া, প্রকৃতির প্রেমজাল ছিন্ন করিয়া, অবাধে মোক্ষপদের যোগ্য হয়। এতাবতা সাংখ্যবাদীদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই 'অজা' পদে প্রকৃতি বা প্রধানই পরিব্যক্ত।

বৈদান্তিকগণ এতদুত্তরে বলেন যে, একটি মন্ত্র আছে, যথা—"অর্বাগ্‌বিলস্‌ চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" অর্থাৎ অধোমুখ ঊর্দ্ধতল একটি চমস (হাতা বা বাটীর ন্যায় যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষ) আছে ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক এতদ্দ্বারা কি বস্তু বুঝাইতেছে, তাহা জানা যায় না। তদ্রূপ আলোচ্য মন্ত্রের কেবল ঐ 'অজা' শব্দের দ্বারা উহাকে "প্রধান" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সমুচিত নহে। "চমস" শব্দে উক্ত মন্ত্রেরই পরবর্ত্তী একটি শ্রুতিতে মস্তক বা মুণ্ডকে বুঝায়। 'চমস' সম্বন্ধে যেমন, 'অজা' সম্বন্ধেও তদ্রূপ যদি আর একটি পরবর্ত্তী শ্রৌতবাক্য পাওয়া যায়, তবে উক্ত 'অজা' পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রতীত হইতে পারে। কঠোপনিষদে একটি শাখায় বলা হইয়াছে যে, জলন্ত স্থূল অগ্নির রক্তবর্ণই মৌলিক তেজের বর্ণ। আর স্থূল অগ্নির শ্বেতবর্ণই মৌলিক রসভূতের বর্ণ; এবং স্থূল অগ্নির কৃষ্ণবর্ণ মৌলিক ক্ষিতির বর্ণ। বেদান্তবাদিগণ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত ঐ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শ্রৌত বাক্যটির প্রতিপাদ্য বিষয় এই ক্ষিত্যপতেজ-তত্ত্ব। উক্ত উপনিষদেই স্থলান্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মা ব্রহ্মের শক্তিরূপিণী মায়া বা প্রকৃতি কর্ত্তৃক এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, মূল মীমাংসিতব্য বিষয় অনুসারে আলোচ্য মন্ত্রটিতে সেই ব্রহ্মশক্তিই সূচিত হইতেছেন, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শ্রৌত বাক্যেও তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। উহাই সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বীজ বা কারণ-তত্ত্ব এবং ক্ষিত্যপতেজের জন্মিত্রীত্ব হেতু উহাকেই ত্রিবর্ণাত্মিকা অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে ইঁহাকে "ছাগী" অর্থে গ্রহণ করিব না কেন? অজা শব্দের দুটি অর্থ; ছাগী এবং যাহা জন্মে নাই। "ক্ষিত্যপ্‌তেজ" ভৌতিক পদার্থ। "ভূত" শব্দের অর্থই জাত; অতএব উহা কদাপি অভূত বা অজাত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলা যায়, উক্ত "অজা" শব্দটি আলোচ্যস্থলে রূপকভাবেই ব্যবহৃত হইতে পারে। উপনিষদে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্যকে এইরূপ রূপকভাবে "মধু" বলা হইয়াছে; আবার তদ্রূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাণীকে "গাভী" বলা হইয়াছে! অতএব আলোচ্যস্থলেও যদিও জগতের মূল ভৌতিকতত্ত্ব ছাগী নহে, তথাপি ঐরূপ রূপকভাবেই "অজা" অর্থাৎ ছাগী বলা হইয়াছে।

যাহাহউক, এই সমস্ত বিতর্ক-বিচারের বৈদান্তিক সারনিষ্কর্ষ বা সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও সচরাচর বেদান্ত-শাস্ত্রে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত "প্রধান" বৎ একটি তত্ত্ববিশেষ সূচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সাংখ্যের সেই স্বপ্রধান স্বাধীন প্রধান নহে; তাহা "মায়া" অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি; তাহা ব্রহ্ম-সাপেক্ষ; সুতরাং স্বপ্রধানা বা স্বাধীনা নহে। কিন্তু নিরপেক্ষ-বিশ্ব-বিধাতৃত্বহেতু সাংখ্যের "প্রধান" বাস্তবিকই প্রধান; উহা স্বাধীন, স্বসাপেক্ষ ও স্বয়ম্ভূতত্ত্ব। সাংখ্যশাস্ত্রে কোন ভাবেই উহা ব্রহ্মের অধীন বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রী—

কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ।

মহাপ্রাণতার সুন্দর সুস্পষ্ট সুচিত্রিত মহান্ আদর্শ সমগ্রজগতের সমস্ত জাতির সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া মহাত্মা বিবেকানন্দ মরসংসারের সমস্ত বন্ধন, সমস্ত আকর্ষণ সম্পূর্ণ ছেদ করিয়া, মহাসমাধি-সোপানের সাহায্যে মহাশান্তি-ধামে গমন করিয়াছেন। স্থূলদর্শীর জন্য তাঁহার স্থূলদেহের কয়েক মুষ্টি ভস্মমাত্র অবশেষ রহিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানীর নয়নে এক বিরাট্ বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানময় মহাসত্তা অনন্তকালের জন্য অধিকৃতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহার বিজয়ভেরীর ধীরগম্ভীররবে জগতের এক-প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে, প্রত্যেক অণু সাকাঙ্ক্ষকর্ণে সেই মন্দ্রমধুর সঞ্জীবনশব্দ শ্রবণ করিতেছে, নবজগৎ নববিজয়ের জন্য তাঁহাকে নবপ্রীতিপূর্ণবচনে বারম্বার আহ্বান করিতেছে, এদিকে পাপতাপহারিতরঙ্গরঙ্গ-বিলাসিনী সুরধনীর পবিত্র প্রবাহের অনতি-দূরে অবস্থিত সেই মহাপুরুষের মস্তকে শতধা উচ্ছলিত জননীর শতধার স্নেহের ন্যায় মহাকালের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। পবিত্রতাময়ী জন্মভূমি জননীর সুস্নিগ্ধ-অঙ্কে নিরাতঙ্ক-মনে মহাত্মা পরম শান্তি-লাভের জন্য মহানিদ্রার্থে প্রস্তুত হইয়া শয়ন করিলেন। উজ্জ্বল মধুর মহিমান্বিত আলোক স্থূল দৃষ্টির দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। মহাপুরুষ বিবেকানন্দের কর্ম্ম জীবন তীব্রতার আবর্ত্ত সঙ্কুল বহুল-জটিলতাময় ঝটিকাপ্রবাহ স্বরূপ নানাভাব-পূর্ণ হইলেও, চরম বড় স্থির, বড় গভীর, বড় সামঞ্জস্যযুক্ত, বড় মধুরিমাময়, বড় আনন্দময়, বড় নিরাবিল। মৃত্যু সংসারের সুখদবিশ্রাম। মৃত্যু বাধা বিপত্তি ঘাত-প্রতিঘাতময়বিশৃঙ্খলজীবনের একমাত্র সুব্যবস্থা। অজ্ঞজনের মস্তকতাড়ন বক্ষো-বিদারণের কারণ হইলেও বিজ্ঞের নিকট উহাতে বেশ সামঞ্জস্য আছে। কোনও স্বদেশপ্রাণ পরহিতরত মহাত্মার মরণে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার, বৃদ্ধি ব্যতীত সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়না। স্বদেশবৎসল ব্যক্তি মৃত্যুর পরই স্বদেশবৎসল বলিয়া পরিচিত হন। কেবল ফল দ্বারাই কর্ম্মের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অন্য কোনও রূপে উহার মর্ম্মবোধ হয় না। মহাপুরুষ বিবেকানন্দ যে কর্ম্ম আপনার প্রতিভূরূপে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও বীজভাব অতিক্রম করে নাই। সময়ে ঐ বীজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব্ব অমৃতফল প্রসব করিবে। যাহাতে সমস্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে। এই মহাপুরুষের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া চমকিত বিস্মিত এবং অলৌকিক স্বাধীনতা-পূর্ণকার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া স্তম্ভিত আশ্বস্ত, আর স্বদেশ-স্বজাতির প্রতি অত্য-ধিক অনুরাগ চিন্তা করিয়া আনন্দে গৌরবে প্রাণ পুলকিত ও প্রেমে ভক্তিতে হৃদয় বিগলিত হয়। বিবেকানন্দ উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্তপরিবারের সন্তান হইলেও শিক্ষায় সম্পদে তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন না। জাতীয়ধর্ম্মভাবের প্রবল প্রবাহ তাঁহার প্রাণের উপর ভাগীরথীর পূত

ধারার ন্যায় বহিতেছিল, জাতীয়ভাবের সাগর-সঙ্গমে তাঁহার প্রাণটীও সেই তরঙ্গে আপন রঙ্গে অপার আনন্দে ছুটিল। ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী অবিশ্রান্তগমনে গন্তব্য-সমীপে উপস্থিত হইল। হিমালয় হইতে কুমারিকা বিরাট্ ভারতবর্ষের প্রতি স্থানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে পৃথক্ নামে পরিচিত হইয়া পদচারী গৈরিকধারী কম্বলসম্বল বিবেকানন্দ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ভারতের সকলধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মূল-ভিত্তি কি? ভারতীয়-ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন-সত্তা কি? এই বিষম-সমস্যার বিপুল-গবেষণায় তিনি যে পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসমিতিতে সমগ্র সভ্য-জগৎ তাহার সুচারু-পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। তাঁহার প্রদর্শিত-ভিত্তির নিকট অপর সকল দেশের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিই অদৃঢ় অমার্জ্জিত এবং অল্প মূল্য ইহা সভ্য-জগৎ অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিবেকানন্দের জীবনে ইহাই প্রথম সাধনা এবং বর্ত্তমান ভারতের ইহাই প্রধান সাধনা। ঈশ্বর বিশ্বাস এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও ব্যক্তিগত স্বাধীন মত ছিল না। উত্তুঙ্গ-পর্ব্বতের তুহিনসঙ্কুল-স্থল হইতে যেমন নানাদিকে নানা নদ নদী প্রবাহ ছুটিতে থাকে, অথচ কাহারও বিরোধ নাই, সকলেই আপন আপন অধিকারে থাকিয়া গন্তব্যের দিকে চলিয়া যাইতেছে, তদ্রূপ একই মহাপুরুষের নিকট হইতে হিন্দু-ধর্ম্মের বিভিন্নরূপ শক্তিগুলি ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইত, অথচ পরস্পর বিরোধ সম্পর্ক নাই, স্ব স্ব অধিকারে সকলেরই সমান মূল্য, সকলেরই লক্ষ্যস্থির, সকলের মধ্যেই যেন এক অলক্ষ্য সামঞ্জস্য বিরাজমান। তাঁহার অনেক বক্তব্য আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও নিপুণ-পর্য্যালোচনায় বিশেষচিন্তায় উহার অভ্যন্তরে যৌক্তিকতা এবং মৌলিক একতা দর্শন করিয়া অনেক পাশ্চাত্যদেশীয় বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইতেন। বিবেকানন্দ কখনও কপোলকল্পিত যুক্তি-জাল ও কূটতর্করাশির সমাবেশ করিয়া স্বমত পোষণ করিতেন না। তিনি বিরুদ্ধ-বাদীর যুক্তিতর্ক বা বিশ্বাস সিংহবেগে আক্রমণ করিতেন, যখন পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী স্বপক্ষরক্ষণে অক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক উপদেশ প্রার্থনা করিত, তখন উপনিষদের গভীর রহস্য বেদান্তের অমূল্য-তত্ত্ব বলিয়া দিতেন, ইহাপেক্ষা অন্যরূপ ধর্ম্ম উপদেশ বা শিক্ষা তাঁহার নিকট পাওয়া যাইত না। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে একদিন বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমি পুণ্য-পুঞ্জ পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের প্রাণের প্রিয় পরমপবিত্র উপনিষদের মহাসত্য ব্যতীত আর কিছু শিখি নাই বা জানি না।" বিবেকানন্দ বলিতেন, "ভারত ধর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মে—এদেশের বা এজাতির অধিকার স্বাভাবিক। যদি পাশ্চাত্য-দেশের সহিত এই প্রাচ্যভূখণ্ডের কোনরূপ ধর্ম্মবিষয়ক সম্বন্ধ কখনও থাকে, তবে তাহা এই ভারত আচার্য্য পাশ্চাত্যদেশ শিষ্য, ভারত আদর্শ পাশ্চাত্যদেশ অনুকারী, চিরদিন

শিক্ষক, পাশ্চাত্যদেশ শিষ্য, ভারত সেবা পাশ্চাত্য-দেশ সেবক।” ভারতবাসীর ইহাই সান্ত্বনা, মহাত্মা বিবেকানন্দের জীবনেই ঐ সকল দৈববাণী সফলতা লাভ করিয়াছে। ভারতের উন্নতি ধর্ম্মে “এই কথা তাঁহার মুখে সকলেই শুনিতেন। তিনি বলিতেন “ভারত পশুবলে বলীয়ান্ ছিলনা, ধর্ম্মবলই ভারতের চিরসম্বল, ভারত কখনও পাশ্চাত্যের স্থূল-উন্নতির অনুকরণে শান্তি পাইবে না, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের অক্ষয়কবচ উহাই ভারতের চরম আশ্রয়।” চপলাবার্ত্তায় কি বাষ্পীয়-যন্ত্রে ভারত উন্নত বা আদর্শ হইতে পারে না, ধর্ম্মবলেই জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রকৃত উন্নতির ভাজন হইতে পারে। অকৃতকার্য্যতা কি, তাহা তিনি নিজ জীবনে কোন সঙ্কীর্ণ-মুহূর্ত্তেও কোনও প্রসঙ্গে উপলব্ধি করিয়া যান নাই। শঙ্কা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। পরাধীনতার কদর্থনা কিরূপ, তাহা তিনি অণুমাত্রও মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহার পাশ্চাত্যপ্রদেশীয় বন্ধুগণ প্রতিপদেই লক্ষ্য করিতে পারিতেন যে, সত্যপ্রচারে তিনি রাজশক্তির নিকটও ক্ষণকালের জন্য মস্তক অবনত করেন নাই। জাতি, কুল, পাণ্ডিত্য এবং ধন-গৌরবের প্রতি তিনি কখনও সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। কর্ত্তব্যপালনে তিনি এতই নিবিষ্ট হইতেন যে, তাঁহার বিদেশীয় স্নেহাস্পদ শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি ও সহানুভূতিপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। তাঁহার বিদেশীয়-ভক্তগণ অনেক সময় তাঁহার স্বদেশ স্বধর্ম্ম প্রেমের প্রবলতার পক্ষপাতে তীব্র অপ্রিয়ভাবে সমালোচিত হইয়া মর্ম্মাহত ও খিন্ন হইত, কিন্তু তাঁহার অলোকসামান্য-প্রতিভার নিকট আপনা হইতেই নতমস্তক হইয়া যেন কোনও অনিবার্য্য অনির্দ্দেশ্য কারণে সকল ভুলিয়া যাইত। স্বদেশের প্রতি অসাধারণ সহানুভূতিবশে তিনি বিদেশীয়ের গুণ গৌরব অপেক্ষা স্বদেশীয়ের দোষ বা অসম্পূর্ণতাকে ও উচ্চাসন প্রদান করিতেন। ভারতবর্ষ জগতের কোনও অংশে ন্যূন বা অনুন্নত এ ধারণা তাঁহার মনের শত হস্ত দূরে স্থান পাইত না। পাশ্চাত্যদেশের এমন অনেক মহাত্মার নাম করা যাইতে পারে যাঁহারা বিবেকানন্দের অতুল গরিমায় অসীম মহিমায় আকৃষ্ট হইয়, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় রাজোপচারে আজীবন সেই দেশে রাখিয়া সেবা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা বিবেকানন্দের হৃদয়ে স্বদেশের কোটী কোটী ভ্রাতার দুঃখদারিদ্র্য অনুন্নতির বিষমচিন্তার প্রবল-তুফান বহিতেছিল তিনি পাশ্চাত্যের বিলাস-ঝটিকার কুসুম-সুবাসে মৃদুমধুর-মলয়-হিল্লোলে বিমল নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় নীরবে নিরাবিলচিত্তে কাল কাটাইতে পারিলেন না। জন্মভূমি-জননীর কোটী কণ্ঠের ক্রন্দন অসীম আর্ত্তনাদ অনবরত তাঁহার হৃদয়ের তারে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভাগীরথী তীরে বেলুড়মঠে অরণ্যচরবৃত্তির্য গুহাতি প্রতি:বশী লইয়া সহকারিগণও এবং শিষ্যদল সঙ্গে লইয়া স্বদেশের ভবিষ্যত চিন্তা এবং শিষ্যক

মণ্ডলীর পরিণতি বিবেচনায় তিনি প্রায় শেষ জীবনের পঞ্চনবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছেন।✓ বিদেশের স্বদেশের বহুপ্রাজ্ঞ তত্ত্বানুসন্ধিৎসুব্যক্তি তাঁহার সহিত ও উপদেশ-প্রার্থনায় আগমন করিতেন। নানা প্রসঙ্গে নানা ভাব-তরঙ্গে সকলেই বিভোর হইতেন, সকলেই যেন এক ঐন্দ্রজালিক-শক্তি-বলে আত্মহারা হইতেন। আনন্দের প্রবাহ, প্রীতির পরাকাষ্ঠা তৃপ্তির প্লাবন দেখা দিত। বহির্ভাব পরিত্যাগ করিয়া আভ্যন্তর-ভাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইত, স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়ে সেই পুরাতনস্বদেশের ভবিষ্যতসমস্যা ভিন্ন আর কোনও উদ্বেল-ভাব নাই। তাঁহার চিন্তা যেস্থানে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তাহাতে তিনি দেখিতেন "ভারতের ভবিষ্যগগন অতুল আলোকময় সজ্জিত। ভারতের ভবিষ্যত মঙ্গলময় আনন্দময়!" তিনি বলিতেন, "ভারত কাহারও নিকট প্রত্যাশা বা প্রার্থনা করে না। ভারতের জাতীয়-জীবন আপনা আপনি অসংখ্য-বাধা অতিক্রম করিয়া ক্রমে প্রবলতা লাভপূর্ব্বক মহানদীর ন্যায় সাগর সঙ্গম প্রাপ্ত হইবে। যদি কোনও বিদেশীয়-জাতি ভারতের হিতার্থে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত হন, তবে সে অযাচিত-দান তাঁহাদেরই মহত্ত্বের পরিচয়, ভারত জগতের কাছে সহানুভূতি চায় না।" বিবেকানন্দ ভারতীয়-ভাবের সমষ্টি ছিলেন। বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মগধ, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ কর্ণাট, রাজপুতনা, মহারাষ্ট্র যে প্রদেশে যখন তিনি যাইতেন, সে প্রদেশবাসীরা তাঁহাকে সেই প্রদেশবাসী বলিয়া মনে করিত। যদি ভারতের সকল বিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব ও সংস্কার এক শরীরে একত্রিত করিয়া সঞ্জীবন-মন্ত্র-বলে জীবিত করা যায়, তবে বোধ হয় বিবেকানন্দের প্রতিরূপ পাওয়া যায়। সকল প্রদেশের সর্ব্ববিধ সংস্কার বা ধারণার প্রতি তাঁহার সমান সহানুভূতি ছিল। বঙ্গীয়ভাবের সঙ্কীর্ণতা তাঁহার সার্ব্বভৌমতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই। স্বার্থ ত্যাগের আদর্শস্তরে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিতেন "ত্যাগই সার্ব্বজনীন-উন্নতির উপায়। বুদ্ধদেবের ত্যাগ শিক্ষায় সহস্রাধিকবর্ষ মধ্যে সমগ্র ভারত এক বিশাল-সাম্রাজ্যে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। ত্যাগ সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। আশা-কশাঘাতে কামনার চঞ্চল-অঞ্চল ধরিয়া ছুটাছুটি করিয়া কেহ কখনও শান্তির অধিকারী হইতে পারে নাই। ত্যাগই শান্তি, ত্যাগই বিশ্রাম।" এই সত্য এই মহাত্মার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যশের আশা তাঁহার সম্মুখে যাইতেও লজ্জিত হইত। তিনি আত্ম-প্রশংসারূপ পঙ্ক স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। অন্যান্য গুরুভাইদের অপেক্ষা তাঁহার শক্তি সামর্থ যে বিন্দুমাত্র ও বেশী ছিল, একথা স্বপ্নেও তাঁহার মুখে কেহ শুনিতে পায় নাই। তিনি পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। গুরুর শিক্ষা দীক্ষায় লক্ষ্য স্থাপন করিয়া তিনিও পবিত্র জীবনোপভোগ করিয়া গিয়াছেন। শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট সময় সময় বলিতেন 'কামিনী

কাঞ্চনের প্রবঞ্চনা এড়াইয়া যশের আশা-শূন্য হইয়া যেন কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের পথে পদচারণ করিয়া মরিতে পারি।" যে সময় তিনি জগতীতলে অবতীর্ণ হন, সে দিন ভারতের বড় দুর্দ্দিন। ভারতের হতভাগ্য-সন্তানগণ যে দিন সঞ্চিত অমূল্য পৈতৃক-ধনে অতুল বেদ বেদান্ত-জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া পথভ্রমে বিড়ম্বনার বিলাস-বনে উপনীত হইতে ছিলেন, সেই সময় বিবেকানন্দ প্রাচীন পবিত্র আদর্শ আনিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলেন, ভারতের জাতীয়-জীবন তখন খণ্ডশঃ বিভক্ত হইতে ছিল দেখিয়াও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। ধৈর্য্য, ত্যাগ, কর্ত্তব্য পরতার উচ্চ আদর্শ তাঁহার অন্তঃকরণে নিহিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য এবং তাঁহার উপদেশ পরিচালিত কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ বঙ্গের আর এক অতুল-গৌরব-প্রদীপ্ত-প্রতিভার অনুকারী ছিলেন আমরা স্বর্গীয় গুণসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাই-স্বরায় মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়াও সেই স্বভাবসিদ্ধ স্বদেশীয়-বেশ সামান্য ধুতি চাদর পরিধান করিয়াই গমন করিতেন। তাহাতে কদাচিৎ অসুবিধার কারণ হইলে বলিয়াছিলেন "আমাকে ডাকিলে আমি এই ভাবেই আসিব, এভাবে অসুবিধাবোধ হইলে আমাকে ডাকা কেন?" বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য-দেশের সুসভ্য কুবেরকুলের নিকট নিজের গৈরিক-বসনে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া কোনও সময় ঐ প্রকার প্রত্যুত্তর দিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য-দেশীয় শিষ্য সমূহের মধ্যে ভারতীয় ভাব প্রচলনে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন "যদি তোমরা ভারতকে ভাল বাসিতে চাও, ভারত যেমন আছে, তাহাকে তেমনি রাখিয়া ভালবাসিতে হইবে। ভারতকে হ্যাট কোট পরাইয়া কাঁটা চামচ ধরাইয়া টুল টেবিলে বসাইয়া বিদেশীয়-বেশে বিদেশীয়-ব্যবহারে বিকৃত সাজাইয়া ভালবাসিতে চাও, তবে তোমরা প্রকৃত পক্ষে ভারতকে ভালবাসিতে চাও না।" তাঁহার বিদেশীয় ভক্তগণ শক্তিমতে ভারতের আচার ব্যবহার প্রথা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা তাঁহার উপদেশের অতুল সম্মান। ভারতের অনুন্নত সাধারণের উন্নয়ন বিবেকানন্দের জীবনের মহাব্রত ছিল। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী হিতৈষণাসংকল্পই তাঁহাকে ঐরূপ মহদুদ্দেশ্যের সন্নিহিত করিয়াছিল। তাঁহার এবং তাঁহার সহকারী সতীর্থ সম্প্রদায়ের সমবেত যত্নের ফল শ্রীরামকৃষ্ণমিশন ঐ উদ্দেশ্যেই কার্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। বিবেকানন্দ যে সমদর্শিতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ইহার একটী প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ না করিয়া পারিলাম না। একদা আমেরিকার কোনও প্রখ্যাতনামা ধনীর ভবনে বিবেকানন্দ অতিথি হয়েন, ভারতের নয়নে বিবেকানন্দের প্রতিভাপূর্ণ-মুখমণ্ডল সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক হইলেও আমেরিকা সেই ধনি-সন্তানের নিকট তিনি নিগ্রোরূপে বিবেচিত হন। নিগ্রোকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিতে সভ্যতা ও অভিজাত্যাভি-

স্বামী ধানমুণ্ড সঙ্কুচিত হইলেন। নিগ্রো-ভ্রমে বিবেকানন্দের আতিথ্য প্রত্যাখ্যাত হইল। তিনি যথেচ্ছ যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিন পরে ঐ ব্যক্তি বিবেকানন্দের গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া সযত্নে তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া যান, এবং জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয় আমি যখন ভ্রমক্রমে আপনাকে নিগ্রো বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, তখন আপনি কেন বলিলেন না যে, আমি নিগ্রো নহি।" বিবেকানন্দের সরল সুহাস সুপ্রকাশ বদনে ধ্বনিত হইল "ঐরূপ বলিলে যে আমার নিগ্রোভ্রাতাকে অঙ্গীকার করা হয়না। পাঠক মহোদয়। আমি নিগ্রো নহি বলিলে সর্বজন ভ্রাতৃভাব সর্বত্র আমিত্বের সুপসার ও সঙ্কীর্ণ হয়, নিগ্রোভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব অঙ্গীকার করা হয়না ইহাই বিবেকানন্দের অভিপ্রায়। নিগ্রোকেও যদি ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন না করা যায়, তবে সাম্য বৈষম্যে পরিণত হয়, ইহাতে মহাপুরুষ প্রকৃতই বাথিত হইতেন। ইহাপেক্ষা সার্ব্বজনীন সমদর্শনের দৃষ্টান্ত আর সুলভে মিলিবে কি? বিবেকানন্দের মুখে সর্ব্বদা বিষ্ণু, শিব, হরি, কালী, নারায়ণ মধুসূদন ইত্যাদি দেবনাম এবং শঙ্কর বুদ্ধ নানক গুরুগোবিন্দ ইত্যাদি ধর্ম্মাচার্য্যগণের নাম শুনা যাইত। বিবেকানন্দ ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের সর্ব্ববিধ আচার ব্যবহারই বেশ স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন এবং প্রত্যেকটীরই সম্মান করিতেন। হিন্দুশাস্ত্র তাঁহার নিকট অতি উচ্চ পূজা পাইত। একদা কোনও সাহেব তাঁহার নিকট হিন্দুর পুরাণ প্রসঙ্গের নিন্দা করেন, প্রত্যুত্তরে বিবেকানন্দ বাইবেলের বহুল গলদ উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিষদন্ত বেশ সুকৌশলে ধ্বাপিত করেন। পক্ষান্তরে বেদ এবং উপনিষদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, যদি সহস্র সহস্র বৎসর দোষানুসন্ধান ও অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলেও এই মূল্যবান্ বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র স্থান চ্যুত হইবে না যে, বেদ উপনিষদের সহিত বাইবেলের তুলনাই হইতে পারে না। বেদ উপনিষদের উচ্চভাব ধারণা করিতে পারিলে বাইবেলের উপর বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বীতশ্রদ্ধ হইতে বাধ্য হইবেন। পুরাণের পবিত্রতা এবং মৌলিকতাসম্বন্ধেও তিনি অশেষবিধ আবশ্যকীয় উপদেশদ্বারা সাহেবের গর্ব্বজাত বর্ব্বরতার সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছিলেন। সংস্কৃতকে দেববাণী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। সংস্কৃতের আলোচনায় অধ্যাপনায় তাঁহার একাদৃশ অনুরাগ ছিল যে, চরম দিনেও তিনি ৩ ঘণ্টা পাণিনীয় ব্যাকরণের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অতীতের আঙ্কাদিতে জগতের বিশাল-কুক্ষিতে তাঁহার অতুল কার্য্যাবলী সংরক্ষিত রহিয়াছে। তিনি জীবনে স্বাধীন শান্ত পবিত্র ছিলেন, মরণেও সেইভাবে দেদীপ্যমান! ভারত-সন্তান! তোমার অগ্রগামী উন্নতিকামী বিবেকানন্দ তোমাকে বাণী দিয়া গেলেন, তুমি কি তাহার সদ্ব্যবহার করিবে না? তুমি কি গুণের আদর, জ্ঞানের মর্ম্ম, ধর্ম্মের মহিমা, কর্ম্মের গরিমা বুঝিবে না? তুমি স্বর্গত-বিবেকানন্দের পূত-দেহের পবিত্র-ভস্ম বিভূতিরূপে

ললাটে লেপন কর, আর তাঁহার পরিত্যক্ত গৈরিকবসনে জাতীয় নিশান নির্ম্মাণ করিয়া সাদরে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হও। আলস্য ঔদাস্য করিলে বুঝিব, তুমি বিবেকানন্দের সহোদর হইবার অযোগ্য এবং । বিবেকানন্দের প্রতি সমাজ-সাধারণের স্নেহ বা সহানুভূতি সমান ছিল না, থাকিতেও পারে না। গীতাপ্রবর্ত্তক জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্রের আলোক সকলের হৃদয়ে সমান প্রতিবিম্বিত হয় নাই। শঙ্করাবতার শঙ্করদেবের চারুচরিত্রচিত্র সকলের নিকট সমানরূপে গৃহীত হয় নাই, ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম। মহাযোগী মহেশ্বরকেও কেহ পিশাচ, কেহ পাগল, কেহ লম্পট, কেহ কপট, কেহ বা সত্যশিবসুন্দর বলিয়া আসিতেছে। ভাবিয়া দেখিলে, পাগলামীতে ও শিবত্বে বেশ সুন্দর স্বাভাবিক-সামঞ্জস্য আছে। যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা বিবেকানন্দের সম্বন্ধেও আমরা সেরূপ সামঞ্জস্যের অসদ্ভাব দেখি না। নিন্দুকের নির্দ্দয়-আক্রমণ, সহৃদয়ের সহজ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষীর অশেষ শুভ-শংসন কিছুতেই তাঁহার স্বরূপের বিরূপতা ঘটিবেনা। বিবেকানন্দের অসাধারণত্ব ধারণা করিতে পারিলে এবং অলৌকিক কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, কেহই বোধ হয় তাঁহার প্রতি প্রবলতর পক্ষপাত-পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ—বিবেকানন্দ সম্ভ্রান্ত বংশীয়, সঙ্গীত-বিদ্যায় সুশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী ব্যক্তি ছিলেন। যে যৌবনে কদর্য্য-বাসনায় জীবমাত্রকেই কদর্থিত করে, সেই নব যৌবনের ললিত লাবণ্য শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় যাঁহার সকল শরীরে তরঙ্গায়িত, যৌবনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ বিলাস-পিপাসা ক্রমশঃ পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে ; বিদ্যা, বয়স, রূপ, যাঁহার নিকট সম্মিলিত হইয়াছে, কামিনী-কাঞ্চন-যশঃ যাঁহার করতলগত, সেই যুবক ভোগ-সঙ্গ-রঙ্গ দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া, খ্যাতি প্রতিপত্তি-প্রত্যাশা বিদায় দিয়া, সন্ন্যাসাবলম্বন করিলেন, ইহা কি অসাধারণতা নহে ? এ সন্ন্যাস, কদর্য্য স্বার্থবশে নহে, কুকার্য্য-গোপনমানসে নহে, তাড়নায় বিড়ম্বনায় নহে, জরাজীর্ণ-দেহে নহে, কর্ত্তব্যজ্ঞানে—ধর্ম্মপ্রাণতায় ; ইহাও কি উন্নত আদর্শ নহে ? দ্বিতীয়তঃ--বাল্যাবধি স্নেহের ক্রোড়ে লালিত, এমন কি পথ-কষ্ট পর্য্যন্তও অনুভব না করিয়া, সন্ন্যাসের পর হিমাচলের গুহা-মন্দিরে, বিশাল প্রান্তরে, মরুভূমির অভ্যন্তরে নিঃসম্বল অবস্থান এবং পাদচারে সমগ্র-ভারত পর্য্যটন ও এই ভ্রমণ সময়ে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মের মৌলিকতা অনুসন্ধান, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র-পাণিনীয় ব্যাকরণ এবং বেদ-বেদান্তাদিশাস্ত্রের অধ্যয়ন, এ সকল কি কিছুই অসাধারণতার পরিচয় নয়? তৃতীয়তঃ—চিকাগোর ধর্ম্ম-মহামেলায় সমস্ত দেশের সকল ধর্ম্মপ্রতিনিধির সমাগম সত্ত্বেও, যে ভারত জড়োপাসকজ্ঞানে অবজ্ঞাত হইয়াছিল এবং আহূতও হয় নাই, সেই ভারতের কৃষ্ণকায় অজ্ঞাতনামা অশ্রুতকীর্ত্তি গৈরিকধারী যুবক সন্ন্যাসী, চিকাগো-মেলায় প্রাণপণ পরিশ্রমপ্রাপ্ত দশ মিনিট বক্তৃতাবসরে

জগৎ বিচলিত করিতে পারিয়াছিলেন! যেন কোনও মহাসত্তা তাঁহাকে বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি এবং সহস্র বদনের কথন-শক্তি এক মুখে প্রদান করিয়াছিলেন! কেবল যে সে বক্তৃতা চপলা-চমকের মত একবার বিস্ময় উৎপাদন করিয়া চলিয়া গেল, তাহা নহে, এখনও তাহা সমগ্র সভ্য-জগতে পূজিত হইতেছে! ইঁহাকে কি মহাপুরুষ বলিব না? "বিগতগর্ব্ব হীনসর্ব্বস্ব দুর্ব্বল ভারত কেবল এক ধর্ম্মবলেই জগতে অতুলনীয় জগতের গুরু;" নব্যসভ্যতার শীর্ষস্থানীয় মার্কিণে জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে যে ব্যক্তি ইহা দেখাইয়া দিলেন, তিনি কি শ্রদ্ধার অযোগ্যপাত্র? চিকাগো-মেলায় ভারতীয় মুটে মুজুর মিঠাইওয়ালাও যাঁহার তেজস্বিতায়, আমেরিকার অভিজাত গণ্য মান্যগণের নিকট আদর ও একত্র ভোজনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তিনি কি স্বদেশবৎসল মহাত্মা নহেন? সভ্যতা-ভিমানী মার্কিণজন যাঁহার মাহাত্ম্যে উচ্চাসন ত্যাগ করিয়া ভূমিতে বসিয়া, হস্তদ্বারা, ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত নিরামিষ-ভোজ্য গ্রহণ করিয়া, ভারতের শিষ্যত্ব প্রচার করিতেছে, সেই মহাত্মা কি অসাধারণ নহেন? প্রার্থনা করিতে যিনি জানিতেন না, তাঁহার চরিত্রও কি জাতীয়-আদর্শরূপে গৃহীত হইবার অযোগ্য? ভারতের হিতকল্পে, ভারত জগতে গণ্য হউক, এই আশা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, যে মহাত্মা উহা অনেকাংশে সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহার কালিফর্ণিয়ার বেদান্ত-মঠে সহকারি সন্ন্যাসিগণ এখনও ভারত আমেরিকার ধর্ম্মগুরু হইবার যোগ্য, এই সত্য প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত করিতেছেন, তিনি কি ভারতের প্রত্যেকের মাননীয় নহেন? ভাবিলে মনে হয়—'যেন বিবেকানন্দের জীবনই ভারতের ভবিষ্যবেদ!" বিবেকানন্দ কর্ম্মবীর ছিলেন; কর্ম্মেই তাঁহার পর্য্যবসান, ফলের ভার ভগবানের হাতে। আমরা অভাবের অভাবনীয়-পীড়নে দণ্ডিত হইয়া সন্তপ্ত-প্রাণে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, যেন বিবেকানন্দের পবিত্র আত্মা পরম শান্তি-সরোবরের রাজহংস-রূপে বিরাজ করিতে পারেন। ওঁ শান্তিঃ॥

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ভারতী।

অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্।

(মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন-বিরচিতম্)

(১)

ত্বৎপাদকিঙ্করসমোঽস্ত্যমরোঽপি নিত্যং
যৎ সর্ব্বশংকৃতিগুণৈ স্ত্বয়ি শঙ্করীত্বম্।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

জীবের মঙ্গল কর সকল সময়,
তাই মা! শঙ্করী-নামে তব পরিচয়!
একারণ ত্রিসংসারে যত দেবগণ
তোমার শ্রীপদে নিত্য ভৃত্যের মতন।
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ,
তাই ওমা অন্নপূর্ণে! এই নিবেদন,—

কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা !

(২)

সৃষ্ট্যাদিকালসমবস্থতয়া স্বমাদ্যা
ত্বাং মাতরং জগুরতোঽপি পিতামহাদ্যাঃ।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

কিবা সৃষ্টি স্থিতি, কিবা প্রলয়ের কালে
সমভাবে থাক তুমি এই ভূমণ্ডলে।
তাই মা গো ! বিধি-বিষ্ণু-আদি দেবগণ
"মা" বলিয়া তোমাকেই করে সম্বোধন।
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ
তাই ওমা অন্নপূর্ণে ! এই নিবেদন,—
কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা—
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা !

(৩)

ঈশোঽপি যৎ তব করাম্বুজভোজনার্থী
ব্যক্তির্ন তৎ ত্বদপরা ক্বচিদন্নদাত্রী।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

জীবের জীবন রক্ষা করিবার তরে
তোমা বিনা অন্নদাত্রী কে আছে সংসারে ?
তুমি নিজ হস্তে দিলে আহার তুলিয়া
তবেই শিবের তৃপ্তি আহার করিয়া !
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ
তাই ওমা অন্নপূর্ণে ! এই নিবেদন,—
কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা !

(৪)

কৈলাসমুজ্ঝিতবতী বসসীহ নিত্যং
দীনেষু যৎ তব সদৈব দয়ার্দ্রচিত্তম্।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

এ সংসারে যেই জন দীন-হীন অতি।
তোমার পরম কৃপা সদা তার প্রতি।
এ কারণ তুমি মা গো ! ছাড়িয়া কৈলাস
পুণ্যময় কাশীধামে থাক বার মাস !
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ,
তাই ওমা অন্নপূর্ণে ! এই নিবেদন,—
কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা !

(৫)

আকীটমাশিবমশেষজনেষু শক্তি—
র্যাসৌ ত্বমেব তব এব সদা সভক্তি।
আরাধয়ন্ত্যপি সুরা জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

কীট হ'তে মহেশ্বর পর্য্যন্ত সকলে
তোমারি শক্তিতে শক্তি ধরে ভূমণ্ডলে !
তাই মা গো ! ভক্তি ভরে দেবতা সকল
আরাধনা করে তব চরণ-কমল !
ওমা অন্নপূর্ণে ! তুমি ত্রিলোক-শরণ,
এ দাসের মনোবাঞ্ছা কর মা পূরণ !

(৬)

ইচ্ছামি নাপরপদং ন চ কল্পবৃক্ষং
সংকাময়ে জননি তাবকপাদযুগ্মম্।
নিঃশ্রেয়সাস্তকফলানি চতুর্ব্বিধানি
শ্রীপাদপাদপগতস্য ন দুর্ল্লভানি॥

কিবা অন্য পদ, কিবা কল্পতরু আর,
কিছুই না চাই মা গো ! কভু একবার।
একমাত্র সেই তব চরণ-কমল,
আমার আরাধ্য বস্তু, জানি অবিরল।
তোমার শ্রীপাদ-তরু-তলে যেই জন

আশ্রয় লইয়া মা গো! রহে সর্ব্বক্ষণ,
অতি ভাগ্যবান্ ভবে সে জন কেবল,
মুষ্টির ভিতর তার চতুর্ব্বর্গ-ফল!

(৭)

হে মাতরত্বদুদিতান্যখিলস্য যানি
সর্ব্বাণি সন্তি চ ভবন্বিদিতানি তানি।
অভ্যাসদোষবশগেন কৃতার্থনায়াং
বাচালতৈতদপরাধমুমে ক্ষমস্ব॥

হৃদয়ের ব্যথা যত হৃদয়ে রাখিয়া
ক্রন্দন করুক জীব গোপন করিয়া,
তোমার নিকট কিছু নহে অগোচর,
সকলি জানিছ মা গো! তুমি নিরন্তর!
যা কিছু বাচালতা-ভাবে করিনু প্রার্থনা,
সেই বাচালতা-দোষ কর মা মার্জ্জনা!

(৮)

গায়ন্তি কেচন জনা গিরিরাজপুত্রীং
দক্ষোদ্ভবাঞ্চ ভবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্।
রাখালদাস ইদমেব চ বেত্তি তত্ত্বং
মাতা ত্বমেব জগতাং জগদীশ্বরী ত্বম্॥

একমাত্র তুমি ভব-দুঃখ-বিনাশিনী,
কত লোক কত কথা কিন্তু বলে শুনি,—
কেহ বলে তুমি মাগো! হিমালয় সুতা,
কেহ বলে তুমি মাগো! দক্ষের দুহিতা।
অজ্ঞান রাখাল-দাস সন্তান তোমার,
মনে বুঝিয়াছে কিন্তু এই কথা সার,—
তুমিই ত্রিলোক-মাতা, ত্রিলোক-ঈশ্বরী,
এ তত্ত্ব পরম সত্য চিরদিন ধরি!

(৯)

চক্রুশ্চ যে বহুষু জন্মসু যোগযুক্তা
ভক্ত্যা চ মুক্তিরহিতা তব সাধনানি।
হে সর্ব্বশক্তিময়ি! বাল্যমনোজ্ঞমূর্ত্তিং
ধৃত্বা স্বয়ং সমকরোস্তদভীষ্টপূর্ত্তিম্

ত্রিলোক ঈশ্বরী তুমি ত্রিলোকের মাতা,
তোঁরে না সম্ভবে মাগো! গর্ভবাস-ব্যথা!
ভোগসুখ বিসর্জ্জিয়া বহু জন্ম ধ'রে
যেবা কন্যারূপে পেতে আরাধনা করে,
মধুর-মনোজ্ঞ-রূপে বালিকা সাজিয়া
ভোলাও তাহার মন "মা" ব'লে ডাকিয়া।
পূরাও ভক্তের মনে অভিলাষ যেবা,
সর্ব্বশক্তিময়ি! তোর অসম্ভব কিবা?

( )

হে সর্ব্বগে শতসমাঃ সততং তপোভি—
র্যা নির্ম্মলত্বমগমৎ ত্বয়ি সানুরাগা।
তদ্গর্ভদর্পণ নিজ প্রতিবিম্ব মাত্রং
সন্দর্শ্য মাতরখিলস্য কৃতার্থিতা সা॥

শত শত জন্ম ধ'রে আরাধি সতত
চির তরে মলিনতা যার অপগত,
তুমি তার গর্ভ-রূপ-দর্পণ মাঝারে
নিজ প্রতিবিম্ব দিয়া ধন্য কর তারে।
হে সর্ব্বগে! সর্ব্বভূতে বিহার তোমার,
গর্ভে নেহারিলে তোরে কি বৈচিত্র্য তার?

(১১)

মঞ্চে বিরিঞ্চিমুখদেববরাঃ শিরঃস্থে
মুদ্রার্দ্ধমুদ্রিতদৃশস্তব সাধনানি।
কুর্ব্বন্তি কিন্তু গতিহীনসুতে জনন্যা
নিত্যং কৃপাস্থিতিরিতি প্রণতিং গৃহাণ॥

বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর মস্তক উপরি
ধরি তব সিংহাসন রাজরাজেশ্বরি!
অর্দ্ধ নিমীলিত-নেত্রে করেন সাধন,
আমি কিন্তু মূঢ়মতি, অতি অভাজন।

তা ব'লে নিগ্রহ যেন না হয় তোমার,
গতিহীন. সুতে সদা করুণা মাতার!
দাসের প্রণতি মাগো! করহ গ্রহণ,
শ্রীচরণে এই ভিক্ষা মাগে অকিঞ্চন!

(১২)

স্মৃত্বা সমাধিসুরথাচরিতং ভবত্যাঃ
শ্রীপাদপঙ্কজযুগং ত্রিজগৎসুসারম্।
নিশ্চিত্য মাতরধুনা শরণাগতোঽস্মি
ত্বৎকিঙ্করস্য তু কুরুষ তবোচিতং যৎ॥

সমাধি সুরথ আদি যত ভক্ত জন,
সে সবার ইতিহাস করে আলোচন,
জননি গো! এই জ্ঞান হ'য়েছে আমার
শ্রীপাদ-পঙ্কজ তব জগতের সার।
সেই পাদ-পদ্ম তব করেছি শরণ,
যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি কর মা! এখন।

(১৩)

ত্বয্যেব বিশ্বজননি ত্রিজগৎ প্রভুত্বং
ভৃত্যা বয়ন্তু ভবদঙ্ঘ্রিযুগস্য নিত্যম্।
ইত্থং চিরাবগতি খণ্ডনপণ্ডিতানাং
নাদ্বৈতবাদগহনং বয়মাশ্রয়ামঃ॥

ত্রিলোক-জননি তুমি ত্রিলোক-ঈশ্বরী—
আর সবে তব পদে কিঙ্কর কিঙ্করী।
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাহি জানে দাস,
জন্মে জন্মে থাক্ এই পবিত্র-বিশ্বাস।
"সবাই পরম ব্রহ্ম" এ পাপ কথন
"অদ্বৈত বচনে" ঘোষে যে পণ্ডিত জন,
তাদের সে তর্ক-রূপ-গহন ভিতরে
যেন মা! জীবাত্মা মোর কভু না বিচরে!

(১৪)

চিরং ধ্যাত্বা ধাত্রাদিকতনুমংশৈরবয়বৈ—
র্ভবন্তে কল্যাণং তব তু করুণৈবাদ্ভুতকরী।
ত্বদঙ্গানাং পীঠস্থলগকিয়দংশার্চ্চনবশা—
দসীমং ক্ষেমং স্যাৎ সকলমনুজে দক্ষ-
তনুজে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যেবা আছে আর,
পরম কঠিন মা গো! সেবা সে সবার।
মনে মনে সর্ব্ব অঙ্গ করিয়া গঠন,
সুন্দর সাজায়ে তাঁরে শাস্ত্রের মতন,
বহুকাল সেইরূপ করে যদি ধ্যান,
তবে ত পাইবে লোক অশেষ কল্যাণ
কিন্তু কি কল্যাণময়ী তুমি ওগো উমা,
বিচিত্র নেহারি ভবে তোমার মহিমা!
পুণ্যময় কত শত শত পীঠস্থানে
মা! তোর অঙ্গুলি নখ যা আছে যেখানে,
সেই ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র করিলে অর্চ্চন
কি মঙ্গল নাহি লভে ভবে ভক্ত জন?

(১৫)

গীতো যঃ প্রথয়াঽক্ষপাদ ইতি যঃ খ্যাতঃ
কণাদাখ্যয়া
যুঞ্জানেন চ তদ্বয়েন মুনিনা জীবাত্মনাং
ব্রহ্মণা।
পার্থক্যং প্রতিপাদিতং স্ববচনৈর্বেদানিরু-
দ্ধার্থকৈ—
র্মাতস্ত্বৎপদদাসতা ময়ি ততঃ সিদ্ধেতি
তৃপ্তং মনঃ॥

মহাযোগী,—যোগবলে এই ত্রিভুবন
তন্ন তন্ন করি যাঁরা করিত দর্শন,
বেদের বিরুদ্ধ বাণী মুখে না আনিত,
নাহি ছিল ভ্রান্তি, নাহি লোকে প্রতারিত,
সে সর্ব্বজ্ঞ অক্ষপাদ, সর্ব্বজ্ঞ কণাদ,
ঘুচায়ে দিয়াছে মা গো! দাসের বিষাদ,

দার্শনিক-ঋষি-বাক্যে বুঝেছি মা! বেদ,
জীবাত্মা পরাত্মা দোঁহে আছয়ে প্রভেদ।
করুক যতই তর্ক তর্কপটু জন,
প্রভু ভৃত্য এক বস্তু হয় না কখন্?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ,
২৬। ২ বৃন্দাবন পালের লেন।
শ্যামবাজার। কলিকাতা।

এস মা!

(দুর্গোৎসবে—"আগমনী")

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

বর্ষা-বারি-স্নাত শরৎ আগত,
সাজায়ে কুসুম সাজীতে।
ওমা দুর্গে! তব শ্রীপদ-পল্লব
মনসাধে পুন পূজিতে।

তবে—

এস দুর্গে! এস, শ্রীমণ্ডপে বস,
"দশভুজা" রূপ ধরি।
আজি বর্ষ-পরে, সাজি হর্ষভরে,
ও রূপ দর্শন করি।
দশ হস্তে কিবা দশ অস্ত্র-বিভা!
ঝলমল দশদিশি!
বাণী বামপাশে, দক্ষিণে শ্রী হাসে;
ধনে জ্ঞানে মিশামিশি!

গুহ-গজানন দুদিকে দুজন,
সিদ্ধি ও শূরত্ব সাজে।
বল-নিদর্শন শ্রীপদ-বাহন
চতুষ্পদরাজ রাজে।
অসুর সুশাক্ত, শক্ররূপী ভক্ত,
শক্তি-শেল সহে বুকে;
দেবী-পদস্পর্শে হিয়া হাসে হর্ষে,
বাহিরে ভ্রুকুটি মুখে!
অপরূপ রূপে— দশভুজা-রূপে
সর্ব্বরূপ সুবিকীর্ণ।
সেবিতে সে রূপ, ভাবে ভব-ভূপ
সিংহরূপে অবতীর্ণ!
মতান্তরে বলে, শক্তি-পদতলে
মহাবিষ্ণু হন হরি;
বিচিত্র কি তা'তে? পঞ্চ-ঈশ-মাথে
রাজে রাজরাজেশ্বরী!
পুরুষে প্রকৃতি গুণ-ক্রিয়াবতী,
পুরুষ অগুণাক্রিয়;
অতএব হন পুরুষ পরম
শক্তির বাহন স্বীয়।
ষড়দরশন শুভসম্মিলন
দশভুজা-রূপে হয়,—
শ্রুতি-স্মৃতি-বিধি, তন্ত্র-পুরাণাদি—
সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়!
সর্ব্বতত্ত্ব-সার রূপে মা তোমার,
সর্ব্ব-দৃষ্টি সমাকৃষ্ট।
সর্ব্বানন্দময়, সর্ব্বশুভোদয়,
সর্ব্বসিদ্ধি সমাবিষ্ট!
কিবা!
বাণী-বীণা-তানে শুভ বেদ-গানে,
বিমোহিত বিশ্বসৃষ্টি!

সুসম্পদরাশি বৃষ্টি করে হাসি
কমলার কৃপাবৃষ্টি!
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি, গুহ গোত্র-বৃদ্ধি-
বিধান-নিদান হন।
আপনি শঙ্কর সর্ব্বশুভঙ্কর,
স্বরূপে অরূপে র'ন!
এ রূপ সেবনে ভজনে স্তবনে,
সর্ব্বদেব সুকৃতার্থ।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, যক্ষ-বিদ্যাধর,
নাগ নর চরিতার্থ!
হেন আয়োজন, লীলা-প্রয়োজনে,
এস লীলাময়ী মাগো!
নিদ্রাভঙ্গে রঙ্গে, সাঙ্গোপাঙ্গ-সঙ্গে
বঙ্গের বোধনে জাগো।
হেন আয়োজনে, ভক্তি-নিমন্ত্রণে,
মহাশক্তি! এস তবে।
ভক্ত একজন মর্ত্ত্যে যদি র'ন,
তবু মা! আসিতে হবে।
মোরা কুসন্তান, নাই ভক্তি-জ্ঞান;
তাই হেন শক্তিহীন।
শোকে দুঃখে রোগে, দুর্ভিক্ষে দুর্ভোগে,
ধ্বংসপুর-সম্মুখীন!
দুর্গোৎসব যার সর্ব্বোৎসব-সার,
তবু এ দুর্গতি তার!
ভক্তি-বহির্মুখ ভজন-হুজুক
ভস্মে ঘৃতাহুতি সার।
তাই মা কাতরে, আজি বর্ষ-পরে,
যাচি পুন পদার্পণ।
চাবনা এবার শ্রীপদে তোমার,
ভক্তি ভিন্ন অন্য ধন।
দুঃখ-রোগ-শোক যত হয় হোক্,
পাই যদি ভক্তি-বিন্দু,
পাব সব হবে, সব দুঃখ যাবে,
উথলিবে সুখসিন্ধু।
এ সব উৎসব পাবে প্রাণ নব,
শক্তি-ভক্তি-সমুদ্ভবে;
সংস্রাব্দ পরে পুনঃ বঙ্গ-ঘরে
সত্য দুর্গোৎসব হবে!

ওমা!

হয়োনা কৃপণা সে অমৃত-কণা
দিতে মৃত সুতগণে।
কুপুত্রই হয়, কুমাতা ত নয়,
জানে মা! জগৎ-জনে।
কৃপা যদি কর, কি না দিতে পার?
নিজে যে মা! তুমি শক্তি।
স্বর্গ-মোক্ষ ছার! কৃপায় তোমার
লভে জীবে কৃষ্ণভক্তি।
তোমারি সাধনে, লভি কৃষ্ণধনে,
গোপী পিয়ে প্রেমামৃত।
তোমারেই ভজি, হরি-প্রেমে মজি,
হর হরি-সম্মিলিত!
সর্ব্বসিদ্ধি-শক্তি— পেতে তব ভক্তি,
যে প্রার্থনা প্রাণগতা,
অপূর্ণ কি রবে? তুমি যে মা! ভবে
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পলতা!
এস গো মা! তবে এ মনোমণ্ডপে,
বস মা! করুণাভরে।
করিতে পূজন, কিছু আয়োজন
নাই মা! এ শূন্য ঘরে।
নাহি সাজ সজ্জা, নাহি তাহে লজ্জা;
সজ্জা পায় লজ্জা রূপে!
ও রূপ-কিরণে, নিরুপকরণে,
পদে দিব প্রাণ সঁপে।

এস মা! এবার সম্বল সেবার—
কেবল নয়ন-বারি ;
কিছু নাই আর, এস মা! এবার—
জলে জলে পূজা সারি।

যে ছেলে আদরে যা দেয় মা তোরে,
তাই সে মা! তুই নিস্।
যা'ই মা যাহার আশার আহার,
তাই মা! তাহারে দিস্!

মাগো!

তাই আশাভরে, কাতরে মা তোরে
চাই দেখা দিন তিন।
এ ত্রিদিন স্মরি, কত কষ্টে হরি
তিনশ বাষট্টি দিন।
বিষাদ-বিকারে, থাকি অন্ধকারে,
সারাটি বছর ভরে'।
ত্রিদিন পুলকে রহি মা আলোকে,
ও পদ-নখেন্দু-করে!

দুঃখে বক্ষ ফাটে, কত কষ্টে কাটে
ঊনদিনত্রয় বর্ষ।
তব শুভোদয়ে, এ সুদিনত্রয়ে,
ধরায় ধরেনা হর্ষ!

এবার আবার কি ভাগ্য অপার।
তিনদিনে চারিদিন!*
পেলাম প্রশ্রয়, বুঝি পদাশ্রয়
পাবে নিরাশ্রয় দীন।
তাই মা! আহ্বানি, উর হর-রাণি!
পূর অবনীর আশ।
এ সুখ-শরতে, এস মা ভারতে,
মরতের মহোল্লাস!
এস মা শঙ্করি! সর্ব্বশুভঙ্করি!
কিঙ্করে করুণা করি।

এস জগদম্বে! জগদবলম্বে!
অবিলম্বে অবতরি।
অকৃতী সন্তানে মাতৃস্নেহ দানে
মাতৃভক্তি দেহ শিক্ষা।
এস মা! অন্তরে, থেকনা অন্তরে,
অন্তরের এই ভিক্ষা॥

শ্রীশঃ—

* তিথিরহস্য-বশে এবার এই ১৩০৯ বঙ্গাব্দে, আশ্বিনের ২২ শে, ২৩ শে, ২৪শে, ও ২৫ শে, এই চারিদিন দুর্গোৎসব। (হিং সঃ)

——:০:—

৯ম বর্ষ। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ। ৭ম, ৮ম সংখ্যা।

১৮২৪, ১৩০৯।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৪।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

জাতিভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(৩১) "মহাভারতেও জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক সদ্বিচার দৃষ্ট হয়। শান্তি পর্ব্বের ১৮৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—"রক্তবর্ণ দ্বিজেরা ভোগবিলাসী, তেজস্বী, ক্রোধী, হঠকারী, বৈদিক আচার-ভ্রষ্ট হইয়া অবশেষে ক্ষাত্রয় শ্রেণীভুক্ত হইল। লোহিত বর্ণ দ্বিজেরা গোচারণ ও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ এবং বৈদিক আচার পরিত্যাগ করাতে বৈশ্য-শ্রেণীভুক্ত হইল। কৃষ্ণবর্ণ, অশুচি, মিথ্যা-বাদী ও ক্রূরস্বভাব লোভী দ্বিজেরা নীচ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিত; তাহারা শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত হইল। এইরূপে গুণানুসারে জাতিভেদ হওয়াতে, দ্বিজেরা নানা জাতিভুক্ত হইলেন।" মহাভারতের সময়ে কয়েক জন পুরোহিত ও রাজন্য ভিন্ন অপর সকলেই এক বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। কায়স্থ, বৈদ্য, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তৈলিক, তামুলি প্রভৃতি স্বতন্ত্র জাতি ছিলনা, এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যেরা সকলেই বেদপাঠ ও স্বহস্তে যজ্ঞাদি সম্পাদন এবং গৃহ্যাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারিত। পুরোহিতদের বেদে একাধিপত্য এবং বৈশ্যদের নানা জাতিতে বিভাগ, এই সকল আধুনিক পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি।"*

(৩২) "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১। ১৬ এবং ২। ১৭) যে অব্রাহ্মণোক্ত ব্যক্তি (ব্রাহ্মণ নয়, এমন ব্যক্তি) যাজন করিতে পারিত, তাহার প্রমাণ আছে। উক্ত ব্রাহ্মণের অপর অংশে (৭। ২৯) দেখা যাইতেছে যে, জন্মে ব্রাহ্মণ না হইয়াও লোকে গুণবলে ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত। কোন যজ্ঞে ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট ভাগ ক্ষত্রিয় ভোজন করিতে পাইলে, তাঁহার সন্তানেরা

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত। সি, আই, ই।

ব্রাহ্মণ গুণবিশিষ্ট হইয়া প্রতিগ্রহসমর্থ, সোম-পিপাসু, ক্ষুধার্ত্ত, সর্ব্বত্রগামী হইতেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব জন্মিত। কোন ক্ষত্রিয় যজ্ঞে বৈশ্যের অংশ ভোজন করিলে, তদ্বংশীয়েরা বৈশ্য গুণোপেত হইয়া জন্মিত, এবং রাজাকে কর প্রদান করিত, এবং তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ বৈশ্য জাতির উপযুক্ত হইত। যদি যজ্ঞে ক্ষত্রিয় শূদ্রের অংশ গ্রহণ করিত, তবে তাহার সন্তানেরা শূদ্র-গুণোপেত হইয়া জন্মিত। তাহারা পরের সেবা করিত এবং প্রভুর ইচ্ছানুসারে তাড়িত ও প্রহারিত হইত। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাহারা শূদ্র-শ্রেণীর যোগ্য হইত।"*

(৩৩) বিদেহরাজ রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত উপনিষদ্-তত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মহা আনন্দিত হইয়া রাজাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহাতে জনক কহিলেন "আমি যাহা অভিলাষ করিতেছি, আমাকে তাহা প্রদান করুন।" তদবধি জনক ব্রাহ্মণ হইলেন।†

(৩৪) ব্রাহ্মণকুলে না জন্মিয়াও অনেকে বিদ্যাবলে এবং যশঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। জনক তাহার একটী অন্যতম উদাহরণ। এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। 'দ্যূতক্রীড়াসক্ত, দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ আমাদের মধ্যে আসিয়া যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইবে'—এই বলিয়া ঋষিগণ ইলূষের পুত্র কাকষকে যজ্ঞীয় ভূমি হইতে অপমানিত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতাগণ কাকষকে জানিতেন এবং কাকষও দেবতাদিগকে জানিতেন; তাই কাকষ ঋষি মধ্যে গণ্য হইলেন।*

(৩৫) পূর্ব্বকালে সত্যপ্রিয়তা ও বিদ্যাবত্তার উপরেই যে ব্রাহ্মণত্ব-লাভ অনেকাংশে নির্ভর করিত, তাহা সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান হইতেই জানিতে পারা যায়। এই উপাখ্যানটী অতিশয় চিত্তরঞ্জক; তাই পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।*

জাবালার পুত্র সত্যকাম একদিন মাতাকে কহিল "মা! আমি ব্রহ্মচারী হইব। কোন্ বংশে আমার জন্ম?" মাতা সে কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন "আমি তোমায় গর্ভে ধরিয়া, যৌবনেই দাসীরূপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতাম; কাহার ঔরসে যে তোমার জন্ম, তাহা আমি জানি না। তোমার নাম সত্যকাম, আমার নাম জবালা। তুমি এখন হইতে "সত্যকাম জাবাল" বলিয়া আত্মপরিচয় দিও।"

সত্যকাম গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী হইবার বাসনা জানাইল; কিন্তু গৌতমকর্ত্তৃক বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইয়া, সত্যকাম মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই বলিল। সত্যকামের সত্যনিষ্ঠায় হরিদ্রুমত গৌতম মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত। সি, আই, ই।
† শতপথ ব্রাহ্মণ।

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।
* ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ৪র্থ অধ্যায়, ৪।৫।৬।৭।৮।৯খণ্ড।

"তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপত্বা নেষে ন সত্যাদগা" ...." ইত্যাদি।

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ ভিন্ন এমন করিয়া আর কেহ সত্য কথা বলিতে পারে না। তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব।" সেই অবধি সত্যকাম ব্রাহ্মণ হইল।

(৩৬) ক্ষত্রিয় পুরুর বংশ সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত রহিয়াছে। এক স্থানে আছে,—"এই বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছেন, অনেক রাজর্ষি এই বংশকে পবিত্র করিয়াছেন।" কলিযুগে ক্ষেমকের পর এই বংশ লোপ পাইবে।*

(৩৭) অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—"এই বংশে গর্গের জন্ম। গর্গ হইতে সিবির জন্ম। তাঁহা হইতে গার্গ্য ও সৈন্দের জন্ম। গার্গ্য ও সৈন্যেরা ক্ষত্রিয়গুণবিশিষ্ট হইয়াও অবশেষে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন †

(৩৮) গর্গের ভ্রাতা মহাবীরের তিন পৌত্র—ত্রয্যারুণ, পুষ্করি এবং কপি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন †

(৩৯) আমরা মৎস্য পুরাণে ৯১জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু সেই পুরাণের ১৩২ অধ্যায়ে আবার লিখিত আছে "এই ৯১ জন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঋক্‌সমূহ প্রণীত বা সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন; তাঁহারা ঋষিকদিগের সন্তান; ঋষিকেরা বৈদিক ঋষিদিগের সন্তান। শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ভলন্দশ্চৈব বন্দশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
তে চ মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়াঃ বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা।
ইত্যেক নবতিঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রাঃযৈশ্চ বহিষ্কৃতঃ॥"*

(৪০) অণু পুরুর ভ্রাতা। অণুর বংশেই বলির জন্ম। মৎস্য পুরাণে এবং বায়ু পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বলি রাজাই সর্ব্বপ্রথমে চারি জাতি বা চারি বর্ণের নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। হরিবংশের ৩১ অধ্যায়েও এই কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৪১) এক বর্ণভুক্ত ব্যক্তির বর্ণান্তরপ্রাপ্তির প্রমাণাদি পূর্ব্বেও একবার প্রদত্ত হইয়াছে।

"শূদ্রে চৈত ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো নচ ব্রাহ্মণঃ॥†"

ব্রাহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি কেহ শূদ্রের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে শূদ্ররূপে পরিগণিত হইবে, এবং যদি কেহ শূদ্রবংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(৪২) "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"*

* বিষ্ণুপুরাণ।
† বিষ্ণুপুরাণ।

* মৎস্যপুরাণ।
† মহাভারত।
* মনুসংহিতা।

যে সকল দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নবান হয়, তাহারা জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

(৪৩) ক্ষত্রিয় হইতে অপর বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। আমরা তাহার দুই একটী এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

'ধৃষ্টাদ্ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ'*

মনুর পুত্র ধৃষ্ট, তাহা হইতেই ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি হয়। ধার্ষ্টগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন

(৪৪) রাজা অম্বরীষের পুত্র বিরূপ, বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, তাঁহার পুত্র রথীতর ক্ষত্রিয়—অথচ অঙ্গিরস বলিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা হয়।†

(৪৫) আমরা নিম্নে বিন অনুষ্ঠানে একজন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ হইবার উপাখ্যান সংক্ষেপে দিতেছি:—

বীতহব্যের পুত্রগণ কাশীরাজ দিবোদাসকে আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে কাশীরাজের আত্মীয়গণ প্রাণত্যাগ করেন। রাজা দিবোদাস ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ভরদ্বাজ দিবোদাসের জন্য এক যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে প্রতর্দ্দন নামে দিবোদাসের এক পুত্র জন্মিল। যথাকালে প্রতর্দ্দন পিতা কর্ত্তৃক বীতহব্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। বীতহব্য পলায়ন করিয়া মহর্ষি ভৃগুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতর্দ্দন তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে দেখাইয়া দিতে বলিলেন। ভৃগু মিথ্যা করিয়া বলিলেন, 'এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই।' প্রতর্দ্দন প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ভৃগুর কথায় ক্ষত্রিয় বীতহব্য সেই অবধি ব্রাহ্মণ হইলেন।

(৪৬) ভগবান মনুর দৌহিত্র পুরূরবা। বিষ্ণুপুরাণ মতে, এই পুরূরবার পুত্র আয়ু। আয়ুর পঞ্চ পুত্র মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ একজন। এই ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র শুনহোত্র। শুনহোত্রের তিন পুত্র—কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদ হইতে চতুর্ব্বর্ণ-প্রবর্ত্তয়িতা শৌনক জন্ম গ্রহণ করেন।

'পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥'*

(৪৭) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও এইরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে লিখিত আছে, গৃৎসমদের পুত্র শুনক। এই শুনক হইতে শৌনিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতি জন্মিয়াছিল।

(৪৮) 'বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতেহঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেহথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।'

বৎস হইতে বৎসভূমি এবং ভার্গব হইতে ভার্গভূমি। ভার্গবের বংশে অঙ্গিরস-পুত্রগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ জন্ম গ্রহণ করেন।

(৪৯) পুরাণাদির মতে আয়ুর পুত্র রাজা নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, তাঁহার পুত্র অণু। অণু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ

* শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২।১৭

† বিষ্ণুপুরাণ ৪।২

* হরিবংশ। ২৯ অধ্যায়

বলি। বিষ্ণুপুরাণের মতে, এই বলির পত্নীর গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই পঞ্চ পুত্র জন্মে। ইহারা বালের ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণের মতে সেই রাজা বলি হইতেই চারি বর্ণ উৎপন্ন হয়।

পৌরাণিক শাস্ত্র হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিতে চাহিনা, এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেরূপ স্থানও নাই। তবে এইরূপ উদাহরণের সীমা নাই। পুরাণাদি অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে *

(৫০) যদিও মনুর পূর্ব্বে আমরা সংকীর্ণ বর্ণের আর তেমন উল্লেখ দেখিতে পাই না ; কিন্তু পুরাকালে 'পঞ্চমবর্ণ'ও যে শিক্ষা, চরিত্র, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতির জন্য যথারীতি পূজিত হইত, তাহারও প্রমাণ আছে—

'There is evidence to show, that in early times there were Panchamas distinguished for their genius, learning and piety, and their names are venerated by the Hindus up to the present day. If tradition may be believed, Valmiki, the author of the Ramayana, which is considered to be the first and certainly one of the finest epic poems in Sanskrit, is said to have been a Panchama. This tradition is supported by the Padma purana and Jnana Vasishtha, both of which are regarded as words of authority by learned Brahmins. The immortal author of Kural, known as Tiruvalluvar and Tiruppanlyalwar, one of the twelve saints worshipped by the Vaishnava community, are both supposed to have been men of Panchama origin. Marner Numbiyar, a disciple of Yamunacharya, one of the greatest Vaishnava scholar saints of antiquity, though a Panchama by birth, received all the high funeral honors of a Brahman saint on his death.'*

(৫১) 'Neither birth, nor study, nor learning constitutes Brahmanhood ; character alone constitutes it.†

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি, এ।

৺স্বামী বিবেকানন্দ।

বঙ্গের সুকীর্ত্তিমান সুসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সেই নবোদীয়মান মূর্ত্তিমান প্রতিভা আজ অকাল-অস্তমিত।

* হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ।

* "The condition of low castes"—by K. Ramanu achari, Esq., M. A, B. L., Principal, Maharaja's college. Vizianagram.

† মহাভারত। বনপর্ব্ব, ৩১৩। ১০৮
c. f. মহাভারত, বেদব্যাস ১৮৮ অধ্যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের এই অকাল-কাল-প্রাপ্তিতে আজ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ পর্যন্ত শোক-স্পৃষ্ট। ফলে "অকালমৃত্যু" কথাটা লৌকিক বিচারের কথা মাত্র। যে কোন কালের মৃত্যুই সেই মৃতের পক্ষে কাল-মৃত্যু। অকালে মহাসংহারিণী সাংঘাতিকতাও অনায়াসে অতিক্রান্ত হয়; কিন্তু কালে অতি তুর্লক্ষ্য সামান্য সূত্রেও অলক্ষ্যে জীবন-সূত্র ছিন্ন হয়।

"নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদ্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
ছিন্নকুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥"

অর্থাৎ—

অকালে না মরে যদি বিঁধে শত শরে।
কালপূর্ণ হলে ছিন্ন কুশাগ্রেও মরে॥

কে ভাবিয়াছিল যে, এত শীঘ্র এই পৃথিবী-প্রখ্যাত নামকীর্ত্তিমান ধর্ম্মপ্রচারক পরলোকপ্রাপ্ত হইবেন? কোন উৎকৃষ্ট অভিনেতা জন-রঞ্জন অভিনয় করিতেছে যদি অকস্মাৎ কোন অপরিহার্য্য কারণে সূত্রধার কর্ত্তৃক নেপথ্যে আহূত হন, তবে সেই আকস্মিক অভিনয়-ভঙ্গের অনিবার্য্য-হেতুত্ব-বোধাভাবে দর্শকমণ্ডলীতে যেমন বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, স্বামী বিবেকানন্দের এই আকস্মিক তিরোধানে অস্মদ্দেশে অনেকের অন্তরে সম্ভবতঃ সেই ভাব লাগিয়াছে। অবশ্য পরলোকগত স্বামীজীর সম্বন্ধে সকলের অভিমত সমান নহে; আর তাহা হওয়াও অসম্ভব। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই নিন্দকের অভাব নাই। আজ যাঁহার গীতার সর্ব্বজাতি-নির্ব্বিশেষে জগদ্ব্যাপী গৌরব, তাঁহারই সেই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়ী মহালীলা বিষয়ে আজিও এই ভারতেই শত মতভেদ বর্ত্তমান। এ হেন পরম-প্রেমাবতার অকলঙ্ক চন্দ্র গৌরচন্দ্রের চরিত্র-চন্দ্রিকাও অনেকের হৃদয়ান্ধকূপে প্রবিষ্ট হইতেছে না! তবে বিবেকানন্দ আর কোন্ ছার? অতএব বিবেকানন্দের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে সহস্র মতভেদ থাকিলেও, তিনি যে অন্ততঃ একজন সুপণ্ডিত, সুবক্তা, সুলেখক ও সুপ্রতিভাবান শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত। পাশ্চাত্য ভূমে তাঁহার ন্যায় সুগৌরব-সমাদর লাভ অতি অল্প ভারতবাসীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় ও স্বনামধন্য কেশব চন্দ্র সেন ইউরোপে 'বাঙ্গালী' নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের—বিশেষতঃ বেদান্তবিদ্যার বা ব্রহ্মবিদ্যার অপূর্ব্ব তত্ত্বব্যাখ্যায় যুগপৎ ইউরোপ ও আমেরিকাকে এরূপ বিস্মিত ও বিমোহিত করিতে বিবেকানন্দের ন্যায় কেহই কৃত-কার্য্য হয়েন নাই। আজ নিত্য-নবোন্নতি-বিলাসী—সর্ব্বোন্নতিগ্রাসাভিলাষী মার্কিন-সমাজে আমাদের দরিদ্র বিবেকানন্দ বেদান্ত-তত্ত্ব চর্চ্চার তুমুল তরঙ্গ তুলিয়া, নবধর্ম্মোন্নতির যে উদ্যম উৎসারিত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তাহা কাল-ক্রোড়-পোষণে কালে কি আকার ধারণ করিবে, কে জানে? সে তরঙ্গ আজ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মস্তিষ্ক তরঙ্গায়িত করিতেছে।

চিকাগোর সেই সর্ব্বধর্ম্ম-সমালোচনী মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সেই পাশ্চাত্য-চিত্ত-চমৎকারিণী বক্তৃতা আমরা মুদ্রিত পুস্তিকায় পাঠ করিয়াছি; তাহা বাস্তবিকই এক অভিনব মৌলিকতাময়ী, অথচ সার্ব্বজ-

শাস্ত্রানুসারিণী এবং অধ্যাত্মজ্ঞানানুরাগিগণের বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহিণী। তারপর ইংলণ্ড এবং মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নস্থানে তিনি যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক জানিবার, শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় ছিল। অপর, স্বামী বিবেকানন্দ অত্যল্প কাল মধ্যে যে কতিপয় গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে মূল্যবান সম্পত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তাঁহারই অভিভাবকতায় উদ্ভূত ও পরিচালিত "উদ্বোধন" নামক সাময়িক পত্রটিও বেশ চলিয়াছিল। আশা করি, তাঁহার শিক্ষিত সতীর্থ ও সহকারিগণের সম্যক্ সাত্ত্বিক যত্ন থাকিলে, এখনও উহা ভাল চলিতে পারিবে। বিবেকানন্দ আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই প্রতিভা ও মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত "রামকৃষ্ণ মিসন্" এখনও আমাদিগের আশাস্থল। আশা করি, বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত অথচ সমুজ্জ্বল জীবনের সুমহান্ উদ্দেশ্যের অনুসরণেই রামকৃষ্ণ-মিসনের কার্য্য চলিবে।

আমাদের বোধহয়, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, ভারতের সেই লুপ্ত গুপ্ত প্রাচীন বেদান্তবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুদ্ধার ও প্রচারণ; দ্বিতীয়, উন্নততম আধ্যাত্মিক আদর্শে ভারতীয় জাতিসাধারণের সমুন্নয়ন; এবং তৃতীয়, পাশ্চাত্য প্রদেশে ভারতের ধর্ম্ম-গুরুত্ব প্রতিষ্ঠাপন। বেদান্ত—বেদের অন্ত, বেদের শেষভাগ; অর্থাৎ বেদান্ত বা উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ বা সার ভাগ। "বেদোঽখিলং ধর্ম্মমূলম্।" বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল। এই মূলেরই সর্ব্বশেষ-পরিণতি বেদান্তামৃত-ফল। যে বেদান্তবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার বলে ভারত একদিন জগৎ-গুরুত্ব পদ লাভ করিয়াছিল; যে ব্রহ্ম-বিদ্যার অবনয়নে আজ ভারতের এই অত্যবনতি; এবং যে ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুন্নয়নেই কেবল ভারতের পুনরুন্নয়নের আশা, সেই ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্তবিদ্যার পুনঃসঞ্জীবন সুসাধ্য, দুঃসাধ্য বা অসাধ্যই হউক, বিবেকানন্দের জীবন তৎসঙ্কল্পেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

তারপর, বর্ত্তমান ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সৎশিক্ষা প্রচারের একদেশদর্শিতার পরিবর্ত্তে স্বাধিকারানুযায়ী সর্ব্বসাধারণে তৎপ্রচারই বিবেকানন্দের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝিয়া, অনেকে হয়ত তাঁহাকে হিন্দুসমাজ-বিপ্লাবক ভাবিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সামাজিক বিপ্লব না ঘটাইয়া, ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যকর ভাবে যেরূপ সংস্করণ বা পরিবর্ত্তন সমাজোন্নয়নার্থ আবশ্যক, তাহাই তাঁহার উদ্দিষ্ট ও কর্ত্তব্যক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি অংশ্য জগদাচার্য্য ব্রাহ্মণ জাতির অবনয়ন-অভিলাষী ছিলেন না। ব্রাহ্মণ আপন অধিকারে উন্নতই থাকুন, বরং আত্মসংস্কার পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবনতির প্রতীকার করুন; শূদ্রত্ব ও পাতিত্য হইতে আত্মরক্ষা করুন; আর সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রাদিও ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে আত্মগঠন পূর্ব্বক উন্নত হউন; বিবেকানন্দের তাহাই আশা। গুণ, জ্ঞান, সদাচার, এই তিন লইয়াই সভ্যতা। অতএব

সত্যতাই মনুষ্যত্বের মূলধন। এই মূলধন কেবল কতিপয় "ভদ্র" আখ্যাধারী সম্প্রদায়-বিশেষে চিরনিবদ্ধ না থাকিয়া, অধিকার-ভেদে আচণ্ডাল সর্ব্বজাতি-সাধারণেতেই বিতরিত হউক, ইহাই বিবেকানন্দের উদার উদ্দেশ্য বা অভিমত।

সৃষ্টি ক্রমোন্নতিশীল; মানব মাত্রেই মুক্তির অধিকারী। অতএব অবনতের উন্নয়ন বিপ্লবের কারণ নহে; উহা স্বাভাবিক। কিন্তু উন্নতের অবনয়নই জগতের সর্ব্ব-বিপ্লবের হেতু। অতীতসাক্ষী ইতিহাসের কুক্ষিতে ইহার শত উদাহরণ সুরক্ষিত। যাহাহউক, সাধারণতঃ লৌকিক নিয়মেও দেখা যায় যে, অজ্ঞান জ্ঞানী হইলে, দরিদ্র ধনী হইলে বা রোগী সুস্থ হইলে, তাহাতে কোন সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয় না; কিন্তু ধনী দরিদ্র হইয়া পড়িলে, জ্ঞানী জ্ঞানভ্রষ্ট বা সুস্থ রোগগ্রস্ত হইলেই যত বিপদ-বিপ্লব-বিড়ম্বনা ঘটে। ব্রাহ্মণ শূদ্রত্বে অবনত হইলেই সমাজের অনিষ্ট; কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণত্বে উন্নত হইলে, তাহাতে সমাজের বিশিষ্ট ইষ্টই হইবার কথা। অতএব ব্রাহ্মণাদি স্বপদে স্বপথে থাকুন, শূদ্রাদিও ব্রাহ্মণাদির আদর্শে আত্মোন্নয়ন সাধনে যত্নবান হউন; এই নীতিসূত্রই বিবেকানন্দের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের নিয়ামক।

তারপর, আমাদের এই গতগর্ব্ব হত-সর্ব্ব অধঃপতিত ভারত আজ জগতের চক্ষে অপর সমস্ত বিষয়ে দীন হীন হইলেও, তথাপি একটি বিষয়ে ইহা আজিও ভূতলে অতুল। সেটি ইহার আধ্যাত্মিকতা রূপ অমূল্য সম্পদ। সাধারণ গ্রাম্য প্রবাদ-কথায় বলে "রাজার হাতী মলেও লাক্ টাকা" এ বিষয়ে সেই প্রবাদ প্রকৃষ্টরূপেই প্রমাণিত। ভারত এখনও আধ্যাত্মিকতায় মানবজাতির শিক্ষা-গুরুত্বের অধিকারী। এই অধিকার পৃথিবীর এই নবযুগে আবার পরিজ্ঞাত, প্রচারিত ও কার্য্যে পরিণত হউক, এতদিচ্ছাই বিবেকানন্দের সর্ব্বোদ্দেশ্যের সারতম তৃতীয় উদ্দেশ্য বা শেষ উদ্দেশ্যের জনয়িত্রী। অধুনা পাশ্চাত্য সমাজ হইতে ভারতের অনেক ঐহিকশিক্ষার আবশ্যকতা আছে, এবং তদ্ভিন্ন ভারতের এই নব-যুগানুসারী পুনরুন্নয়ন একান্তই অসম্ভব। কিন্তু পাশ্চাত্যভূমি ভারতকে আর তুচ্ছ না করিয়া, পরন্তু গুরু-গৌরবের চক্ষে দেখিলেই তাহার নিকট হইতে সে গুরু-দক্ষিণা অনায়াস-লভ্য হইতে পারে। এই জন্যই দরিদ্র বিবেকানন্দের বেদান্ত-বিদ্যালোকিত ক্ষুদ্র জীবনে বিশাল ও বিপুল আয়োজনের আশা জাগিয়াছিল। এই জন্যই চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভার সু-যোগ বুঝিয়া, সুযোগ্য বিবেকানন্দের ছুটিয়া আমেরিকায় গমন এবং ভগবৎকৃপায় তথায় আশাতীত সুকৃতকার্য্যতার ফলে তাঁহার সেই সুমহদুদ্দেশ্যের শুভ বীজবপন। এই জন্যই তাঁহার ইউরোপ-পরিভ্রমণ; ভারতের তীর্থপর্য্যটন; হিমালয়ের সাধু-সিদ্ধ-নিষেবিত দুর্গম প্রদেশ পরিদর্শন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যত্রয় সাধনার্থ তিনি ভারতে আবার সেই শঙ্করাচার্য্যের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রণালীর কালোপযোগীভাবে বেদান্ত-বিদ্যার বিস্তার ও তদর্থে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যার সু-

বিদ্বান সন্ন্যাসীমণ্ডলী-মণ্ডিত মঠস্থাপনাদি-রূপ কার্য্যক্ষেত্রে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অমিত উৎসাহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! বুঝি এই অভিশপ্ত দেশেরই দুর্ভাগ্য-দোষে এহেন ধর্ম্ম-ধীর ও কর্ম্ম-বীরের আকস্মিক তিরোধান হইল। আর তাইবা বলি কেন? প্রকৃতির রীতিই যেন এই। তৃণের স্খলন বা ওষধির ফলনের ন্যায় যাহার প্রতিভার শীঘ্র শীঘ্র অতি অভ্যুদয় হয়, তাহার শীঘ্র শীঘ্র অবসানও প্রায় অবশ্যম্ভাবী। ইহা আমাদেরই যুগযুগান্তরের পরীক্ষাপূত "ফলিত জ্যোতিষ" শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেই যেন পৃথিবীর অত্যল্পকালস্থায়ী অতিথি। যেন তাঁহারা পথ ভুলিয়া পৃথিবীতে আসিয়া, আবার শীঘ্রই সে ভ্রম সংশোধন করেন! সেই শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি হইতে আধুনিক রামকৃষ্ণ, কেশব চন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। অন্ততঃ এ দেশে ত প্রকৃতির এই নিয়মই দেখিতেছি। ভগবদিচ্ছায় আমাদের বিবেকানন্দও একটু অসাধারণত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন, অতএব তিনিই বা কিরূপে সে নিয়মের বহির্ভূত রহিবেন?

চিকাগোর সেই বিখ্যাত বক্তৃতার পূর্ব্বে আমাদের সেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের এই বিবেকানন্দত্ব কলিকাতায় কোন্ কোণে কয়জনে জানিত? কিন্তু চিকাগোর সেই কাণ্ডের পরে, এমন একজন শক্তিশালী বাঙ্গালী যে এতদিন স্বদেশে লুক্কায়িতপ্রায় থাকিয়া অকস্মাৎ ঐ দূরাতিদূর বিদেশে উদিত হইয়াছেন, ইহা বস্তুতঃ অনেকেরই বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল। বিবেকানন্দকে দেখিতে, তাঁহার কথা শুনিতে, তাঁহার শিক্ষা-সঙ্গ পাইতে অনেকেরই অন্তরে ঔৎসুক্যের উৎস ছুটিয়াছিল। তারপর, সেই বিবেকানন্দ দেশে ফিরিলেন। সেই সময়ে কলিকাতায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ মহালোকারণ্যের কৌতূহল-কোলাহলময়ী যে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, আমরা তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া, সে সমারোহ স্বচক্ষে দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্বাসিত ও উৎসাহিত হইয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে সেই বৃহচ্চক্ষু-বিভাসিত প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখচ্ছবি এত শীঘ্র কাল-যবনিকার অন্তরালে লুকাইবে। ফলে ভগবদিচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে; তাহাতে আর আক্ষেপের অপেক্ষা কি? তবে আমরা নাকি সংসার-মোহের দাস, তাই শোক-দুঃখ, দুরাশা-নিরাশা, সব আমাদেরই চিত্তের নিত্য ভোগ্য দণ্ড। বিবেকানন্দ চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সতীর্থ, সঙ্গী, সহকারী ও শিষ্যবর্গ; এবং তাঁহার সমর্থক, সহানুভাবক ও সাহায্য-কারকগণ ঈশ্বরেচ্ছা জানিয়াও নিরাশা ও নিরানন্দের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যাহাহউক, আশা করি, ভগবৎকৃপায় ক্রমে তাঁহাদের শোক-ভগ্ন ও নিরাশা-নিমগ্ন হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইবে; ক্রমে তাঁহারা তাঁহাদের সেই স্বর্গগত প্রিয় অধিনায়কের প্রদর্শিত পথে স্ব স্ব ধর্ম্ম, জ্ঞান, শিক্ষা ও সহৃদয়তার বলে অগ্র

লিত পাদক্ষেপে পুনরগ্রসর হইতে পারিবেন। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সুযোগ্য, সুবিদ্বান, সুপ্রতিভান্বিত ও সুধী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত; অতএব ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা বিবেকানন্দকে হারাইয়াও তাঁহাদের দিকে আশ্বাসিত চক্ষে চাহিতেছি।

আমাদের পরমধামগত পরমহংস শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য বলিয়াই বিবেকানন্দ পরিচিত। ফলে তিনি উক্ত পরমহংসদেবের নিকট রীতিমত কোন ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য বা সাধারণতঃ কৃপাশ্রিত জ্ঞানোপদিষ্ট শিষ্য, তাহা আমরা অবগত নহি; আর তদবগতির বিশেষ আবশ্যকতাও নাই। তবে যুবক বিবেকানন্দ যখন বালক নরেন্দ্রনাথ ছিলেন, তখনই তিনি পরমহংসদেবের বিশেষ স্নেহাশ্রয় লাভ করেন। তাঁহার বালক-কৃপাশ্রিতগণের মধ্যে নরেন্দ্রনাথই নাকি অগ্রগণ্য ছিলেন। যাহা-হউক, উক্ত মহাপুরুষের মহাশীর্ব্বাদ ও মহতী কৃপাশক্তি যে নরেন্দ্রনাথের এই বিবেকানন্দত্ব লাভের অন্ততঃ বিশিষ্ট হেতু, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। "মহৎ-কৃপা-লেশ" ভিন্ন সাধারণতঃ কেহই কোনরূপ অসাধারণতা লাভে অধিকারী হয় না। যাহা-হউক, বুঝি গুরু রামকৃষ্ণের বিরহ অধিক দিন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই, প্রিয়-শিষ্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহার চিরকুমার-জীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত ও আরব্ধ প্রিয় কার্য্য-নিচয় অসমাপ্ত ফেলিয়াই গুরু-চরণানুসরণ করিলেন। অতএব আমরা আশা করি, পরলোকে সেই গুরুকৃপা-বলেই আমাদের বিবেকানন্দের আত্মা বিশ্বগুরু শ্রীভগবানের শ্রীপদাশ্রয়ে চিরশান্তি লাভ করুন।

শ্রীশঃ—

জ্ঞান-কর্ম্ম-সমন্বয়। *

গীতাতে দ্বিবিধ বৈদিক ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠা এক; আর বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মনিষ্ঠা এক। ফলাভিসন্ধি সহিত যে কর্ম্মনিষ্ঠা, তাহা ঐ জ্ঞাননিষ্ঠার বিরোধী। তাহা ভিন্নপথগামী। আর ফলাভিসন্ধি-বর্জ্জিত ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান যে চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম, তাহাই ঐ ব্রহ্মবর্ত্মবাহী; কেননা, তাহা জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা ও জ্ঞানোৎপত্তির হেতু। কর্ম্মসন্ন্যাসী আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিও ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত ও

---

* বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠ স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় এত দিন দ্বারবঙ্গরাজের প্রধান মন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত থাকায়, ইদানীং সাহিত্য-সেবা-কার্য্যে কিছু অনবসরযুক্ত ছিলেন; অধুনা পেন্‌সিয়ন গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতায় অবস্থিত হইয়াছেন; অতএব এই অবসর-সুযোগে আমরা তাঁহার নিকট তাঁহার মহার্হ চিন্তা-উপহার যথাসম্ভব পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশা করি। যদিও এক্ষণে তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু অবশ্য জ্ঞান-বৃদ্ধও বটেন; সুতরাং সেই প্রাচীন পাকা-হাতের সমীচীন দান অধিকতর উপাদেয় ও উপকারী হইবে, সন্দেহ নাই। বিষয়-কার্য্যে অবসর গ্রহণের পর এই প্রথমেই তিনি হিন্দু-পত্রিকায় এই ক্ষুদ্র-প্রবন্ধ-রত্নটি উপহার দিয়াছেন। আমরা সাদরে উহা প্রকাশ করিলাম। আশা করি, হিন্দু পত্রিকার প্রতি চন্দ্রশেখর বাবুর এই সানুগ্রহ অভিভাবকতা অব্যাহত থাকিবে।

(হিঃ পঃ সঃ)

লোক-সংগ্রহচিকীর্ষু হইয়া কর্ম্ম করিবেন। তাদৃশ জ্ঞানীর কর্ম্মনিষ্ঠাও কেবল মাত্র জ্ঞানপরতা-হেতু ঐ একই ব্রহ্মপথ-বাহী। এই উভয় ফলত্যাগস্থলে কর্ম্ম মৃত, জ্ঞানই জীবিত। সুতরাং মৃত, জীবিত সমুচ্চিত অভিপ্রেত নহে।

এস্থলে অনেক ছিদ্র আছে; বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। যদি ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, আর হৃদয়ে ফলকামনা না থাকে, তবেই তো ফলাভিসন্ধি-বর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম করা যাইতে পারে; এবং তাহা হইতে ক্রমে আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে। আর আত্মজ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রহ-চিকীর্ষু হইয়া ঐরূপ ক্রিয়া করিতে পারেন। তাদৃশ উভয় অধিকারীরই মোক্ষ নিশ্চয়। কিন্তু ফলকামনা নাই, এমন লোক তো প্রায় দৃষ্ট হয় না। বরং ফলকামনা আছে, ঈশ্বরে ও দেবতাতে বিশ্বাস নাই, এমন লোক অনেক। আবার ক্রিয়া মানেনা, দেবতা মানেনা, প্রার্থনা মানেনা, অথচ এক নিরাকার ঈশ্বর মানে, এমন লোকও আছে। এই উভয় শ্রেণী পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক ফল লাভের যত্ন করেন। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরকে মানেন, প্রার্থনার ঔচিত্য স্বীকার করেন এবং হৃদয়ে ফলকামনাও অপার। স্বর্গ-লাভের কারণ প্রায় নহে; সাংসারিক সুবিধার কামনাই সব। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের নিকট সেই সব ফল চান। তজ্জন্য বন্ধু-বান্ধবে মিলিয়া প্রার্থনা করেন। আর কেহবা অপেক্ষাকৃত সুবিবেচনা সহকারে ঈশ্বরের নিকট ফল চাওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ করেন না। কিন্তু ফল অবশ্য চাই। অতএব তল্লাভ জন্য কেবল পুরুষকার অবলম্বন করেন। সার কথা এই যে, স্বর্গ-কামনাই হউক, সগুণ মুক্তির কামনাই হউক, সাংসারিক বিপদ্, আপৎ হইতে উদ্ধারের কামনাই হউক, এবং আপনার ও সন্তানাদি পরিবার বর্গের ও আত্মীয় স্বজনের আয়ু, আরোগ্য, বল, বুদ্ধি, সুখ, শান্তির কামনাই হউক,— এই সকল সুসিদ্ধির নিমিত্তই বৈদিক প্রবৃত্তিধর্ম্ম-বিধি কর্ম্মকাণ্ডের অভ্যুদয়। এ সমস্ত সত্ত্বে বিধিবিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। পুরুষকার-ফলে বঞ্চিত হইলেই সাধক দেবের ও দৈবানুষ্ঠানের শরণাপন্ন হন। যদি তাদৃশ পুরুষকার-বঞ্চিত ব্যক্তি, বেদবিহিত দেবতা ও দৈব-ক্রিয়া না মানেন, কিন্তু কেবল একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখেন, আর কেবল সেই ঈশ্বরের নিকট ফল চান, তবে তাদৃশ ঈশ্বর সেস্থলে কেবল ফলদাতা দেবতামাত্র। তথা ক্রিয়ার সহিত এবং বিধিবিহিত নামের সহিত প্রার্থনা হইল না, এই প্রভেদ। সঙ্ক্ষেপতঃ বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসী পুরুষ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত এবং আমন্ত্রিত দেবতা সমূহকে একমাত্র ঈশ্বরের সহ অভেদ জ্ঞান করিয়া, ফল অথবা সগুণ মুক্তি প্রার্থনা করিবেন। আর ফলের ইচ্ছা না থাকে তো লোক-সংগ্রহার্থ তাহাতে যোগ দিবেন।

সম্পদে বিপদে ঈশ্বর-স্মরণই মনুষ্যত্ব। মঙ্গল লাভে সেই মঙ্গলময়ের পূজা দেওয়া সমস্ত গৃহীর কর্ত্তব্য। বিপদ ও সঙ্কট

হইতে ত্রাণের নিমিত্ত তাঁহারই পূজা উচিত। যিনি ভগবানের ভক্ত ও শরণাগত, ঐ সমস্ত অবস্থায় তিনি তাঁহারই সকাশে ভজন ও যাচন পরায়ণ হন। কিন্তু সেই সকল কাম্য পূজা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী আচরিত হওয়া প্রয়োজন। যে যে দেবতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক সেই সমস্ত ক্রিয়াচরণের বিধি আছে, তৎসাধনের যে সমস্ত পদ্ধতি আছে, তাহারই অনুষ্ঠান উপাদেয়। কেননা নামের ভেদে অর্চ্চনার মূলতত্ত্ব-ভেদ হয় না। কালী, দুর্গা, চণ্ডিকা, লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, শিব, বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতি সর্ব্ব দেবতার নাম ও রূপ, সেই রূপ-নাম-বিশেষণ-বিবর্জ্জিত ভগবানেতে সমন্বিত। অতএব ভগবৎভক্ত সাধু গৃহস্থ দেব-দেবীর পূজার সহ ঈশ্বরোদ্দেশে মঙ্গলাচরণ করিবেন। তাঁহার গৃহের মঙ্গলার্থে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজার সহিত মহামায়ার পূজা দিবেন। ভগবানের শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ-মূর্ত্তি ও শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি যত দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাদের অর্চ্চনা করিবেন, এবং স্বকীয় পরকীয় কল্যাণার্থে তত্তৎ বস্তোপলক্ষিত বাসরে ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে অন্নদান করিবেন।

গৃহপতি যদি নিষ্কাম হইয়া থাকেন, তথাপি সকামী পরিবারের অধিকার পূরণার্থে এইরূপ কাম্য এবং বিধিবিহিত কর্ম্ম সকল করিবেন এবং করাইবেন। তাহাতে স্বয়ং ফলাফলে নির্লিপ্ত থাকিবেন। অতএব আত্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মোপাসক হইলেও প্রকৃতিবর্গের অধিকারতত্ত্বজ্ঞ সাধুপুরুষের সহ কাহারো বিরোধ সম্ভবে না। আর যদি ফলকামনা পূর্ব্বক কৃত হয়, তবে সেই কাম্য কর্ম্মই শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম। ফলে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যোগরূপ প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম, ঈশ্বর-স্মরণহীন প্রবৃত্তিধর্ম্ম অপেক্ষা উপাদেয়। কেননা একমাত্র ঈশ্বরের স্মরণই নিষ্কামচিত্ততা ও বৈরাগ্য লাভের হেতু।

অতএব একমাত্র ঈশ্বরে সমন্বিত দেবোদ্দিষ্ট ব্যতীত ক্রিয়া করিবেনা; এবং ক্রিয়াবিহীন ঈশ্বর স্মরণ, দেবারাধন, এবং মঙ্গল-প্রার্থনা করিয়া সন্তুষ্ট হইবে না। এই সমস্ত স্থলে দেবজ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বিহিত। কিন্তু মোক্ষ স্বরূপ যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা কর্ম্মবন্ধনের বিরোধী বিধায়, তাহার সহ কর্ম্মের সমুচ্চয়াভাব। তাদৃশ আত্মজ্ঞানের নাম সাংখ্যজ্ঞান। সাংখ্যজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ ফলকামনা শূন্য বিধায়, তত্ত্বতঃ পরস্পর সমন্বিত এবং উভয়ই মোক্ষপথবাহী। আর প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম ফলজনকত্ব হেতু বন্ধনপর। ফলে সে বন্ধন আমরা দেখিতে পাই না; কেননা তাহাই 'অদৃষ্ট'। অদৃষ্ট শুভাশুভ উভয়রূপী। শুভ আপাততঃ যত রুচির ও প্রার্থনীয় হউক, কিন্তু বন্ধন মাত্র। ব্রহ্মদৃষ্টি ব্যতীত—আত্মজ্ঞান ব্যতীত সে মায়া তিরোহিত হয় না।

শ্রীচঃ শেঃ বঃ।

বর্ণভেদ-তত্ত্ব।

(বর্ণ ও জাতিশব্দ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

ক্ষত্রাদ্ বভূব ব্যাধশ্চ বলবান মৃগহিংসকঃ।
তীবরাৎ শুণ্ডিকন্যায়াং বভূবুঃ সপ্ত পুত্রকাঃ।
তে কলৌ হড্ডিসংসর্গাদ্বভূবুর্দস্যবঃ সদা।
ব্রাহ্মণ্যাং ঋষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথম বাসরে।
কুৎসিতশ্চোদরে জাতঃ কূবরস্তেন কীর্ত্তিতঃ।
তদাশৌচং বিপ্রতুল্যং পতিত ঋতুদোষতঃ।
সদ্যঃ কোটীক সংসর্গাদধমো জগতীতলে।
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং ঋতোঃ প্রথমবাসরে।
জাতঃ পুত্রো মহাদস্যুর্বলবাংশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ।
আকারেণ তথা বাচা হ্যতীতঃ ক্ষত্রিয়ং যতঃ,
তেন জাত্যা সপুত্রশ্চ বাগতীতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষত্র-বীর্য্যেণ শূদ্রায়ামৃতুদোষেণ পাপতঃ।
বলবন্তো দুরন্তাশ্চ বভূবুর্ম্লেচ্ছ জাতয়ঃ।
অবিদ্ধকর্ণাঃ ক্রূরাশ্চ দুর্দ্ধর্ষা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
শৌচাচারবিহীনাশ্চ নির্ভয়া বলদুর্জ্জয়াঃ।
ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলাজাতির্বভূব হ।
জোলাৎ কুবিন্দ কন্যায়াং সরাকঃ পরি-
কীর্ত্তিতঃ।
বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চবিপ্রযোষিতঃ।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ॥
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতয়ঃ শূদ্রাস্তেব্যালগ্রাহিণো ভুবি॥
বিপ্রস্য জ্যোতির্গণনাদ্বেতনাচ্চ নিরন্তরং।
বেদধর্ম্মপরিত্যক্তো বভূব গণকো ভুবি॥
লোভীবিপ্রশ্চ শূদ্র নামগ্রে দানগৃহীতবান্।
গ্রহণে মৃতদানানামগ্রদানী বভূব সঃ॥
কিঞ্চিৎপুমান্ ব্রহ্মযজ্ঞে যজ্ঞকুণ্ডাৎসমন্বিতঃ।
সম্ভূতো ধর্ম্মবক্তাচ মৎ পূর্ব্বপুরুষঃ স্মৃতঃ॥
পুরাণং পাঠয়ামাস তঞ্চ ব্রহ্মাকৃপানিধিঃ।
পুরাণপ্রবক্তাশ্চৈব স যজ্ঞকুণ্ডসম্ভবঃ॥
বৈশ্যায়াং সূতবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ॥"

মতান্তরে কয়টী জাতির উৎপত্তি-প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

"পট্টিকারশ্চ মালিন্যাং স্থপতিশ্চ বভূব হ।
স্থপতেরপি গন্ধিকাং চিত্রকারোঽপ্যজায়ত॥
গোপালিন্যাং চিত্রকারাৎপ্রতিমাগঠকঃ স্মৃতঃ।
প্রতিমাগঠাদেব কন্যায়াং নাপিতস্য চ॥
সূত্রধারস্য সম্ভবঃ সোপান গৃহকারকঃ॥
করণস্ত্রিয়াঞ্চ মাহিষ্যাদ্ রথকারস্য সম্ভবঃ।
সরাক্যাং স্থপতেশ্চাপি স্বর্ণকারস্য সম্ভবঃ॥
স্বর্ণকারাচ্চ কৈবর্ত্তঃ কুবেরিণ্যাং বভূব হ।
তত গান্ধিককন্যায়াং কৈবর্ত্তাদেব শুণ্ডিকাঃ॥
শৌণ্ডিক্যাং সরাকাজ্জাতো রজকো মল-
নাশকঃ।
শৌণ্ডিকাং রজকাজ্জাতো নটো গরুড় এবচ॥
গরুড়ান্নটকন্যায়াং শৃঙ্গকারস্য সম্ভবঃ।
শৃঙ্গকার্য্যাং নটাজ্জাতো গণিত্রামীতি
বিশ্রুতঃ॥
তস্য পুত্রাৎ শৃঙ্গকার্য্যাং ভূমিমালীতি বিশ্রুতঃ॥
অনয়োরভবৎ পুত্রঃ পুণ্ডকশ্চ তথৈবচ॥
ধঙ্কারাঙ্গকাকার কাচকারকচক্রিকঃ
এতে বৈ পুণ্ডকাজ্জাতাঃ কন্যায়াং নাপি-
তস্য চ॥
চক্রিকাং গাঙ্গপুত্রোঽপি কন্যায়াং পুণ্ডকস্য চ
গঙ্গাপুত্রাৎ পুণ্ডজীবী নটকন্যায়া সম্ভবঃ॥
পুণ্ডজীবাদ্ গণ্ডকারো রজককন্যা সম্ভবঃ।
গণ্ডকারাদ্ বাদ্যকার বর্দ্ধকানাঞ্চ সম্ভবঃ॥

পুণ্ড্রীবাদ্ ভড্ জাতির্নট্যা বৈ শববাহকঃ।
তড়াত্তু চূর্ণকারো বৈ বাদরস্তীবরস্তথা,
কপালী চর্ম্মকারশ্চ কুরাব সরবৌ তথা,
পুলিন্দো মেরুবিন্দশ্চ শুন্দো মল্লস্তথাবকঃ।
কুম্ভকারঃ কর্ণিকারো ভোগলোহমৃতপস্তথা,
এতে বৈ তীবরাজ্জাতা কন্যায়াং ব্রাহ্মণস্য চ॥
ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলাদেব চণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ,
চত্বারিংশৎ পঞ্চমাসু জাতাঃ পুত্রা বিলোমজাঃ॥

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ ও স্মৃতিসংহিতায় আরও বহুবিধ জাত্যুৎপত্তি-প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সকলগুলির স্থান সঙ্কুলন হইলেও, আবশ্যক হইবে না ভয়ে, এ প্রসঙ্গে উহা যথোচিতরূপে উদ্ধৃত করিয়া দেখান সম্ভব হইল না।

বিভিন্ন পুরাণমতে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি বিভিন্নভাবে সমর্থিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই যে সমান রীতির অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সকল শ্লোকের যথাযথ অনুবাদ প্রবন্ধ-কলেবরে স্থান পাইবেনা বলিয়া আপাততঃ বিরত হইলাম। বস্তুতঃ এই সকল শাস্ত্রবাক্য দৃষ্টে বুঝা যায়,—অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহ ও ব্যভিচার-দোষ বশতঃ জাত সন্তানেরাই চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত সমস্ত জাতির প্রবর্ত্তক। যাহাদের জন্ম একরূপ, তাহারা এক জাতি। শূদ্র-সংসর্গে ব্রাহ্মণীর গর্ভোদ্ভূত সন্তান 'চণ্ডাল' নামধারী। এইরূপ সংসর্গবশে যত সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহারা এই চণ্ডাল জাতি। অন্যবিধ সংসর্গজাত সন্তানের জাতি অন্য। শাস্ত্র-প্রমাণ-বলে বুঝিতে হয়, জাতি জন্মের অধীন।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় দ্বিজ, দ্বিজাতি, দ্বিজন্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়; ইহার অর্থ, তাহাদের দুই প্রকার বা দুইবার জন্ম আছে। মাতৃগর্ভ হইতে এক জন্ম, উপনয়ন-সংস্কারে দ্বিতীয়বার জন্ম। বৈদিক "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে উপনয়নের সময় মৃগচর্ম্মের উপর গর্ভবাসী শিশুর মত ভাবে ব্রহ্মচারীর উপবেশনের কথা আছে। ঐ ব্রহ্মচারীকে কৃষ্ণাজিন দ্বারা আবৃত করা হইত। পরবর্ত্তিকালে কৃষ্ণাজিনের স্থানে বস্ত্রব্যবহার নিয়ম হইয়াছিল। তাহার পর ব্রহ্মচারী ঐ কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদন হইতে প্রসূত হইতেন; তখন তাঁহার দ্বিতীয় জন্মের চিহ্নস্বরূপ মৃগচর্ম্ম-তন্ত্রী তাঁহার গলায় দেওয়া হইত। উহাকে (যজ্ঞোপবীতকে) বেদে নাড়ীস্বরূপ বলা হইয়াছে। মৃগচর্ম্ম অধুনাও ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞোপবীত বিষয়ের বেদবাক্য (ব্রাহ্মণবাক্য) বিস্তারভয়ে উদ্ধৃত হইল না। ফলতঃ দ্বিজন্মা ও দ্বিজাতি একার্থক হইলে, জাতি-জন্মের সম্বন্ধ বড় কাছাকাছি। শাস্ত্রান্তরে দেখা যায়—'জন্মনা ব্রহ্মণো জ্ঞেয়ঃ" জন্ম দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়াই সন্তান ব্রাহ্মণ হয়। এই অভিপ্রায়ানুসারেই "ব্রাহ্মণীভূতমাতাপিত্রোরুৎপদ্যমানত্বং ব্রাহ্মণত্বং" এই লক্ষণ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। সুতরাং জন্মানুসারে জাতি হইবে, এই পর্য্যন্ত অনুশীলনে বুঝা গেল। এ সকল শাস্ত্রবচনের যৌক্তিকতা পরে বিবেচিত হইবে।

বর্ণপ্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বোক্ত যে বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারও মূলে জন্মতত্ত্ব বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠবর্ণ,

ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য কি, দেখা যাউক। স্বাস্থ্য, আহার, বিহার, দেশের প্রকৃতিগত শীতাতপের ন্যূনাধিক্য অনেক সময়ে শারীরিক বর্ণবিভেদের কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু উহাই বর্ণভেদের মুখ্য কারণ নহে; শুক্র-শোণিতই বর্ণভেদের প্রকৃষ্ট কারণ। আমাদের দেশে আমাদের চক্ষে শ্যাম, গৌর ও কৃষ্ণবর্ণের লোক থাকিলেও, বস্তুতঃ আমাদের জাতীয়বর্ণ শ্বেতাভ-কৃষ্ণ। এক পিতার সন্তান একজন শ্যাম ও অপর গৌরবর্ণ দেখা যায়; ইহারা এক মাতারই গর্ভজাত সন্তান। যমজ সন্তানেরও বর্ণভেদ হয়; কিন্তু এই বর্ণভেদ ইহুদী ও কাফ্রিজাতির বর্ণভেদের মত নহে। জগতের ইতিহাসে একজাতি একবর্ণের অধিকারী। অপর জাতীয় লোক অপর দেশে সুদীর্ঘকাল বাস করিলে, বা আহার-পরিচ্ছদাদির নিয়ম তদ্দেশ-প্রচলিত প্রথানুসারে পালন করিলে, তাহার বর্ণের যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে, তাহাও সহোদরদ্বয়ের শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হইবার মত। শ্বেতদ্বীপে বহুবর্ষ পুরুষানুক্রমে বাস করিলেও শোণিতসম্বন্ধ ব্যতীত কাফ্রীজাতি তদ্দেশীয়ের ন্যায় বর্ণলাভ করিতে পারিবে না। শোণিতসম্বন্ধেও বহুপুরুষ পরে আনুপাতিক অল্পতালাভ করিয়া, ক্রমে পূর্ব্ববর্ণ অদৃশ্য হয়। বিভিন্ন শোণিতসম্বন্ধে আপাততঃ এক অভিনব বর্ণ উৎপন্ন হয়; পরে তজ্জাতীয় শোণিত বহুপুরুষ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সংসৃষ্ট হইলে, বর্ণান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ববর্ণপ্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজে আর্য্য ও অনার্য্য-শোণিতের বহুকালবর্ত্তী সংমিশ্রণের ফলে শ্বেতাভ কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব হইতেই এই ব্যাপারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, পরে প্রদর্শিত হইবে। ফলতঃ জন্ম অর্থাৎ শুক্রশোণিতসম্বন্ধই বর্ণপার্থক্যের কারণ; দেশ, কাল, আহার, পরিচ্ছদাদি সহকারী মাত্র। এতাবৎকাল আমরা জন্মানুসারে জাতিব্যবস্থার আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি অন্যবিধ আন্দোলনে অগ্রসর হইতে হইবে।

গুণ কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ শাস্ত্রের বিষম রহস্য। এই রহস্যের গভীর তলদেশ দর্শন অসম্ভব হইলেও, উহাই জাতিতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক, গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ কেবল চতুর্ব্বর্ণ সম্বন্ধেই পাওয়া যায়।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

(গীতা ৪ ১৩।)

গুণ-কর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ আমি সৃষ্টি করিয়াছি; ইহা শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখের উক্তি। "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এই অংশই এখানকার সংশয়-তরঙ্গমালার একমাত্র নিদান।

কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন "গুণকর্ম্ম-বিভাগাভ্যাং সহ"। তাঁহাদের মতের তাৎপর্য্য গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদ নহে। ভগবান্ বলিতেছেন—"আমি গুণকর্ম্মবিভাগের সহিত চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি। কেবল বর্ণ সৃষ্টি করিয়াই নিরস্ত হই নাই, তাহাদের গুণ ও কর্ম্মবিভাগও আমি করিয়াছি।" ইহাতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি যেমন হউক না কেন, ভগবান্ তাঁহার গুণ-কর্ম্ম নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। অন্য বর্ণ ব্রাহ্মণের গুণ পাইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, এইরূপ বুঝা যায়। আমরা এ ব্যাখ্যায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না; কারণ ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ পক্ষ।

শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে বলেন, "গুণবিভাগঃ কর্ম্মবিভাগশ্চ, গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বগুণপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমো-দমস্তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি; সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজ-প্রভৃতীনি; তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি; রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্ম ইত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" সত্ত্বগুণ, ও শম দম ইত্যাদি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। এই গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে জাতিবিভাগ; অর্থাৎ এতাদৃশ গুণ ও কর্ম্মসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণজাতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। ইহার অর্থ অনেকাংশে সঙ্গত; যেহেতু শাস্ত্রান্তরে "কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং" অর্থাৎ কর্ম্মানুসারেই বিভিন্ন বর্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে, এইরূপ দেখা যাইতেছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কে কীদৃশ গুণসম্পন্ন হইবেন, তাহা আলোচিত হইবে। এখন টীকাকারগণের মত পর্য্যালোচনা করা যাউক। শ্রীমৎ আনন্দগিরি বলেন, "গুণবিভাগেন কর্ম্মবিভাগস্তেন।" গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইহাদের পার্থক্য অনুসারে যে কর্ম্মের (শম-দম, যুদ্ধ, কৃষি প্রভৃতির) পার্থক্য, তদ্দ্বারা চারিজাতি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি, এইরূপ গিরিমহাশয়ের মতের অর্থ। অনেক বচনের সংহিত একবাক্যতা হয়, এইজন্য গিরির ব্যাখ্যা সমধিক সঙ্গত বোধ হয়।

শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যাও শঙ্করের মতের অভিন্ন। গিরি শঙ্করের ভাষ্যের টীকাকার। স্বামী মূলের টীকা করিলেও, ভাষ্য ও গিরিকৃত টীকা পর্য্যালোচনা করিয়াই যে তিনি টীকা করিয়াছেন, একথা তাঁহার নিজোক্তিতেই জানা যায়; অতএব গুণানুযায়ী কর্ম্মঅনুসারে বিভিন্ন জাতিচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইঁহাদের সকলেই এই মতের সমর্থক। পরে যুক্তির চর্চ্চা করা যাইবে। গুণ তিনটী; সত্ত্ব, রজ ও তম। মানব কেন, জগতের যাবতীয় বস্তুজাতই এই ত্রিগুণের সংযোগে উৎপন্ন। প্রত্যেক শরীরই তিন গুণের সংযোগে উৎপন্ন। প্রত্যেক শরীরেই তিনগুণ আছে, তবে যে দেহে যে গুণের আতিশয্য দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি তদ্গুণাবলম্বী বলিয়া বিবেচিত হয়। মহর্ষি মনু বলেন,—

> যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
> স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্।

সত্ত্বগুণের আধিক্যে মানব সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইবে; আবার রজঃপ্রকৃতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলে রাজস হইবে। অধুনা দেখা যাউক, সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের লক্ষণ কি? সত্ত্বগুণের পরিচয় পাইব কি উপায়ে?

মহাত্মা মনুসংহিতায় দেখা যাইতেছে—

> বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
> ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্॥
> ১২। ৩১

যৎসর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎসত্ত্বগুণলক্ষণম্॥
১২।৩৭২

আরম্ভরুচিতা ধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্॥১২৩

যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্। যচ্চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসম্॥১২।৩৬

লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা। যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্॥ ১২।৩৩

যৎকর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্‌জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্ ১২।৩৫

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠমেষাং যথোত্তরম্॥১২।৩৮

মানবীয় সত্ত্বগুণের লক্ষণ, বেদাভ্যাস, তপ, জ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; ধর্ম্মকার্য্য, আত্মচিন্তা ইত্যাদি। রাজসগুণলক্ষণ—আরম্ভপ্রিয়তা, অধৈর্য্য, অসৎকার্য্য, পরিগ্রহ, সর্ব্বদা বিষয়সেবা, খ্যাতিজনক কর্ম্মানুষ্ঠান ও দৈন্যাবস্থায় শোকপ্রকাশ ইত্যাদি। তমোগুণের লক্ষণ—লোভ, স্বপ্ন, অধৈর্য্য, নাস্তিকতা, অনধিকারকার্য্য করা, যাচ্ঞাশীলতা, প্রমাদ, লজ্জাকরকর্ম্ম করা ইত্যাদি। প্রধানতঃ ধর্ম্মই সত্ত্বগুণের লক্ষণ, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ; এবং কাম বা কামনাই তমোগুণের লক্ষণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীনির্ম্মলানন্দ ভারতী।
যশোহর।

কাল্যপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্রম্।

(শঙ্করাচার্য্য-কৃতম্।)

(১)

প্রাগ্দেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতং নার্চ্চিতং মে,
তেনাহং দুঃখবর্গৈর্জঠরজননজৈর্বাধ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ।
নীত্বা জন্মান্তরং মে পুনরিহ ভবিতা কাশ্রয়ো নেতি জানে,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

পূর্ব্ব জন্মে কখনই তব শ্রীচরণ
আশ্রয় না করিয়াছি, অথবা অর্চ্চন।
তাই মাগো! মাতৃগর্ভে করিয়া প্রবেশ,
জঠর-যন্ত্রণা আমি সহিনু অশেষ।
পর জন্মে কোথা গিয়া লইব আশ্রয়,
তাহার কিছুই আমি না জানি নিশ্চয়।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(২)

বাল্যে বালাভিলাষৈর্জড়িত জড়মতির্বাললীলাপ্রসক্তো,
ন ত্বাং জানামি মাতঃ কলিকলুষহরাং ভোগমোক্ষৈকদাত্রীম্।
নাচারো নাপি পূজা ন চ যজনকথা ন শ্রুতির্নৈব সেবা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

বাল্যকালে বাল্যকাল-সুলভ-ইচ্ছায়
জড়িত হইয়া ছিনু জড়বুদ্ধি হায়!
কলি-পাপ-হরা ভোগ-মোক্ষ-বিধায়িনী
তোমারে না চিনিলাম কভু গো জননি!
আমার আচার নাই, পূজাও না রয়,
পূজার কথাও কভু মনে নাহি হয়।
শাস্ত্রজ্ঞান কিছু নাহি জন্মিল আমার,
সেবাও না করিলাম কদাপি তোমার।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৩)

প্রাপ্তোঽহং যৌবনং তৎ বিষধরসদৃশৈরিন্দ্রিয়ৈর্দষ্টগাত্রো,
নষ্টপ্রজ্ঞঃ পরস্ত্রী-পরধন-হরণে সর্ব্বদা সাভিলাষঃ।
ত্বৎপাদাম্ভোজযুগ্মং ক্ষণমপি মনসা ন স্মৃতোঽহং কদাপি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

যৌবন সময়ে পঞ্চ ইন্দ্রিয়-ভুজঙ্গ
দংশন করিল মাগো! এই মোর অঙ্গ।
অমনি চৈতন্য মোর পাইল বিনাশ,
পরস্ত্রীতে পরধনে হ'ল অভিলাষ।
হায়রে শ্রীপাদপদ্ম যুগল তোমার
স্মরণ না করিলাম কভু একবার!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৪)

প্রৌঢ়ে ভিক্ষাভিলাষী সুতদুহিতৃকলত্রার্থমন্নাদিচেষ্টঃ,
ক্ব প্রাপ্স্যামি ক্ব যামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ।
নো তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ ভজনবিধির্নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

প্রৌঢ়কালে পুত্র-কন্যা-ভার্য্যার কারণ,
অন্ন বস্ত্র হেতু মোর ব্যস্ত ছিল মন।
কোথা যাব, কোথা পাব, ভাবি নিরন্তর,
জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে গেল মোর কলেবর।
চিন্তা নাহি করিলাম বারেক তোমার,
চিন্তা করিতেও শ্রদ্ধা না ছিল আমার।
না করিনু কভু হায় তোমার ভজন,
না করিনু কভু তব নাম-সংকীর্ত্তন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৫)

বৃদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃশবিবশতনুঃ শ্বাসকাশাতিসারৈঃ,
কর্ণঘ্রাণাক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

বৃদ্ধকালে বুদ্ধিটুকু না রহিল আর,
আসিয়া যুটিল কাশ-শ্বাস-অতিসার।
অবশ হইল অঙ্গ, হলো অতি ক্ষীণ,
হইলাম চক্ষু-কর্ণ-ঘ্রাণ-শক্তিহীন।
দন্তগুলি একে একে খসিয়া পড়িল,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা আসি মোরে চাপিয়া ধরিল।
অনুতাপানল শেষে দহিল আমায়,
চিন্তিনু মরণ-চিন্তা না চিন্তি তোমায়।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৬)

কৃত্বা স্নানং দিনাদৌ কচিদপি সলিলং নাহৃতং নৈব পুষ্পং,
নো নৈবেদ্যাদিচেষ্টা কচিদপি চ কৃতা নৈব ভাবো ন ভক্তিঃ।
ন ন্যাসো নৈব পূজা ন চ গুণকথনং নাপি চর্চ্চা কৃতা তে!
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

প্রাতঃকালে করি স্নান তোমায় কখন
পুষ্প-জল দিয়া নাহি করিনু অর্চ্চন।
নৈবেদ্যাদি সংগ্রহেও নাহি ছিল মতি,
না ছিল সাত্ত্বিক ভাব, না ছিল ভকতি।
কিবা ন্যাস, কিবা পূজা, গুণ-সঙ্কীর্ত্তন
কোনরূপ চর্চ্চা নাহি করিনু কখন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৭)

জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়শমনীং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীং,
নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্যলীলাদয়াঢ্যাম্।
মিথ্যাকার্য্যাভিলাষৈরনুদিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসংঘৈঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

সর্ব্ব-সিদ্ধি-দাত্রী ভব-ভয়-বিনাশিনী,
বেদ-সারভূতা নিত্য-আনন্দ-দায়িনী।
নিরন্তর লীলাময়ী করুণা-শালিনী।
চিনিতে না পারিলাম তোমায় জননি!
দিন দিন বৃথা কার্য্যে সঁপে দিয়া মন,
জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে আমি পড়িনু এখন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৮)

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খড়্গমুণ্ডাভিরামা,
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণপকুণশিরোমালিনী দীর্ঘনেত্রা।
সংসারস্যৈকসারা মনসি ন চ কদা ভাবিতা ভাবনাভিঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

শ্যামল-জলদ-সম-শ্যামাঙ্গ-ধারিণী,
মুক্তকেশী, খড়্গ-মুণ্ডে মানস-মোহিনী,
ভক্ত-ভয়-বিনাশিনী, ইষ্ট-বিধায়িনী,
দুর্জ্জয়-রাক্ষসগণ-মস্তক-মালিনী,
ত্রিসংসার-সারভূতা, আয়ত-লোচনা,
চিন্তিতে তোমারে নাহি জন্মিল বাসনা।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৯)

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশঃ পরিণমতি সদা ত্বৎপদাম্ভোজযুগ্মং,
ভাগ্যাভাবান্ন চাহং ভবজননি ভবৎপাদপদ্মং ভজামি।
নিত্যং লোভৈঃ প্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকস্ত্বাং প্রযাচে,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

কিবা ব্রহ্মা, কিবা বিষ্ণু, কিবা মহেশ্বর,
তব পাদ-পদ্ম-যুগ সেবনে তৎপর।
পরম দুর্ভাগ্য আমি, তাই গো জননি!
তব পাদ-পদ্ম নাহি পূজিনু কখনি।

লোভ-মোহ-বশে আমি থাকিয়া সদাই,
হইনু বিকৃতবুদ্ধি,—তাই ভিক্ষা চাই,—
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১০)

রাগদ্বেষৈঃ প্রমত্তঃ কলুষযুততনুঃ কামভোগ-
প্রলুব্ধঃ,
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিবহিতঃ কৌল-
সংঘৈর্বিহীনঃ।
ক্ব ধ্যানস্তে ক্ব চর্চ্চা ক্ব চ মনুজপনং নৈব
কিঞ্চিৎ কৃতং মে;
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

রাগ-দ্বেষে মত্ত, পাপ-পূর্ণ কলেবর,
নানা কাম্য-বস্তু ভোগে লুব্ধ নিরন্তর।
হিতাহিত-বিচারের না আছে শকতি,
তন্ত্রোক্ত আচার নাই, নাই তায় মতি।
কিবা ধ্যান, কিবা পূজা, মন্ত্রজপ আর,
কিছুই না করিলাম কদাপি তোমার।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১১)

রোগী দুঃখী দরিদ্রঃ পরবশকৃপণঃ পাংশুলঃ
পাপচেতা
নিদ্রালস্যপ্রসক্তঃ স্বজঠরভরণে সর্ব্বদা
ব্যাকুলাত্মা।
কিং তে পূজাবিধানং ক্ব চ মনুজপনং
কানুরাগঃ ক্ব চাস্তা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

কিসে তব পূজা করি, মন্ত্র জপি আর,
কিসে বল অনুরাগ দেখাই তোমার!
করিতে তোমার কার্য্য মন নাহি সরে,
ছট্ ফট্ করে প্রাণ উদরের তরে!
রোগী দুঃখী পরাধীন অবোধ নির্ধন,
পাপিষ্ঠ কুমনা নিদ্রালস্যপরায়ণ!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১২)

মিথ্যাব্যামোহরাগৈঃ পরিবৃতমনসঃ ক্লেশ-
সংঘাবৃতস্য,
ক্ষুন্নিদ্রাঢ্যিতস্য শ্রবণবিরহিণঃ পাপকর্ম্ম-
প্রবৃত্তেঃ।
দারিদ্র্যস্য ক্ব ধর্ম্মঃ ক্ব চ ভজনবিধিঃ ক্ব
স্থিতিঃ সাধুসঙ্গে;
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

মিথ্যা মোহ-অনুরাগে মুগ্ধ মোর মন,
নানাবিধ ক্লেশে আমি ক্লিষ্ট অনুক্ষণ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা ল'য়ে ব্যাপৃত সদাই,
তত্ত্ব-কথা-শ্রবণেও শ্রদ্ধা মোর নাই।
পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত আমি, পরম নির্ধন,
ভজনেতে সাধুসঙ্গে ধর্ম্মে নাহি মন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননিজঠরগস্তাবদালব্ধ-
দেহ-
স্ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্ম্ম-
হেতুস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থা জগদিদমখিলং ত্বামৃতে
নাস্তি মাতঃ।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

পিতার শরীর হতে জনম লভিয়া,
মাতৃগর্ভে রহিলাম শয়ন করিয়া।

তার পর, তথা হ'তে দেখিনু সংসার ;
তুমিই স্বয়ং কর, করাও আবার !
তুমি দয়াময়ী, কর্ম্ম-হেতু-স্বরূপিণী,
তুমিই স্বয়ং বুদ্ধি-চিত্ত নিবাসিনী।
তোমা বিনা মাগো ! এই অনন্ত ভুবন
থাকিতে না পারে হায় কিছুতে কখন !
ভয়ঙ্করি ! ভীমমুখি ! যথেচ্ছরূপিণি !
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি !

(১৪)

ত্বং ভূমিস্ত্বং জলোঘস্ত্বমসি হুতবহো-
গন্ধবাহস্ত্বমেব
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্বিকা-
হহঙ্কৃতিশ্চ।
আত্মাপ্যোবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী
ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ ;
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে ॥

তুমি ভূমি, তুমি জল, তুমিই অনল,
তুমি বায়ু, তুমি পুনঃ আকাশ-মণ্ডল,
তুমিই মহৎতত্ত্ব, তুমিই প্রকৃতি,
তুমি মন, তুমি আত্মা, তুমি অহঙ্কৃতি।
তুমিই সংসারে মাগো ! একমাত্র সার,
তোমা বিনা সার বস্তু কিছু নাই আর !
ভয়ঙ্করি ! ভীমমুখি ! যথেচ্ছরূপিণি !
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি !

(১৫)

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী
ভৈরবী ত্বং,
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ
শিবা ত্বম্।
মাতঙ্গী ত্বঞ্চ ধূমা ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা
হিঙ্গুলাখ্যা,
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে ॥

তুমি কালী তারা দুর্গা ভৈরবী সুন্দরী,
তুমি লক্ষ্মী ছিন্নমস্তা ত্রিভুবনেশ্বরী,
তুমি গিরিসুতা ধূমা শিবানী বগলা,
তুমিই মাতঙ্গী তুমি মঙ্গলা হিঙ্গুলা।
ভয়ঙ্করি ! ভীমমুখি ! যথেচ্ছরূপিণি !
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি !

(১৬)

স্তোত্রেণানেন দেবীং পরিণমতি জনো যঃ
সদা ভক্তিযুক্তো,
দুষ্কীর্ত্তিং দুর্গসংঘং পরিভবতি সদা বিঘ্নতা-
নাশমেতি।
নাধির্ব্যাধিঃ কদাচিৎ ভবতি যদি পুনঃ
সর্ব্বদা সাপরাধঃ
সর্ব্বং তৎ কামরূপা ত্রিভুবনজননী ক্ষাময়েৎ
পুত্রবুদ্ধ্যা ॥

ভক্তিভরে এই স্তব পঠি মনে মনে,
যে জন প্রণাম করে দেবীর চরণে,
দুর্গতি দুষ্কর্ম্ম তার সব দূরে যায়,
যত কিছু বিঘ্ন তার সকলি পলায়।
আধি ব্যাধি কিছু তার না থাকে কখন;
যদিও তাহার দোষ রহে সর্ব্বক্ষণ,
তবু সেই কামরূপা ত্রিলোক-জননী
তার প্রতি তুষ্ট থাকি দিবস-যামিনী,
আপনার পুত্র বলি ভাবিয়া তাহায়,
মার্জ্জনা করেন তার দোষ সমুদায়।

(১৭)

জেতা শক্ত্যা কবীনাং ভবতি ধনপতির্জ্ঞান-
শীলো দয়াত্মা,
নিষ্পাপো নিষ্কলঙ্কঃ কুলমতিকুশলঃ সত্যবাক্
ধার্ম্মিকশ্চ।

নিত্যানন্দো গুণাঢ্যঃ পশুজনবিমুখঃ সৎ-
পথাচারশীলঃ,
সংসারাব্ধিং সুখেন প্রতরতি গিরিজাপাদ-
পদ্মাবলম্বাৎ॥

পার্ব্বতীর পাদ-পদ্মে যে লয় আশ্রয়,
নিজবলে কবিগণে সেই করে জয়।
ধনবান্ জ্ঞানবান্ দয়াবান্ হয়,
পাপ নাহি থাকে তার, কলঙ্ক না রয়।
কুলাচার-যুত সদা, সত্য-পরায়ণ,
সুধার্ম্মিক, সদানন্দ, গুণ-নিকেতন।
মূর্খের সংসর্গে তার নাহি থাকে মতি,
নিরন্তর থাকে তার সাধুপথে গতি।
সংসার-সাগর এই অগাধ অপার,
অনায়াসে সেই জন হ'য়ে যায় পার।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর
বি, এ,

সামবেদ সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

অথ চতুর্থী।

(মন্ত্রঃ প্রার্থয়তে)

৩ ২ ৩ ২   ৩ ১ ২ ৩ ১ ২   ৩ ১২ ৩ ২
অগ্নি স্তুক্থে পুরোহিতো গ্রাবাণো বর্হিরধ্বরে।
৩ ১ ২   ৩ ২ ৩ ১ ৩
ঋচয়ামি মরুতো ব্রহ্মণস্পতে দেবা অবো
১ ২
বরেণ্যম্। ৪॥

উক্থে—স্তোত্র শাস্ত্রাত্মকে—স্তবরূপ শাস্ত্রাত্মকে।

অধ্বরে—হিংসা রহিতে অস্মিন্ যজ্ঞে (১)

অগ্নিঃ পুরোহিতঃ—যজ্ঞাৎ পুরস্তঃ উত্তর-বেদ্যাং ঋত্বিগ্‌ভির্নিহিতোভূৎ—যজ্ঞের সম্মুখে উত্তরবেদীতে ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক নিহিত হইয়াছিলেন। (পুরোহিত অর্থ সম্মুখে স্থিত।)

---

(১) ভগবান্ সায়নাচার্য্য যজ্ঞ মাত্র হিংসারহিত, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। পশুহনন ব্যতিরেকে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়না এবং তজ্জন্যই "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" এই শ্রুতিবাক্য আছে। কিন্তু উহা রাজসী বৃত্তি—

"হিংসাচৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা তু রাজসী।
ব্রাহ্মণৈঃ সন কর্ত্তব্যং যতস্তে সাত্বিকামতাঃ॥"
বাচস্পত্যাভিধানধৃত (হিংসা শব্দ ব্যাখ্যানে)
বৃহন্মনুধৃত বচনং।

যদি হিংসা দোষ না হইত, তাহা হইলে "মা হিংসাৎ সর্ব্বভূতানি" এরূপ শ্রুতি থাকিত না। যাজ্ঞিকদিগের বৈধহিংসা কর্ত্তব্য কিন্তু পশুবধ-জনিত পাপ ভোগ করিতে হয়; তৎপরে যজ্ঞকর্ম্ম জন্য কিছুদিন স্বর্গ ভোগ করেন। ইহা আমার পূজ্যপাদ বিবিধাস্তর্বাণি গুরুদেব স্বামীজীরও মত; কারণ তিনি যৎকালে রেওয়াঁ রাজ্যে মহা-রাজার অনুরোধ ক্রমে কিছু দিনের জন্য বাস করেন, তখন মহারাজ রঘুরাজ সিংহ যজ্ঞ কামনা করেন। স্বামীজী জানিতে পারিয়া, ভাবি হিংসা জন্য, রাজ্য হইতে এক ক্রোশ দূরে গিয়া বাস করেন। মহা-রাজ জানিতে পারিয়া স্বামীজীর নিকট গিয়া রাজ্য-ত্যাগ-কারণ জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীজী কহেন "আমি বৈষ্ণব, আমার স্বর্গ-কামনা নাই"। মহারাজ কহেন "সভা-পণ্ডিতের আদেশ ক্রমে করিতেছি"। স্বামীজী কহেন—"আপনি স্বর্গ ভোগ করি-বেন, কিন্তু প্রথমে পশু-হনন পাপ জন্য নরক ভোগ করিতে হইবে; আরও এ যজ্ঞ

গ্রাবাণঃ—সোমাভিষবার্থং পুরতো নিহিত ইত্যর্থঃ—সোমে সিঞ্চিত করিবার জন্য অগ্রে রক্ষিত প্রস্তর সকল।

বর্হিশ্চ পুরতো নিহিতং আসাদিতং—দর্ভাসনও অগ্রে রক্ষিত হইয়াছে।

হে মরুতঃ—একোনপঞ্চাশন্মরুদ্‌গণাঃ!

হে ব্রহ্মণস্পতে—স্তোত্রস্য পালক!

হে দেবাঃ—দ্যোতনাদিগুণযুক্তা ইন্দ্রাদয়ঃ!

বরেণ্যং—বরণীয়ং—ভজনীয়ম্।

অবঃ—রক্ষণম্।

ঋচা—সূক্তরূপয়া স্তুত্যা।

য়ামি—যাচামি (বর্ণলোপশ্ছান্দসঃ—ছন্দ জন্য বর্ণ লোপ করা হইয়াছে) প্রার্থনা করিতেছি।

স্তোত্র শাস্ত্রাত্মক, হিংসারহিত এই যজ্ঞে অগ্নিদেব পুরোহিত হইয়াছেন; সোম সিঞ্চন করিবার জন্য প্রস্তর সকল পুরোহিত হইয়াছে; দর্ভাসনও পুরোহিত হইয়াছে। হে মরুদ্‌গণ! হে স্তোত্রপালক! হে দ্যোতনাদিগুণযুক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমাদিগের নিকট সূক্তরূপ স্তুতিদ্বারা এই প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের এই সকল দ্রব্যগুলি এইরূপে রক্ষা কর, যাহাতে ভজনীয়ই থাকে। ৪॥

সম্পূর্ণ হইবে না"; পরিশেষে আচার্য্যকে কহেন যে "আপনি লোভে মহারাজকে পাপে প্রেরণা করিতেছেন, কিন্তু সেই পাপ আপনাকে ভোগ করিতে হইবে।" স্বামীজী পরদিন প্রত্যূষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রয়াগ গমন করেন। মহারাজ যজ্ঞ আরম্ভ করেন—সাত লক্ষ মুদ্রা যজ্ঞে ব্যয় হয়; তন্মধ্যে তিনলক্ষ আচার্য্য প্রাপ্ত হন; কিন্তু যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নাই। আচার্য্য যজ্ঞীয় অগ্নিশিখা-বেষ্টিত হইয়া দগ্ধ হন।

অথ পঞ্চমী।

(সুদীতি ঋষিঃ পুরুমীঢ়ো বা)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিমীড়িষ্বাবসে গাথাভিঃ শীর শোচিষম্।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২উ ৩ ১
অগ্নিং রায়ে পুরুমীঢ় শ্রুতং নরোঽগ্নিঃ
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সুদীতয়ে ছর্দিঃ। ৫॥

হে পুরুমীঢ়! (এক ঋষির নাম)।

অগ্নিং অবসে—অগ্নিং রক্ষণায়।

ঈড়িষ্ব—স্তুহি গাথাভিঃ ইতি শেষঃ—গাথাদ্বারা স্তব কর। (গাথা অর্থাৎ মন্ত্ররূপ বাক্য দ্বারা)

শীর শোচিষং—শয়ন-স্বভাব রোচিষং—শয়ন স্বভাব প্রভাশালী, অর্থাৎ যে অগ্নির দীপ্তি ঊর্দ্ধদিকে না গিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে)

রায়ে—ধনায়। নরঃ—অন্যেঽপি যজমানাঃ স্তুবন্তি স্বার্থং।

সুদীতয়ে—মহ্যং—আমাকে।

অগ্নিঃ ত্বয়া অভিষ্টুতঃ সন্ ছর্দিঃ গৃহং প্রযচ্ছতু।

হে পুরুমীঢ়! নিজের রক্ষার জন্য অগ্নিকে গাথাদ্বারা স্তব কর; সেই শয়ন-স্বভাব প্রভাশালী অগ্নিকে ধনের জন্য স্তব কর। শুন, অন্যান্য যজমানগণ আপন স্বার্থের জন্য তাঁহাকে স্তব করিতেছেন; তজ্জন্য অগ্নি তোমাকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আমাকে একটি গৃহ প্রদান করুন। ৫॥

অথ ষষ্ঠী।

(প্রাকণ্বঋষিঃ)।

৩ ১ ২ ৩ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্রুধি শ্রুৎকর্ণ বহ্নিভির্দেবৈরগ্নে সয়াবভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
আসীদন্তু বর্হিষে মিত্রো অর্য্যমা প্রাত-
১ ২ ৩ ২
র্য্যাবভিরধ্বরে ॥ ৬ ॥

হে শ্রুৎকর্ণ !—শ্রবণসমর্থাভ্যাং কর্ণাভ্যাং যুক্ত !
হে অগ্নে !
শ্রুধি—শৃণু। যঃ মিত্রঃ অর্য্যমা দেবশ্চ।
অগ্নেঃ প্রাতর্যাবভিঃ—প্রাতঃকালে দেবযজনং গচ্ছদ্ভিঃ।
দেবৈঃ—সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ ইত্যর্থঃ।
সয়াবভিঃ—আহবনীয়াগ্নিনা ত্বয়া সমান গতিভিঃ।
বহ্নিভিঃ—অগ্নেঃ বহ্নিভিঃ দেবৈশ্চ সহ।
অধ্বরে—ক্রতু নিমিত্তে ইত্যর্থঃ।
বর্হিষি—দর্ভে।
আসীদন্তু—উপবিশন্তু—উপবেশন করুন।

হে শ্রবণসমর্থ কর্ণযুক্ত অগ্নি! তুমি আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। যাঁহারা প্রাতঃকালে দেবযজন-স্থানে গমন করিয়া থাকেন, সেই সকল দেবগণের সহিত ও তোমার সমান গতিশীল অন্যান্য বহ্নিগণ সহিত সূর্য্যদেব ও অর্য্যমাদেব আমাদের যজ্ঞ-নিমিত্ত রক্ষিত এই কুশাসনে উপবেশন করুন। ৬ ॥

অথ সপ্তমী।

(সৌভরি ঋষিঃ)

১র ২র ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২
প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেব ইন্দ্রো ন
৩ ১ ২
মজ্মনা।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র
অনু মাতরং পৃথিবীং বিবাবৃতে তস্থৌ
২র৩ ১ ২
নাকস্য শর্ম্মণি ॥ ৭॥

দেবঃ—দ্যোতমানঃ। ইন্দ্রঃ—পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ।
দৈবোদাসঃ—দিবোদাসেনাহূয়মানঃ অগ্নিঃ—দিবোদাস দ্বারা আহূয়মান অগ্নি।
মাতরং—সর্ব্বস্য লোকস্য ধারণাৎ পৃথিবীমাতা তাং পৃথিবীং অনু প্রবিবাবৃতে দেবান্ প্রতি হবির্বোঢ়ুং বিশেষেণ প্রবর্ত্তয়তি—সমুদয় লোক ধারণ বশতঃ পৃথিবীমাতা—সেই পৃথিবীকে—ইন্দ্রাদি দেবতার নিকট হবি বহন করিতে বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।
মজ্মনা—বলেন আজুহাব—বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন।
নাকস্য—স্বর্গস্য। শর্ম্মণি গৃহে স্বায়তন এব তস্থৌ—অতিষ্ঠৎ—ছিলেন।

দ্যোতমান পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দিবোদাস ঋষি ইন্দ্রাদি দেবতার নিকট হবি বহন করিবার জন্য মাতা পৃথিবীকে বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; দিবোদাস অগ্নিকে বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন; সুতরাং অগ্নি স্বর্গের কল্যাণ-গৃহে অথবা নিজ আয়তন স্থানে পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছিলেন ॥৭॥

অথ অষ্টমী।

(মেধাতিথি মেধ্যা তিথিশ্চ)।

২৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২৩১র ২র
অধ জ্মো অধবা দিবো বৃহতো রোচনাদধি।
৩ ১ ২ ৩ ২র ৩২উ ৩ ১ ২
অয়াবর্দ্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো
পৃণ ॥৮॥

হে ইন্দ্র!
অধ—অধুনা।

জ্মঃ—অগস্তি গচ্ছন্তঃস্যামিতি জ্যা পৃথিবী তস্যাঃ সকাশাৎ—পৃথিবী হইতে।

অথবা—অপিবা—কিম্বা।

দিবঃ—অন্তরিক্ষাৎ।

বৃহতঃ—মহতঃ।

রোচনাৎ—নক্ষত্রৈর্দীপ্যমানাৎ স্বর্গাৎ বা আগত্য—স্বর্গ হইতে।

অধি—পঞ্চম্যর্থানুবাদোঽয়ম্—অধিশব্দ পঞ্চমীর অর্থানুবাদ।

অয়া—অনয়া তন্বা—এই শরীর দ্বারা।

মমা গিরা—মদীয়য়া বিস্তৃতয়া স্তুত্যা—আমার বিস্তৃত স্তুতি দ্বারা।

বর্দ্ধাব—বৃদ্ধো ভব—বর্দ্ধিত হও। (অগ্নি দুই প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন; এক শরীর দ্বারা—অর্থাৎ বেদী মার্জ্জনাদি ক্রিয়া দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ স্তুতি দ্বারা।

হে সুক্রতো!—শোভন কর্ম্মবনিস্ত্র!

জাতা—জাতান্ অস্মদীয়ান্ জনান্—আমাদের হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণকে পৃণ—অভিলষিতৈঃ ফলৈরাপূরয়—অভিলষিত ফল দ্বারা পূর্ণ কর। হে মহৈশ্বর্য্যশালী অগ্নি! অধুনা তুমি পৃথিবী হইতে, অথবা মহৎ অন্তরিক্ষ হইতে, কিম্বা নক্ষত্র দ্বারা দীপ্তিমান স্বর্গ হইতে আগমন কর ও আমার শরীর দ্বারা ও বিস্তৃত স্তুতি-বাক্য দ্বারা বর্দ্ধিত হও। হে শোভন কর্ম্মবান্! তুমি আমাদের হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণকে অভিলষিত ফল দ্বারা পূর্ণ কর। ৮॥

অথ নবমী।

(বিশ্বামিত্র ঋষিঃ)

১ ২ ৩২উ ৩১র ২র ৩২
কায়মানো বনা ত্বং যন্মাতৄরজগন্নপঃ।

বনা—বনানি—কাননানি।

কায়মানঃ—ভক্ষিতুং কাময়মানঃ—ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক।

যৎ—যস্মাৎ কারণাৎ তানি বিহায়—যে কারণে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া।

মাতৄঃ—মাতৃভূতা অপঃ—মাতৃভূতজল।

অজগন্—অগমঃ—গন্তবানসি; অপ্সু প্রবিষ্টত্বাৎ শান্তো বর্ত্তসে—জলে প্রবেশ হেতু শান্ত হইয়াছ।

তৎ—তস্মাৎ। তে—তব।

নিবর্ত্তনং—নিতরাং তত্রৈব বর্ত্তনং—সর্ব্বদা তথায় থাকা।

ন প্রমৃষে—ন প্রমৃক্ষ্যতে—ন সহ্যতে—সহ্য করিতে পারি না।

যৎ—যস্মাৎ কারণাৎ।

দূরে সন্—দূরে অদৃশ্যতয়া বর্ত্তমানস্ত্বং—অদৃশ্য বশতঃ দূরে থাকাতে।

ইহ—অস্মৎ সম্বন্ধিষরণী রূপেষু কাষ্ঠেষু—আমাদের অরণী কাষ্ঠে।

আভুবঃ—সমস্তাৎ ভবেঃ—মথনাৎ ক্ষণমাত্রেণাস্মাকং সমীপে ভবসি। মন্থন হেতু ক্ষণমাত্রেই আমাদের নিকটে হইয়াছ।

তস্মাৎ তব দূরতো বর্ত্তনং অস্মভ্যং
১র ২র ৩ ১ ২
রোচতে—তজ্জন্য (ন তৎ তে অগ্নে! প্রমৃষে
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
নিবর্ত্তনং যদ্দূরে সন্নিহা ভুবঃ ৯।। তোমার দূরে থাকা আমাদের ভাল লাগে না:

হে অগ্নি! তুমি বন সকল ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক, তথাপি ঐ সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভূতজলে প্রবেশ

করিয়া শান্ত হইয়া আছ। (১) তোমার তথায় ঐরূপ থাকা সহ্য করিতে পারি না; যেহেতু দূরে থাকাতে তুমি অদৃশ্য হইয়াছ। অদৃশ্য ভাবে দূরে থাকা বশতঃ অরণি হইতে ঈষৎ আবির্ভূত হইয়াছ।

অথ দশমী।

(কণ্ব ঋষিঃ)

নিত্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতি র্জনায় শশ্বতে।
দীদেথ কণ্বঋতজাত উক্ষিতোয়ং
নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ॥১০॥

জ্যোতিঃ—প্রকাশরূপং—প্রকাশরূপ-জ্যোতিঃ।

শশ্বতে—বহু বিধায় যজমানায়।

মনুঃ—প্রজাপতিঃ।

নিদধে—দেবযজনদেশে স্থাপিতবান্—দেবযজনস্থলে রাখিয়াছেন।

ঋতজাতঃ—তেন ঋতেন যজ্ঞেন নিমিত্ত ভূতেনোৎপন্নঃ—যজ্ঞের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাক।

উক্ষিতঃ—হবির্ভিস্তৃপ্তঃ সন্—হবির্দ্বারা-তৃপ্ত হইয়া।

(১) অগ্নি জলে কি প্রকারে প্রবেশ করিবে? কারণ উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মবান্, তজ্জন্য কারণাত্মক জল অর্থ করিলেই সুসঙ্গত হইবে। কারণাত্মক জলের বিষয় মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে সৃষ্টি-প্রকরণে বিবৃত আছে, যথা—

"ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ
তমোনুদঃ ইত্যাদি"॥৬॥"

কণ্ব—এতন্নামকে মহর্ষৌ ময়ি—কণ্বনামে মহর্ষি-আমাতে।

দীদেথ—দীপ্তবানসি।

য়ং—অগ্নিং।

কৃষ্টয়ঃ—মনুষ্যাঃ।

নমস্যন্তি—নমস্কুর্ব্বন্তি। (সপ্তমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।)

ইতি সামবেদ সংহিতায়াং প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অগ্নি! (১) প্রজাপতি মনু বহুবিধ যজমানের জন্য তোমার জ্যোতি দেবযজনস্থলে রাখিয়াছেন। তুমি যজ্ঞকার্য্যজন্য প্রাদুর্ভূত হইয়া থাক, তজ্জন্য এক্ষণ হবির্দ্বারা তৃপ্ত হইয়া কণ্ব আমাতে দীপ্ত হও। তুমি সেই অগ্নি, যাহাকে মানবগণ নমস্কার করিয়া থাকে।

(পঞ্চমখণ্ড সম্পূর্ণ।)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১) অগ্নি শব্দে এখানে পঞ্চমহাভূতাত্মক অগ্নি অপেক্ষা "পরমাত্মা" অর্থ যুক্তিযুক্ত। অগ্নি শব্দে পরমাত্মা, যথা—

"অঙ্গয়তি প্রাপয়তি কর্ম্মণঃ ফলং ইতি অগ্নিঃ পরমাত্মা, প্রমাণং—বেদান্তদর্শনে, ১ম অধ্যায়ে—২য় পাদে—২৮শ সূত্রভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ "অগ্নিশব্দোঽপ্যগ্রণীত্বাদি যোগাশ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি।"

তদ্ভিন্ন সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় হিন্দুপত্রিকা প্রথমবর্ষের—২ পৃষ্ঠায় অগ্নাস্তু ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।

ঋগ্বেদ-৩য় মণ্ডল

৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

পুরোভেদী জাত বসু ইন্দ্র-চিরশত্রু হিংসু
তেজে দাসগণে তিনি করিলেন জয়।
ব্রহ্মাকৃষ্ট ভুরিদাত্র প্রবর্দ্ধিত যাঁর গাত্র,
পুরিত তাঁহার দ্বারা রোদসী উভয় ॥ ১
হে ইন্দ্র! বলিন্ পূজিত! তোমায় করি ভূষিত,
অন্নাশায় তব স্তুতি করি উচ্চারণ।
মনুজাত মানুষের অথবা দৈব বিশের,
সকলের অগ্রে তুমি করহ গমন ॥ ২
হে ইন্দ্র! প্রবুদ্ধনীতি অরাতিগণের ভীতি
মায়াবীদিগকে তুমি করেছ সংহার।
বলে স্কন্দহীন করি বিনাশ করেছ অরি,
রামাগণ-ধেনু সব কৈলা আবিষ্কার॥ ৩
দিবস সৃজন করি যুদ্ধার্থীর সহচরি
স্বর্গপ্রদ ইন্দ্র সেনা করিলেন জয়।
দিবসের কেতু দীপ্ত করিলা মনু-নিমিত্ত,
হইল রণের জন্য জ্যোতির উদয় ॥ ৪
রণযোগ্য বহু ধন করিয়া ইন্দ্র গ্রহণ,
প্রবল শত্রুর সেনা করিলা প্রবেশ।
এই সব উষা হার জাগ্রত হ'ল স্তোতার,
তাঁহাদের শুভ্রবর্ণে বৃদ্ধি পেল তেজ ॥ ৫
মহনীয় কর্ম্ম তাঁর সুকৃত অনেক আর,
মহান্—তাঁহাকে করে সকলে স্তবন।
বলিগণে বল দ্বারা চূর্ণ করিলেন পুরা
শত্রুহা মায়ায় দস্যু করিলা নিধন ॥ ৬
দেবপতি, নরে যিনি বরপ্রদ ইন্দ্র তিনি,
মহাযুদ্ধে দেবগণে দিলা বহু ধন।
তাই বিপ্র কবিগণে বিবস্বতের সদনে
উক্থ দ্বারা করিতেছে তাঁহার স্তবন ॥ ৭
সকলের বরণীয় বলপ্রদ সে স্বর্গীয়
জলাধিপ, স্বর্গাধিপ, জেতা সে ইন্দ্রের।
পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ স্বর্গ যাঁর দান—স্তোতৃবর্গ
হৈলা আনন্দিত—সহ তাঁর আনন্দের ॥ ৮
তিনি দিয়াছেন অশ্ব, দিয়াছেন হরিদশ্ব
বহুলোক-উপভোগ্য তাঁহারই গোধন;
দিয়ে হিরণ্ময় ধন, করিয়ে দস্যুহনন,
করেছেন আর্য্যবর্ণে তিনিই পালন ॥ ৯
ওষধি ও বনস্পতি তাঁর দান—দিবা-ভাতি
প্রদত্ত এ অন্তরীক্ষ কর্ত্তৃক তাঁহার।
তিনি করি মেঘ ভেদ, বিপক্ষ করি উচ্ছেদ,
করেছেন অগ্রগামী শত্রুর সংহার ॥ ১০
যুদ্ধোৎসাহে বলীয়ান্ অন্নবান্ ধনবান্
মঘবান্ যুদ্ধে শত্রু করেন হনন।
আমরা যে করি স্তব, শ্রবণ করেন সব;
আশ্রয় পাইতে করি তাঁরে আবাহন ॥ ১১

এই সূক্তে ব্যবহৃত ৫টি শব্দের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনূদিত হইল। যথা—

১ম ঋক্—দাসং
২য় ঐ মানুষাণাং ক্ষিতিনাং (মনুজাত মানুষের)
ঐ ঐ দৈবীনাং বিশাং (দৈব বিশের)
৭ম ঐ বিপ্রাঃ কবয়ঃ
৯ম ঐ আর্য্যং বর্ণং।

প্রথমোক্ত দাস শব্দ অনার্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইরূপ ৯ম ঋকের দস্যু শব্দও অনার্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনুষ্যত্ব সহকারে ক্ষেত্রের অধিপতিত্ব রক্ষার জন্য

যে এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাঁহাদিগকে ক্ষিতি বলিত। এই ক্ষিতি শব্দ হইতে ক্ষেত্রী, ক্ষত্র ও ক্ষত্রিয় শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। "বাহোর্বাশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ জাতঃ" ইহা পৌরাণিক কল্পনা; পুরুষ সূক্তের প্রসিদ্ধ রূপক হইতে উদ্ভূত। যে কেহ পুরুষত্ব সহকারে ক্ষেত্রস্বামী হইবে, সেই ক্ষত্রিয়, ইহাই প্রকৃত বৈদিক মত। দৈববিশ শব্দে "Enlightened" বৈশ্য অর্থাৎ আর্য্য জাতীয় বৈশ্য বুঝাইতেছে। ২য় ঋকে বলা হইতেছে, ক্ষিতি (ক্ষত্র) গণের ও বিশ্ বৈশ্যগণের অগ্রে অগ্রে ইন্দ্র চলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। ৭ম ঋকে বিপ্রকবিগণ অর্থাৎ মেধাবী স্তোতাগণ যে উক্থ দ্বারা ইন্দ্রের স্তবন করেন, তাহাতে যে পুরোহিত শ্রেণী লক্ষ্য করিতেছে, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও, এই দাস, ক্ষিতি, বিশ্ ও বিপ্র শব্দ দ্বারা পরস্পর পানাহার বর্জ্জিত ৪ জাতির লোক বুঝাইতেছে না; কেবল চারি শ্রেণীর লোক বুঝাইতেছে, এই মাত্র। তবে ৯ম ঋকে 'আর্য্যং বর্ণং' শব্দে শ্বেত বর্ণের লোকে কৃষ্ণবর্ণের লোকের বিরুদ্ধ ভাব স্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে (২। ১২। ৪) ঋকে "দাসবর্ণ" শব্দের ব্যবহার আছে। সুতরাং এই "আর্য্য-বর্ণ" ও "দাসবর্ণ" শব্দে মাত্র Fairskinned ও dark-skinned বুঝাইত। আমরা যেমন এক্ষণ জেতৃ ইংরেজকে শ্বেত ও জিত আমাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ জাতি বলি, (হেম বাবু বলিয়াছেন "এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি এক দিন") "আর্য্য বর্ণ" ও "দাস বর্ণ" শব্দে ঠিক্ তাহাই বুঝাইত। এতদপেক্ষা জাতিত্বের অন্য কোন ভাব প্রকাশ করিত, এরূপ অনুভব হয় না। যখন বেদ রচনার বহুশত বর্ষ পরেও আর্য্যানার্য্যের পরিণয় ও তাহাদের পরস্পরের অন্ন-ব্যবহারের কথা পাই, তখন আর্য্যবর্ণ ও দাসবর্ণে দ্বিবিধ বর্ণের লোক বুঝাইলেও 'caste' বলিতে আমরা এক্ষণ যাহা বুঝি, অর্থাৎ আদান-প্রদান ও পরস্পর পানাহার বর্জ্জিত সম্প্রদায়, তাহা বুঝাইত না।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

বিল্বপত্রিকা-সমর্পণ-স্তোত্রম্।

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্।)

(১)

দ্রষ্টা চ দর্শনং দৃশ্যমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে প্রথমা বিল্বপত্রিকা॥

দর্শক-দর্শন-দৃশ্য,—এই পত্রত্রয়,
যে প্রথম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(২)

কর্ত্তা কার্য্যঞ্চ করণমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দ্বিতীয়া বিল্বপত্রিকা॥

কর্ত্তা ও করণ কার্য্য,—এই পত্রত্রয়,
যে দ্বিতীয় বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৩)

ভোক্তা চ ভোজনং ভোজ্যমিতি পত্র-
ত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে তৃতীয়া বিল্বপত্রিকা ॥
ভোক্তা ও ভোজন, ভোজ্য,—এই পত্রত্রয়
যে তৃতীয় বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৪)

ভূর্ভুবশ্চ তথা স্বশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে চতুর্থী বিল্বপত্রিকা ॥
ভূলোক ও স্বর্গ, ভুবর্লোক,—পত্রত্রয়
যে চতুর্থ বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৫)

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে পঞ্চমী বিল্বপত্রিকা ॥
জাগ্রৎ-সুষুপ্তি-স্বপ্ন,—এই পত্রত্রয়
যে পঞ্চম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৬)

স্থূলং সূক্ষ্মং মহাসূক্ষ্মমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে ষষ্ঠিকা বিল্বপত্রিকা ॥
স্থূল, সূক্ষ্ম, মহাসূক্ষ্ম —এই পত্রত্রয়
যেই ষষ্ঠ বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৭)

অবিদ্যা সংসৃতির্জীব ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে সপ্তমী বিল্বপত্রিকা ॥
অবিদ্যা, সংসার, জীব,—এই পত্রত্রয়
যে সপ্তম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৮)

উৎপত্তিশ্চ স্থিতির্নাশ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে অষ্টমী বিল্বপত্রিকা ॥
সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়,—এই পত্রত্রয়
যে অষ্টম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৯)

সত্ত্ব রজস্তম ইতি গুণ-পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে নবমী বিল্বপত্রিকা ॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ,—এই পত্রত্রয়
যে নবম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(১০)

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দশমী বিল্বপত্রিকা ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,—এই পত্রত্রয়
যে দশম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে ইহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(১১)

ত্বমহংহন্তা তথা তত্তা ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে রুদ্রাখ্যা বিল্বপত্রিকা ॥
ত্বং ও অহং, তৎ,—এই পত্রত্রয়
একাদশ বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়;
ভক্তিভরে ইহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(১২)

একাদশৈতাঃ কথিতাঃ শাস্তবো বিল্বপত্রিকাঃ
এতাভিরর্চিতঃ শম্ভুঃ সদ্যো মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥

একাদশ বিল্বপত্র শিবপূজা তরে
সর্ব্বদাই অনুকূল, জানিও সংসারে।
ইহা দিয়া শিব-পূজা যে করে সাধন,
শিব তারে সদ্যমুক্তি করেন অর্পণ !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ,

বিজয়া-গীতি

কেমনে বিদায় দিব মায়াময়ি ! মা তোমায় ?

(১)

বিজয়ার বিসর্জ্জনে বিশ্ব বিসর্জ্জিত হায় !
যেন আর কিছু নাই !
ধূ ধূ শুধু সর্ব্ব ঠাঁই !
মা-হারা সংসার যেন 'সাহারা' মরুর প্রায় !

(২)

সত্য বটে সর্ব্বঘটে আছগো মা ! সর্ব্বদায় ;
আবাহন-বিসর্জ্জন সম্ভবেনা মা তোমায়।
কিন্তু মা যে ব্রহ্মজ্ঞান,
অজ্ঞানে না পায় স্থান ;
তাই মাতৃশোকরাশি বাসি আজি বিজয়ায়।

(৩)

মৃণ্ময়ী ডুবিল জলে,
চিন্ময়ী ত জলে স্থলে ;
অন্তরিক্ষে অন্তস্তলে অনন্তরূপিণী মায়—
দেখেনা এ ভ্রান্ত চিত, শান্ত নয় সান্ত্বনায়।
স্থূলে ভুলে ভোলা মন
সূক্ষ্মে না করে গমন ;
আগমন-নির্গমন অনন্তের নাহি, হায় !
বুঝে না এ ভ্রান্ত চিত—"মা-হারা ছাঁ"
বিজয়ায় !

(৪)

প্রতিমারি বিসর্জ্জন,
প্রতিমায় মা সদা র'ন,
প্রকৃতির প্রতি রূপে মা'রি প্রতিরূপ তায় !
রবিতে মা-রূপরাশি,
শশীতে মায়ের হাসি,
নদীতে মায়ের হৃদি-সুধা-ধারা ব'য়ে যায় !
পবন-প্রবাহময়
মায়েরি নিশ্বাস বয় ;
বিশ্বাস-বিরহে মন আশ্বাস না লভে তায়।

(৫)

(যার)

লোম-কূপে বিশ্ব ডুবে, তারে কি ডুবানো
যায় ?
কারণ-বারিধি-বপু—
বারিতে ডোবে কি কভু ?
প্রবোধ না মানে তবু অবোধ সন্তান তায় ;
মাতৃশোক-বৃদ্ধি-ভয়ে অসিদ্ধেরা সিদ্ধি খায় !
সে দীন সন্তান সবে,
তোমারি কৃপার্দ্র ভবে,
বিজয়া-বিষাদে লভে প্রসাদ সে বিজয়ায়।

(৬)

মা তোমার বিজয়ার মহিমা কি মোহময় !
সহসা সবার যেন কি অপূর্ব্ব ভাবোদয় !
শত্রু-মিত্র-ভেদ ভুলি,
সবে করে কোলাকুলি !
প্রণিপাত—আশীর্ব্বাদ কেহ করে, কেহ পায়

সমানে সমানে আর—
নমস্কারি—নমস্কার!
ঘরে ঘরে নারী-নরে নব সম্মিলন প্রায়!
কি যেন উচ্ছ্বাস রঙ্গে
তরঙ্গিত বঙ্গ-অঙ্গে!
কি যেন ভাবের ঢেউ লেগেছে সবের গায়!
দশমী দিবাবসানে,
কি যেন কি হয় প্রাণে;
হঠাৎ কি যেন সবে হারায়ে, কি যেন পায়!
তাই এত কোলাকুলি—গলাগলি বিজয়ায়॥

(৭)

ভুলি যদি ত্রিদিনের মহোৎসব মা তোমার,
ভুলিব না তব এই মহাভাব বিজয়ার।
ক্ষীরের মন্থনে যথা নবনীর আবির্ভাব,
দুর্গোৎসব-মন্থনেতে তথা বিজয়ার ভাব!
বিজয়া-বিজিত-চিত্ত
শিখে এ সুন্দর সত্য—
মা' হয়ে মা আছে নিত্য, মেয়ে হয়ে আসে যায়!
তাই মা! বিদায় দিতে কি দায় এ বিজয়ায়!

(৮)

মেয়েরা বরণ করি,
আদরে গলাটি ধরি,
কাতরে কেঁদে বলে "মা! আবার আসিস্";
তাতে নাকি আঁখি-নীরে তুইও ভাসিস্!
দেখালি যা এ আঁখিতে,
আর কি প্রাণ থাকিতে—
ভুলিব চিন্ময়ী মূর্ত্তি মৃণ্ময়ীর প্রতিমায়?
মূর্ত্তিপূজা-মহাতত্ত্ব শিখালি মা! বিজয়ায়।

(৯)

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" এ বাণী,
তোমারি 'চণ্ডী'তে শুনি চণ্ডিকে! ভবানি!
মেয়েদের কথা শুনো,
এসগো মা! এস পুনঃ,
ভাসি পুন স্রোতে যেন সে ত্রিদিন-ভরসায়;
তিনশ বাষট্টি ঢেউ ঠেলে ফেলে হাতে পায়!
পুন যেন নবমীতে হাসি-খেলি-নাচি-গাই;
দশমীতে দিয়ে জলে, আঁখিজলে ভেসে যাই!
সে ক্রন্দনানন্দরাশি,
সে অশ্রু-আবৃত হাসি
কে বুঝিবে, না বুঝিলে মা তোমারি করুণায়?
কিঞ্চিতে বঞ্চিত তাই করনি মা! বিজয়ায়।

(১০)

শুধু চিন্ময়রূপে পূজি চিন্ময়ীরূপিণী মায়,
নহে চিত তিরপিত শুধু আধ্যাত্মিকতায়।
মেটে মণ্ডপেতে মম,
মেটে মূর্ত্তি অনুপম!
স্বচ্ছ প্রাণে "ইহাগচ্ছ" আহ্বানে আগচ্ছ তায়।
"গচ্ছ গচ্ছ পরং ধাম" বিসর্জ্জনে বিজয়ায়;
"সম্বৎসরব্যতীতে চ,
পুনরাগমনায় চ"
দেখো মা! থেকনা ভুলে, রেখ মা! এ প্রার্থনায়।
বিজয়া-প্রণতি-গীতি ইতি সমর্পিত পায়॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

প্রশ্নোত্তরম

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিৎ শ্রোত্রিয়ো ভবতি কেনস্বিদ্বিন্দতে মহৎ।
কেনস্বিদ্ দ্বিতীয়বান্ ভবতি রাজন্ কেন চ বুদ্ধিমান্॥১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
ধৃত্যা দ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধসেবয়া॥২॥

যক্ষ উবাচ।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব॥৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং তপ এষাং সতামিব।
মরণং মানুষোভাব পরীবাদোঽসতামিব॥৪॥

যক্ষ উবাচ।

কিং ক্ষত্রিয়াণাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব॥৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইষস্ত্রমেষাং দেবত্বং যজ্ঞ এষাং সতামিব।
ভয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ পরিত্যাগোঽসতামিব॥৬॥

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

যক্ষ প্রশ্ন করিলেন, কি প্রকারে শ্রোত্রিয় হয়, কি প্রকারে মহৎ দ্রব্য লাভ করা যায়; কি প্রকারে দ্বিতীয় হয় ও কি প্রকারে বুদ্ধিমান হয়? ১।

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন।—শ্রুতের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়; তপস্যা দ্বারা মহৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; ধৃতির দ্বারা দ্বিতীয়বান হয় ও বৃদ্ধ-সেবা দ্বারা বুদ্ধিমান হয়।

(জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্ বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেবচ॥ একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ)

যক্ষ কহিলেন।—ব্রাহ্মণদিগের দেবত্ব কি? কোন্ ধর্ম্ম সাধুদিগের ন্যায়? ইঁহাদিগের মানুষ-ভাব কি? এবং অসতের ন্যায় ইঁহাদিগেরই বা কি কার্য্য? ৩॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) ইঁহাদের দেবত্ব; তপস্যা ইঁহাদিগের সাধুদিগের ন্যায় ধর্ম্ম; মরণ ইঁহাদের মানুষ-ভাব ও পরীবাদ ইঁহাদের অসৎ ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য।৪॥

যক্ষ কহিলেন,—ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব কি? কোন্ ধর্ম্ম সাধুগণের ন্যায়? ইঁহাদের মানুষ-ভাব কি ও অসৎ লোকের ন্যায় ইঁহাদের আচরণ কি?৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, —ধনুরূপ অস্ত্র ইঁহাদের দেবত্ব; যজ্ঞ ইঁহাদের সাধুদিগের ন্যায় আচরণ; ভয় ইঁহাদের মানুষ-ভাব এবং শরণাগত ব্যক্তির পরিত্যাগ ইঁহাদের অসৎ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ।৬॥

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

প্রশ্নোত্তরম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যক্ষ উবাচ।

কিমেকং যজ্ঞিয়ং সাম কিমেকং যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
কাচৈকা বৃণুতে যজ্ঞং কাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম মনো বৈ যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
ঋগেকা বৃণুতে যজ্ঞং তাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ॥৮॥

যক্ষ কহিলেন, যজ্ঞিয় সাম কোন্ পদার্থ? কোন্ বস্তু যজ্ঞিয় যজুঃ? কোন্ বস্তু যজ্ঞকে বরণ করে এবং যজ্ঞ কাহাকে অতিক্রম করে না ?।৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—প্রাণই যজ্ঞিয় সাম, মনই যজ্ঞিয় যজুঃ; একমাত্র ঋক্ যজ্ঞকে বরণ করেন এবং যজ্ঞ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না।৮॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাপততাং শ্রেষ্ঠং কিং স্বিন্নিবপতাং বরম্।
কিং স্বিৎ প্রতিষ্ঠমানানাং কিং স্বিৎ প্রসবতাং বরম্ ॥৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ষমাপততাং শ্রেষ্ঠং বীজন্নিবপতাং বরম্।
গাবঃ প্রতিষ্ঠমানানাং পুত্রঃ প্রসবতাং বরম্ ॥১০॥

যক্ষ কহিলেন, পতনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ কি? নিবপনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ কি? প্রতিষ্ঠমানদিগের শ্রেষ্ঠ কি? ও প্রসবকারীদিগের শ্রেষ্ঠ কি? ৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৃষ্টি পতনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ; বীজ নিবপনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ; গো প্রতিষ্ঠমানদিগের শ্রেষ্ঠ এবং পুত্র প্রসবকারীদিগের শ্রেষ্ঠ।১০॥

যক্ষ উবাচ।

ইন্দ্রিয়ার্থাননুভবন্ বুদ্ধিমান্ লোকপূজিতঃ।
সম্মতঃ সর্ব্বভূতানামুচ্ছ্বসন্ কো ন জীবতি ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেবতাতিথি ভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি ॥১২॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিৎ গুরুতরং ভূমেঃ কিং স্বিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ!
কিং স্বিচ্ছীঘ্রতরং বায়োঃ কিং স্বিদ্ বহুতরং তৃণাৎ ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরা তৃণাৎ ॥১৪

যক্ষ কহিলেন, কোন্ বুদ্ধিমান্ লোকপূজিত, সর্ব্বজীবের সম্মত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি অনুভব করিয়া ও নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াও জীবিত নহেন ? ১১

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—দেবতা, অথিতি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আপনার, এই পঞ্চজনের তৃপ্তি সাধন যে না করে, সে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়াও মৃত। ১২

যক্ষ কহিলেন, পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কি ? আকাশ হইতে উচ্চতর কি ? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে ? ও তৃণাপেক্ষা বহুতর কি ? ১৩

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা; আকাশ হইতে পিতা উচ্চতর; বায়ু অপেক্ষা মন শীঘ্রগামী; এবং চিন্তা তৃণ হইতেও বহুতরা॥ ১৪

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিং স্বিজ্জাতং নবেপতি।
কস্যস্বিদ্ধৃদয়ং নাস্তি কিংস্বিদ্বেগেন বর্দ্ধতে ॥১৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন বেপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে ॥১৬

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিৎ প্রবসতো মিত্রং কিং স্বিন্মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য চ কিং মিত্রং কিং স্বিন্মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সার্থঃ প্রবসতাং মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্ মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥১৮॥

যক্ষ কহিলেন, কে নিদ্রিত হইয়া নেত্র নিমীলন করে না ? কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না ? কাহার হৃদয় নাই ও বেগের দ্বারা কি বর্দ্ধিত হয় ? ১৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মৎস্য নিদ্রিত হইয়া চক্ষু নিমীলন করে না; অণ্ড জন্ম গ্রহণ করিয়া স্পন্দিত হয় না; প্রস্তরের হৃদয় নাই এবং নদী বেগের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়।১৬॥

যক্ষ কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র কে ? গৃহবাসীর মিত্র কে ? পীড়িত ব্যক্তির মিত্র কে এবং যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার মিত্র কি ? ১৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র সার্থসঙ্গী; গৃহবাসীর মিত্র ভার্য্যা; পীড়িতের

যক্ষ উবাচ।

কোঽতিথিঃ সর্ব্বভূতানাং কিং স্বিদ্ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অমৃতং কিং স্বিদ্রাজেন্দ্র কিং স্বিৎ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥১৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতিথিঃ সর্ব্বভূতানামগ্নিঃ সোমঃ গবামৃতম্।
সনাতনোঽমৃতো ধর্ম্মো বায়ুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥২০

মিত্র বৈদ্য ও মরণ-ধর্ম্মশীল ব্যক্তির মিত্র দান। গৃহীর মিত্র ভার্য্যা, যথা—

পুত্র-পৌত্র-বধূ-ভৃত্যৈরাকীর্ণমপি সর্ব্বতঃ।
ভার্য্যাহীনং গৃহস্থস্য শূন্যমেব গৃহং ভবেৎ ॥

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহং তু গৃহিণীহীনমরণ্যং সদৃশং মতম্ ॥

* * * *

নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যা সমা গতিঃ
নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে সহায়ো ধর্ম্ম-সংগ্রহে ॥

ভারতে শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্ম্মে ১৪৩ অধ্যায়ে)

তজ্জন্য দান শিক্ষার আদেশ দিয়াছেন—

এতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমং ?

দানং দয়ামিতি। বৃহদারণ্যোকাপনিষদি ৫ অঃ ২ ব্রাহ্মণে ঐ অর্থদান অপেক্ষা জীবের জীবনদানকে শ্রেষ্ঠ দান কহিয়াছেন—

'দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং————"
শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৯ অঃ ভূতদ্রোহরূপ দণ্ডের পরিত্যাগকে দান কহে; ধনদান নহে) ১৮॥

যক্ষ কহিলেন, সকল জীবের অথিতি কে? সনাতন ধর্ম্ম কি? হে রাজেন্দ্র! অমৃত কি? ও এই জগৎ কি? ১৯॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদেকো বিচরতে জাতঃ কো জায়তে পুনঃ।
কিং স্বিদ্ধিমস্য ভৈষজ্যং কিং স্বিদাবপনং মহৎ ॥২১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সূর্য্য একো বিচরতে চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নি হিমস্য ভৈষজ্যং ভূমিরাবপনং মহৎ ॥২২॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদেকপদং ধর্ম্ম্যং কিং স্বিদেকপদং যশঃ।
কিং স্বিদেকপদং স্বর্গ্যং কিং স্বিদেকপদং সুখম্ ॥২৩॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি; গাভীর দুগ্ধ অমৃত; ঐ অমৃতই অমৃত-সমানধর্ম্ম; কারণ গাভীর দুগ্ধ হইতে ঘৃত, ঐ ঘৃত অগ্নিতে আহুত হইয়া চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, সুতরাং গোদুগ্ধই চন্দ্র অর্থাৎ অমৃত ও মোক্ষের হেতু হওয়াতে উহাই সনাতন ধর্ম্ম; এবং বায়ুই এই সমুদায় জগৎ ॥২০॥

যক্ষ কহিলেন, একা কি বিচরণ করে? কোন্ বস্তু পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে? হিমের ঔষধ কি? ও কোন্ বস্তু মহৎ আবপন? ২১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সূর্য্য একা বিচরণ করেন; চন্দ্র পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন; অগ্নি হিমের ঔষধ এবং ভূমি মহৎ আবপন।২২॥

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি? যশের একমাত্র আশ্রয় কি? স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি? এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি? ২৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্ম্যং দানমেকপদং যশঃ।
সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং
সুখম্ ॥২৪॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাত্মা মনুষ্যস্য কিং স্বিদ্দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীব্যং কিং স্বিদস্য কিং স্বিদস্য
পরায়ণম্ ।২৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্য্যা দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনং পর্জ্জন্যো দানমস্য পরা-
য়ণম্ ।২৬॥

যক্ষ উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং কিং স্বিদ্ধনানাং স্যাৎ কি-
মুত্তমম্।
লাভানামুত্তমং কিং স্যাৎ সুখানাং স্যাৎ
কিমুত্তমম্ ।২৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দক্ষতা ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয়; দান একমাত্র যশের আশ্রয়; সত্য একমাত্র স্বর্গের আশ্রয় এবং শীল একমাত্র সুখের আশ্রয় ।২৪॥

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের আত্মা কি? দৈবকৃত সখা কে? ইহার উপজীবন কি? ও ইহার পরম আশ্রয় কি? ২৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুত্র মনুষ্যের আত্মা; ভার্য্যা দৈবকৃত সখা, পর্জ্জন্য ইহার উপজীবন এবং দান ইহার আশ্রয় ।২৬॥

যক্ষ কহিলেন, ধনের মধ্যে উত্তম কি? ধনের মধ্যে উত্তম কি? লাভের মধ্যে উত্তম কি ও সুখের মধ্যে উত্তম কি? ২৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুত্তমং শ্রুতম্।
লাভানাং শ্রেষ্ঠমারোগ্যং সুখানাং তুষ্টি-
রুত্তমা। ২৮॥

যক্ষ উবাচ।

কশ্চধর্ম্মঃ পরোলোকে কশ্চধর্ম্মঃ সদা ফলঃ।
কিং নিয়ম্য ন শোচন্তি কৈশ্চসন্ধির্নজীর্য্যতে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আনৃশংস্যং পরোধর্ম্ম স্ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ।
মনো যম্য ন শোচন্তি সন্ধিঃ সদ্ভির্ন-
জীর্য্যতে ।৩০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দক্ষতা ধনের মধ্যে উত্তম; শাস্ত্রজ্ঞান ধন সকলের মধ্যে উত্তম; লাভের মধ্যে আরোগ্য শ্রেষ্ঠ এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই শ্রেষ্ঠ। ২৮।

যক্ষ কহিলেন, লোকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলপ্রদ? কি দমন করিলে শোক করিতে হয় না ও কাহার সহিত সন্ধি করিলে জীর্ণ হয় না? ২৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আনৃশংস্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; ত্রয়ী (অকার, উকার ও মকার-বিশিষ্ট শব্দ-প্রণব) ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলদাতা, মনকে সংযত করিলে শোকাবসন্ন থাকে না এবং সাধুর সহিত সন্ধি করিলে নষ্ট হয় না।

(অহিংসাধর্ম্ম যথা—অহিংসা পরমো-ধর্ম্মস্তথাহিংসা পরন্তপঃ। অহিংসা পরমং সত্যং যতো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে। (অনুশাসন পর্ব্বণি ১১৫ অধ্যায় ২৫।) প্রণবমাহাত্ম্য যথা—সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মাব্রহ্ম-সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ॥ মাণ্ডুক্যোপনিষদি ২।

যক্ষ উবাচ।

কিন্নু হিত্বা প্রিয়ো ভবতি কিন্নু হিত্বা ন শোচতি।
কিন্নু হিত্বার্থবান্ ভবতি কিন্নু হিত্বা সুখী ভবেৎ। ৩১।

অন্যত্র যথা—যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্।
মনু ২ অঃ ৮২।

যিনি প্রতিদিন আলস্যশূন্য হইয়া তিন বৎসর প্রণব-ব্যাহৃতিযুক্ত সাবিত্রী জপ করেন, তিনি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন ও পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

তজ্জন্যই কহিয়াছেন, মনকে বশ করা ক্লেশ-সাধ্য।

চঞ্চলংহি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥
গীতা ৬অঃ ৩৪।

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ঐ ঐ ৩৫।

পাতঞ্জলিও কহেন—

অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। ১২॥
পাতঞ্জলদর্শনে-যোগপাদে।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়।

সাধু লোকের সহিত মিত্রতা যেরূপ শিলায় রেখা——

"উৎকৃষ্ট মধ্যম অধম জনেষু মৈত্রী
যথাশিলাসু শিকতাসু জলেষু রেখা।"

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মানং হিত্বা প্রিয়োভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ। ৩২।

যক্ষ উবাচ।

কিমর্থং ব্রাহ্মণে দানং কিমর্থং নটনর্ত্তকে।
কিমর্থং চৈব ভৃত্যেষু কিমর্থং চৈব রাজসু। ৩৩।

"সৌহৃদাৎ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বাসো নাম জায়তে।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ॥"
বন পর্ব্বণি ২৯৬অঃ ৪২॥

সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গ সেবধি নৃণাং॥
শ্রীভাগবতে ১১স্কন্ধে ২অঃ ২৮।

সাধূনাং হৃদয়ং ধর্ম্মো বাচোদেবাঃ সনাতনাঃ।
কর্ম্মক্ষয়াণি কর্ম্মাণি যতঃ সাধুর্হরিঃ স্বয়ম্।
কল্কিপুরাণে ১৬অ ২১।

সাধূনাং বাপ্যসাধূনাং সন্ত এব সদা গতিঃ।
মৎস্যপুরাণে ২১০অঃ।

যক্ষ কহিলেন, কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, কি ত্যাগ করিলে শোক করে না, কি ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় ও কি ত্যাগ করিলে সুখী হয়? । ৩১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মান ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক করিতে হয় না; কাম ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলে সুখী হয়। ৩২।

যক্ষ কহিলেন, কি জন্য ব্রাহ্মণকে দান করে, কি জন্য নট ও নর্ত্তককে দান করে,

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম্মার্থং ব্রাহ্মণে দানং যশোঽর্থং নট-নর্ত্তকে।
ভৃত্যেষু ভরণার্থং বৈ ভয়ার্থং চৈব রাজসু।৩৪।

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিদাবৃতো লোকঃ কেনস্বিন্ন প্রকাশতে।
কেন ত্যজতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি।৩৫।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকস্তমসা ন প্রকাশতে।
লোভাৎ ত্যজতি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি।৩৬।

কি জন্য ভৃত্যকে দান করে ও কি জন্য রাজাকে দান করে? ৩৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মার্থ ব্রাহ্মণকে দান করে; নট ও নর্ত্তককে যশের জন্য দান করে, ভরণার্থে ভৃত্যসকলকে ও ভয় জন্য রাজাকে দান করে। ৩৪।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ বস্তু দ্বারা লোক আবৃত, কোন্ বস্তু দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয় না, কি কারণে মিত্রগণ ত্যাগ করে ও কি কারণে স্বর্গগমন করে না? ৩৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অজ্ঞান দ্বারা লোক আবৃত থাকে; অন্ধকার দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয় না, লোভবশতঃ মিত্রগণ ত্যাগ করে এবং সঙ্গবশতঃ স্বর্গগমন করে না। ৩৬।

যক্ষ উবাচ।

মৃতঃ কথং স্যাৎ পুরুষঃ কথং রাষ্ট্রং মৃতং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধং মৃতং কথং বা স্যাৎ কথং যজ্ঞো-মৃতো ভবেৎ।৩৭।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ।

যক্ষ কহিলেন, পুরুষ কি প্রকারে মৃত হয়, কি কারণে রাজ্য মৃত হয়, কি কারণে শ্রাদ্ধ মৃত হয় ও কি জন্য যজ্ঞ মৃত হয়? ৩৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দরিদ্র পুরুষ মৃত, অরাজক রাজ্য মৃত, অশাস্ত্রীয় শ্রাদ্ধ মৃত এবং যজ্ঞে দক্ষিণা দান না করিলে যজ্ঞ মৃত হয়। ৩৮।

(সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং ধৃতঃ
শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি।
মৃচ্ছকটিকে ১ অঙ্কে।)

দারিদ্র্যান্মরণাদ্বামরণং মম রোচতে ন দারিদ্র্যম্।
অল্পক্লেশং মরণং দারিদ্র্যমনন্তকং দুঃখম্।
মৃচ্ছকটিকে ১ অংকে।

রাজ্যরক্ষণ—

মহতাতু প্রযত্নেন স্বরাষ্ট্রস্য চ রক্ষিতা।
নিত্যং স্বেভ্যঃ পরেভ্যশ্চ যথা মাতা যথা পিতা। মৎস্য পুরাণে ২১৯ অঃ।
যদি ন স্যান্নরপতিঃ সম্যঙ্‌নেতা ততঃ প্রজা।
অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব।
কামন্দকী ১সর্গে। শুক্রনীতিসারে ১অং ৬৭

যক্ষ উবাচ।

কাদিক্ কিমুদকং প্রোক্তং কিমন্নং কিঞ্চ বৈ বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য কালমাখ্যাহি——।৩৯।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সন্তো দিগ্‌জলমাকাশং গৌরন্নং প্রার্থনা-বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য ব্রাহ্মণঃ কালঃ——।৪০।

যক্ষ উবাচ।

তপঃ কিং লক্ষণং প্রোক্তং কো দমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষমাচ কা পরা প্রোক্তা কা চ হ্রীঃ পরি-কীর্ত্তিতা।৪১।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং মনসো দমনং দমঃ।
ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনম্।৪২

নিরাহারাঃ প্রজাঃ শোচ্যাঃ শোচ্যং রাষ্ট্র-মরাজকম্।
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৩৮ অঃ ৭৮।

অরক্ষিতাত্মা যো রাজা প্রজাশ্চাপি ন রক্ষতি।
প্রজাশ্চ তস্য ক্ষীয়ন্তে ততঃ সোঽনুবিনশ্যতি।
রাজধর্ম্মে—শান্তি পর্ব্বণি ৯০অঃ

অরক্ষ্যমাণাঃ কুর্ব্বন্তি যৎকিঞ্চিৎ কিল্বিষং প্রজাঃ।
তস্মাচ্চ নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্‌ গৃহ্ণাত্যসৌ করান্।
যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিঃ ১অঃ ৩৩৩

শ্রাদ্ধে লক্ষণক্রান্ত ব্রাহ্মণ না হইলে শ্রাদ্ধ-ফল হয় না, তজ্জন্য শাস্ত্রে দোষিত ব্রাহ্মণ নিষেধ করিয়াছেন। দোষিত ব্রাহ্মণ যথা,—

ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিন এবচ।
যথেষ্টাচারণস্যাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকং।
আহ্নিকতত্ত্বে।

শ্রোত্রিয়-লক্ষণ যথা,—

একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈর-ধীত্য বা।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥
ব্যবহারতত্ত্বে দেবলধৃত বচনং।

শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় দরিদ্রায় চ বাসব।
সন্তুষ্টায় বিনীতায় সর্ব্বভূতহিতায় চ॥
বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাং চ সংযমঃ।
ঈদৃশায় সুরশ্রেষ্ঠ যদ্দত্তংহি তদক্ষয়ং।
বৃহস্পতি-স্মৃতিঃ।

বলিং প্রতি শ্রীভগবদ্‌ বাক্যং—

অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধমধীতমব্রত
যদক্ষিণং যজ্ঞমনর্ত্ত্বিজাহুতম্।
অশ্রদ্ধয়া দত্তমসংস্কৃতং হবি-
রেতে প্রদত্তাস্তব দৈত্যভাগাঃ॥
শ্রীহরিবংশে—ভবিষ্যপর্ব্বণি ৭২।৪৭।

ন যজ্ঞা দক্ষিণাহীনাস্তারয়ন্তি কথঞ্চন।
শান্তি পর্ব্বণি ৭৯ অঃ ১১।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ দিক, কোন্ জল, কোন্ অন্ন, কি বিষ, শ্রাদ্ধের কাল কি? ৩৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সাধু সকল দিক্, আকাশই জল; ইন্দ্রিয়ই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল। ৪০।

যক্ষ কহিলেন, তপস্যার লক্ষণ কি, দম কাহাকে কহে, ক্ষমা কাহাকে কহে, এবং লজ্জা কাহাকে কহে? ৪১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তী থাকাকে তপস্যা কহে; মনের দমনকে

যক্ষ উবাচ।

কিং জ্ঞানং প্রোচ্যতে রাজন্ কঃ শমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দয়া চ কা পরা প্রোক্তা কিঞ্চার্জবমুদাহৃতম্। ৪৩।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা। ৪৪।

যক্ষ উবাচ।

কঃ শত্রুর্দুর্জয়ঃ পুংসাং কশ্চ ব্যাধিরনন্তকঃ।
কীদৃশশ্চ স্মৃতঃ সাধুরসাধুঃ কীদৃশঃ স্মৃতঃ।৪৫।

দম কহে; শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতাকে ক্ষমা কহে এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াকে লজ্জা কহে। ৪২।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! জ্ঞান কাহাকে কহে; শম কাহাকে কহে; দয়া কাহাকে কহে এবং আর্জ্জব কাহাকে কহে? ৪৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তত্ত্বার্থের সম্যক্ বোধকে জ্ঞান কহে; চিত্তের প্রশান্ততাকে শম কহে; সকলের সুখৈষী হওয়াকে দয়া এবং চিত্তের সমতাকে আর্জ্জব কহে।৪৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রোধঃ সুদুর্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ।৪৬

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের দুর্জ্জয় শত্রুকে? অনন্ত ব্যাধি কি? সাধু কাহাকে কহে এবং অসাধু কাহাকে কহে? ৪৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধ দুর্জ্জয় শত্রু; অনন্ত ব্যাধি লোভ; সর্ব্বভূতের হিতরত ব্যক্তিকে সাধু কহে ও নির্দ্দয় ব্যক্তিকে অসাধু কহে। ৪৬।

"কান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোঽস্তি চেদ্দেহিনাম্" পঞ্চরত্নে।

ষড়্দোষাঃ পুরুষেনেহ হাতব্যাভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধং আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৩২ অঃ ৮১।

লোভোঽস্তি গুণেন কিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ। ষড়রত্নে।

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যুনশ্বরম্॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কঃ, ১০ অঃ ৯।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।*

(শ্রীম—কথিত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ শনিবার, ২৪শে চৈত্র, ইংরাজি ৫ই এপ্রিল, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। প্রাতঃকাল; বেলা আন্দাজ আটটা। মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহাস্য বদনে কক্ষ মধ্যে ছোট খাটটীর উপর উপবিষ্ট; মেঝেতে কয়েকটী ভক্ত বসিয়া আছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রাণকৃষ্ণ জনাইয়ের মুখুর্য্যেদের বংশসম্ভূত। কলিকাতায় শ্যামপুকুরে বাড়ী, ম্যাকেঞ্জি লয়াল এবং কোর Exchange নামক নীলাম-ঘরের কার্য্যাধ্যক্ষ। তিনি গৃহস্থ, কিন্তু বেদান্ত-চর্চ্চায় তাঁহার বড় প্রীতি। পরমহংসদেবকে বড় প্রীতি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ইতিমধ্যে একদিন নিজের বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। তিনি বাগবাজারের ঘাটে রোজ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন ও নৌকার সুবিধা হইলেই একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। আজ এইরূপে নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন। মাষ্টারকেও তুলিয়া লইয়াছিলেন। নৌকা কূল হইতে একটু অগ্রসর হইলেই ঢেউ হইতে লাগিল। মাষ্টার বলিলেন, "আমায় নামাইয়া দিতে হইবে।" প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁহার বন্ধু অনেক বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কোন মতে শুনিলেন না, বলিলেন "আমায় নামাইয়া দাও, আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাব"। অগত্যা প্রাণকৃষ্ণ তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন।

মাষ্টার পেঁছিয়া দেখেন যে, তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পেঁছিয়াছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তিনি একপাশে বসিলেন।

(অবতারবাদ।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কিন্তু মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যদি বল, অবতার কেমন ক'রে হবে, যাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা জীবের ধর্ম্ম অনেক আছে, হয়ত রোগ শোকও আছে; তার উত্তর এই যে, "পঞ্চ-ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।"

"দেখ না, রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ে কাঁদ্‌তে লাগিলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ কর্‌বার জন্যে বরাহ-অবতার হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হ'লো, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হ'য়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপনা হ'য়েছে। তাদের নিয়ে এক রকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বল্‌লেন, একি হ'লো, ঠাকুর যে আর আস্‌তে চান না! তখন সকলে শিবের কাছে গেলেন ও ব্যাপারটী নিবেদন কর্‌লেন। শিব গিয়ে তাঁকে অনেক জেদাজিদি কর্‌লেন। তিনি ছানাপনাদের মাই দিতে লাগ্‌লেন। তখন শিব ত্রিশূল

* প্রথম ভাগ ছাপা হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। ১৩।২ গুরুদাস চৌধুরীর গলি; কলিকাতা।

এনে শরীরটা ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর হি হি ক'রে হেসে তখন স্বধামে চ'লে গেলেন।"

প্রাণকৃষ্ণ। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়! অনাহত শব্দটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনাহত শব্দ সর্ব্বদাই এমনি হ'চ্ছে। প্রণবের ধ্বনি, এই ধ্বনি পরব্রহ্ম থেকে আস্‌ছে। যোগীরা শুন্‌তে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুন্‌তে পায় না। যোগী জান্‌তে পারে যে, সেই ধ্বনি নাভি থেকে একদিকে উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।

(পরলোক।)

প্রাণকৃষ্ণ। মহাশয়, পরলোক কি রকম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেনও ঐ কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ হয় নাই, ততক্ষণ আবার জন্ম গ্রহণ কর্ত্তে হবে। কিন্তু জ্ঞান লাভ হলে আর এ সংসারে আস্‌তে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে আর যেতে হয় না।

"কুমোরের হাঁড়ী রৌদ্রে শুকুতে দেয় দেখনি? তার ভিতর পাকা হাঁড়ীও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়ীও আছে। গরু টরু চ'লে গেলে হাঁড়ী কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ী ভেঙ্গে গেলে, কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়; তার দ্বারায় আর কোন কাজ হয় না। পাকা হাঁড়ীর আর কুমোরের চাকে আস্‌তে হয় না। কাঁচা হাঁড়ী ভাঙ্গলে, কুমোর তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ী তৈয়ার হয়।"

"তাই যতক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এ সংসারে ফিরে ফিরে আস্‌তে হবে।

"সিদ্ধ ধান আর পুঁত্‌লে কি হবে? তাতে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হ'লে, তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হ'য়ে যায়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(বেদান্ত ও অহঙ্কার।)

পুরাণ-মতে ভক্ত একটী, ভগবান একটী, আমি একটী, তুমি একটী; শরীর যেন সরা; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যেন জল; ব্রহ্ম যেন সূর্য্য। এই শরীর-সরা মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপ জল রয়েছে। আর ব্রহ্ম সূর্য্য-স্বরূপ, তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।

বেদান্ত-মতে ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ। অহংরূপ একটা লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে প'ড়ে আছে।

(মাষ্টারের প্রতি) এইটে শুনে যাও—অহং লাটিটী তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র। অহং লাটিটী থাক্‌লে, দুটো দেখায়। এ এক ভাগ জল, ও এক ভাগ জল; ব্রহ্ম-জ্ঞান হ'লে সমাধিস্থ হয়, তখন এই অহং পুঁছে যায়।"

"তবে লোক-শিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে করে, আমি জ্ঞানী হ'য়েছি।

লক্ষণ কি? জ্ঞানী কারু অনিষ্ট কর্‌তে পারে না। বালকের মত হ'য়ে যায়।

লোহার খড়্গো যদি পরশ-মণি ছোঁয়ান হয়, তখন খড়্গ সোণা হ'য়ে যায়। সোণার খড়্গে হিংসার কাজ হয় না। তবে বাহিরে হয়ত দেখায় যে রাগ আছে, কি অহংকার আছে; কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও সব কিছুই থাকে না।"

"দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখ্‌লে বোধ হয় যে ঠিক এক গাছা দড়ি প'ড়ে আছে। কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার—অহংকারের আকার কেবল; কিন্তু সতি কার ক্রোধ নয়, অহংকার নয়।"

"বালকের আঁট থাকে না। এই খেলা-ঘর ক'র্‌লে, কেউ হাত দেয়, ত ধেই ধেই ক'রে নেচে কাঁদ্‌তে আরম্ভ ক'রে। আবার নিজেই ভেঙ্গে ফেল্‌বে সব। এই কাপড়ে এত আঁট, ব'ল্‌ছে "আমার বাবা দিয়েছে, দেবো না।" আবার একটা পুতুল দিলে পরে ভুলে যায়, কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চ'লে যায়।"

"এই সব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয় ত বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য্য। কোচ, কেদারা, ছবি, গাড়ি, ঘোঁড়া; আর সব ফেলে কাশী চ'লে যাবে।

(বেদান্ত ও অবস্থাত্রয় সাক্ষী।)

"বেদান্ত-মতে জাগরণ কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন দেখেছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো "তুই কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালি? আমি রাজা হ'য়েছিলুম। সাত ছেলের বাপ হ'য়ে ছিলুম। ছেলেরা সব লেখা পড়া, অস্ত্রবিদ্যা, সব শিখ্‌ছিল। আমি সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব কচ্ছিলুম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি? সে ব্যক্তি বল্‌লে "ও ত স্বপন, ওতে আর কি হ'য়েছে?" কাঠুরে বল্‌লে, "দূর তুই বুঝিস্‌না, আমার কাঠুরে হওয়াও যেমন সত্যি, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্যি। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য।"

প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান করেন, তাই বুঝি ঠাকুর জ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছিলেন। এই বারে ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থার কথা বলি-তেছেন। ইহাতে কি তিনি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিতেছেন?

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। নেতি নেতি ক'রে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। নেতি নেতি বিচার ক'রে সমাধিস্থ হ'লে আত্মাকে ধরা যায়।

"বিজ্ঞান কি, না বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে শুনেছে, সে অজ্ঞান; যে দেখেছে, সে জ্ঞানী; যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপ জানা হ'য়েছে। ঈশ্বর দর্শন ক'রে, তাঁর সহিত আলাপ; যেন তিনি পরম আত্মীয়; এর নাম বিজ্ঞান।

"প্রথমে নেতি নেতি কর্ত্তে হয়। তিনি পঞ্চভূত নন, তিনি ইন্দ্রিয় নন, তিনি মন, বুদ্ধি, অহংকার নন, তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। অর্থাৎ ছাতে উঠ্‌তে হবে। সব সিঁড়ী একে একে ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। সিঁড়ী কিছু ছাত নয়। কিন্তু ছাতের উপর পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাত তৈয়ারী,—ইট, চুণ, সুরকি,—সেই জিনি-সেই সিঁড়িও তৈয়ারী। যিনি পরব্রহ্ম,

তিনিই জীব-জগৎ হ'য়েছেন ; চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হ'য়েছেন। মাটী টাটী এত শক্ত কেন—যদি আত্মা থেকেই হ'য়েছে? তাঁর ইচ্ছাতে সব হ'তে পারে। শোণিত-শুক্র থেকে যে হাড়-মাস হচ্ছে। সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(গৃহস্থ ও বিজ্ঞান।)

"বিজ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে. তিনিই জীব-জগৎ হ'য়েছেন। সংসার, তিনি ছাড়া নন। তাই রামচন্দ্র যখন জ্ঞান লাভের পর "সংসারে থাক্‌বো না" বল্লেন, দশরথ বশিষ্টকে তাঁর কাছে পাঠিয়েদিলেন, বোঝা-বার জন্যে। বশিষ্ট ব'ল্লেন "রাম! যদি সংসার ঈশ্বর-ছাড়া হয়. ত তুমি ত্যাগ ক'র্‌তে পার।" রামচন্দ্র তখন চুপ্‌ করে রৈলেন। তিনি বেশ জানেন যে, ঈশ্বর-ছাড়া কিছুই নাই। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হ'লো না।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কথাটা এই, মন শুদ্ধ হলেই সেই চক্ষু হয়। দেখনা কুমারী-পূজা। হাগা-মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখ্‌লাম—সাক্ষাৎ ভগবতী! এক দিকে স্ত্রী, এক দিকে ছেলে, দুজনকেই আদর কর্‌ছে, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। তবেই হ'লো মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হয়, সেই মনটী পেলে, সংসারেই ভগবান-দর্শন হয়। তবে সাধন চাই।

(গৃহস্থ ও "কামিনী")

"সাধন চাই। এইটী জেনো যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই পুরুষকে ভালবাসে। পুরুষও স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক ভালবাসে। তাই শীগ্‌গির পড়ে যায়। কিন্তু সংসারে তেমনি খুব সুবিধা। বিশেষ দরকার হ'লে, হ'লো একবার স্বদারায় গমন ক'র্‌লে।

(মাষ্টারের প্রতি)। মাষ্টার হাস্‌চো কেন?

মাষ্টার (স্বগত) সংসারী লোক একেবারে পেরে উঠ্‌বে না ব'লে ঠাকুর এই পর্য্যন্ত অনুমতি দিলেন। ষোল আনা ব্রহ্মচর্য্য সংসারে থেকে কি একেবারে অসম্ভব?

হঠযোগীর প্রবেশ।

পঞ্চবটীতে একটী হঠযোগী কয়দিন ধরিয়া আছেন। তিনি কেবল দুধ আর আফিং খান, আর হঠযোগ করেন, ভাত টাত খান না। আফিংএর ও দুগ্ধের পয়সার অভাব হইয়াছিল। ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর কাছে গিয়াছিলেন, তখন হঠযোগীর সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। হঠযোগী রাখালকে বলেন যে "পরমহংসজীকে ব'লে যেন আমার কিছু ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়।" ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "কল্‌কাতার বাবুরা এলে ব'লে দেখ্‌বো।"

হঠযোগী। (ঠাকুরের প্রতি)। "আপ্‌ রাখালসে ক্যা বোলা থা"?

"শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ব'লেছিলুম, দেখ্‌তে, যদি কোন বাবু কিছু দেয়। তা কৈ, (প্রাণকৃষ্ণ আদি ভক্তদের প্রতি) তোমরা বুঝি এঁদের like কর না?" প্রাণ-

কৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। (হঠযোগীর প্রস্থান)।

ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সত্য কথা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রাণকৃষ্ণ আদি ভক্তদের প্রতি) "আর সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আমার সত্য কথার আঁট তবু একটু কম্‌ছে। আগে ভারী আঁট ছিল। যদি ব'ল্‌তুম নাইবো। গঙ্গায় নামা হ'লো, মন্ত্রোচ্চারণ হ'লো, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হ'লো, পূরো নাওয়া বুঝি হ'লোনা। অমুক জায়গায় হাগ্‌তে যাব, তো সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ী গেলাম, কল্‌কাতায়, ব'লে ফেলেছি রুটী খাব না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে! কিন্তু রুটী খাবনা ব'লেছি, তখন মিঠাই দিয়ে পেট ভরাই।

"এখন তবু একটু আঁট ক'মেছে। বাহ্যে পায় নাই, যাবো ব'লে ফেলেছি, কি হবে? রামকে* জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম। সে ব'ল্লে, গিয়ে কাজ নাই, তখন বিচার ক'ল্লুম, ভাবলুম, সব ত নারায়ণ। রামও নারায়ণ, ওর কথাটাই বা না শুনি কেন?

"হাতী নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও ত নারায়ণ। মাহুত যেখানে ব'ল্‌ছে, "হাতীর কাছে এসনা", সেখানে মাহুতের কথা না শুনি কেন?

"এই রকম বিচার ক'রে আগেকার চেয়ে একটু আঁট কমেছে।

(ক্রমশঃ)

(শ্রীম-কথিত)

* ৺রাম চাটুয্যে, ঠাকুরবাড়ীর পূজারি।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

দশম খণ্ড।

এই খণ্ডে দ্বিজত্বনিষ্পাদক উপনয়ন নামক শ্রৌতসংস্কার ব্যাখ্যাত হইতেছে। উপনয়ন শব্দের অর্থ, সমীপে লইয়া যাওয়া; বেদপাঠার্থী বালককে গুরুসমীপে লইয়া যাওয়া ব্যাপার যে সংস্কার দ্বারা সংসাধিত হয়, তাহারই নাম উপনয়নসংস্কার।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি। আচার্য্য মনু বলেন "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।" দ্বিজাতি বা দ্বিজ শব্দের অর্থ যাহাদের দুইবার জন্ম হয়। একবার মাতৃগর্ভ-বিচ্যুতি প্রথম জন্ম, উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম সমর্থিত হয়। উপনয়ন কালে, সন্তান যে ভাবে গর্ভে অবস্থিত হয়, ঠিক সেইভাবে উপনয়নার্হ বালক পবিত্রকৃষ্ণসারচর্ম্মে উপবিষ্ট হইবে এবং তাহার পৃষ্ঠোপরিও কৃষ্ণসারচর্ম্ম আবৃত রহিবে। ইহাই দ্বিতীয়বার গর্ভবাস। পরে ঐ গর্ভনিক্রান্তি সংঘটিত হইবে, তখন দ্বিতীয়জন্মের চিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণসারচর্ম্মনির্ম্মিত উত্তরীয় বা পবিত্র গলদেশে শোভমান থাকিবে; ইহাই প্রাচীনকালের উপনয়ন-প্রথায় দ্বিতীয়জন্ম এবং পবিত্রবহন। পরে সময়চক্রের অসাধারণ পরিবর্ত্তনে, ব্যবহার-ব্যতিক্রম

উপস্থিত হইয়াছে; পরিবর্ত্তনের অনুসার-সম্বল শাস্ত্রও একটু এদিক্ ওদিক্ অনুকল্প বিকল্পের আভাসে আবৃত হইয়াছে। গোপথ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মচারী গর্ভস্থ শিশুর মত পবিত্র-কৃষ্ণসার-চর্ম্মাবৃত থাকিয়া, পরে প্রসূত হইবেন, এরূপ উক্তি দেখা যায়। অধুনাতন সমাজে ও উপনয়নকালে ব্রহ্মচারীকে বস্ত্রাবৃত থাকিতে দেখিতে পাই, আর কৃষ্ণসারচর্ম্ম একটুক্‌রা পবিত্রে (পৈতায়) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। স্রোতস্বতীর বেগ মন্দীভূত হইলে বহুকাল পরেও তাহার পূর্ব্বাবস্থার পরিচয় পাইতে নিদর্শন সহায়তা করে; আমাদের দেশে আর্য্যাচার বিষয়ে অনেক সময় এইরূপ জরৎকঙ্কাল নিদর্শন অস্পষ্ট পূর্ব্বাবস্থার একটা আব্‌ছায়া মত অনুস্মৃতি আনিয়া দেয়। এই পবিত্র যজ্ঞোপবীত নামে পরিচিত।

অনেকে 'যজ্ঞোপবীত' নাম দেখিয়া অনুমান করেন, ইহা যজ্ঞকালে ধারণ করা হইত, অন্য সময়ে গলে রাখা হইত না; বস্তুতঃ ইহা উপনয়ন সংস্কারের বা ব্রহ্মণ্যের পরিজ্ঞাপক অসাধারণ চিহ্ন, সুতরাং সততই ধারণ করা হইত বোধ হয়; বিশেষতঃ আর্য্যজীবন যজ্ঞময়; প্রতিদিন নিত্যকর্ম্ম যজ্ঞগুলিও করিতে গেলে অত্যল্প অবসর মাত্র লাভ করা যায়; কাজেই যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগের সময় তাঁহাদের মতেও দুষ্প্রাপ্য। কৃষ্ণাজিন সর্ব্বদা সুলভ না হওয়ায়, আর্য্যগণ উপনিবেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সামাজিক শিল্পোন্নতির ক্রমানুসারে, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে যজ্ঞোপবীত নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। গোভিলদেবের গৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাই; "যজ্ঞোপবীতং কুরুতে সূত্রং বস্ত্রং বাঽপি কুশরজ্জুমেব।" সূত্র, বস্ত্র, কুশরজ্জু সম্ভব এবং সুবিধা অনুসারে যজ্ঞোপবীতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্ত্তমান সমাজে কেবল সূত্র সকলগুলির স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। হয়ত সভ্যতাভিমানী সমাজ কুশরজ্জু বা বস্ত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণে অসুবিধা অনুভব করিয়াই সূত্রগ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল; তখন সূত্রই সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞোপবীত মনে করা হইল এবং তদভাবে বস্ত্র বা কুশরজ্জু অগত্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির হইল। গোভিলাচার্য্যের সূত্রে প্রথমেই সূত্রের নাম থাকিবার বোধ হয় উদ্দেশ্য এইরূপ। সূত্র বা বস্ত্রব্যবহার সমাজে প্রচলিত হইলে, পরে কুশরজ্জু স্থান পাইতে পারে, এরূপ মনে হয় না; পরন্তু সূত্র বা বস্ত্র প্রণয়নের পূর্ব্বেও আর্য্যাস্থানে কুশরজ্জু বেমিল হইত না। আরও দেখা যায়, সমাজ ক্রমশঃ রুচির অনুগামী হইতে বাধ্য হয়। এতাবৎকালে বুঝা গেল, চর্ম্ম, কুশরজ্জু, বস্ত্র, ক্রমশঃ বর্জ্জিত হইল এবং সূত্র পবিত্ররূপে ব্যবহৃত হইল। তখন যজ্ঞোপবীত 'যজ্ঞসূত্র' নাম ধারণ করিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দ্বিতীয়-জন্ম সূচক অর্থাৎ দ্বিজত্বজ্ঞাপক বাহ্যচিহ্ন স্বরূপ যজ্ঞোপবীতে এই সময় হইতে আধ্যাত্মিক ভাব অর্পিত হইল। তখন ইহা অনেকের নিকট 'ব্রহ্মসূত্র' নামে পরিচিত হইল। এই যুগ ভারতের দার্শনিকযুগ; এই সময়ে সংহিতা বা ব্রাহ্মণ ভাগের প্রাধান্য সঙ্কুচিত এবং উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা প্রচারিত হইতেছিল। "ব্রহ্মসূত্র"

পরমপদ ব্রহ্ম সূচনা করে, এই সূত্র-মর্ম্ম যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনিই প্রকৃত বেদজ্ঞ*" এই আধ্যাত্মিক ভাব ব্রহ্মোপনিষদে দেখা যায়।

এতদিনও 'সূত্র' উল্লেখ দেখা যায়। ইহার পর তিন সূত্র একত্র করিয়া একটী গ্রন্থি রচনা করিবার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ছন্দোগ পরিশিষ্টে "উর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং কার্য্যং তন্তু ত্রয়মধোবৃতং ত্রিবৃতঞ্চোপবীতং স্যাৎ তস্যৈকাগ্রন্থিরিষ্যতে" দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে তিনটীসূত্র একত্রিত করিয়া একটী ত্রিদণ্ডী বা গ্রন্থি প্রস্তুত করিবার উল্লেখ কোনও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। মহর্ষি মনুও স্মৃতিশাস্ত্রে ত্রিবৃৎ যজ্ঞসূত্রের কথা বলিয়াছেন।

মহর্ষি দেবলের সময়ে এই সূত্র এক গাছি প্রস্তুত করিতে আবার নয়টী ক্ষুদ্র সূত্রের আবশ্যক হইয়া উঠিল। দেবল বলিয়াছেন "নয় গাছি তন্তু দ্বারা প্রস্তুত সূত্র দ্বারা যজ্ঞোপবীত করিতে হইবে। ঐ সূত্র ব্রহ্মা উৎপন্ন করিয়াছেন, বিষ্ণু ত্রিগুণিত করিয়াছেন, শিব উহার গ্রন্থি রচনা করিয়াছেন এবং সাবিত্রী দ্বারা উহা অভিমন্ত্রিত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকি, পবন, অগ্নি, শুক্র, সূর্য্য এবং সুরাচার্য্য, ইহারা নয়জনই নয় তন্তুর অধিষ্ঠাতা নব দেবতা।" এই সকল প্রমাণে অবগত হওয়া যায়, দার্শনিকযুগে যজ্ঞোপবীতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়া স্মার্ত্তযুগে সমধিক পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তখন ত্রিদণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও, আরম্ভ হইয়াছিল। বাগ্‌দণ্ড, কায়দণ্ড, মনোদণ্ড, এই তিন দণ্ড থাকিলেই ত্রিদণ্ডী, এইরূপ কথা স্বয়ং মনুই বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রনির্ম্মিত এবং বৈশ্যের মেষলোমরচিত যজ্ঞোপবীত হইবে, এইরূপ পার্থক্য মনু উল্লেখ করিয়াছেন। বিস্তার শঙ্কায় উপনয়নে যজ্ঞোপবীত ধারণের আরও অনেক রহস্য প্রকাশ করিবার অবকাশ হইল না।

দার্শনিকযুগে যজ্ঞোপবীত কেবল দ্বিজত্বের চিহ্নমাত্র রহিল না, উহার সহিত সুন্দর ধর্ম্মভাবের সংশ্রব হইল, এবং উহার গৌরব বর্দ্ধিত হইল। ধর্ম্মভাবহীন সূত্রমাত্র পরিজ্ঞাপক না হওয়া উচিত। উপনয়নের উদ্দেশ্য, বেদাদি জ্ঞানবিকাশক শাস্ত্রতত্ত্ব শিক্ষা করিতে গুরুর নিকট গমন। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংযত, শিক্ষিত, তেজস্বী ব্রহ্মচারী নানাশাস্ত্রালোচন ও বহুজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক সমাজের—দেশের—অভাব মোচন করিয়া, জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন করিবেন; এরূপ ব্যক্তির বাহ্য-চিহ্নের সহিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মধারণার সংমিশ্রণ বেশ 'সোনায় সোহাগা' হইয়াছিল। দার্শনিক মস্তিষ্কের বড়ই সম্মানিত সিদ্ধান্ত বলিয়া ইহা সমাজের মধ্যে বেশ পবিত্রতা বা ধর্ম্মভাবের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিল। কালের কুটিল গতিতে উপনয়ন কেবল

---

*সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরংপদং তৎসূত্রং বিদিতং যেন সবিপ্রো বেদপারগঃ। ব্রহ্মোপনিষদ্।

প্রহসন মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। গুরু-গৃহ-বাস কেবল তিন রাত্রি চখ্ নক্ বুজিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া থোঁস গল্প করায় পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম, শক্তিলাভ, সবই কথামাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অধঃপতিত দেশে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সাধন চাই, বেদাধ্যয়ন (জ্ঞানশিক্ষা) অবিরত আবশ্যক। যজ্ঞসূত্র পুনর্ব্বার ব্রহ্মণ্যের অসাধারণ নিদর্শনে পরিণত হওয়া দরকার; নচেৎ বৃথা অর্থব্যয়, বৃথা পরিশ্রম, ব্রত, উপবাস; জাতীয় ভাব কিছুতেই উদ্দীপিত হইবে না। কথাপ্রসঙ্গে আমরা বহু দূরে আসিয়াছি। এখানে বিরাম লাভ করা গেল।

আপস্তম্বের উপনয়নব্যাখ্যার প্রথমে প্রতিজ্ঞাজ্ঞাপক সূত্র।

১। উপনয়নং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অর্থাৎ এই পরিচ্ছেদে আমরা উপনয়ন সংস্কারের বিষয় বলিব।

উপনয়নের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে অর্থাৎ উপনয়নার্হ কুমারের বয়স সম্বন্ধে গৃহ্য-সূত্রকার প্রধান আপস্তম্বের মত,—

২। গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়ীত।

৩। গর্ভৈকাদশেষু রাজন্যং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং॥

গর্ভাষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণকুমারকে উপনীত করাইবে। গর্ভ একাদশবর্ষে ক্ষত্রিয় এবং গর্ভদ্বাদশবর্ষে বৈশ্যকুমারের উপনয়ন হওয়া উচিত। যে সময় প্রথমে সন্তান গর্ভস্থ হয়, সেই সময় হইতে গণনা করিয়া অষ্টম-বর্ষ পূর্ণ হইলে, ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়ন কাল উপস্থিত হয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গর্ভ হইতে গণনা করিয়া একাদশ এবং দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন কাল। এই কাল-নির্ণয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, গর্ভাষ্টমে অথবা অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কাল। ক্ষত্রিয়ের কেহ দশ—একাদশবর্ষ, বৈশ্যের কেহ একাদশ—দ্বাদশবর্ষ বলেন। তিন জাতির মধ্যে উপনয়ন-কালের পার্থক্য হওয়ার কারণ আছে। ব্রাহ্মণসন্তান বাল্যাবধি ব্রাহ্মণসমাজে বাস করে, অনিচ্ছায় বা যদৃচ্ছায় তাহারা অনেক জ্ঞান লাভ করে, যেহেতু ব্রাহ্মণেরাই অধ্যয়নের গুরু, অব্যাহত পঠন পাঠন তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত। সংসর্গজাত শিক্ষা এবং বাল্যাবধি অনিচ্ছাপ্রাপ্ত অনুশীলনের ফলে তাহারা সত্বর শিক্ষার্হ হয়; বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা ব্রাহ্মণসমাজে ব্রাহ্মণকুমার বাধ্য হইয়া শিখিয়া ফেলে এবং সহজতঃ কষ্ট-সহিষ্ণু হয়। এরূপাবস্থায় তাহাকে গুরু-গৃহে ব্রহ্মচারী হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে যত অল্প বয়সে অধিকার দেওয়া যায়, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যসন্তানকে তত সত্বর দেওয়া হয় না। ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈশ্যের সহিত ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধ কিছু দূরবর্ত্তী, কাজেই ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পূর্ব্বে অধিকারী। ব্রাহ্মণ আচার্য্যের গৃহে বাস করিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অপেক্ষা আগে যোগ্য হইবে, কারণ ক্ষত্রিয়সন্তান বৈশ্য অপেক্ষা অনেক সময় অধিক ব্রাহ্মণসংসর্গ লাভ করে। রাজশক্তির অধিকারী হইয়াও ক্ষত্রিয়, কঠোরতার শিক্ষায় এবং ব্রাহ্মণ-সংসৃষ্ট অভিজ্ঞতায়, বৈশ্যকে পশ্চাতে রাখিতে পারে। পূর্ব্বাপরতার একমাত্র কারণ অধিকার-যোগ্যতা; ঐ যোগ্যতা যাহার যত

দিনে উৎপন্ন হইবে, সে ততদিনেই অধিকারী; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের, পরে রাজন্যের, অনন্তর বৈশ্যের অধিকার যুক্তিযুক্ত।

উপনয়নের সময় অর্থাৎ ঋতু-মাসাদির বিবেচনা করিতে গিয়া আপস্তম্ব বলিতেছেন।—

৪। বসন্তো গ্রীষ্মঃ শরদিত্যৃতবো বর্ণানুপূর্ব্বেণ।

ব্রাহ্মণ-কুমারের উপনয়নকাল বসন্ত, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্ম এবং বৈশ্যের শরৎ। এই ঋতুভেদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ়রহস্য আছে, তবে অনভিজ্ঞ লেখকের সে বিষয়ে কিছু জ্ঞান নাই। গ্রীষ্মকাল উগ্রতার নিদর্শন; গ্রীষ্মের বিভীষণভাব মনে চিন্তা করিলে, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। গ্রীষ্মে উগ্রতার অবতার ক্ষত্রিয়জাতি উপনীত হইবেন। সময়ের প্রকৃতি উগ্রতাময়ী; ঐ সময়ের সাধক-ব্রহ্মচারী উগ্রতেজা ক্ষত্রিয়কুমার। সন্তাপযুক্তকালে তেজস্বী সাধক তেজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারেন। বসন্ত মধুরতার নিদর্শন। প্রকৃতির জীর্ণ-পরিত্যাগের এবং নূতন পবিত্র পরিচ্ছদ পরিধানের অবসর সুবসন্ত; সাধক ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী এই শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর সময়ে নিজের শান্তিপ্রিয়তা, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি স্নিগ্ধগুণের উদ্বোধনে কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। সময় ও উদ্দেশ্যে সাম্য চাই। ভীষণা রণরঙ্গিণী নৃমুণ্ডমালিনীর পূজার ব্যবস্থা অমানিশার নিবিড় অন্ধকার রজনীতে, আর ব্রজবিলাসিনী মধুরিমময়ী গোলোকেশ্বরী পূর্ণশক্তি রাধার পূজাকাল রাসপূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ধবলা অমলযামিনী। কালে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। দ্বিপ্রহরের পক্ষে যে সঙ্গীত ভাবোদ্দীপক, প্রভাতের পক্ষে তাহা অরুচিকর। শরতে বৈশ্যের চিরসম্বল কৃষি ও বাণিজ্য, উভয়েরই অনুকূলতা আছে। যে সময় স্বশক্তির অনুকূল ও স্বজাতীয়জীবনের সমধর্ম্মা, সেই সময়ই জাতীয় শক্তির উদ্বোধনের জন্য প্রশস্ত হইবার প্রকৃষ্টকাল। এইরূপ ব্যাখ্যা একদা এক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ত্যাগশীল মহোদয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম; যোগ্যতা বিচারের ভার সুযোগ্য পাঠকগণের উপর অর্পণ করিলাম।

জ্যোতিবশাস্ত্রের মতে উপনয়নের দিন হইবে—বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র ও তারা-শুদ্ধি থাকিলে, শুক্লপক্ষে, স্বাধ্যায়দিনে, উত্তরায়ণকালে; রবি, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে; অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুষ্যা, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রে, কালশুদ্ধিতে। ইহাতে হরিশয়ন, যুতবেধ, যামিত্রবেধ, দশযোগভঙ্গ ও গলগ্রহ প্রভৃতি দোষ না থাকে, এটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা এইরূপ ভাবের একটী জ্যোতিষের বচন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, যথা,—

জীবার্কেন্দুবিশুদ্ধৌ হরিশয়নবহির্ভাস্করে চোত্তরস্থে,
স্বাধ্যায়ে বেদবর্ণাধিপ ইহ শুভদে ক্ষৌরভে নাদিতৌচ।
শুক্রার্কেজ্যার্কলগ্নে রবিমদনতিথিং প্রোজ্‌ঝ্য-ষষ্ঠাষ্টমেন্দুং
নোজ্জীবাস্তাতিচারেঽর্কসিতগুরুদিনে কালশুদ্ধৌ ব্রতং স্যাৎ॥

উপনয়নের ব্যাপারাদি কিরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার আভাস দিতে গিয়া আপস্তম্ব বলিতেছেন।—

৫। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা আশিষো বাচয়িত্বা কুমারং ভোজয়িত্বা অনুবাকস্য প্রথমেন যজুষা আপঃ সংসৃজ্য উষ্ণাঃশীতাস্বানীয় উত্তরয়া শির উনত্তি।

ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদের দ্বারা আশীর্ব্বাক্য উচ্চারণ করাইয়া, (পুণ্যাহ স্বস্তি ঋদ্ধি বাচনই বৃত্তিকার হর দত্তের মতে আশীর্ব্বাক্য-উচ্চারণ,) অনন্তর উপনয়নযোগ্য কুমারকে ভোজন করাইবে। অনন্তর আচার্য্য উত্তর অনুবাকের প্রথম যজুর্মন্ত্র (উষ্ণেন বায়ো' ইত্যাদি) দ্বারা উষ্ণ এবং শীত জল সংগ্রহ করিবেন। উষ্ণজল শীত জলের পাত্রে আনিবেন, পরে ঐ মিশ্রিত জল দ্বারা কুমারের শিরঃ অর্থাৎ মাথার চুলগুলি ভিজাইয়া দিবেন, এই সময়ে "আপউন্দন্ত" ইত্যাদি মুণ্ড মন্ত্র পাঠ করিবেন।

কুমারকে উপনয়নের দিন প্রাতঃকালে ভোজন করাইবার কথা গৃহ্যসূত্রকার লিখিতেছেন, উপনয়নাদি কর্ম্মের পদ্ধতিতেও দেখা যায়, কিন্তু উহা অনুষ্ঠিত হয় না। উপনয়নের পূর্ব্বদিন শেষরাত্রিতে কুমারকে দুগ্ধাদি প্রচুর ভোজন দিবার প্রথা দেখা যায়। ঐ সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রথা প্রচলিত নাই, ব্রাহ্মণী-ভোজন দৃষ্ট হয়। কুমারের শেষ রজনীতে দুগ্ধ দধ্যাদিযুক্ত ভোজন এবং রমণীগণের দধ্যাদিযুক্ত ভোজন-প্রদান কার্য্যকে 'দধিমঙ্গল' বলা হয়; ইহা বোধ হয় অনুকল্প ব্যবস্থা হইবে। ঐ সময়ে কুমারের কপালে দধিতিলক প্রদান করিতে দেখা যায়।

নান্দীশ্রাদ্ধ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিষয়ে সুদর্শনাচার্য্যের মত "পূর্ব্বেদ্যুর্নান্দীশ্রাদ্ধং কুরুতঃ।" অর্থাৎ নান্দীশ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনে করিতে হয়। পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয়। হর দত্ত বলেন "শ্বোভূতে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা আশীর্ব্বাচয়তি।" অধুনাতন সমাজে পূর্ব্বদিনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে দেখা যায় না। সেই উপনয়ন-দিনেই প্রাতে ঐ শ্রাদ্ধ করা হয়। ব্যবহার, শাস্ত্রকে চিরদিন পশ্চাতে রাখিয়া থাকে। কুমার-ভোজনের পর হইতে আচার্য্যের কার্য্য আরম্ভ।

চুল ভিজাইয়া, পরে যাহা করিতে হইবে, আপস্তম্ব তাহা বলিতেছেন

৬ ত্রীংস্ত্রীন্ দর্ভানন্তর্ধায় উত্তরাভিশ্চতসৃভিঃ প্রতিমন্ত্রং প্রতিদিশং প্রবপতি।

প্রত্যেক দিকে তিনটী তিনটী কুশ মধ্যে রাখিয়া, এক এক মন্ত্রে এক এক দিকের কেশ ছেদ করিবেন। প্রথম কেশগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, আচার্য্য পূর্ব্ব দিকের কেশ মধ্যে তিনটী কুশ দিয়া "যেনাবপৎ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, কএক গাছি কেশ ক্ষুর দ্বারা ছেদন করিবেন। অনন্তর বৃষগোময়-পরিপূর্ণ সন্নিহিত পাত্রে ঐ কেশ ও যব প্রক্ষেপ করিবেন। পরে জলস্পর্শ পূর্ব্বক আচমন করিবেন। অনন্তর দক্ষিণ দিকের কেশে কুশ দিয়া 'যেন পূষা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কএকটী কেশ ছেদ ও পূর্ব্ববৎ বৃষগোময়ে নিঃক্ষেপ করিবেন। পরে আচমনান্তর পশ্চিমদিকের কএকটি কেশ ঐ ভাবে "যেনভূয়ঃ" ইত্যাদি

মন্ত্রে বৃষগোময়ে রাখিবেন। তৎপরে উত্তর দিকের কএকটী কেশ ঐরূপে 'যেন পূষা' ইত্যাদি মন্ত্রে ছেদ করিয়া বৃষগোময়ে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। প্রতিবারেই যব দিতে হইবে। এইরূপে আচার্য্য প্রত্যেক দিকের কয়টী কয়টী কেশ ছেদ করিলে, পরে নাপিত সমস্ত কেশ উত্তমরূপে মুণ্ডন করিবে। বপতি শব্দের অর্থ বপন করা। প্র শব্দের অর্থ আরম্ভ। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, আচার্য্য ক্ষুর দ্বারা বপনের আরম্ভ করিবেন, পশ্চাৎ নাপিত তাহা নিঃশেষরূপে সম্পাদন করিবে।

৭। বপন্তমুত্তরয়ানুমন্ত্রয়তে।

নাপিত কেশ বপন করিবে, আর আচার্য্য তাহাকে 'যৎ ক্ষুরেণ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অনুমন্ত্রিত করিবেন। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, যখন আচার্য্য কুমারের কেশ ছেদ করিবেন, তখনই কুমারের দক্ষিণদিকে বসিয়া কুমারের মাতা বা অন্য কোনও ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে অনুমন্ত্রিত করিবেন। অনুমন্ত্রণ নাপিত কর্ত্তৃক বপনে নহে। হর দত্ত কিন্তু আচার্য্যের অনুমন্ত্রণের কথাই বলিয়াছেন। সুদর্শন বলেন, 'আয়ুর্মা প্রমোক্ষী' ইত্যাদি অনুমন্ত্রণ-বাক্যে মধ্যম পুরুষলিঙ্গকতা রহিয়াছে। আচার্য্য বপনে ব্যাপৃত, সুতরাং অনুমন্ত্রণে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নয়; অতএব মাতা বা অন্য ব্রহ্মচারী অনুমন্ত্রণ করিবেন। উভয় মতেই নিজক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আছে।

(ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিতস্য কস্যচিৎ
যশোহর-বেদবিদ্যালয়স্থস্য—

ওঁ নমস্তত্ত্বেভ্যঃ।

তত্ত্বসমাস।

যে মহাপুরুষের মহতী প্রতিভা সমগ্র-জগৎকে চমকিত করিয়াছিল, যাঁহার হৃদয়ের ধন চতুর্বিংশতিতত্ত্ব উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্রাদি বিরাট হিন্দুশাস্ত্রের বিশাল কলেবরে সুন্দররূপে খচিত রহিয়াছে, যিনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন জন্মযোগী; বিপুল গৌরবময় স্বরে বেদ যাঁহার অগাধ-জ্ঞান ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" সেই আদিগুরু, জগতের সর্ব্বপ্রধান মনোবিজ্ঞানবিৎ আচার্য্য কপিল আসুরি মহোদয়কে সর্ব্বপ্রথমে সংক্ষেপে যে পদার্থতত্ত্ব কহিয়াছিলেন, তাহারই নাম তত্ত্বসমাস।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবন্নারায়ণের দ্বাবিংশতি অবতারের মধ্যে মহর্ষি কপিল পঞ্চমাবতার, এরূপ উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। "পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনিশ্চয়ং।" অর্থাৎ শ্রীমন্নারায়ণের পঞ্চম অবতার কপিল নামক সিদ্ধ-শ্রেষ্ঠ আসুরিকে কাল-মহিমায় বিপ্লবপ্রাপ্ত তত্ত্বসমূহনিশ্চয়স্বরূপ সাংখ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বলিয়াছিলেন। এই বচনে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, কপিল যখন আসুরিকে সাংখ্য শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে সাংখ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লইয়া বড়ই বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন, "যদা যদা হি-

ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।" কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্ত্তী সময়ের জন্য এই কথা, তাহা নহে, চিরদিনই ভগবানের অবতীর্ণ হইবার কারণ ধর্ম্মবিপ্লব। আত্মজ্ঞানই মুক্তির সর্ব্বসম্মত উপায়। আত্মজ্ঞান বিপ্লুত হইলে, বস্তুতই সেই সময়ে অবতারের আবশ্যকতা।

সাংখ্য বলিলে সাধারণতঃ অনেকেই মনে করেন, কপিল-কথিত ষড়্দর্শনান্তর্গত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ, কিন্তু ঐরূপ ধারণার মূলভিত্তি দৃঢ় নহে। আমরা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সর্ব্বদাই 'সাংখ্য' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই ; বস্তুতঃ সর্ব্বত্র কপিলপ্রণীত শাস্ত্র লক্ষ্য হইতে পারেনা। বেদ বলিতেছেন "তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিগম্যং" এখানে বোধ হয় কপিলের সাংখ্য এবং পতঞ্জলির যোগদর্শনকে লক্ষ্য করা হয় নাই। আত্মজ্ঞান, বহুপূর্ব্বে শ্রীভগবান্ চতুর্ম্মুখ দেবকে বলিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। সেই আত্মজ্ঞান সময়বশে পঙ্কিল হইলে, সত্য প্রচারের জন্য কপিলদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যোগশাস্ত্রও প্রথমে ব্রহ্মা ব্যাখ্যা করেন। পুরাণে দেখা যায় "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।" পরে ঐ যোগশাস্ত্র মহর্ষি পতঞ্জলি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রকে 'যোগানুশাসন' বলে। কথিতের পুনঃকথন হইলে অনুকথন এবং শিষ্টের পুনঃশাসন হইলে অনুশাসন বলে ; সুতরাং অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে, পতঞ্জলি-রচিত চতুষ্পাদ গ্রন্থ মূল যোগোপদেশ নয় এবং কপিল-রচিত ষড়ধ্যায় বা তত্ত্বসমাস, কিছুই প্রকৃত সাংখ্য নহে। যুগযুগান্তব্যাপী মহাসত্য কপিলাবতারে জগৎ যেরূপ ভাবে সর্ব্বপ্রথমে শুনিয়াছিল, সেরূপ আর শুনে নাই বলিয়া, কপিলের চরণে প্রণত হয়। আর অনাদি যোগ—যাহা স্বয়ং ব্রহ্মা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যে যোগ—মহেশ্বরের চিরসম্বল, অধিক কি, শ্রীভগবান্ ও যে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিতেন, সেই জীবন্ত সত্য মহর্ষি পতঞ্জলির নিকট জীবজগৎ প্রথমে শুনিতে পায় বলিয়াই 'পাতঞ্জল' নামে তাহাদের হৃদয়ধমনী নাচিতে থাকে। খনির অন্ধকারে, পর্ব্বতের গহ্বরে আপনার আলোকে মণি যখন আপনি আলোকিত হয়, অথচ জগৎ তাহার সংবাদ পায় না, তখনও মণি যেরূপ মণিই, পরে ধনীর প্রাসাদে, অপূর্ব্ব পরিচ্ছদে, দশ জনের নয়ন ঝলসাইয়া যখন বিরাজমান, তখনও মণি মণির অধিক কিছু নহে ; কিন্তু সংস্কার উহার মহিমা বুঝিতে দেয়। যখন সাংখ্য (আত্মজ্ঞান) মলীমসভাবে আঁধারে আবৃত ছিল, সমাজ সে তত্ত্বে অন্ধ হইয়া ছিল, তখনও উহা সাংখ্য, পরে কপিলের অপূর্ব্বপরিচ্ছদে উহার সংস্কারশুদ্ধি সম্পন্ন হইলে, উহাই জগতের চক্ষু ঝলসাইয়াছিল। কোনও সত্য নবাগত নহে। সত্যসমুদ্র শ্রীভগবান্ হইতেই উহাদের আবির্ভাব ; তবে অবতারে প্রচারিত হয় বলিয়াই অবতারের পদে জগৎ লুণ্ঠিত হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য এবং গীতাদি সমস্ত শাস্ত্রে "সাংখ্য" অর্থে আত্মজ্ঞান বুঝা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানের নাম সাংখ্য আত্মজ্ঞান বিষয়ে কপিলই সর্ব্বপ্রথম

উপদেষ্টা। কপিল আদি বিদ্বান্, সুতরাং কপিলের আত্মজ্ঞানোপদেশ 'সাংখ্য' নামে জনসমাজে পরিচিত হইতে বাধা নাই। সাংখ্যসূত্র অর্থে আত্মতত্ত্ববিষয়ক সূত্র। কপিল একটী নূতন নাম প্রচার করেন নাই। সাংখ্য বলিলে শাস্ত্রকারগণ জ্ঞান-মার্গই বুঝিয়াছেন। কপিল নিজে দুইখানি সাংখ্যগ্রন্থ বলেন। একখানি অতিক্ষুদ্র, দ্বাবিংশতি সূত্রে সম্পূর্ণ, ইহারই নাম তত্ত্বসমাস; অপর খানি বিস্তৃত, নাম সাংখ্য প্রবচন। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু আসুরিকে এই তত্ত্বসমাস বলা হয়।

আসুরি আমাদের পরিচিত মহর্ষি। আমরা তর্পণকালে "সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে কপিলের পরেই আসুরির নাম পাঠ করি। আসুরি কোনও গ্রন্থ লেখেন নাই। তৎশিষ্য পঞ্চশিখ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা পঞ্চশিখের কতকগুলি সূত্র এখনও দেখিতে পাই; অপর মহামূল্য-গ্রন্থগুলি মহাকালের বিশাল কুক্ষিতে স্থান পাইয়াছে।

তত্ত্বসমাসে সংক্ষেপে কেবল মাত্র পদার্থ-তত্ত্ব ও পদার্থস্বরূপজ্ঞান লাভ করিলে কৃতকৃত্য হওয়া যায় অর্থাৎ মুক্তি হয়, এই কথা বলা হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্তগ্রন্থে বিচার-বিবাদ-বিতর্কের উল্লেখ নাই। মতান্তর, যুক্তিবিস্তার, ঝগড়া ইত্যাদিও দেখা যায় না, যেহেতু জিজ্ঞাসু বিশ্বাসী জ্ঞানপিপাসু শিষ্য আসুরি বিচার দশা অতিক্রম করিয়া, কেবল মাত্র বিশ্বাসের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, উপদেশপ্রার্থনায় কপিলদেবের নিকট গিয়াছিলেন। কপিলদেব যে তত্ত্ব-সমাস কহিয়াছিলেন, তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণকুম্ভের মত নিস্তব্ধ ভাবেই তিনি উপদেশ গ্রহণ ও আলোচনা করিয়াছিলেন।

আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ বড় প্রতিভাবান্ ঋষি ছিলেন; তিনি উপদেশ গ্রহণের পর উহার বিস্তৃত আলোচনা বিচারাদি করেন; তাঁহার তর্ক-জালের বিচার বিভ্রাটের অনুরোধেই কপিলদেব দ্বিতীয়বার সাংখ্য-প্রবচন সূত্র রচনা করিতে বাধ্য হন। প্রথমে তত্ত্বসমাসে যাহা বলেন, পরে মূলতঃ তাহাই প্রকৃষ্টরূপে যুক্তি তর্ক দ্বারা স্থির বলিয়া প্রতিপাদন করেন; কাজেই দ্বিতীয় খানির নাম হইল "প্রবচন"। ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদন করায়, ঐ গ্রন্থের আর এক নাম হইল ষষ্টিতন্ত্র।

সাংখ্যপ্রবচন যে কপিল-প্রণীত, ইহা আমরা ১৩০৬ সালের হিন্দু পত্রিকায় "সাংখ্য-দর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। এই প্রবন্ধে উহার ষষ্টিপদার্থপ্রতিপাদন-প্রণালী এবং সাংখ্যমত যে শ্রৌত, তাহা পরিশেষে দেখান যাইবে। কপিল-রচিত এই প্রথম গ্রন্থ 'তত্ত্বসমাস' আমরা সম্প্রতি প্রকাশ করিব। কপিলের প্রথম সূত্র—

অথাতস্তত্ত্বসমাসঃ ॥১॥

অথ শব্দের অর্থ মঙ্গল, অধিকার, আনন্তর্য্য। এখানে অথ শব্দের অর্থ মঙ্গল। সূত্রের অর্থ,—এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, তত্ত্ববিষয়ে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। এখানে তত্ত্বপ্রতিপাদনই লক্ষ্য বিষয়, কিন্তু সংক্ষেপ করাও তাহার বহির্ভূত নহে। "অধিকারশ্চ

আধিক্যেন আরম্ভাং" অধিকার অর্থ প্রধান-ভাবে আরম্ভ করা। এই অধিকার প্রতি-পাদনের ফলে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থিতিতে অসঙ্গতি নিবারিত হয়। অথ শব্দের অর্থ 'অধিকার' এখানে গৃহীত হইতে পারে না, কারণ অতঃশব্দই আরম্ভ সূচনা করিতেছে। শাস্ত্রে আছে, "মঙ্গলাদীনি প্রথয়িতব্যানি" সাংখ্যপ্রবচনে স্বয়ং কপিলাচার্য্য "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফল-দর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি" বলিয়াছেন, অতএব এখানে অথ শব্দের অর্থ মঙ্গল বলা যাইবে। অথশব্দ উচ্চারণ করিলেই মঙ্গলাচরণ সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন— "ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রাহ্মণঃ পুরা কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ।" ওঁকার এবং অথ শব্দ সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ ভেদ করিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল, এজন্য উহারা মাঙ্গলিক। এই শ্লোকের ভাবে স্পষ্টই বুঝা যায়, অথ শব্দের উচ্চারণ মাঙ্গলিক। অথ শব্দ মঙ্গল সূচনা করিতেছে; সুতরাং আনন্তর্য্য অর্থও এখানে সঙ্গত নহে। যদিও শিষ্য আসুরি জিজ্ঞাসা করিলে, তদনন্তরই কপিলদেব বলিতে আরম্ভ করেন; বিশেষতঃ শাস্ত্রেও আছে "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ" এই জন্য জিজ্ঞাসার আনন্তর্য্য ধর্ত্তব্য হয়; কিন্তু উহার কোনও দৃঢ়তা নাই। প্রশ্ন করিলে পর যে উত্তর দেওয়া হইতেছে, ইহা অনায়াসগম্য, এজন্য একটা অথ শব্দের আবশ্যকতা নাই। মিত্র-ভাবে বিনা জিজ্ঞাসারও বলা যাইতে পারে; কিন্তু শিষ্যভাবে উহা একান্ত দুর্ঘট; অতএব "জিজ্ঞাসার পর" এরূপ অকিঞ্চিৎকর আনন্তর্য্য এখানে মূল্যবান্ নহে। আনন্তর্য্য পূর্ব্বাপর সঙ্গতির জন্য অনেক স্থানে দরকার হয়, এখানে জিজ্ঞাসার আনন্তর্য্য আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে; উহা প্রকাশ করিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রযত্ন অনাবশ্যক।

আর্য্যগণ সর্ব্বকার্য্যে প্রথমে মঙ্গলের অবতারণা করিতেন; ভবিষ্যতেও মঙ্গল হইবে, এইরূপ আশা তাঁহাদের প্রণোদনার কারণ। নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ-পরিসমাপ্তি জন্য অনেক স্থানে মঙ্গলাচরণের কথা বলিতে দেখা যায়।

মঙ্গলাচরণ ত্রিবিধ; বাচিক, মানসিক এবং আনুষ্ঠানিক। "ওঁ", "অথ," "স্বস্তি" দেবতাবাচক, কুশলবাচক শব্দোচ্চারণ এবং শ্লোক দ্বারা দেবতা গুরু প্রভৃতির নমস্কার করাই বাচিক মঙ্গল। মানসিক মঙ্গল—মনে মনে পবিত্র মঙ্গলবাচক শব্দ, দেবতাদির রূপ ও মাঙ্গল্যদ্রব্যের চিন্তা করা। আনুষ্ঠানিক মঙ্গল—কদলীবৃক্ষ রোপণ, পূর্ণকুম্ভস্থাপন, মালিকা-বন্ধন, শঙ্খাদি বাদন, লাজবর্ষণ প্রভৃতি। প্রত্যেক ব্যাপারে সজাতীয় মঙ্গলাচরণ আবশ্যক। কপিলদেব বাঙ্ময়সূত্র উপদেশ দিতে গিয়া, বাচিক মঙ্গল অথ শব্দোচ্চারণ করিয়াছেন। বিষয়—তত্ত্বোপদেশ বাচিক, মঙ্গল—অথ শব্দোচ্চারণও বাচিক।

'অতঃ শব্দের অর্থ, এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া। তত্ত্ব কথাটীর অর্থ যথার্থ-বস্তু। কপিলদেব যে কয়টী পদার্থকে যথার্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তিনি তাহারই উপদেশ দিয়াছিলেন। পদার্থপ্রতিপাদন করিতে হইলে, পদার্থের উপযোগিতা, তাহা-দের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ও কার্য্য-প্রণালী

সম্বন্ধে বলা আবশ্যক হয়; ঐগুলি বলিতে হইলে যে সকল প্রমাণ, যুক্তি ও ক্রম আবশ্যক হয়, তাহাও একান্ত অপরিহার্য্য; সুতরাং এই সকল বিষয়ের বিবরণ দেওয়ারও দরকার হইয়াছে।

কপিলদেবের "তত্ত্বে" কথাটীর একটু রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁহার প্রচারিত চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্ব এবং পুরুষ চৈতন্যতত্ত্ব, এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে কোনওটীকে তিনি আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ বা মরুমরীচিকা অথবা শুক্তি-রজতের মত বলিয়া স্বীকার করিবেন না, ইহার আভাসস্বরূপ তত্ত্বশব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন। এই সূত্রে তত্ত্বোপদেশ দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বিতীয়সূত্রেই প্রধান তত্ত্বের উল্লেখ করিতেছেন।

কথয়ামি অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ২

সূত্রার্থ,—আমি বলিতেছি—প্রকৃতি অষ্টপ্রকার। প্রকৃতি বলিলে, অনেকে বুঝেন 'স্বভাব', কিন্তু এখানে অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় কোনও স্বভাব-বিশেষকে প্রকৃতি বলা হইতেছে না। সমস্ত সংসার বিশ্লেষণ করিলে, দুই প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়, এক চৈতন, অন্য জড়। এই জড়তত্ত্ব জগতের দৃশ্যমানমূর্ত্তি হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মস্তরে বিভক্ত হইতে পারে। বহুদূরে গিয়া ইহা দৃশ্যমান জগৎ ছাড়িয়া সূক্ষ্মজগতে প্রবেশ করে। আণবিক সংস্থান হইতে সেই জগৎ আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ আমরা সেই জগতের ক্রিয়াপ্রণালী একরূপজ্ঞান লইয়া বুঝিতে পারি না। আমাদের চক্ষু সে সূক্ষ্মজগতে যাইতে পারে না। আমাদের চক্ষুর শক্তি সামান্য, যন্ত্র-সাহায্যে এই সামান্য শক্তিরও উদ্বোধন হইতে পারে; এই চক্ষুরও শুদ্ধি ঘটিয়া সামর্থ্য বর্দ্ধিত হইতে পারে; কিন্তু এরূপ যন্ত্র বা প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া দরকার, যাহাতে সূক্ষ্মজগৎও দৃষ্টিশক্তির অধীন হয়। বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান, যেখানে সূক্ষ্ম অর্থাৎ তন্মাত্রজগতের আরম্ভ, সেই পর্য্যন্ত অস্পষ্টরূপে কতক কতক দেখিতে পাইতেছেন; বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহর্ষি কপিল উহার অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন এবং অমোঘ সত্য দর্শন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সূক্ষ্মজগতের যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে 'তন্মাত্র' বলিয়া অভিহিত করা যায়। সূক্ষ্মজগৎ স্থূল জগতের কারণ অর্থাৎ পূর্ব্বতন-অবস্থা। তন্মাত্র-জগৎকে কপিল পাঁচভাগে বিভক্ত করেন, এবং ঐ তন্মাত্রজগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া, আরও তিনটী সূক্ষ্মতম স্তরের বর্ণনা করেন; শেষস্তরেই জড়তত্ত্বের পর্য্যবসান স্বীকার করেন। ঐ স্তরকে কপিল 'অব্যক্ত' নাম দিয়াছেন। কপিলের শেষ-জড়তত্ত্ব দেখা যায় না, শুনা যায় না, শব্দস্পর্শ-রূপরসাদিশূন্য, আমাদের এই ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অনধিকৃত স্থানে। কেবল মাত্র কয়েকটী কারণ হইতে কপিল এরূপ পদার্থের অনুমান করিয়াছেন। এই 'অব্যক্ত' শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অনেকে কপিলদেবকে অজ্ঞেয়-বাদী বলিতে চাহেন, কিন্তু আমরা তাহাতে সম্মত হইতে পারি না। কপিল যেখানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি 'অজ্ঞেয়' বলেন নাই। বেদান্তের মায়া-দেবীর মত কপিলের প্রকৃতি অনির্ব্বাচ্যা

নহে; তবে ব্যক্ত দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাহার সাদৃশ্য অনেকাংশে অল্প। কতক-গুলি ব্যক্ত, কতকগুলি অব্যক্ত, এই দুই ভাগে তিনি জড়ের বিভাগ করিয়াছেন। ব্যক্ত অর্থ স্থূল, অব্যক্ত অর্থ সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতে তাঁহার সূক্ষ্মজগৎ বা অব্যক্ত-জগৎ আরম্ভ হইয়া, চরমঅব্যক্তপ্রকৃতিতে উপনীত হইয়াছে। অব্যক্ত জগতের আটটী বিভাগের মধ্যে, পূর্ব্বতন সাতটী আমাদের নিকট অব্যক্ত হইলেও, মূল বা শেষঅব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, এই জন্য একমাত্র শেষতত্ত্বই 'অব্যক্ত' নাম পাইয়া থাকে। প্রথম সাতটীকে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ মহাশয় 'প্রকৃতি বিকৃতি' এবং মূল অব্যক্তকে "মূল প্রকৃতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মোটের উপর-লক্ষ্য করিতে গেলে বলা যায়, বাহ্যস্থূল জগৎ বিকৃতি এবং সূক্ষ্ম তন্মাত্র বা অব্যক্ত-জগৎ প্রকৃতি। প্রত্যেক অব্যক্ত পদার্থ মূলতত্ত্ব হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূল, এজন্য প্রকৃতপক্ষে শেষতত্ত্বই প্রকৃতি শব্দের লক্ষ্য। এ সূত্রে অবশ্য কপিলদেব অব্যক্তজগৎকেই প্রকৃতি শব্দে বলিয়াছেন। জগন্নির্ম্মাণ-কারণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মহাগুণত্রয় যখন বেশ সাম্য অর্থাৎ পরস্পরাসঙ্গবিরহিত ভাবে অবস্থিতি করে, সেই সময়ে সেই স্তরের নাম মূল প্রকৃতি।

পরে সম্মিলন, সংযোজন ও সংঘর্ষণের ফলে অবস্থান্তরিত হইলে, নাম হয় প্রকৃতি-বিকৃতি। এই নাম সাতটী স্তরের পর আর থাকে না। তখন শুধু বিকৃতি, প্রকৃতি বা অব্যক্ত মূল প্রকৃতির নাম, অব্যক্তজগতে অপর সাতটী পদার্থের নাম যথাক্রমে স্থূলতা অনুসারে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র।

এতক্ষণে কপিল অষ্ট প্রকৃতির কথা বলিয়া, অব্যক্তজগৎ সংক্ষেপতঃ ব্যাখ্যা করিয়া, ব্যক্তজগৎ ব্যাখ্যা-নিমিত্ত বিকার-তত্ত্বের উল্লেখ করিতেছেন।

ষোড়শকন্তু বিকারঃ॥৩

সূত্রার্থ—বিকার ষোড়শ প্রকার। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট প্রকৃতির বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য বা ব্যতি-ক্রম বশতঃ প্রাপ্ত অবস্থা ষোড়শ প্রকার বিকার। চক্ষুরাদি দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও পঞ্চ স্থূলভূত, এই ষোলটীর নাম বিকার। মনের ক্রিয়া-গতি যদিও দুর্লক্ষ্য এবং মনের স্বরূপ যদিও বেশ সূক্ষ্ম অনুভব দ্বারা সমর্থিত হয়, তথাপি মন স্থূল এবং বিকার। মন অহঙ্কারতত্ত্বের কার্য্য বা বিকৃতি, কিন্তু মন হইতে অন্য কোনও তত্ত্ব উৎপন্ন হয় নাই, এজন্য মন মাত্র বিকৃতি, প্রকৃতি নহে। বিশেষতঃ প্রকৃতি আটটী অপেক্ষা মন নিশ্চয়ই স্থূল। ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম পদার্থ হইলেও, উহাদের অধিষ্ঠান অর্থাৎ যে সকল স্থানকে আশ্রয় করিয়া ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিকসিত হয়, তাহারা স্থূল বলিয়া ইন্দ্রিয় একভাবে স্থূল; বিশেষতঃ অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অন্য কোনও তত্ত্ব নহে। পঞ্চমহাভূত—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও মৃত্তিকা, ইহারা স্থূল; পরন্তু তন্মাত্রের স্থূল বিকাশই ইহাদের স্বরূপ। আমাদের পাঁচটীর অধিক জ্ঞানে-ন্দ্রিয় নাই, এজন্য এ জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকের অনুভূতির বিষয়ও পঞ্চভূত বা তাহার গুণ।

প্রকৃতির ব্যাখ্যায় রূপতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, ইত্যাদি নাম দেখিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে এগুলির অর্থ রূপ বা শব্দ গুণ। তন্মাত্র নামের অর্থ অমিশ্রতানিবন্ধন কেবল মাত্র সেই এক প্রকারের অণুসমাবেশ। ভূততন্মাত্র সকলের মধ্যে ভিন্ন ২ শ্রেণীর অণুসমূহের সম্মিলনজাত নানাগুণ সম্পন্ন মিশ্রস্থূল ভাবের পদার্থই ভূত। ভূত পদার্থে গুণের অনুভূতি আছে; তন্মাত্রের গুণ আমাদের অনুভবের অযোগ্য; তন্মাত্র সূক্ষ্মভূত আর মহাভূত স্থূলভূত, এই টুকু রহস্য। এই ভূতপঞ্চকের দ্বারা কোনও নবতত্ত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না। অবয়বসংস্থানের ব্যতিক্রম-ভেদে কেবল নাম ও কার্য্যকারিতার বৈলক্ষণ্য হয় মাত্র, বস্তুতঃ পদার্থ একই থাকে। যেমন হার-বলয়-কেয়ূর কুণ্ডলে সুবর্ণ অভিন্ন, তেমনি।

এতাবৎ কাল জড় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে মহর্ষি কপিল জড়ের পরিচালক চেতনতত্ত্বের কথা বলিতেছেন। জড়ের সংখ্যা অধিক, এজন্য তাহাই অগ্রে বলা হইয়াছে।

পুরুষঃ। ৪

সূত্রার্থ—অপর চেতনতত্ত্বের নাম পুরুষ। জড়ের কার্য্যকারিতা চেতনের অনুগ্রহাধীন। চেতন ব্যতীত জড়জগৎ যে কি এক অবাচ্য অনমুভাব্য দশায় উপনীত হয়, তাহা বলা যায় না। চেতন অনুভবের মূলাধার; অনুভব ব্যতীত বিশ্বসংসারের অস্তিত্বের আর কোনও সাক্ষী নাই। 'আমি' 'এই কথার যাহা লক্ষ্য, তাহাকেই সাধারণতঃ চেতন বলা হয়; যদি 'আমি'র অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে হয়, তবে নিরমুভব নিবিড় অন্ধকারের রাজ্য অগ্রসর হয়।

জগতের সমস্ত জড় পদার্থই যে এক সর্ব্বব্যাপী চেতন সত্তার অনুগ্রহে জীবিত আছে, তাহা এই হিন্দুদেশে বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ছন্দবিনির্ঘোষে বিঘোষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি নবাভ্যুদিত পাশ্চাত্য দেশ এই অমূল্যতত্ত্ব, জড়াধিষ্ঠাতা সার্ব্বজনীন চেতনের সত্তা বিশ্বাস করিয়াছেন।

এই বিশ্ব চৈতন্যময়; এই বিশ্বের মূল উপাদান গুলিতে যখন চেতন সত্তা স্ফূর্ত্তি পায়, এই বহুধা বিভক্ত জড়জগতে যখন কার্য্যকারণ স্রোত উথলিয়া উঠে, তখনই জগৎ কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়; এই অমূল্য সত্য মহর্ষি কপিল এই সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

"পুরুষ" শব্দে সাধারণতঃ পুরুষ জাতি বুঝা হয়, এখানকার পুরুষ অর্থ চেতন সত্তা। পুর অর্থাৎ জড় শরীরে এই চেতন সত্তা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এজন্য উহার নাম পুরুষ, এরূপ কথা ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, কিন্তু বিশ্বের পিতা এবং মাতাস্থানীয়রূপে পুরুষ এবং প্রকৃতির রূপক-কল্পনাই চেতনকে পুরুষ বলিবার কারণ বলিয়া অনেক পণ্ডিত মনে করেন। এবার এখানে বিশ্রাম। বারান্তরে তত্ত্বসমাসের অপরাপর সূত্র ব্যাখ্যাত হইবে।

(ক্রমশঃ)

কপিলসেবকস্য

কস্যচিৎ।

(যশোহর-বেদবিদ্যালয়।)

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পঞ্চম শ্লোকের আলোচনা।

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥"

(অনুবাদ।)

অয়ি নন্দতনুজ! এ ভবাব্ধি বিষম,
রয়েছি পতিত তাহে আমি ভৃত্যাধম;
তব পদ-পঙ্কজের রেণু-কণা-প্রায়—
ভাবি মোরে কৃপা করি রাখ (হরি) পায়।

ভগবচ্চরণে ভগবচ্চরণ-প্রার্থনাই এই শ্লোকের সর্ব্বস্ব। পূর্ব্বালোচিত শিক্ষা-শ্লোকটিও প্রার্থনা-বাক্য মাত্র; কিন্তু তাহা বিষয়-বিষ-বিতৃষ্ণ ও অহৈতুক-ভক্তি সুধা-সুতৃষ্ণ উচ্চাধিকারী ভক্তের প্রার্থনা। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ব শ্লোকে উচ্চাধিকারের আদর্শ-প্রার্থনা সম্মুখে রাখিয়া, পরে এই শ্লোকে একেবারে সর্ব্বাধিকার-নির্ব্বিশিষ্ট,—অথচ নিম্নাধিকার-সুবিশিষ্ট এই প্রার্থনা-বাক্য ব্যক্ত করিয়াছেন।

সাধারণ সংসারী জীবের ত কথাই নাই; সমুন্নত সাধকগণেরও চরম ও পরমসিদ্ধি লাভ পর্য্যন্ত সংসার-সিন্ধুর তরঙ্গ-তাড়ন অল্পাধিক ভোগ করিতেই হয়। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছিলেন,—

"পঞ্চভূতের ফাঁদে—
ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে।"

বাস্তবিক এই পাঞ্চভৌতিক দেহ-মন-প্রাণ লইয়া, এই মায়া-প্রপঞ্চ-রঞ্জিত ছায়া-বাজীর সংসারে কে না অল্পাধিক প্রতপ্ত, প্রবঞ্চিত বা বিড়ম্বিত হন? আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত দেহালম্বী মাত্রই এই ভীম ভবাম্বুধির ভোগাধিশ্রিত। তবে কেহবা মজ্জিত, কেহ মজ্জমান, কেহবা সাধন-সন্তরণে ভাসমান। এক মাত্র ভগবচ্চরণাশ্রয় ভিন্ন এ ভব-নীরধি-নিরাশ্রয়ে আর উপায় কি? উপায় কেবল ও পায়! ওপায়ে স্থান না পেলেই একান্ত অনুপায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রসিদ্ধ "প্রশ্নোত্তর" সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"অপার সংসার-সমুদ্র মধ্যে
নিমজ্জিতোঽহং শরণং কিমস্তি।
গুরো কৃপালো কৃপয়াবদৈতৎ;
বিশ্বেশপাদাম্বুজ-দীর্ঘ নৌকা॥"

অর্থাৎ—

ডুবে মরি হায়! কি আছে আশ্রয়—
অপার সংসার-সমুদ্র-মধ্য?
কহ কৃপা করি গুরো! কৃপাময়!
মহাতরী হরি চরণ-পদ্ম।

এ প্রশ্নের চিরকাল এ-ই উত্তর। তবে কিনা, এই প্রশ্নোত্তর চিরপুরাতন হইলেও আবার ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে নিত্য নূতন।

"পেলে হরি-পদ-তরী,
হেসে ভব-সিন্ধু তরি।"

ইত্যাদি এই একই ভাবান্বিত—একই তত্ত্বাশ্রিত শত সহস্র বাক্যাবলী শত সহস্র গানে, কবিতায়, পুস্তকে, পত্রিকায়, সতত

পড়িতেছি, শুনিতেছি, গাহিতেছি, কহিতেছি ; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত ! কেবল মুখেই সর্ব্বস্ব ; বুকে শুধু ছাই ভস্ম ! 'ভব-সিন্ধু' এবং "হরি-পদ-তরী" এ কথা দুটা খুব জানা শুনা আছে ; কিন্তু উক্ত বাক্যদ্বয় লক্ষিত বস্তু দুটি যে বাস্তবিক কি, তাহা বুঝা দূরে থাক্, বুঝিবার অন্ততঃ আবশ্যকতাও বুঝি না ! আমরা যেন বেশ নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্ত আছি। কে জানে তোমার 'ভব-বারি'—কে জানে 'হরি-পদ-তরী' ? আমরা যেন ও দুয়ের একটীরও ধার ধারি না। আমাদের কাছে ও সব কেবল যেন কবি-কল্পনা। লিখিতে ভাল, পড়িতে ভাল, বক্তৃতায় কহিতে ভাল, সংগীতে গাহিতে ভাল ; তা ছাড়া বাস্তবতায় ভব-বারিতে বিশ্বাস ও পদ-তরীতে আশ্বাস আমাদের কোথায় ? মূলতঃ ভব-বারির ভীষণতা-বোধ না থাকিলে, পদ-তরীর আবশ্যকতা-বোধইবা থাকিবে কেন ? অতএব আমরা নিশ্চিন্ত—নিঃশঙ্কিত ; সুতরাং নিশ্চেষ্ট—নিদ্রিত !

মনে করুন, নদী বাহিয়া একখান নৌকা যাইতেছে। আরোহী অভ্যন্তরে নেশার ঘোরে নিদ্রিত। বাতাস উঠিল, নদীতে তুফাণ ছুটিল, তরঙ্গ-তাড়নে তরী নাচিতে লাগিল। বাহ্য বিজ্ঞানহীন নিদ্রাবেশ-বিলীন আরোহীর তাহাতে বরং আরো যেন ঘুমের ঘোরে দোলার দোলনের ন্যায় আরাম বোধ হওয়ায়, নিদ্রা গাঢ়তর হইল। এ দিকে তরী ডুবুডুবু ! বাতাস উদ্ভ্রান্ত, নদী উচ্ছ্বসিত, তরঙ্গ উন্মত্ত ! তীব্র তাড়নে জীর্ণ তরী বিদীর্ণ প্রায় ! প্রক্ষুব্ধ প্লাবনে ভগ্নতরী মগ্ন হয় হয় ! আরোহী তথাপি ঘুম-ঘোরে অভিভূত ; যেন কালনিদ্রায় কবলিত ! ক্রমে তরীও সেই করালিনী কল্লোলিনীর কবলিত হইতে লাগিল ! নৌকার 'ডহরা' ডুবাইয়া, 'পাটাতন' ভাসাইয়া জল যখন হতভাগ্য আরোহীর শয্যা ভিজাইল, শরীর ভিজাইল, কাণের কাছে 'কল কল' জল-কল্লোল গর্জ্জিল, তখন সে জাগিল। অকস্মাৎ চারিদিকে কৃতান্তের করাল গ্রাসের কাল-অন্ধকার দেখিল ! তখন যে আতঙ্ক, আকুলতা, বিহ্বলতা ; তখন যে উন্মাদনা ও উৎকট যাতনা, দুঃখ-জগতে তাহার তুলনা কোথায় ? তারপর সেই অভাগ্য যাত্রী উন্মত্ত-নদী-বক্ষে ভাসিল ! তখন তাহার যে অবস্থা, সে অবস্থায় সংজ্ঞা আছে কি নাই ! এই নাই, এই আছে ! তখন যদি সেই 'আছে' ভাবটুকুর সময়ে, চকিতে সম্মুখে একখানি সাক্ষাৎ পরিত্রাণ-রূপিণী বিচিত্র-তরণী-দর্শন হয়, তবে তখন তাহার যে অপূর্ব্ব অতুল্য অসাধারণ আনন্দ, এই মায়া-মোহ, পাপ তাপ, রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতি অনন্ত তরঙ্গ-তাড়ন-বিক্ষুব্ধ ভবাব্ধিতে পতিত জীর্ণ-তরীর শীর্ণ আরোহী জীবের সেই 'অভয়-পদ-তরী' দর্শনের আনন্দ ততোধিক—ততোধিক !—অনির্ব্বচনীয় অধিক !!

(কিন্তু) হায় ! অনির্ব্বচনীয় অধিকাধিক আমাদের দুর্ভাগ্য, যে আমরা তাহা কিছুই বুঝি না। ব্যাপরটা কবি-কল্পনার খাতায় তুলিয়া, নির্ভাবনায় নিদ্রা দিতেছি ! গায়ে এখনও জল লাগে নাই কি না, তাই ঘুমও ভাঙ্গে নাই। কিন্তু লাগিতেও বড় বাকি নাই। এ 'নবছিদ্রান্বিতা' তনু-তরী আর

কতক্ষণ ভাসিবে? মানবের পূর্ণায়ু একশ বিশ বর্ষও অনন্ত কাল-সিন্ধুতে একশ বিশ বীচি-পলকেরও যোগ্য নহে! তারপর থাক্ 'একশ বিশ,'—ইদানীং একশ বিশের অর্দ্ধকাল ভাসিতে পারিলেও সে তরীর 'তারিফ্' দিতে হয়। এ কালটুকুও যদি ঘুমে যায়, আর পিঠে জল লাগিলে তবে যদি জাগিতে হয়, তাহা হইলে সাবধান হওয়ার সময় বা উদ্ধার পাওয়ার উপায় আর থাকে কি? সময়ে একটা সাধন স্বরূপ বোঁচ্‌কা—বালিস্ বা বাঁশ—তক্তা, যা কিছু একটা অবলম্বন যোগাড় করার আর যো থাকে না। তখন কেবল হাবুডুবু—কেবল প্রাণ যায়! কেবল হায় হায়! যদি বল, 'পদ-তরী'ত সম্মুখেই আছেন, তবে আর ভাবনা কি? কিন্তু হায়! সকলের ভাগ্যে সে অভয়-আলম্ব-লাভ সহসা ঘটে কৈ? "প?-আনা বাড়ে উনিশ গণ্ডা'ই যে ডুবিতেছে! সে তরী আজও পর্য্যন্ত পেয়েছে কজনে?

"শুকো মুক্তো প্রহ্লাদো বা"

এই সুবিখ্যাত শাস্ত্রোক্তি আমাদিগকে বুঝাইতেছে যে, অন্ততঃ বর্ত্তমান শ্রুতি-শাসিত যুগে এ যাবত্ অতি অল্প মনুষ্যই সে 'তরী' পাইয়া তরিয়াছে। তবে অবশ্য আশা আছে। যেহেতু "আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত" সকলেই পরিত্রাণের অধিকারী। "অনন্ত নরক" হিন্দুশাস্ত্রে অদার্শনিক—অস্বাভাবিক, সুতরাং অযুক্ত। তবে কি না, ডুবিয়া আবার ভাসিতে হইবে। এইরূপ জন্ম-জন্মান্তররূপ ডোবা-ভাসা "কল্পকোটি শতৈরপি"ও চলিতে পারে। ফলে একবার না একবারের ভাসায় পদ-তরী ধরিবার আলম্ব মিলিবে। ভক্তি-ভজনরূপ আলম্ব চাই। ব্যাকুল প্রাণে সেই অকূলের কাণ্ডারীকে ডাকিলে, আলম্ব অবশ্য মিলিবে। পদ-তরীর কাছে আরও বড় তুফাণ; 'আলম্ব' অবলম্বন ভিন্ন সে তরালাভ কেহ করিতে পারে নাই। কারণ তরীস্বামীর তাহাই বিধান। শাস্ত্রে যাঁহাদিগকে "কৃপা-সিদ্ধ" বলা হইয়াছে, তাঁহারাও পূর্ব্বজন্মের সাধন-বলে ইহজন্মে যেন অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবেই কৃপা-সিদ্ধ হইয়া ভবাব্ধিতে অভয়তরী পাইলেন। যেন তিনি একেবারে "হৈল-ডুব" দিয়া তরীর কাছে ভাসিয়া উঠিলেন! অতএব সাধন চাই। তবে কিনা, তাঁহার কৃপা ভিন্ন যেখানে সব অসম্ভব, সেখানে সিদ্ধ মাত্রেই একরূপ 'কৃপা সিদ্ধ'—সন্দেহ কি? আলম্ব-লাভই তাঁহার পক্ষে প্রথম কৃপা-সিদ্ধি; পরে চরম ও পরম কৃপা-সিদ্ধি সেই চরণ-লাভ। ফলে এই আলম্ব লাভের জন্য ব্যাকুলতা চাই, ব্যাকুলতার জন্য ঘুম-ভাঙ্গা চাই; ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। তবে ঘুম ভাঙ্গা অবশ্য নিজের সাক্ষাৎ আয়ত্তাধীন নহে; কিন্তু না শোয়া অবশ্য অন্ততঃ 'আমিত্ব' যতদিন, ততদিন কল্পিত আয়ত্তাধীন। অতএব এ ঘোর তরঙ্গ-তুফাণে জীর্ণতরীর আরোহীর না শোয়া বা অতি অবসাদক বিষয়-বিষ মাদক না খাওয়া উচিত। তাহাই "প্রবৃদ্ধ" সাধকের প্রথম সাধন-পুরুষকার। তারপর ক্রমশঃ উপরের কৃপার সাহায্য আসিতে থাকে। তাহারই আধ্যাত্মিক আনুকূল্যে উপাসক অগ্রসর হইতে হইতে অচিরাৎ আলম্ব লাভ করেন। আলম্ব পাইলে, তরী-লাভের আশা আসিবার আর দেরি থাকে

না। কিন্তু হায়! আমরা ঘুমেই বিভোর! আকণ্ঠ মোহ-মদিরা পান করিয়া, আমরা যেন কলির কুম্ভকর্ণত্ব পাইয়া, নিঃসাড়ে নিদ্রাভূত রহিয়াছি! সংসারের রহস্য কিছুই যেন দেখিয়াও দেখিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না!

"আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ
সংক্ষীয়তে জীবনম্।
ব্যাপারৈর্বহু কার্য্য-কারণশতৈঃ
কালোঽপি ন জ্ঞায়তে॥
দৃষ্ট্বা জন্ম-জরা বিয়োগ-মরণং
ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে।
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদ-মদিরাং
মোহাভিভূতং জগৎ॥"

অর্থাৎ—

আদিত্যের অস্তোদয় সহ অহরহ হায়!
এ জীব-জীবন ক্ষয় পায়।
বহুবিধ ব্যাপারেও, শত কার্য্য-কারণেও,
বোধ নাই—কাল কিসে যায়॥
দেখেও জনম-জরা, জীবের বিয়োগ-মরা,
চিত্ত তাহে নহে ত্রাসযুত।
মোহ-মাদকতা পুরা, পিয়ে সে প্রমোদ-সুরা,
এ জগৎ মোহে অভিভূত॥

এটি জগতের জ্যোতি-চিত্র, সন্দেহ নাই। আমরা যদি দিনান্তেও একবার একান্তে আপন দশা ভাবিতে পারি, তাহা হইলেও ভগবৎ-কৃপায় দুর্দ্দশার অনেক প্রতীকার-পথ পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু আমরা মোহ-মদিরা পানে মহামোহাভিভূত। আমরা যেন মোহ-মদিরার নেশার ঘোরে আমাদের সাধের সংসার-শয্যায় বিষয়-বালিস বুকে করিয়া বিভোর হইয়া পড়িয়া আছি! আমাদিগকেই চেতাইবার জন্য ভক্ত তুলসী-দাস হাঁকিতেছেন,—

"শোতে ২ ক্যা করো ভাই! উঠ্ ভজ মুরার।
অ্যায়সা দিনে আওয়েগে—লম্বা-পা-পসার!"

অর্থাৎ—

শুয়ে শুয়ে কি কর ভাই!
ওঠ—ভজ হরি।
আস্‌ছে সে দিন, শোবে যে দিন
পা লম্বা করি!

আমাদের হুঁস নাই! মোহ নিদ্রার বশে সে মহানিদ্রার কথা একেবারে ভুলিয়া আছি। হায়! সামান্য একটু কিছু বিপদ-সম্ভাবনা বুঝিয়াও লোক কত সতর্ক—কত ব্যস্ত হয়; ভগবানের কাছে কত কাতর হয়; কিন্তু মৃত্যু সম্ভাবনা নিশ্চয়াতিনিশ্চয়রূপে জেনেও আমরা নিশ্চিন্ত! মোহ-মদিরার এমনই মাদকতা।

ভবসিন্ধু-তুফানে আমরা সকলেই হাবুডুবু খাইতেছি। ডুবিতেছি আর ভাসিতেছি; কিন্তু বাহ্যসংজ্ঞা-বিহীনতায় তাহার কিছুরই যেন অনুভব নাই। বলিয়াছি ত, এই ভাসা-ডোবাই জীবের জন্ম-জন্মান্তর। ঐ সমুদ্রে অনন্ত কর্ম্মাবর্ত্ত-চক্রের পাকে পাকে পড়িয়া এইরূপ শত কোটি কল্পও ডোবা-ভাসা চলিতে পারে। তারপর ভগবৎকৃপায় যে বারের ভাসায় সংজ্ঞার উন্মেষ হয়, সেই বারই পারে যাইতে ও সেই 'পদ-তরী' পাইতে যথার্থ ব্যাকুলতা জন্মে এবং গুরু-কৃপায় আলম্ব লাভও হয়। আলম্ব পাইলে, উদ্ধারের আর বড় বিলম্ব থাকে না। ভগবদ্ভজনই সেই আলম্ব। উহা প্রাণপণে ভক্তি-ভুজ-লতা-বন্ধনে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে

পারিলে তার ডুবিবার ভয় থাকে না। ভক্ত তখন আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে সেই ত্রাণ-তরণীর দিকে আসিতে থাকে।

সংজ্ঞা যে আমাদের একেবারেই নাই, তাহাও নহে। যখন ভগবান "দুর্লভ মানব-জন্ম" দিয়াছেন, তখন মানুষের সেই অনন্য-সাধারণ মূলধন সেই সংজ্ঞা অবশ্য কিঞ্চিৎ আছেই; কিন্তু মোহাভিভূত বলিয়াই এ হেন বিপদেও ব্যাকুলতা নাই; সুতরাং ভগবচ্চরণোদ্দেশে উদ্ধার-প্রার্থনাও নাই। ব্যাকুলতাই প্রার্থনার প্রাণ। আমাদের হয় ত মৌখিক প্রার্থনা—প্রার্থনার শব মাত্র। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শিক্ষা-শ্লোকে জীবের ভব-নীরধি-নিমজ্জনরূপ বিষম বিপদ বুঝাইয়া, ভগবচ্চরণাশ্রয়-লাভের জীবন্ত প্রার্থনা জীবকে শিখাইয়াছেন।

এইখানে শ্রীগৌরাঙ্গ "অতিশয়োক্তি" অলঙ্কারে শ্লোকটিতে একটু অভিনব ভাব দিয়াছেন। জলমগ্নের উদ্ধারার্থ তরী বা তজ্জাতীয় আলম্বন-বিশেষেরই আবশ্যকতা। আমরাও পূর্বোক্ত শঙ্করাচার্য্যের শ্লোক এবং সাধারণতঃ প্রচলিত সংস্কারগত ভাবেই ভবাব্ধি-মগ্ন জীবের ত্রাণার্থ ভগবচ্চরণ-তরীর কথাই বলিয়াছি। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার এই শিক্ষা-শ্লোকে ভগবচ্চরণোদ্দেশে তৎপদ-পঙ্কজের রেণুত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়াছেন। এখন, আপাততঃ ইহাতে একটু আলঙ্কারিক অসঙ্গতির উপলব্ধি হয়। সমুদ্রে পদ্ম ফোটে না, এবং সমুদ্রে পতিত জনের পদ্মে স্থান পাইবারও সম্ভাবনা বা স্বাভাবিকতা কিছু নাই। এই জন্যই এই শ্লোকটির আলঙ্কারিক সঙ্গতি-সাধনার্থে "অতিশয়োক্তি"র কল্পনা। অর্থাৎ কোন অনন্য-সাধারণ ব্যাপার-বর্ণনে অসম্ভব-সম্ভাবনাই অতিশয়োক্তির লক্ষণ। সাধারণ সমুদ্রে সাধারণ পদ্ম ফোটে না বটে, কিন্তু ভব-সমুদ্রে ভগবৎপাদপদ্ম ফোটে। আর সাধারণ পদ্মের মূল জলের নীচে নিবদ্ধ থাকে, ফুল উপরে ফোটে; কিন্তু এ অসাধারণ পদ্মের মূল উপরে, ফুল নীচে! অথচ উৎফুল্ল জলের উপরে বটে। অর্থাৎ ভগবান যেন ভক্তের চক্ষে সাক্ষাৎ উদ্ধার-মূর্ত্তিতে ভব-বারিধি-বক্ষে বিরাজমান! এ অপূর্ব্ব কল্পনার 'পদপঙ্কজ'ই শোভা পায়, "পদ-তরী" মানায় না। তবে কি না, জলমগ্নের তরিবার জন্য তরীরই প্রয়োজন। একটি কীট হয় ত পদ্ম প্রভৃতি কোন জল-পুষ্প বা সামান্য একটি পল্লবাদির আশ্রয় পাইলেই তরিতে পারে, কিন্তু মানুষ পারেনা; তাই পদ-তরীর রূপকই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ত্রিভুবন স্থান পাইতেছে, মানুষ তাহার পক্ষে কীটাণু-কীটেরও অধম। অতএব মানব কীটাণু তাহার রেণুত্ব পাইলেই কৃতার্থ। আর জলাশয়ের আয়তন ও তদাশ্রিত পদ্মের আয়তন পার্থিব প্রকৃতিতে যেরূপ স্বাভাবিক, তাহারই আনুপাতিক বিচারানুমানে অনন্ত-প্রসারিত ভব-পারাবারে প্রজ্ঞান-পরিকল্পিত ত্রিজগতের আশ্রয়ীভূত ভগবৎপাদপদ্ম কি বিরাট আয়তনে বিশ্বোজ্জ্বল-বিস্তার বিকসিত! তাই নৌকার রূপকেও শঙ্করাচার্য্য "দীর্ঘনৌকা" ("বিশ্বেশপাদাম্বুজ") বলিয়াছেন। 'অম্বুজ"—অর্থাৎ পদ্মও বলিয়াছেন, নৌকাও বলিয়াছেন। সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য ও মধু-মাধুর্য্য-

হেতু পদ্মই যেন ভগবানের চরণের চিরসংকল্প! সুতরাং নৌকার রূপকেও ভগবানের ভাবাধর কিঙ্কর শঙ্করাচার্য্য 'পাদাম্বুজ' বলিতে ছাড়েন নাই। আর ভব-ত্রাণার্থী সর্ব্ব লোকের স্থান সঙ্কুলন-সুজ্ঞাপনার্থেই "দীর্ঘ নৌকা" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। সে যাহাহউক, স্বয়ং সরস্বতী-পতিরূপে পূজিত শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শ্রীমুখোক্ত শিক্ষা-শ্লোকে অবশ্য আলঙ্কারিক অসঙ্গতি অসম্ভব; এই জন্যই আমাদের বোধ হয় যে, উহা "অতিশয়োক্তি" অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াই এইরূপ দৃশ্য-শোভা প্রকাশ করিতেছে, যেন—অনন্ত বিস্তারিত দুস্তর ভীম ভবার্ণব তুমুল তরঙ্গ-রঙ্গের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে উথলিতেছে; আর কোটি ২ নিরাশ্রয় নর-কীটাণু সেই অকূলে আকুল ও অচেতন-প্রায় হইয়া হাবু ডুবু খাইতেছে। অদূরে—অথচ যেন দূরাতিদূরে মূর্ত্তিমান-পরিত্রাণ ভবতারণ ভগবান সেই সংক্ষুব্ধ সিন্ধু-হৃদয়ে দীনবন্ধুরূপে দণ্ডায়মান! তাঁহার রাতুল চরণ-পদ্ম অতুল শোভায় তাহাতে ফুটিয়াছে! তদ্দর্শনে—স্পর্শনে সিন্ধু-হৃদয়ে প্রেমানন্দোদয়ে তুমুল তুফাণ উঠিয়াছে! আর তাহাই ভেদ করিয়া, সে দুস্তরে নিস্তার-প্রার্থী নর-কীট-নিকর নিরন্তর সেই দিকে ছুটিয়াছে! সকলেরই আশা, প্রযত্ন ও প্রার্থনা—সেই ভক্ত-হৃৎকমল-বিলাসী হরির মরণ-হরণ-চরণ-কমলে শরণ-লাভ। মহাপ্রভুর এই শ্লোকের তত্ত্ব-স্বরূপ ধ্যান করিতে পারিলে, এই মহাদৃশ্যই মনোনয়নে প্রকটিত হয়!

তারপর আর একটি কথা। শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-কমলে রেণু-কণা হইয়া থাকিতেই ভক্তের অভিলাষ ও আব্দার। ইহাতে যেমন ভক্তি-বিনতি, তেমনি ভাব-বিস্তৃতি। কোন জলমগ্ন স্থল-কীটাদি একটি পদ্মে আশ্রয় পাইলে বাঁচিতে পারে; তাহাতে হয়ত বাসা করিয়া কথঞ্চিৎ বাস করিতেও পারে; ফলে তাহাতে পদ্মের সহিত তাহার কোন স্থায়ী বা নিত্য সম্বন্ধ হয় না; কিন্তু রেণুর সহিত পদ্মের নিত্য সম্বন্ধ; রেণু পদ্মেরই অঙ্গীভূত। তাই ভক্তের আশা, তিনি ভবাব্ধিনিমগ্ন নর কীট হইলেও, ভগবৎপাদ-পদ্ম লাভে পরিত্রাণ পাইয়া, ভগবৎকৃপাতেই সেই পাদপদ্মের রেণুরূপে পরিণত হইবেন।

অপর, কীটাদির কিছু না কিছু অহম্বুদ্ধি আছেই; কিন্তু সহজ সিদ্ধান্তানুমোদিত জড়ত্ববশে ধূলী বা রেণু-কণাদির তাহা নাই। আর জলমজ্জমান কীটাদি জলপুষ্প-বিশেষের আশ্রয়ে আপাততঃ প্রাণ-ত্রাণ পাইলেও, ঐ জলপুষ্পই স্বভাবতঃ তাহার চরমাশ্রয় নহে। জল হইতে বাঁচিবার জন্যই তাহার জল-পুষ্পাশ্রয় পাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরে সেই পুষ্পাশ্রিত হইয়া, তখন আবার হয়ত সে তাহা ছাড়িয়া মৃত্তিকাশ্রয় পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। সুতরাং এই কীটো-দ্ধার-উদাহরণ ঠিক ভক্তের পক্ষে খাটে না। ভক্ত ভগবৎপাদপদ্মাশ্রয় লাভে তাহাতেই তাঁহার কৈবল্যার্থানুসারিণী অহম্বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া কৃতার্থ হন। ইহাই 'আত্মনিবেদন'। ইহাই নবধা ভক্তির নবম, চরম ও পরম লক্ষণ। ভক্ত তাই ভগবৎ-পদারবিন্দের রেণু-কণা হইবার প্রার্থী। রেণু যেরূপ পদ্মেরই একান্ত অধীন, অঙ্গীভূত ও চিরাশ্রিত, ভক্তও ভগবানের চরণ-পদ্মে সেইরূপে পরিণত হইবার প্রার্থী।

এস্থলে আর একটি নবভাব-রসাভিষিক্ত মধুর বিচার আছে। ভবসিন্ধু-ভাসমান ভক্ত ভগবানের সেই জগত্তারণ অভয় চরণকে

নৌকারূপে কেন চাহিবে? এস্থলে কেবল অনিত্য লৌকিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধীন রূপকের যৌক্তিকতা দেখিলেই চলিবে না; ইহার আমূলভাব-রস-রহস্যের-বিচার প্রয়োজন; যেহেতু বিষয়টি কেবল 'ভাবের বিষয়'। অথচ ইহাতে লৌকিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের সঙ্গতিও একেবারে অরক্ষিত নহে। মনে করুন, জলমগ্নের নৌকার প্রয়োজন কেবল পারের জন্যই। প্রথমতঃ জল হইতে নৌকার, পরে নৌকা হইতে পারেরই সে প্রার্থী। জলমগ্ন কীটাদির দৃষ্টান্তে পুষ্প-পত্রাদি যেমন, জলমগ্ন মানুষের দৃষ্টান্তে নৌকাদিই তদ্বৎ। কীট ফুল পেলেও কূল চায়; মানুষ তরণ পেলেও অবতরণ চায়; অথবা তরী পেলেও তীর চায়। শাস্ত্র বলেন,—

"নাবার্থীহি ভবেত্তাবদ্যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্॥"

অর্থাৎ—

তাবৎ নৌকার প্রয়োজন সার,
যাবৎ পারে না যায়।
হলে নদী পার, কে তখন আর,
নৌকায় থাকিতে চায়?

কিন্তু এ তরী ত সে তরী নয়; এ যে জীবের জন্য চির-শরণ চরণ-তরী! এ তরীকে ছাড়িয়া আবার তীর কে চায়? সিন্ধু-তরিতে তরীর প্রয়োজন; আবার তরী হইতে অবতরিতে তীরের প্রয়োজন। এ তরীতে সিন্ধু হইতে উত্তরণই জীবের স্বার্থ; কিন্তু এ তরী হইতে অবতরণ আর অসম্ভাবিত ও অপ্রার্থিত; যেহেতু ভগবচ্চরণই ভবত্রাণার্থীর চরমাতিচরম পরমতম আশ্রয়। "যৎপ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

যাহা পাইলে জীবের আর পুনঃসংসারাবৃত্তি হয় না, তাহাই পরাৎপর ভগবানের পরমাধারতত্ত্ব। পায়ের উপরই জীবের দেহের সমস্ত ভর; এই সত্যের ঔপমিকসাম্যে বলা যায় যে, ভগবানের চরণই ভগবত্তত্ত্বভারাধার, তাহাই জীবের স্বার্থ সারাৎসার; তাহা পাইবার জন্যই জীবের যত সাধন-ভজন; আর তাহা পাইলেই জীবের পুনঃসংসারাবৃত্তির পূর্ণ-পরিমোচন। অতএব এই "চরণ-তরী" কথাটি সাধন-ভক্তি-সাহিত্যে সুচির-প্রসিদ্ধ রহিলেও, এই রূপকালঙ্কারে তরীর সহিত ভগবচ্চরণের অনুরূপ ঔপমিক সাম্য সম্ভাবিত নহে। এতাবতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোকটিতে ভবাব্ধি-মগ্নের ভগবৎ-পাদপদ্মের রেণুত্ব-প্রার্থনায় একভাবে অলঙ্কার-শাস্ত্রের অবিরোধিতাও রক্ষিত হইতেছে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সহিত মহাপ্রভুর বিচারে মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীর রচিত ও পঠিত গঙ্গাস্তবে একটি আলঙ্কারিক ভুল এই ধরিয়াছিলেন যে, দিগ্বিজয়ী গঙ্গাকে "শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ-কমলোৎপন্না" বলিলেন কি প্রকারে? জল হইতেই কমলের উৎপত্তি, কিন্তু কমল হইতে জলের উৎপত্তি অবশ্য অস্বাভাবিক; সুতরাং বিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে জলময়ী জাহ্নবীর উৎপত্তি বলায় আলঙ্কারিক দোষ ঘটিতেছে। ফলতঃ এইরূপ বৈয়াকরণ-চতুষ্পাঠীর বালক ছাত্রের যোগ্য বিতর্ক-বিবাদে মহাপ্রভু আপনিই আবার এইরূপ সুমধুর সমাধান করিলেন যে, কৃষ্ণ পাদপদ্মের অতি অচিন্ত্য-শক্তি; স্বভাবের নিত্যপ্রসিদ্ধ স্বাধীনতা ইহারই অধীন; অতএব শ্রীবিষ্ণুর চরণরূপ কমল হইতে জলরূপা গঙ্গার উদ্ভব কখনও অস্বাভাবিকতা-জনিত আলঙ্কারিক অসঙ্গতির উদাহরণ নহে। অতএব ঐরূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের অন্তর্গতিতে ভবসমুদ্রে ভগবৎ-পাদপদ্মের বিকাশ ও ভবাব্ধি-মগ্নের তদ্ধূলী-কণত্ব-প্রাপ্তির অভিলাষ অসঙ্গত নহে। যাহাহউক, অতঃপর আমরা মূল শ্লোকের পদ-পদার্থালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

৯ম বর্ষ। পৌষ মাস। ৯ম, ১০ম সংখ্যা।

১৮২৪, ১৩০৯।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রী[illegible] [illegible] বি, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৪।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ১॥০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্ট্রী কৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা

পৌষ। ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

জাতিভেদ।

(পূর্ব্বানুবর্ত্তি।)

চতুর্থ অধ্যায়।

১। আহার ও বিবাহ।

জাতিভেদ-প্রথা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে আহার ও বিবাহ সম্বন্ধে তেমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না।

যে পরাশরস্মৃতি কলির ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই লিখিত আছে :—

"ক্ষত্রিয়োবাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥"

যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান এবং শুচিব্রতধারী, তাঁহাদের গৃহে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা "হব্যে কব্যে" ভোজন করিবে।

"But in the olden times we see from the Mahabharata and other works, that Brahmans, Kshatriyas and Vaisyas could eat the food cooked by each other. Manu lays down generally that a twice-born should not eat the food cooked by a Sudra (IV. 223); but he allows that prepared by a Sudra, who has attached himself to one, or is one's barber, milkman, slave, family-friend, and co-sharer in the profits of agriculture, to be partaken (IV. 253). The implication that lies here is that the three higher castes could dine with each other. Gautama, the author of a Dharmasutra, permits a Brahman's dining with a twice-born (Kshatriaya or Vaisya) who observes his religious duties (17,1). Apastamba, another writer of the class, having laid down that a Brahman should not eat with a Kshatriya and others, says that according

to some, he may do so with men of all the varnas, who observe their proper religious duties, except with the Sudras. But even here there-is a counter-exception, and as allowed by Manu, a Brahman may dine with a Sudra, who may have attached himself to him with a holy intent (I-18. 9, 13, 14)"*

আমরা বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর একত্রে আহার-নিষেধই জাতিভেদের প্রথম নিদর্শন। সেকালে আহার সম্বন্ধে এরূপ হইত না, তাহা শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহোদয়ের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হইবে। মনু, আপস্তম্ব, গৌতম প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের মতামত উদ্ধৃত করিয়াই শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার নিজাভিমত পোষণ করিয়াছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত এল্ ফিনষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন—"But there is no prohibition in the code against eating with other classes, or partaking of food cooked by them (which is now the great occasion for loss of caste), except in the case of Sudras ; and even then the offence is expiated by living on water-gruel for seven days (ch XI. 153)."†

অন্যত্র ভাণ্ডারকর মহাশয় বলিয়াছেন—

"Even in the time of the epics, the Brahmans dined with the Kshatriyas and Vaisyas, as we see from the Brahmanic-sage-Durvasa, having shared the hospitality of Draupadi, the wife of Pandavas." *

মন্বাদির সময়েই জাতিভেদ এত কঠিন হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখনই দেখিলাম, এমন কি—সে সময়েও আহারাদি সম্বন্ধে অনুশাসন কঠোর ছিল না, বরং শিথিলই ছিল। সুতরাং হিন্দুসমাজে যখন জাতিভেদের বন্ধনই শিথিল ছিল, তখন আহারাদি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিয়ম ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রাচীন আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শেষে কখন কখনও শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণের ভিতর আহারাদি চলিত, ইহা সেই তাৎকালিক-সমাজের উদার-ভাবেরই পরিচায়ক। সেই সময় ক্ষত্রিয়-রাজগণ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং তাঁহারাও সেই সকল যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইয়া আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন। মহাভারত পাঠ করিলেই জানিতে পাওয়া যায় যে, পাণ্ডব-দিগের বনবাস কালে স্বয়ং দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। বৈদিক-সময় হইতে মন্বাদির সময় পর্য্যন্ত খাদ্যাদি কিরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সে বিষয়ের আলোচনা করিবার আমার আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

---

* "Social History of India" by Ramkrishna Gopal Bhandakar. M. A., PHD, C I E.

† Elphinstone's History of India P. 20.

* Dr. R. G. Bhandarkar on "Social Reform and the programme of the Madras Hindu social Reform Association."

তবে আমি পাঠকদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

১। ঋগ্বেদ—১০।৬১।২ ; ২।৭।৫ ; ৫ ২৯।৭ প্রভৃতি ঋক্।

২। Muir's Sanskirt Text-vol V. pages 463-64.

৩। Dr. Rajendralal Mitters "Indo Aryan" vol I ; pages 354 421.

৪। Mr. R. C. Dutt's "History of civilisation in Ancient India" vol I, pages 41-44.

৫। Mr. P. N. Boses' "History of civilisation under British Rule" vol II ; pages 84-85.

৬। মনুসংহিতা—৫।১২ ১৮ প্রভৃতি শ্লোক।

অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহের কথা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। উচ্চ জাতীয় পুরুষ ও নিম্ন জাতীয়া স্ত্রীলোকে যে বিবাহ হইত, তাহারই নাম অনুলোম বিবাহ এবং উচ্চ জাতীয়া স্ত্রীলোক ও নিম্ন জাতীয় পুরুষে যে বিবাহ হইত, তাহাকেই প্রতিলোম বিবাহ বলিত। যদিও প্রতিলোম বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু মনু অনুলোম বিবাহের বিধি দিয়া গিয়াছেন।*

প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ সত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতিলোমজ-রোমহর্ষণ বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন। যখন নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন বেদব্যাস-শিষ্য রোমহর্ষণ বিপ্রগণ মধ্যে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।*

আবার অন্যত্র দেখিতে পাই :--

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচস্বাচ বিশঃস্মৃতে।
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বাশ্চাগ্রজন্মনঃ ॥"*

শূদ্র কেবল একমাত্র শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে, বৈশ্য শূদ্র ও বৈশ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের কন্যা এবং বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, এবং ব্রাহ্মণ চারি জাতিরই কন্যা বিবাহ করিবে।

"Men of the three first-classes are freely indulged in the choice of woman from any inferior caste, provided they do not give them the first place in their family. But no marriage is permitted with woman of a higher class."†

শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের অন্তর্গত বংশসমূহ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বংশের সহিত বৈবাহিকসূত্রে বদ্ধ হইয়া উচ্চ বংশত্ব প্রাপ্ত হইত।

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ ॥"

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ ॥"‡

বিবাহিতা শূদ্রাতে ব্রাহ্মণের ঔরসজাতা পারশব নাম্নী কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে, এবং এই প্রকার ব্রাহ্মণ-সংসর্গ যদি ধারাবাহিক ক্রমে সাত পুরুষ

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৭৮।১৩, ২৪।

* মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায়।
† Elphistone's History of India.
‡ মনুসংহিতা ১০।৬৪, ৬৫

পর্য্যন্ত চলে, তাহা হইলে সপ্ত জন্মে উপরোক্ত পারশবাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষ হেতু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পদ্ধতি ক্রমে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও শূদ্র হয় এবং শূদ্র ও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২। সংক্ষিপ্তসার।

এতক্ষণ আমরা কি দেখাইলাম, তাহা সংক্ষেপে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা দেখাইলাম যে, হিন্দু আর্য গণ দলে দলে মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অমিতবিক্রমের নিকট সেই প্রাচীন ভারতের অসভ্য সন্তানদিগের বাহুবল অধিক দিন টিকিতে পারিল না, তাই তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। কেহ কেহ বা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। যাহারা পলায়ন করিতে পারিল না বা যাহাদিগের পলায়নের কোন সুযোগ ঘটিল না, তাহারা বিজেতৃগণের অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

কিন্তু যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, যাহারা দুর্গমকাননে, দুরারোহ শৈল-শিখরে অন্ধতমোরাশিব্যাপ্ত গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা কতক বা স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য এবং কতক বা শত্রুনিপীড়ন ও প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে হিন্দু-আর্য্যদিগের নব উপনিবেশ সমূহ আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগের বিক্রম তৃণসংলগ্ন অগ্নিবৎ অধিক দিন বর্ত্তমান ছিল না।

আমরা দেখাইয়াছি যে, এই সময়ে, আর্য্য-হিন্দুদিগের এই সর্ব্ব-প্রথমযুগে—ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। দেবোপাসক আর্য্যগণই বেদের স্রষ্টা। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বপ্রধান। সেই ঋগ্বেদে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি সমস্তই বিশদরূপে বিবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতে জাতিভেদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক পুরুষসূক্তেই জাতিভেদের কথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে, সেই শ্লোকাবলী ঋগ্বেদের অন্যান্য শ্লোকের তুলনায় তত প্রাচীন নহে—অপ্রাচীন ও আধুনিক। ঋগ্বেদের ভাষা কঠোর ও তাহার শব্দসঙ্কলন এবং ব্যাকরণবিধিও স্বতন্ত্র। কিন্তু পুরুষসূক্তের ভাষা অনেকটা আধুনিক-সংস্কৃতের মত। ঋগ্বেদে অন্যান্য যে সকল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই অধুনা অপ্রচলিত। কেবল পুরুষসূক্ত সম্বন্ধেই সে কথা খাটে না। এইরূপ আরও অন্যান্য যুক্তিবলে আমরা দেখাইয়াছি যে, পুরুষসূক্ত ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি যে, ঋগ্বেদের যুগে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল না। সুতরাং আর্য্যদিগের রচিত স্বভাবসুন্দর সরল মন্ত্রগুলি তখন সকলে মুখে মুখে শিখিয়া রাখিত। তাহার পর আমরা দেখাইয়াছি যে, সমগ্র ঋগ্বেদ প্রণয়নে প্রায় ৬০০ শত বৎসরেরও অধিক কাল ব্যয়িত হইয়াছে এবং এই প্রণয়নকার্য্য একজন বা দুইজন বা তিনজনে হয় নাই।

এই সকল এবং অন্যান্য কারণেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদ-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক থাকা অসম্ভব নহে এবং প্রকৃতও তাহাই আছে।

আমাদিগের বেদ আছে, বেদান্ত আছে, স্মৃতি আছে—পুরাণ আছে, তন্ত্র আছে, ইতিহাস আছে, কাব্য আছে—আমাদিগের আরও অনেক গ্রন্থ আছে। এই সকল প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক উভয়-বিধ গ্রন্থেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের হিন্দু-সমাজের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বর্ণিত আছে। আমরা সেই সকল গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছি যে, ঋগ্বেদে বর্ণিত চতুর্ব্বর্ণ-মনুষ্যের উৎপত্তি হইতে অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত চতুর্ব্বর্ণ-মনুষ্যের উৎপত্তি অনেক স্বতন্ত্র। যে সকল গ্রন্থের স্থানবিশেষে পুরুষসূক্তের ছায়া আছে, সে সকল স্থান বিশ্বাস্য নহে—কারণ পুরুষসূক্তই প্রক্ষিপ্ত, তাহারই মৌলিকতা নাই।

জাতিভেদ বলিলে আমরা এখন যাহা বুঝি, প্রাচীন ভারতের আর্য্যসমাজে তেমন একটা কিছু ছিল না। এখনযেমন জাতিভেদ বংশগত হইয়াছে, তখন তাহাও ছিল না। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, পদ্মপুরাণ, ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ, স্কন্দ পুরাণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, কৌষিতকী উপনিষৎ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাশি হইতে নানাবিধ শ্লোক এবং উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া, বায়ু পুরাণ, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি এবং Mr. Elphinstone কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মিঃ পি এন্ বোস (BSC, FES, MRAS &c) কৃত "ইংরাজ শাসনে হিন্দুসভ্যতা" (History of civilisation under British Rule) নামক পুস্তক, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই মহাশয়ের "হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস," শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর MA., PHD, C. I. E., মহাশয়ের "ভারতের সামাজিক ইতিহাস" (Social History of India) এবং "Social Reform and the Programme of the Madras Hindu-Social Reform-Association," অধ্যাপক কে, রামানুজাচারী মহোদয়ের "নিম্ন-জাতির অবস্থা" ("The condition of Low castes") প্রভৃতির সাহচর্য্যে আমরা দেখাইয়াছি যে, পূর্ব্বে জাতিভেদ গুণগত এবং কর্ম্মগত ছিল। তখন ব্রাহ্মণসন্তান কর্ম্মদোষে বা স্বভাবদোষে অনায়াসেই নিম্নস্তরে নামিয়া যাইত এবং শূদ্র বা বৈশ্য, ক্ষত্রিয় অনায়াসেই স্বভাব-গুণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিত।

সর্ব্বশেষে আমরা দেখাইয়াছি, তখন বিবাহ-পদ্ধতি এরূপ ছিল না। অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া পরিগণিত হইত। যদিও প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন প্রতিলোমজ ঋষি একটী ব্রাহ্মণ-সভায় উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। আহারাদি সম্বন্ধেও প্রাচীনভারতে এখনকার মত এমন সকল নিয়ম ছিল না। এমন কি, শুদ্ধ, শান্ত, ক্রিয়ানিরত, ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রের গৃহে ব্রাহ্মণের আহারও দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত না, বরং শাস্ত্রানুমোদিতই ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

হিন্দুসমাজে জাতিবিভাগ।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্যগণ ভারতভূমে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়া অনার্য্যদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত করিলেন। অনার্য্যগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল।

আর্য্যেরা অপ্রতিহত গতিতে দেশের পর দেশ অধিকার করিয়া গঙ্গা যমুনার দোয়াব খণ্ডে বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অধিক সাহসী ও বলশালী ছিলেন, তাঁহারা দলে দলে ভাগিরথী-তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া তৎপূর্ব্ব-দেশে উপস্থিত হইয়া নূতন নূতন অধিনিবেশ সমূহ স্থাপন করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আর্য্য-আচার ব্যবহার দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে অসংখ্য নদ নদী অতিক্রম করিয়া নূতন নূতন উপনিবেশ সমূহ স্থাপন করিবার সময় আর্য্যদিগের যে কত যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, তাহার আর সংখ্যা নাই। অবশেষে এই সকল হিন্দু অধিনিবেশ সমূহই ভারতের সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল প্রাচীন উপনিবেশ হইতেই অযোধ্যার কোশল, উত্তর বিহারে বিদেহ, এবং বারাণসীতে কাশীবংশের উদয় হইয়াছিল। সমকালীন ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভারতের সেই বৈদিক যুগের প্রারম্ভে বর্ণ-ভেদ ছিল, জাতিভেদ ছিল না। আর্য্য ও অনার্য্যের ভিতর যে প্রভেদ—গৌর ও কৃষ্ণের ভিতরে যে প্রভেদ—বিজেতৃ ও বিজিতে যে প্রভেদ, সর্ব্বপ্রথমে শুধু তাহাই ছিল। তখন জাতিভেদ ছিল না। তবে কি প্রকারে এই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল? আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই যে, যখনই কোন দেশে একটী নবাগত দুৰ্দ্ধর্ষ শক্রর আবির্ভাব হইয়াছে; তখনই তাহাদিগের সহিত আদিম অধিবাসীদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সেই পরাজিত আদিম অধিবাসীদিগের ভিতর কতক কতক নূতন শক্রর পদানত হইয়াছে, আর কতক বা স্বাধীনতার মায়া কাটাইতে না পারিয়া বিজন অরণ্যে বা দুরধিগম্য গিরিশৃঙ্গে পলায়ন করিয়াছে।

আমেরিকার দিকে দৃষ্টিপাত কর—সেত আর অধিক দিনের কথা নহে, তিন চারি শত বৎসরের কথা মাত্র যখন শ্বেতকায় ইউরোপীয় দল আমেরিকায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন আদিম অধিবাসীদিগের কি দশা ঘটিয়াছিল? ইতিহাসের পত্রে লিখিত আছে যে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অধিক শান্তিপ্রিয়, যাহারা অপেক্ষাকৃত হীনবল, তাহারা বিজেতৃগণের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া জেতাদিগের বিজিত গ্রাম ও জনপদে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল; আর যাহারা স্বাধীনতা-প্রিয়, অপেক্ষাকৃত অধিক বলবান ও সাহসী;

তাহারা চর্ভ্জা "আপ্পিন্" পর্ব্বতের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় আশ্রয় লইয়াছিল।

সেই প্রাচীন স্যাক্সনদিগের আগমনের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। দেখিবে, তখন ব্রিটনের আদিম অধিবাসিবৃন্দ পরাকৃত হইয়া কতক বা দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ক্রীতদাসের ন্যায় বিজেতৃগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল আর অবশিষ্টাংশ ওয়েলস ও স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিল।

গ্রীসেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। আবার যখন দেসিডোমনিয়গণ সদল-বলে স্পার্টা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন আদিম অধিবাসীদিগের কিয়দংশ হেলট্ বা দাসরূপে পরিণত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিল, আর কতক মেসিনা প্রদেশের পর্ব্বত ও বনশ্রেণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আমাদিগের ভারতবর্ষেও তাহাই হইয়াছিল। অনার্য্যদিগের মধ্যে কতক আর্য্যের দাসত্ব স্বীকার করিল, আর কতক পর্ব্বতশৃঙ্গে, বনশ্রেণীতে আশ্রয় লইয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিল। ইহারাই আর্য্যকর্ত্তৃক দস্যু বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই সময়ে "গৌরবর্ণ" আর্য্য "কৃষ্ণবর্ণ" দস্যু, এই দুই বিভাগে সমাজ বিভক্ত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে গেলে বৈদিক যুগেই জাতিভেদ প্রথার বীজ সর্ব্ব প্রথমে অঙ্কুরিত হয়। সেই সমাজে যাহারা দাসত্ব স্বীকার করিল তাহারা "দাস" ও যাহারা উপদ্রবকারী হইয়া দাঁড়াইল, তাহারা "দস্যু" নামে পরিচিত হইল। কিন্তু উভয়েই এক জাতির লোক। অবশেষে যে সকল অনার্য্যেরা বিজিত হইয়া আর্য্যদিগের আচার, নীতির অনুকরণ করিল, তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল। কিন্তু কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান বা শাস্ত্রের জ্ঞান লাভে তাহাদিগের অধিকার জন্মিল না।*

যাঁহারাই রোমান নগরের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, রোমে বর্ষে বর্ষে যে সকল অসভ্য জাতীয় পুরুষ ও স্ত্রী বন্দীকৃত হইয়া আনীত হইত, রোমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিতেন। সেই ক্রীত দাসগণ সর্ব্ব প্রকার সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত।

"In the early Roman republic, the principle of the absolute exclusoin of foreigners pervaded the Civil Law no less than the constitution. The alien or denizen could have no share in any institution supposed to be coeval with the state......They refused, as I have said befcre, to decide the new cases by pure Roman Civil Law. They refused, no doubt because it seemed to involve some kind of degradation, to apply the law of the particular state from which the foreign litegant came ...they set themselves to form a system answering to the primitive and literal meaning of Jus Gentum, that is, Law common to all nations."†

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত।

† "Ancient Law" by Sumner Maine; PP 48-49.

ভারতবর্ষেরও যে এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। আদিম অধিবাসীদিগের ভিতর যাহারা আর্য্যদিগের দাস হইল, তাহারা শীঘ্রই সকল প্রকার সামাজিক সুখ-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের কোলাহল, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা বাতাসের সহিত মিলিয়া গেল। আর্য্য ও দস্যুর শোণিতে সিক্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্র আবার শুষ্ক ও কঠিন হইয়া উঠিল; উচ্ছ্বসিত চঞ্চল সমাজ আবার শান্ত হইল—এক কথায় বলিতে গেলে আর্য্যগণ আর্য্যভূমির রাজা হইলেন। কিন্তু সেই পলায়িত দস্যুদিগের উপদ্রব কমিল না।

আর্য্যগণ নূতন নূতন গ্রাম, নূতন নূতন জনপদ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। নূতন ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া শস্যোৎপাদন করিতে লাগিল—কিন্তু অনার্য্য দস্যুদিগের সাময়িক অত্যাচার ও আক্রমণের বিরাম হইল না।

অবশেষে যখন নির্ব্বিঘ্নে হোমাদি সম্পন্ন করা দুষ্কর হইতে লাগিল—নিশ্চিন্তে বিনিদ্র হইয়া রজনী যাপন করা কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন আর্য্যগণ আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে তৎপর হইলেন। তাঁহারা আপনাদিগের ভিতর কতকগুলি সবলকায় সাহসী ব্যক্তি বাছিয়া লইয়া আপনাদিগের গ্রাম ও জনপদ, ধন ও রত্ন, সুখ ও শান্তি রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। ইহারাই অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপন আপন অধিকার মধ্যে বাস করিতে লাগিল।

যাহারা ক্ষত হইতে ত্রাণ করে, তাহারাই ক্ষত্রিয়। তাই উল্লিখিত অস্ত্রধারী পুরুষগুলি ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বেই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে দেখাইয়াছি—

"ব্রহ্মবা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়ো রূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং"

অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ জাতি একাকী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ বর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিল।

এই ক্ষত্রিয় বা রাজন্য জাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বলিতেছেন:—

"পঞ্চনদের প্রাদুর্ভাবের সময় রাজপদের তত সম্মান হয় নাই। সকলেই যোদ্ধা, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, যাঁহার অধিনেতৃত্বে দেশ প্রদেশ করায়ত্ত হইত, তিনি নেতার স্বাভাবিক সম্মান পাইতেন, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু গাঙ্গ-প্রদেশে প্রাধান্য লাভ সময়ে আর্য্যদের এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। সাধারণ লোকেরা রাজাদের আড়ম্বর ও স্ব স্ব অবস্থা হইতে তাঁহাদের ভোগ-বিলাসাদির বিষয়ে অত্যন্ত প্রভেদ দেখিয়া তাঁহাদিগকে এক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। একদিকে সাধারণ লোকের অবনতি, অপর দিকে রাজাদের আড়ম্বরপ্রিয়তা, তাহার উপর পুরোহিতদিগের কল্পনা, এই তিনে মিলিয়া ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। তখন রাজারা কোন সম্রান্ত কৃষক বা ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ-সম্পর্ক রক্ষা করা লজ্জাকর বোধ করিতে লাগিলেন।"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বিএ।

স্বরজ্ঞান। ‡

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন,—

স্বরজ্ঞানং শিরো যস্য লক্ষ্মীঃ করতলে ভবেৎ।
এতত্তু শরীরে যস্য সুখং তস্য সদা ভবেৎ।

যে ব্যক্তি স্বরশাস্ত্রকেই সকল শাস্ত্রের শিরোমণি স্বরূপ জ্ঞান করিয়া স্বরশাস্ত্রানুসারে চলেন, লক্ষ্মী তাঁহার করতলগত এবং যাঁহার স্বরজ্ঞান আছে, তাঁহার সর্ব্বদা সুখ হইয়া থাকে।

এতজ্জানাতি যো যোগী এতৎ পঠতি নিত্যশঃ।
সর্ব্বদুঃখৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তো লভতে বাঞ্ছিতং ফলং॥

যিনি স্বরজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং নিত্য যিনি ইহা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বদুঃখহীন হইয়া বাঞ্ছিত ফললাভ করেন।

প্রণবঃ সর্ব্ববেদানাং ব্রহ্মাণ্ডে ভাস্করো যথা।
মর্ত্ত্যলোকে তথা পূজ্যঃ স্বরজ্ঞানী পুমানপি॥

সমস্ত বেদের মধ্যে প্রণব যেমন শ্রেষ্ঠ এবং জগতের মধ্যে সূর্য্য যেরূপ, তদ্রূপ স্বরজ্ঞানী ব্যক্তি মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সকলেরই পূজনীয় হইয়া থাকেন।

নাড়ীত্রয়ং বিজানাতি তত্ত্বজ্ঞানং তথৈবচ।
নৈব তেন ভবেত্তুল্যং লক্ষকোটি রসায়নম্॥
একাক্ষর প্রদাতারং নাড়ীভেদনিবেদকম্।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা চানৃণী ভবেৎ॥

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিন নাড়ী ও ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব যিনি জ্ঞাত আছেন, লক্ষকোটি রসায়নবেত্তাও তৎসদৃশ হইতে পারেন না। এ হেন অনুপমের অমূল্য স্বরশাস্ত্রের একাক্ষর এবং উক্ত নাড়ী তিনটির স্বরূপ উপদেশ যিনি প্রদান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা সেই উপদেষ্টাকে দান করিলে উপদিষ্ট ঋণমুক্ত হইতে পারে।

স্বর, তত্ত্ব, গর্ভ, বর্ষ, রোগ ও চিকিৎসা, কাল, দেববশীকরণ ও স্ত্রীবশীকরণ—এই দশ প্রকরণ স্বরশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে স্বর ও তত্ত্বের বিষয় সংক্ষেপে বলিয়াছি (১)। এক্ষণ গর্ভাদি অন্যান্য বিষয় ক্রমে বলিতেছি।

বন্ধ্যা নারীর পুত্র লাভ করিবার উপায়।

ঋতুরক্ষা কালে পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়ে এবং স্ত্রীর বাম নাসিকায়

‡ সন ১৩০৮ সালের মাঘ মাসের হিন্দু পত্রিকায় স্বরজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে আর লিখিতে পারি নাই। কেন না, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা না হইলে আমাদের ইচ্ছায় কোন কায হয় না। সুতরাং ইচ্ছা সত্বেও এতদিন লিখিতে পারি নাই।

(১) স্বর ও তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিবার এখানে অনেক বাকি আছে ; তাহা যথাসময়ে বিশদ রূপে বিবৃত করিব। আর স্বরোদয় মতে চিকিৎসা কেবল কৌশল মাত্র। ইহার সুফল অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ লোকের ঔষধ কি মন্ত্র এবং অর্থব্যয় না হইলে বিশ্বাস হয় না।

নিশ্বাস বহন কালে গর্ভাধান করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ সঞ্চার হয় (২)

ঋতুকালে রবিঃ পুংসাং স্ত্রীয়াঞ্চৈব সুধাকরঃ
উভয়ো......প্রাপ্তে বন্ধ্যাপুত্রমবাপ্নুয়াৎ ॥

পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় ও স্ত্রীলোকের বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময়ে পৃথ্বী অথবা জলতত্ত্বের উদয় কালে ঋতু রক্ষা করিলে, বন্ধ্যা নারীও গর্ভ ধারণ করিবে। যথা—

ক্ষিতি অপ্ তত্ত্বেষু বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ।

অর্থাৎ পৃথ্বী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকও গর্ভবতী হইবে। আর ঐ দুই তত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান সুখী ও সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

গর্ভাধানং মারুতে স্যাচ্চ দুঃখী,
দিশাখ্যাতো বারুণে সৌখ্যযুক্তঃ।
গর্ভস্রাবী স্বল্পজীবী চ বহ্নৌ,
ভোগী ভব্যঃ পার্থিবেনার্থযুক্তঃ॥

ইহার অর্থ—জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভের সন্তান সুখী হয়, এবং তাহার সুখ্যাতি নানাদিকে বিস্তারিত হইয়া থাকে। আর পৃথ্বী তত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে, সেই সন্তান সুন্দর, ভোগী ও ধনবান্ হইবে। বায়ু তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে, সেই সন্তান দুঃখী হইবে। অগ্নি তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে, গর্ভস্রাব হয় কিম্বা অল্পায়ুবিশিষ্ট সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

অতএব পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস এবং স্ত্রীলোকের বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়ে পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান করিলে সুসন্তান লাভ হয়। কিন্তু পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে পুত্র এবং জলতত্ত্বের উদয়কালে কন্যা জন্মিয়া থাকে।

মাহেন্দ্রে চ সুতোৎপত্তির্বারুণে দুহিতা ভবেৎ।
শেষেষু গর্ভহানিঃ স্যাজ্জাত মাত্রস্য বা মৃতিঃ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে পুত্র জন্মিয়া থাকে। জলতত্ত্বের উদয়কালে কন্যা হয়। এই দুই তত্ত্ব ব্যতিরেকে অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই তিন তত্ত্বের কোন তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে গর্ভ নষ্ট হয় কিম্বা সন্তান জন্মিবামাত্রেই মরিয়া যায়।

যাঁহাদের সন্তান হয় নাই, স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া ধারণা হইয়াছে, কিম্বা যাঁহাদের উপর্য্যুপরি কন্যা জন্মিয়া থাকে, তাঁহারা ঋতুরক্ষা কালে উপরোক্ত নিয়মে পৃথ্বী তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান করিলে সুন্দর সুপুত্র লাভ করিবেন, সন্দেহ নাস্তি। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

(২) পূর্ব্বে প্রবীণা গিন্নিরা নববধূকে স্বামীর বামপার্শ্বে শয়ন করিবার জন্য বিশেষরূপে উপদেশ দিতেন। এখনকার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন নব্যগণ প্রাচীন সকল প্রথাকেই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান্। কিন্তু আমরা ঐরূপ শয়নের প্রথার মধ্যে গভীর উদ্দেশ্য দেখিতেছি; এইরূপ আমরা ভূয়ো দর্শনে বুঝিতেছি যে, হিন্দুর গৃহে আবহমান প্রচলিত কোন প্রথা অনর্থক কি অনাবশ্যকীয় নহে। বামপার্শ্বে শয়নের উদ্দেশ্য বিজ্ঞ পাঠকগণ পশ্চাদুক্ত "নিশ্বাস পরিবর্ত্তনের উপায়" পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

যাহার কন্যা লাভের ইচ্ছা থাকে, তিনি জলতত্ত্বের উদয়কালে ঋতুরক্ষা করিলে সুখী ও ভাগ্যবতী কন্যা লাভ করিবেন।

এরূপ নিয়মেও যদি কাহারও ভাগ্যে পুত্র বা কন্যা লাভ না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা নহে, সেই পুরুষ নিজেই বন্ধ্যা। অর্থাৎ পুরুষের শুক্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এক প্রকার জীবন্ত কীটাণু থাকে, তাহাকে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রে স্পারম্যাটোজিয়া কহে। ঐ Spermatozea (শুক্রকীটে) যাহার অচেতন ও মস্তকবিহীন হয়, তিনি সহস্র চেষ্টা করিলে এবং শতনারী বিবাহ করিলেও সন্তান লাভে বঞ্চিত থাকিবেন।

যাঁহারা স্ত্রীকে বন্ধ্যা মনে করিয়া পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়া থাকেন; কেহ বা বিবাহ করিয়া শেষে সংসার অশান্তির আগার করিয়া নিজেও আমরণ জ্বালাতন হইয়া থাকেন; তাঁহারা স্বরমতে প্রোক্ত নিয়ম পালন করিয়া বিফল হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ শুক্রে জীবন্ত কীটাণু আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। নিজের বন্ধ্যাত্ব না বুঝিয়া, কেবল অবলা সরলা স্ত্রীর স্কন্ধে বন্ধ্যাত্ব দোষ চাপাইয়া নববরবেশে রসের বাসর-ঘরে আবার আসর জমকাইয়া বসিবার আশা করিলে ভগবানের নিকট দোষী হইতে হয়।

স্বর মতে উপরোক্ত নিয়মে গর্ভাধান করিবার পূর্ব্বে একটি ঔষধ সেবনের বিধি আছে, যথা—

শঙ্খবল্লী গবাং দুগ্ধং পৃথ্ব্যাপো বহতে যদা।
ভর্ত্তুরগ্রে বদেৎবাক্যং গর্ভং দেহি ত্রিভির্ব্বচঃ
ঋতুস্নাতা পিবেন্নারী ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ।
রূপলাবণ্য সম্পন্নং নরসিংহং প্রসূয়তে॥

স্ত্রীলোক ঋতুস্নানান্তে পতির সম্মুখে "গর্ভং দেহি" এই বাক্য তিনবার বলিয়া পুত্রার্থে পৃথ্বীতত্ত্বের বহন কালে এবং কন্যার্থে জলতত্ত্বের বহন কালে গোদুগ্ধ ও শঙ্খবল্লী পান করিবে (৩)। পরে রাত্রিকালে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গর্ভাধান হইলে রূপলাবণ্যসম্পন্ন মহাবলিষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে পারে।

যদিও এই ঔষধটি স্বরশাস্ত্রে আছে; কিন্তু স্বরজ্ঞ গুরুদেবেরা বলেন যে, বাধকাদি স্ত্রীজাতীয় কোন পীড়া না থাকিলে এ ঔষধ সেবন করিবার আবশ্যক হয় না।

গর্ভাধান সময়ে যেমন তত্ত্ব বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তেমনি স্বরের বাল্যাদি অবস্থা বিচার করিয়া অনুকূল অবস্থায় কার্য্য না করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

---

(৩) দুগ্ধ ও শঙ্খবল্লী কত পরিমাণে পান করিবে, তাহা স্বরশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই; কিন্তু স্বরজ্ঞ গুরুদেবেরা পরিমাণ জ্ঞাত আছেন। পরিমাণটি আমার ঠিকস্মরণ নাই। আমি চট্টগ্রামে ৺চন্দ্রনাথ দর্শনে যাইতেছি; শিক্ষার সময়ে যে খাতায় ঐ গুলি লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহা এখন সঙ্গে আনি নাই। এজন্যে পরিমাণ লিখিতে পারিলাম না।

যদি এই ঔষধ সেবন করিতে হয়, তবে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে সেবন করিতে হইবে। যে কোন পীড়ায় যে কোন ঔষধ অর্থাৎ ঔষধ মাত্রই দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় সেবন করিতে হয়। ইহাই স্বরশাস্ত্রের নিয়ম।

চপলঃ কাতরো মূর্খঃ কৃপণশ্চাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অসত্য বহুভাষী চ জাতো বাল স্বরোদয়ে॥
ব্যবসায়ী কলাভিজ্ঞঃ স্ত্রীরতঃ সুভগঃ সুখী।
দীর্ঘায়ুররিভিঃ শূরঃ কুমারোদয় সম্ভবঃ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণো রাজা ভবতি বিশ্রুতঃ।
সর্ব্বকাল জয়ী যুদ্ধে জাতো যুবোদয়ে শিশুঃ॥
স্ত্রীজিতো ধার্ম্মিকঃ কামী বিবেকী স্থির-
সাহসঃ।
সত্যবাদী সদাচারঃ পুমান্ বৃদ্ধোদয়োদ্ভবঃ॥
ক্লেশী সমৎসরঃ ক্রূরো বিভ্রমো বিকলেন্দ্রিয়ঃ
সর্ব্বকার্য্যালসো দুষ্টো জন্ম যস্য মৃতোদয়ে॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, বালস্বরে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান চঞ্চল প্রকৃতি, মূর্খ, কৃপণ, অজিতেন্দ্রিয়, মিথ্যাবাদী, বহুভোগী ইত্যাদি দোষবিশিষ্ট হয়।

কুমারস্বরোদয়ে জন্মগ্রহণ করিলে দীর্ঘায়ু ও কলাভিজ্ঞ, শূর, সুখী ইত্যাদি হয়।

যুবাস্বরে জন্ম গ্রহণ করিলে, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন রাজা হয় অথবা রাজা সদৃশ হয় এবং সর্ব্বকাল যুদ্ধে ও মোকদ্দমা মামলায় জয়লাভ করে।

বৃদ্ধস্বরোদয়ে জন্ম হইলে সদাচারী, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক ও বিবেকী ইত্যাদি হয়।

মৃতোদয়ে জন্মিলে দুঃখী, ক্রূর, অলস ইত্যাদি হইয়া থাকে।

স্বরের উক্ত পঞ্চাবস্থা বিচার করিয়া গর্ভাধান এবং অন্যান্য সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

পুত্র সুকবি, পণ্ডিত ও বাগ্মী হইবার উপায়।

জাত মাত্র বালকং পিতা স্বর্ণং দত্ত্বা পশ্যেৎ। ততো গৃহান্তরে গর্ভাধান পদ্ধত্যুক্তং পঞ্চদেবতা পূজাদি ধারা হোমান্তং কৃত্বা পঞ্চাহুতীদ্দদ্যাৎ। "হ্রীং অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি ইত্যেভিমন্ত্রৈরিতি।

ততঃ কাংস্যপাত্রে সমাংশেন মধুসর্পিষী সমানীয় তদুপরি ঐমিতি সপ্তধা জপ্ত্বা। "হ্রাং আয়ুর্ব্বক্ষাদি" ইতি মন্ত্রেণদক্ষিণ হস্তানামিকায়াৎ শিশুং প্রাশয়েৎ।

ইত্যায়ুর্জ্জননং কৃত্বা পিতা গুপ্তং নাম কুর্য্যাৎ ততো জন্মদিনাবধি ত্রিদিনাভ্যন্তরে কর্ত্তব্যং যথা—

বালকস্য তু জিহ্বায়াং ত্রিদিনাভ্যন্তরে
ন্যসেৎ।
মধুনা শ্বেত দূর্ব্বাভিঃ সুবর্ণস্য শলাকয়া।
ইদং বাগ্‌ভব কূটন্তু* লিখেদ্বৈ জননান্তরে।
স এব পণ্ডিতো ভূয়াৎতু মূর্খো ভবেদ্ ধ্রুবং।
বাগ্‌ভবকূটমপি তত্রৈব যথা।—
কামদেবস্ততো যোনিস্তুর্য্যা স্বর পুরন্দরী।
ভুবনেশী ততঃ পশ্চাৎ পঞ্চবক্ত্র বিভূষিতঃ।
অয়ংস বাগ্‌ভবো দেবী বাগীশত্ব প্রদায়কঃ।
অনেন বাগ্‌ভব কূটেন বালকঃ পণ্ডিতঃ সুকবিঃ শব্দালঙ্কারবিচ্চ ভবতি।

যদীমং মন্ত্রং কৃতপুরশ্চরণো বালিশস্যাপি (৪) মূর্দ্ধনি হস্তং দত্ত্বাষ্টোত্তর শতং জপেত্তদা সোঽপি শ্লোকং করিষ্যতি। যদিচেমং মূকস্য জিহ্বায়াং জপেত্তদা সোঽপি কবির্ভবতি।

* "এই মন্ত্রটি ক্লাং হ্রীং ঐং শ্রীং হ্রীং হেসৌঃ।" ইহার নাম বাগ্‌ভবকূট।

(৪) বালিশস্য—মূর্খস্য।

বাগ্‌ভবকূট—মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্র জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়।

জিহ্বাং সম্মাৰ্জ্জ্যদেবেশি লিখিদ্ধেম-শলাকয়া
দূর্ব্বায়া বা মহাদেবি জিহ্বোষ্ঠয়োঃ
সমালিখেৎ।

পংক্তিদ্বয়েন সংলিখ্য কুর্য্যাচ্চ বালসংস্ক্রিয়াং
একাদশাহে দেবেশি দ্বাদশাহেঽথবা পুনঃ।
বর্ণ জাত্যাদি ভেদেন সাসান্তঃ সন্তুবিষংতি।
যথা শক্ত্যুপচারেণ দেবতাং পূজয়েৎ পুনঃ।
সংপূজ্য দেবতাং ভক্ত্যা লিখেৎ মন্ত্রং মহেশ্বরী
যদি পিতা ন দেশস্থো পিতৃব্যো মাতুলোঽপি
বা।

লিখিত্বা পরমেশানি কুর্য্যাচ্চ বালসংস্ক্রিয়াং
মূলমন্ত্রং লিখেন্মন্ত্রী যস্তোষ্ঠে শ্বেতদূর্ব্বায়া।
বাক্যোচ্চারণতো বালো বাগ্মী দ্রুত কবি-
র্ভবেৎ।

জিহ্বায়াঞ্চ লিখেদ্ মন্ত্রং যত্নে দারুকুশেন বা
বারত্রয়ন্তু সম্মার্জ্জ্য দক্ষিণেনৈব পাণিনা।
মন্ত্রমুচ্চার্য্য প্রত্যেকং পংক্তিং কুর্য্যাৎ
সুশোভনং।

আদৌ সংস্কার কর্ত্তব্যান্তরন্তে বিলিখেন্মনুং।
কবির্ব্বাগ্মী ভবেৎ পুত্রঃ সর্ব্বকাম প্রকারকঃ
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ধার্ম্মিকো জায়তে
মহান্।

ইহার প্রয়োগ এইরূপ—

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, পিতা স্বর্ণ দ্বারা পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক পঞ্চ দেবতাদি পূজা করিয়া ধারা হোম করিবেন (৫)। পরে পঞ্চাহুতি দিতে হইবে (৬) তৎপর কাংস্যপাত্রে ঘৃত ও মধু সমানাংশে লইয়া তদুপরি ঐঁ মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া আয়ুর্ব্বর্চ্চাদি মন্ত্রে (৭) দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ঐ ঘৃত মধু লইয়া শিশুর মুখে দিবেন। ইহাকে আয়ুর্জনন কহে। এই সময়ে পিতা মনে মনে শিশুর একটি নাম রাখিবেন।

ইহার পর তৃতীয় দিনে শ্বেত দূর্ব্বা অথবা স্বর্ণশলাকা দ্বারা মধু লইয়া বালকের জিহ্বাতে বাগ্‌ভবকূট অর্থাৎ ক্লীঁ হ্রাঁ ঈঁ শ্রীং হ্রীং হেসৌঃ—এই বীজ লিখিয়া দিবেন।

তৎপর জাতি অনুসারে শুভশৌচান্ত দিনে পিতা অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পিতৃব্য কিম্বা মাতুল অবস্থানুসারে উপচার দ্বারা দেবতা পূজা করিয়া নিজ কুলদেবতার মন্ত্র ওষ্ঠে লিখিবে এবং জিহ্বাতে পূর্ব্বোক্ত বাগ্‌ভবকূট লিখিবে। অগ্রে

(৫) হিন্দুর গৃহে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদি কার্য্যে দেওয়ালে ঘৃত দ্বারা ধারা দেওয়া রীতি আছে। তাহাকে বসুধারা বলে। এখানে ধারা হোমের নিয়ম বলিয়াছেন। ধারা হোম যথা—দেহলীং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশ পরিমাণতঃ সপ্তধা পঞ্চধা বিন্দন্ দদ্যাৎ সিন্দুর চন্দনৈঃ। প্রত্যেকবিন্দৌ মতিমান্ কামং মায়াং রমাং স্মরন্। ঘৃতধারামবিচ্ছিন্নাং দত্বা।
কাম, মায়া, রমা অর্থে—ক্লীং হ্রাং শ্রীং হইবে,

(৬) পঞ্চ আহুতি যথা—হ্রীং অগ্নয়ে স্বাহা হ্রীং ইন্দ্রায় স্বাহা, হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা, হ্রীং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো স্বাহা, হ্রীং ব্রাহ্মণে স্বাহা।

(৭) হ্রীং আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশো।

স্বর্ণ দ্বারা জিহ্বা তিনবার মার্জ্জনা করিবে, পরে স্বর্ণশলাকা কিম্বা শ্বেত দূর্ব্বা দ্বারা ওষ্ঠে মন্ত্র লিখিবে এবং কাষ্ঠ অথবা কুশ দ্বারা জিহ্বাতে লিখিতে হইবে; কিন্তু প্রথমোক্ত প্রকারে ধারাহোমাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া বালকের সংস্কার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে শিশু সুপণ্ডিত সুকবি, বাগ্মী, শব্দালঙ্কারবিৎ হইবে।

এইরূপ করিবার দিন পূজোপকরণ ও অন্ন বস্ত্রাদি এবং দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিবার বিধি আছে। আর ঐ সকল কার্য্য নিজে করিতে না পারিলে ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণের দ্বারা সমস্ত সম্পন্ন করিতে হইবে। কারণ,— "মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ, তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাঃ।" এ কথা যেন মনে থাকে।

ইহা ব্যতীত গর্ভাধান করিবার আরো নিয়ম স্বরশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। অতঃপর তাহা বলিব; কিন্তু আমি প্রথমে যে স্বরশাস্ত্র গ্রন্থ দৃষ্টে শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাতে ইহা পাই নাই। জ্বালামুখী তীর্থে অবস্থিতি সময় পঞ্জাব দেশীয় এক পরমহংস বাবার নিকট স্বরশাস্ত্রে নিম্নের লিখিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম * পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করিতেছি।

চতুর্থ প্রহরে রাত্রে র্যো গচ্ছেৎ রমণীঃ নরঃ
হরিভক্তিরতং সুতং লভতে স মহামতিঃ।
তনয়া জায়তে তস্য ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা।
রাত্রিগত ফলং দেবি ইতিতে কথিতং ময়া।

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গর্ভাধান করিলে হরিভক্তি পরায়ণ মহামতি পুত্রলাভ করিয়া থাকে অথবা কন্যা সমুৎপন্ন হইলে, সেই কন্যা পতিব্রতা ও ধর্ম্মশীলা হয়।

অতএব সুপুত্র লাভের আশা করিলে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গর্ভাধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন দিনে গর্ভাধান করিতে নিষেধ আছে।

শ্রীহরি বাসরে তথা অমাবস্যা দিনে চৈব
অথবা পূর্ণিমা তিথৌ চতুর্দ্দশী দিনে চৈব
তথা বৈ অষ্টমী তিথৌ রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং
পরিত্যজেৎ মহাদেবি যদিচ্ছেদাত্মনো হিতং

যদি আপনার হিত কামনা থাকে, তবে হরিবাসর, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও রবিবার এবং সংক্রমণ (সংক্রান্তি) দিনে গর্ভাধান করিবে না। (৮)

* এই পরমহংস বাবার হস্তে একটি অলাবু পাত্র সর্ব্বদা থাকিত। তিনি যত-বার ঐ পাত্রের মধ্যে হাত দিতেন, তত-বার পাঁচটি টাকা বাহির করিতেন এবং তাহা দ্বারা মিষ্টান্ন কিনিয়া বালকদিগকে দিতেন ও অন্যান্য প্রকারে দান করিতেন। বাঙ্গলা সন ১২৮২ সালের পূর্ব্বে অনেক দিন লাহোর সহরে ছিলেন এবং সকলে তাঁহাকে "তুম্বুরো বাবাজি" বলিয়া ডাকিত।

(৮) স্বরমতে গর্ভাধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ কবি, বাগ্মী ও পণ্ডিত হইবার যে উপায় লিখিত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করি। ইহার প্রকরণ যিনি বুঝিতে না পারিবেন, তিনি আমাকে লিখিলে নিয়ম প্রকরণ সমস্ত বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

স্বরের যে পঞ্চাবস্থা বলিয়াছি, তাহা বিচার করিয়া সর্ব্ব কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ঐ অবস্থা এবং কোন অবস্থায় কোন্২ কার্য্য করা উচিৎ, তাহা বলিতেছি।

স্বরাণাং বালদ্যাবস্থা ফলঞ্চ।
উদিতস্য স্বরস্য স্থানামে স্বর বশেনতাঃ।
পঞ্চবালাদিকাবস্থাঃ স স্ব কাল প্রমাণতঃ।
আদৌ বালঃ কুমারশ্চ যুবা বৃদ্ধো মৃতস্তথা।
নিজাবস্থা স্বরূপেণ ফলদা নাত্র সংশয়ঃ।
কিঞ্চিল্লাভ করো [illegible] কুমারশ্চার্দ্ধ লাভদঃ
সর্ব্বসিদ্ধিঃ যুবাদ [illegible] হানি মৃতে ক্ষয়ঃ।
যাত্রা যুদ্ধে বিবাদে চ [illegible] দুষ্টে রুজান্বিতে।
বালস্বরো ভবেদ্দুষ্টো বিবাহাদি শুভেঽশুভঃ।
সর্ব্বেষু শুভ কার্য্যেষু যাত্রাকালে তথৈব চ।
কুমারঃ কুরুতেসিদ্ধিং সংগ্রামে সঙ্কটো জয়ী
শুভাশুভেষু সর্ব্বেষু মন্ত্র যন্ত্রাদি সাধনে।
সর্ব্বসিদ্ধিং যুবাদত্তে যাত্রাযুদ্ধে বিশেষতঃ।
দানে দেবার্চ্চনে দীক্ষা গূঢ়মন্ত্র প্রজল্পনে।
বৃদ্ধ স্বরো ভবেত্তব্যো রণ ভঙ্গোভয়ঙ্গমে।
বিবাহাদি শুভং সর্ব্বং সংগ্রামাদ্য শুভং তথা
নকর্ত্তব্যং নৃভিঃ কিঞ্চিদ্যাতে মৃত্যু স্বরোদয়ে
মৃতো বৃদ্ধস্তথা বালঃ কুমার স্তরুণঃ স্বরঃ।
যথোত্তর বলাঃ সর্ব্বে জ্ঞাতব্যাঃ স্বরবেদিভিঃ

ভাবার্থ—পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক এক নাসিকায় এক ঘণ্টা হিসাবে শ্বাস বহন হয়। ঐ এক ঘণ্টার মধ্যে স্বরের পাঁচটি ভাব বা অবস্থা হয়। যথা—বাল, কুমার যুবা, বৃদ্ধ ও মৃত। এই পাচ প্রকার অবস্থা ও নামানুসারে কার্য্যের ফল প্রদান করিয়া থাকে। আমরা কোন কার্য্যো-দ্দেশে গমন করিয়া কিম্বা ব্যবসায়াদি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিফলমনো-রথ হই এবং অদৃষ্ট পূর্ব্ব অদৃষ্টকে ধিক্কার দেই, কিম্বা সমস্ত দোষ বিধাতার ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু স্বরের উক্ত পঞ্চাবস্থা ও তত্ত্ব বিচার না করিয়া কার্য্য করি, এ জন্য আমাদের আশানাশ মন-স্তাপ হয়; ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; সুতরাং ইহাতে সংশয় করা উচিৎ নহে। বালস্বরে কার্য্য করিলে কিঞ্চিল্লাভ, কুমার স্বরে অর্দ্ধ লাভ, যুবাস্বরে সর্ব্ব সিদ্ধি হয় এবং বৃদ্ধ ও মৃত্যু স্বরে কার্য্য করিলে হানি ও ক্ষয় হয়।

যাত্রা, যুদ্ধ, বিবাদ, বিবাহাদি কার্য্য বাল স্বরে করিলে অশুভ হয়।

যাত্রা, সংগ্রামে এবং সর্ব্ব প্রকার শুভকার্য্য কুমার স্বরে হইলে শুভ হয়।

মন্ত্র যন্ত্রাদি সাধন, কোন কার্য্যোপ-লক্ষে যাত্রা, যুদ্ধ ও সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভ কার্য্য যুবাস্বরে করিলে সিদ্ধি হয়। যুবা স্বরে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা সিদ্ধি হইয়া থাকে।

দান, দেবার্চ্চনা, দীক্ষা, গূঢ় মন্ত্র সাধন বৃদ্ধস্বরে ভাল। তদ্ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে বৃদ্ধ স্বর ভাল নয়।

মৃত্যু স্বর উদয়ে কোন কার্য্য করিতে নাই। ইহাতে যে কার্য্য করিবে, তাহা নষ্ট হইবে।

যে জন্ত কোনস্থানে যাইতে হইলেও কুণ্ঠিত নহি। ফল কথা একবার পরীক্ষা দ্বারা স্বরশাস্ত্রের সত্যতা প্রত্যক্ষ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

স্বরের এই পঞ্চাবস্থা বিচার করিয়া সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য। (৯)

স্বরের এই পঞ্চাবস্থা বিচার করিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। আর নাড়ী সংক্রমণ ও তত্ত্ব সংক্রমণ কালে কোন কার্য্য করিতে নাই। সংক্রমে যে কার্য্য করিবে, তাহাই নষ্ট হইবে।

নাড়ী ও তত্ত্ব সংক্রমণে কর্ত্তব্য।

এক নাসিকা হইতে নিশ্বাস অন্য নাসিকায় বহন আরম্ভ হইবার সময় নাড়ী সংক্রমণ বলিয়া কথিত হয়। যথা—বাম নাসিকায় একঘণ্টা বহন শেষ হইয়া দক্ষিণ নাসিকায় বহন আরম্ভ হইবে, ইহাকে নাড়ী সংক্রমণ বলে। অর্থাৎ যে মুহূর্ত্ত এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় শ্বাস যায়, সেই মুহূর্ত্তেই নাড়ী সংক্রমণ তত্ত্ব সংক্রমণ ও এইরূপ। একতত্ত্ব শেষ হইয়া আর এক তত্ত্ব আরম্ভ হইবার সময় তত্ত্ব সংক্রমণ বলিয়া থাকে। নাড়ী ও তত্ত্ব সংক্রমণ কালে কোন শুভ কার্য্য করিবে না।

নাড়ী সংক্রমণ কালে তত্ত্ব সংক্রমণে তথা।
শুভং কিঞ্চিন্ন কর্ত্তব্যং পুণ্যদানাদি কোটিধা

নাড়ী সংক্রমণ কালে ও তত্ত্ব সংক্রমণ কালে শুভ কার্য্য মাত্রেই করিবে না এমন কি, সংক্রমণ কালে দানাদি পুণ্য-কর্ম্ম করিতে নাই।

সংক্রমণ সময়ে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তানের মাতার মৃত্যু হয়। যথা—

যুগ্মে যুগ্মং ক্ষয়ো নষ্টে মাতুর্মৃত্যুশ্চ সংক্রমে।

আমাদের দেশে মা খেগো ছেলে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া কিছুদিন পরে তাহার মাতার মৃত্যু হইলে তাহাকে মাতৃরিষ্টি বা মাখেগো ছেলে বলিয়া থাকে। কিন্তু আমরা নিজের অজ্ঞতা ও দোষ না বুঝিয়া বালককে মাখেগো বলিয়া সমস্ত দোষ তাহার স্কন্ধে চাপাই। (১০)

সংক্রমণ কালে দূরস্থানে যাত্রা করিলে যাত্রা হানিকরী হইয়া থাকে—

যাত্রা হানিকরী [illegible] মৃত্যু কালে নসংশয়ঃ।

এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় নিশ্বাস বহন আরম্ভ হইবার সময় সংক্রম বলিয়া মন্দফল প্রদান করে কেন, তদ্বিবরণ বলিতেছি।

পিঙ্গলায়াং স্থিতা রুদ্র ইড়ায়াং সঙ্গতাঃ পরে
সুষুম্না মধ্যগা জ্ঞেয়াশ্চত্বারো যে নপুংসকাঃ

অত্র প্রকারো—বাম নাসাতো দক্ষিণ নাসা প্রবেশ প্রারম্ভ সময়ে দেহ বায়ুঃ

---

(৯) এই পঞ্চ অবস্থা চিনিবার উপায় পরে বলিব।

(১০) সৃষ্টিরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের সুখ সুবিধার জন্য ভগবান নানা উপায় করিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাহা বুঝিনা, জানিনা এবং জানিতে চেষ্টাও করি না। বাস্তবিক মানুষ ইচ্ছা করিলে—শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন করিলে সুন্দর, সুখী, ধর্ম্মশীল, দীর্ঘজীবী ও ভাগ্যবান সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সুসন্তান লাভের উপায় স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বিশদভাবে বলিবার ইচ্ছা আছে।

কিঞ্চিৎকালমুত্তরত্র বহতি স-দক্ষিণায়ণ-প্রারম্ভসময়ন্তর্বর্তিনীঃ, স্বঃ, ৯ কারান্মকং ক্রুরকর্মমুদীত্ত এবং দক্ষিণনাসাতো বাম-নাসাগমনকালেঽপি স-উত্তরায়ণপ্রারম্ভ-কালান্তর্বর্তিনীঃ স্বঃ ২ রূপ দ[ৈ]র্ঘকর্ম মুনেতি।

পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে,—

স্বরং সপ্তমমারভ্য চত্বারশ্চ নপুংসকাঃ।
তে স্বযুম্নাশ্রিতে প্রাণে প্রোদাস্তায়ন-
সংক্রমে। ইতি।

সংক্রমণ কালে [illegible] আকাশ তত্ত্বের উদয় হয়, কিন্তু আকা[illegible] কেবল যোগ-সাধন ও তত্ত্বজ্ঞ[illegible] হয়। তদ্ভিন্ন সকল প্রকার কার্য্য [illegible] নষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য বলিয়াছেন "নভো বহতি সংক্রমে।" অর্থাৎ সংক্রমণ কালে আকাশ তত্ত্বের উদয় হয়, এজন্য কোন কার্য্য করিলে আকাশতত্ত্বের ন্যায় বিফল হয়। (১১)

(ক্রমশঃ।)

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়

(১১) স্বরজ্ঞান পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয় জানিবার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন; তাঁহারা স্বরের বাদ্যাদি অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যে অতঃপর পূর্ব্ব ঠিকানায় পত্র না পাঠাইয়া "জেলা নোয়াখালি সদর কোর্টের হেড ক্লার্ক বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের কেয়ারে" আমাকে লিখিবেন। তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর পাইতে অবশ্য বিলম্ব হইবে না।

তত্ত্ব-সমাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

মহর্ষি কপিলদেবের তত্ত্ব-সমাসের চারিটী সূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সম্প্রতি পঞ্চম-সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। চতুর্থ-সূত্রে চেতন বিশ্বাবভাসক 'পুরুষ' নামক অবিকৃততত্ত্বের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এই পঞ্চম সূত্রে মূলপ্রকৃতির স্বরূপশক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। কপিলদেব বলিতেছেন,

ত্রৈগুণ্যং। ৫

মূলপ্রকৃতির স্বরূপ ত্রৈগুণ্য। ত্রিগুণ-ভাব এই সৃষ্ট সংসারের সূক্ষ্ম-সীমা। এই বিরাট বিশ্বের যাবৎবস্তুতেই ত্রিগুণ-ভাবের উপলব্ধি করা যাইতেছে। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে, জগতে সর্ব্বানুস্যূত ত্রিগুণভাব, জগৎকারণ মূল-প্রকৃতির ত্রিগুণভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অনুমান-জগতে তথ্যাবিষ্কারের প্রণালী দ্বিবিধ। অনুমানক্রমের অনুলোমপ্রবাহ এবং বিলোমপ্রবাহ। অনুমানের প্রণালী যখন ক্রমস্ফুট অবস্থায় গমন করে, তখন তাহা হইতে অনুলোমক্রম আবিষ্কৃত হয়, আর যখন ক্রমশঃ সূক্ষ্মাবস্থায় বা বিপরীত-নিয়মে, বিকাশেরপ্রতিকূলপথে গমন করে, তখন উহাদ্বারা বিলোমপ্রবাহ অবগত হওয়া যায়। কার্য্য দ্বারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম কারণস্তরে উপনীত হইতে এই প্রণালী সহায়তা করে। কারণদর্শনে কার্য্যের সম্ভাবনাকল্পনায় অন্যবিধ উপায় উপকারী।

উভয়ের প্রকারগতপার্থক্যের ন্যায় ফলগত-পার্থক্যও যথেষ্ট।

ব্যক্তকার্য্যজগৎ ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং ইহা হইতে অব্যক্ত-জগতের পরমকারণ প্রকৃতিতেও ত্রিগুণভাব কল্পনা করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ত্রিগুণময় জগতের সুক্ষ্মতমতর-কল্পনা যেখানেই না কেন বিশ্রাম লাভ করুক, তাহাকে ত্রিগুণময় না বলিলে চলিবেনা। কপিলদেব বলিতেছেন, বাহ্য এবং আন্তর উভয়জগতের মূলকারণ এক ত্রিগুণময় বিকারশীল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব।

ত্রিগুণ কি, তাহা এখন বিবেচনা করা যাউক। ত্রিগুণ শব্দের অর্থ তিনটী গুণ। উহাদের স্বরূপ স্থির করিবার জন্য শব্দার্থের আলোচনা আগে করা যাউক। শব্দের অর্থ সাধারণতঃ যেরূপভাবে গৃহীত হয়, দার্শনিকগণ তদপেক্ষা ভিন্ন অর্থে সেই সকল শব্দ ব্যবহার করেন, এইজন্য ইহাদের "পারিভাবিকঅর্থ" নামক একটী নূতন আভিধানিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

'গুণ' বলিলে ন্যায়বৈশেষিকদর্শন-রচয়িতা গৌতমকণাদমহর্ষিদ্বয়, দ্রব্যাশ্রিত-ভাব বিশেষ বুঝিতেন। ইঁহাদের মতে গুণ শব্দ যে ভাবের পরিজ্ঞাপক, ইংরেজী Quality শব্দ সেইরূপ ভাব বুঝায়। কণাদ বা গৌতম লঘুত্ব, গুরুত্ব রূপ, রস ইত্যাদি দ্রব্যাশ্রিত ভাব সকলকে 'গুণ' শব্দে বুঝিলেও, কপিল তাহা বুঝেন নাই। কপিলের গুণ স্বয়ং দ্রব্য, দ্রব্যাশ্রিত ভাববিশেষ নহে। কণাদ ও গৌতমের 'গুণ' এই কপিলের 'গুণে' বিদ্যমান, কিন্তু কণাদ ও গৌতমের 'গুণে' আর 'গুণ' থাকেনা।

মীমাংসকগণ 'গুণ' বলিলে দ্রব্যাগতভাব বা ধর্ম্মবিশেষকে বুঝেন নাই, তাঁহাদের মতে 'গুণ' অর্থ অঙ্গ। কোনও প্রধান কার্য্যের দশটী অঙ্গ আছে, ঐ অঙ্গগুলিও কার্য্য, প্রধানকার্য্য ও কার্য্য, ইহাদের পার্থক্য এই যে, উহাদের প্রাধান্য নাই, আর প্রধান বা মূল কার্য্যের প্রাধান্য আছে। 'গুণ' শব্দের অর্থ সুতরাং অপ্রধান। অপ্রধান-কার্য্য প্রধানকার্য্যের অনুরোধেই করিতে হয়, অতএব অ[illegible]কার্য্যের কোনও স্বার্থ নাই, কেবল [illegible] (প্রধান কার্য্যার্থতা ই) উহাদের [illegible]। প্রধানের জন্য অঙ্গ, প্রাধসি[illegible]থাকিলে অঙ্গ অনাবশ্যক। মীমাংসা শাস্ত্রে 'গুণ' নামের মূলতত্ত্ব পরার্থতা। কপিলদেব প্রকৃতির পরিচয়ে ত্রিগুণ-ভাবের কথা বলিতেছেন। ত্রিগুণ আর প্রকৃতি কিছুই পৃথক্ নহে। তিনটী গুণ অর্থাৎ পরার্থপদার্থসমবায়ই কপিলদেবের প্রকৃতি! জগতের সমস্ত পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া, তিনি তিনটী সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং সেই তিনধর্ম্মযুক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মমহাগুণময়ভাবকেই জগৎকারণ বলিয়াছিলেন; এই পর্য্যন্ত অনুমান শাস্ত্রের সহায়তায় অবগত হওয়া যায়। প্রকৃতির পরার্থতাই প্রধান পরিচয়। প্রকৃতি বা গুণত্রয় ভোগ্যবস্তু, আর পুরুষ বা চৈতন্য-তত্ত্ব ভোক্তা। সাংখ্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই প্রকৃতির পরার্থতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সাংখ্য-প্রবচনে পুরুষতত্ত্বের অনুমান করিতে গিয়া, কপিলদেব "সংহত পরার্থত্বাৎ" এই সূত্রে প্রকৃতি পর্য্যন্ত জড় তত্ত্বের পরার্থতা প্রতিপাদন, এবং তাহাই পুরুষানুমানে

কারণ, ইহা বলিয়াছেন। "ভোক্তৃভাবাচ্চ" এই সূত্রে পুরুষের ভোক্তৃত্ব ও বলিয়াছেন। প্রকৃতি অর্থ গুণত্রয়। প্রকৃতি পদার্থ অর্থাৎ গুণত্রয় পদার্থ; এখন বুঝা গেল পদার্থতাই মীমাংসকগণের ন্যায় কপিলাচার্য্যের মতেও 'গুণ'শব্দ প্রয়োগের হেতু।

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে আচার্য্যপ্রবর বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে, সাংখ্যাচার্য্যগণ যে 'গুণ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নৈয়ায়িক বা বৈ[illegible]ক মতের 'গুণ' পদার্থের বাচক ন[illegible] 'গুণ' শব্দের অর্থ তাঁর। ত্রিগুণ[illegible] বুঝা যায়, যাহাতে তিনটী গুণ বা [illegible] আছে তাদৃশ রজ্জু। এখানে 'গুণ' শব্দ অপ্রধান বাচক হইলেও সাধারণতঃ বন্ধক অর্থেই ব্যবহৃত। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, ত্রিগুণই পুরুষ বা জীবের বন্ধের কারণ। ত্রিগুণের প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিয়াই আপনাকে (ত্রিগুণাতীত পুরুষস্বরূপকে) গুণাত্মক মনে করেন, এবং মোহবশতঃ বদ্ধ হন; প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বন্ধ মোক্ষ কথার কথা। পুরুষ যে ভ্রমবশতঃ বাঁধা পড়েন, সেই বন্ধনের উপকরণ ত্রিগুণময়রজ্জু প্রকৃতি। এরূপভাবে ও 'গুণ' শব্দের রূপকগত অর্থ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, বস্তুতঃ দার্শনিক ক্ষেত্রে রূপকের প্রাবল্য কল্পনার তারল্য প্রবেশ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তিগণের পন্থা কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছে।

এতক্ষণ ত্রিগুণ কথাটির অর্থ এবং তদানুষঙ্গিক দার্শনিক অভিসন্ধি আলোচিত হইল। সম্প্রতি দেখা যাউক, ত্রিগুণের কার্য্যপরিচয়াদি কি প্রকার। শাস্ত্রে দেখিতে পাইতেছি "সত্ত্বংরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ"। ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এই ত্রিগুণ যখন সমভাবে সমবেতশক্তিতে অবস্থান করে, তখন এই ত্রিগুণেরই নাম প্রকৃতি, যখন পৃথক্ অবস্থায় ন্যূনাধিক ভাবে থাকে, তখন তাহারাই প্রত্যেকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; তাহারাই সৃষ্টোন্মুখী প্রকৃতি। সাংখ্যপ্রবচনে আছে, "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগৎকারণীভূত জড়পদার্থ; এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়।

সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম প্রকাশ, লঘুতা ইত্যাদি; রজোগুণের ধর্ম্ম প্রণোদনা ও চলত্ব প্রভৃতি; তমোগুণের ধর্ম্ম গুরুত্ব ও আবরকতা বা অপ্রকাশক ভাব। ঈশ্বর-কৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় এই কথা বলিয়াছেন, যথা—"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ, গুরুবরণকমেব তমঃ।" সাংখ্যশাস্ত্রের ভূয়ঃ প্রচারকর্ত্তা আচার্য্য পঞ্চশিখ বলিয়াছেন, সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম—প্রীতি, তিতিক্ষা, সন্তোষ, লাঘব, অভিষঙ্গ ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলিলে সত্ত্বগুণ সুখাত্মক। রজোগুণ—রাগ, চপলতা, ক্রোধ, দুঃখ, উদ্দীপনা প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট, কিন্তু সংক্ষেপে রাগাত্মক। তমোগুণ—নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ, মোহ, ভীতি প্রভৃতি অশেষ গুণশালী হইলেও, সংক্ষেপতঃ মোহাত্মক।

গীতা, মনুসংহিতা, মহাভারত ও ভাগবতাদি অশেষ গ্রন্থে গুণত্রয়ের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তথায় অনুসন্ধান করিবেন, এখানে সাধারণতঃ

ইহাই বক্তব্য, সুখ দুঃখ মোহই ত্রিগুণের অসাধারণ ধর্ম্ম।

জগতের সমস্তকার্য্যকারণশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, সুখ দুঃখ মোহ এই তিনে জগৎ আবৃত। জগতে যাহা কিছু, প্রত্যেক পদার্থই হয়ত সুখ, নয় দুঃখ, নয় মোহ উপস্থিত করিবে; ইহা ছাড়া এ জাগতিকপদার্থের অন্যবিধ সামর্থ্য নাই। কোনও একটী রম্যবস্তু দর্শনে একজন সদাশয়ব্যক্তি দর্শনসুখ লাভ করেন, অন্য আকাঙ্ক্ষা তিনি ত্যাগ করিতে পারেন। অপর কামী ব্যক্তি ঐ বস্তু দর্শনে সাতিশয় মর্ম্মপীড়া পায়, যেহেতু সে উহা লাভ করিতে চায় এবং অকৃতকার্য্য হয়। আর এক ব্যক্তি মুগ্ধ, উহাতে মোহ প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার-পরাঙ্মুখদশায় উপনীত হইবে; ইহাই সংসারে ত্রিগুণের রঙ্গ। জড়জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি বা মানস ব্যাপারের দ্বারা উপলব্ধ; এই জড়জগৎ আমাদিগকে সুখ, দুঃখ ও মোহ ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব প্রদান করে না; আর আমাদিগের মানস-শক্তিও এই ত্রিবিধভাবেরই দ্বারা অনুপ্রাণিত। অনুকূলতাজ্ঞান, প্রতিকূলতা-বোধ এবং সম্মুগ্ধভাব, এই তিন ভাবই সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের কার্য্য, ইহা সুখ-দুঃখমোহাত্মক গুণত্রয়ের কথা বলায়, স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, জড়জগতের জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের উপকরণ মানসদ্রব্য ত্রিগুণাত্মক। আমরা ক্রমশঃ জড়ের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অবস্থার আলোচনা করিয়া, যতই দূরে অগ্রসর হই না কেন, জড়জগতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারিবনা, ত্রিগুণাত্মকভাবও ছাড়িতে পারিব না, সুতরাং আমাদের কল্পনা বা অনুমান সে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মস্তরে—সে অনুমিতির রাজ্যে ও জড়-ধর্ম্ম ত্রিগুণাত্মকভাব—সুখদুঃখমোহময়তা দেখিতে পাইবে। কার্য্য স্থূল ব্যক্ত, কারণ সূক্ষ্ম অব্যক্ত, কিন্তু উভয়ই জড়, উভয়েই ত্রিগুণভাবের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

জড়জগতের মূ[illegible]ণ জড় অব্যক্ত ত্রিগুণাত্মক, এই [illegible] এ সূত্রে অবগত হওয়া গেল। [illegible] সাংখ্য-দর্শনের সৎ-কার্য্যবাদ [illegible]কার্য্যকারণের অভিন্নভাব-পরিজ্ঞাপক ষষ্ঠ সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাই-তেছে। ইহাতে জগৎসৃষ্টিই সাধারণতঃ প্রতিপাদ্য, কিন্তু ভঙ্গ্যন্তরে সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত।

সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ। ৬

কার্য্য জগৎ, কারণ অব্যক্ত ত্রিগুণময় মহতী জড়সত্তা। এই ব্যক্ত এবং অব্যক্তের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, সঙ্কোচ বিকাশ এই দুইটী কার্য্যের আবশ্যক হয়।

মহামুনি কপিল বলিতেছেন, সৃষ্টি রহস্য আর কিছুই নয়—কার্য্যকারণের ভিন্নতা-অনুভব আর কিছুই নয়, কেবল 'সঞ্চর' এবং 'প্রতিসঞ্চর'। কূর্ম্ম তাহার হস্তপদাদি এবং শুণ্ডটী যখন শরীরাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া দেয়, তখন বোধ হয়, ঐ অঙ্গগুলি পূর্ব্বেও কূর্ম্মের শরীরে ছিল, কিন্তু এখন তাহার সঞ্চর অর্থাৎ বিকাশ উপস্থিত হইল। যখন কূর্ম্ম হস্ত পদ শুণ্ড শরীরাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখে, উহা

আমাদের অনুভবের বিষয় হয় না, তথন উহার প্রতিসঞ্চর বা লুকায়িতভাব আমরা অনুভব করি।

সৃষ্টি অর্থ বিকাশ, বিনাশ অর্থ সঙ্কোচ। সৃষ্টিতে ব্যক্তভাব, বিনাশে অদর্শন। যথন ব্যক্ত কার্য্যভাবে আমরা উপলব্ধি না করি, অর্থাৎ কারণভাব বা অব্যক্তভাবশতঃ অনুভব করিতে পারিনা, তথন আমরা ভ্রমবশতঃ মনে করি উহা 'নাই'। আর যথন কার্য্যরূপে ব্যক্তভাবে [illegible] করি, তথন মনে করি উহা 'জন্মি[illegible]' [illegible] বস্তুতঃ পদার্থের উৎপত্তি বিনাশ কি[illegible]। যথন পদার্থ অদর্শন অবস্থায় উপনী[illegible] [illegible]থন আমরা বিনষ্ট বলিয়া মনে করিলেও, উহার তিরোভাব ব্যতীত আর কিছুই হয় না। পদার্থমাত্রের স্বভাব, কথনও ব্যক্তদশায় উপনীত হইবে, আবার কথনও অব্যক্ত অবস্থায় পৌঁছিবে। কার্য্য এবং কারণ একই পদার্থ, তবে প্রকটিতঅবস্থায় তাহাকে কার্য্যবলে, এবং তিরোভূত অবস্থায় তাহাকে কারণ বলে। 'উৎপত্তি হইল' বলিলে একটা নূতন কোথাও হইতে আসিল, এবং পূর্ব্বে ছিলনা, সংপ্রতি জগতে আসিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত।

সাংখ্যাচার্য্য বলেন—ঘট নির্ম্মিত হইল, ইহার অর্থ ঘটের আবির্ভাব হইল। [illegible] আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ঘট ছিল, কিন্তু সংপ্রতি যে আকারে যে সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই আকারে সেইভাবে ব্যবহৃত হইত না। প্রত্যেকপদার্থেরই তিনটী ভাব আছে, একটী কারণভাব, আর একটী কার্য্যভাব, আর একটী সংহারভাব। ঘট যথন মৃত্তিকা ছিল, তথনও ঘট ছিল, কিন্তু তাহাদ্বারা জলআনয়ন প্রভৃতি ঘটের বর্ত্তমানকার্য্য হইত না, যেহেতু তথন তাহার কার্য্যাবস্থা নহে, কারণাবস্থা। যথন ঘট ঘটেরকার্য্য জলানয়নাদি করিতে পারে, অর্থাৎ যে অবস্থা বা আকার দেখিলে, আমরা তাহাকে 'ঘট' বলিয়া থাকি, উহা ঘটের কার্য্যাবস্থা; এই অবস্থাতে ব্যবহারনিষ্পাদন করা যায় বলিয়া, ব্যবহারিকজগতে এই অবস্থাকেই 'ঘট' সংজ্ঞা দেয়। যথন ঘট ভাঙ্গিয়া গিয়া কেবল চাঁড়া খোলা রূপে পড়িয়া রহিয়াছে, তথন ঘটের সংহারভাব; তথন ও ঘট আছে, কিন্তু কার্য্যকারিতা নাই। এই ঘটের সংহারভাবকে সাংখ্যাচার্য্যগণ ঘটের ধ্বংস, সংহার বা অতীতাবস্থা বলিয়া থাকেন। সাংখ্যমতে মাটী এবং শেষ চাঁড়া খোলা উভয়ই ঘট, মধ্যাবস্থাও ঘটই। কার্য্যনিষ্পাদন দ্বারাই সংসারে পরিচয়, কাজেই বিস্তৃতঘটসত্তা কেবল মাঝখানে কতটুকুকাল 'ঘট' নাম লাভ করিতেছে।

কার্য্য কারণ এক হইলে প্রকৃতিও জগৎ একই হইল। জগতের অব্যক্তভাব প্রকৃতি, প্রকৃতির ব্যক্তভাব জগৎ। কার্য্য আর কারণ এক না হইলে, কার্য্য কারণাত্মক হইবার হেতু থাকে না। কারণ বলিলে অবশ্য এথানে উপাদান কারণই বুঝা হইতেছে, ইহা মনে রাখা দরকার। মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, সূত্র হইতে হয় না, অতএব ঘট ও মৃত্তিকা একই জিনিষ, কেবল মৃত্তিকার অবস্থাসংস্কারবিশেষ ঘট, এবং অসংস্কৃতস্বভাবসিদ্ধভাব মৃত্তিকা।

কুর্ম্মকঙ্কর প্রতিকঙ্কর দৃষ্টান্তে দেখা গেল— কার্য্য, কারণ হইতে একটু বিকসিতভাব। কোনও পদার্থ অসৎ নহে। সবই ছিল এবং থাকিবে। জগতে অসৎ কিছুই নাই, সবই সত্যতত্ত্ব; তবে উপলব্ধিকালে "আছে" বলা আমাদের ভ্রমাত্মক সংস্কার। আমরা অনুভব করিতে না পারিলেও, যেমন কূর্ম্মের শরীরাভ্যন্তরস্থ শুণ্ডটী বিনষ্ট হইয়াছে মনে করিতে পারিনা, তদ্রূপ যখন ঘটকে কার্য্যভাবে ব্যক্তদশায় ব্যবহারিকজগতে কার্য্যসম্পাদকরূপে দেখিতে না পাই, তখন ঘট নাই, এরূপ মনে করাও আমাদের অন্যায়। সাংখ্যাচার্য্যগণ এই কার্য্যকারণের অভেদবাদ এবং সৃষ্টি বিনাশ আবির্ভাব তিরোভাব ভিন্ন কিছুই নহে, এই রহস্য কূর্ম্মশরীরাবয়বের সঙ্কর প্রতিসঙ্কর দ্বারা দেখাইয়া, তাঁহাদের অভিমত জগৎকারণ অব্যক্ততত্ত্বের সহিত ব্যক্তজগতের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

সপ্তমসূত্রে ভগবান্ কপিলাচার্য্য সমস্তজিজ্ঞাসার মূলকারণ ত্রিতাপবাধার বিবরণ পরিস্ফুটরূপে বলিয়াছেন। যে ভয়ে ভীত— যে কষ্টে ক্লিষ্ট হইয়া, মহর্ষি আসুরি কপিলের নিকট তত্ত্ব কথা শুনিতে গিয়াছিলেন, সেই সংসারজ্বালামালারজনক——অশেষঅশান্তির উৎপাদক—ত্রিবিধ দুঃখ স্বরূপের পরিচয় না দিলে, সমস্ত বক্তব্যই উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া যায়, কাজেই আচার্য্য বলিতেছেন,—

অধ্যাত্মমধিভূতমধি দৈবঞ্চ ।৭

দুঃখ ত্রিবিধ, অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব। সংসারে কোনও কার্য্য করিতে হইলে পূর্ব্বে তাহার অভাব অনুভব করিতে হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সুনিয়ম। অভাবে না পড়িলে, কেহই উপযোগিতা বুঝিতে পারে না। অভাব জগতের শিক্ষক, অভাবের নিকটই প্রবৃত্তির উন্মেষ লাভ। আহারের প্রবৃত্তি কেন? ক্ষুধা উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষুধা কি? আহার্য্যের আবশ্যকতা জ্ঞাপক এক রকম অভাবের আহ্বান। "নাই চাই" এই প্রাকৃতিক ঈঙ্গিতই আমাদের ক্ষুধা। সর্ব্বত্রই অভাবের আহ্বানে জগতের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এবং জগৎ কর্ম্মবেগে চলিতে থাকে। আমরা দেখিলে[illegible]তে শান্তির অভাব, সংসার মরু[illegible] তুল্য দুঃসহ। সংসারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত-পর্য্যন্ত অভাবের ঘনরোলকল্লোল কর্ণ বিদীর্ণ করিতেছে। সংসারে শান্তির অভাব! তৃপ্তির অভাব!! শান্তি পাইনা কেন? দুঃখ আসিয়া পীড়ন করে। শান্তির উদ্দেশে ছুটিতে থাকি, সহসা পৃষ্ঠদেশ হইতে দুঃখ আসিয়া ভীষণ আঘাত করে। দুঃখের তাড়নায় সংসারের সর্ব্বত্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। এই দুঃখ কতপ্রকার, এবং কি কি কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা জানা আবশ্যক। শত্রুর প্রকৃত পরিচয় না পাইলে তাহাকে পরাস্ত করা যায় না; রোগের প্রকৃতি না বুঝিলে চিকিৎসা করা অসম্ভব। দুঃখের প্রতীকার অবশ্যই অভিপ্রেত। সংসারের সকল শ্রেষ্ঠধর্ম্মাচার্য্য এবং মনস্বীগণই একবাক্যে সংসারের দুঃখবহুলতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। জগতের অনিন্দ্যপুরুষ বুদ্ধদেব সংসারে অসংখ্য দুঃখ দেখিয়া, তাহার প্রতীকারার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আদি বিদ্বান্ কপিল,

ত্রিবিধদুঃখ পরিহারই জীবজীবনের উদ্দেশ্য-রূপে বর্ণনা করেন। পাশ্চাত্যপণ্ডিত সোপেনহায় ও সংসারের দুঃখবহুলতা বেশ ভাল রূপে বুঝিয়াগিয়াছেন। সকল জীবেরই বাসনা, দুঃখে পতিত না হই। স্তন্যপায়ী শিশু হইতে গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধ পর্যন্ত দুঃখের তাড়নায় আকুল। এই দুঃখকে ভালরূপ চিনিতে না পারিলে, ইহাকে বিনাশ করা যাইতে পারে না, কাজেই পরিচয়—দুঃখ ত্রিবিধ।



সম্প্রতি দুঃখের ত্রিবিধ বিভাগের ... বিরবাখ্যাদ্বারা দুঃখের ত্রিবিধ বিভাগের ... সম্পাদন করা হইতেছে। প্রথম দুঃখ আধ্যাত্ম। আধ্যাত্ম যাহা আত্মাকে অধিকার করে। আত্মা অর্থ শরীর এবং মন, শারীর এবং মানস দুঃখ সুতরাং অধ্যাত্ম। যদিও সমস্ত-দুঃখই মনে অনুভূত হয়, অর্থাৎ মন ব্যতীত কোনও প্রকার দুঃখানুভব হয় না; তথাপি শরীরে রোগাদিজনিত দুঃখ শারীর এবং মনের কামাদিজনা দুঃখ মানস; এরূপ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। দ্বিতীয় দুঃখ অধিভূত। ভূত অর্থাৎ প্রাণিসমূহ হইতে আগত দুঃখ অধিভূত। ব্যাঘ্রচৌরাদি-প্রাণিজনাদুঃখ যেরূপেই অনুভূত হউক না কেন, উহাদের উৎপত্তিহেতু ভূত প্রাণী (ব্যাঘ্র চৌরাদি) নিশ্চিত, সুতরাং ঐ দুঃখ অধিভূত। কেহ কেহ 'ভূত' অর্থাৎ অগ্নি বায়ু জলাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে অধিভূত বলেন। অনন্তর তৃতীয় দুঃখ অধিদৈব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইতেছে যে, দেব দেবযোনি ভূতপিশাচাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ অধিদৈব। দেব অর্থ দেব-যোনি, দেবযোনির মধ্যে ভূত, প্রেত, পিশাচাদি মনুষ্য শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া মানবকে অশেষ ক্লেশ প্রদান করে, এরূপ বিশ্বাসসম্পন্ন আচার্যগণ এই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এক সম্প্রদায় 'ভূত' শব্দে অগ্নি বায়ু বুঝেন নাই, প্রাণিজাত বুঝিয়াছেন। এই দলই "অধিদৈব" শব্দের ব্যাখ্যায় 'দেব' শব্দে অগ্নি বায়ু প্রভৃতিকে বুঝেন। উভয় মতের সংক্ষিপ্ত রহস্য, এক মতে 'ভূত' প্রাণী, ও 'দেব' অগ্ন্যাদি। অপর মতে 'ভূত' অগ্ন্যাদি, এবং 'দেব' ভূতাদি দেবযোনি। জগতের সমস্ত প্রকার দুঃখই এই তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারিবে। স্বশরীরের অথবা নিজ চিত্তের অবস্থান্তর প্রাপ্তিজনিত সঞ্জাত দুঃখ অধ্যাত্ম, অন্যহেতু হইলে, হয় তাহা অধিভূত, নয় অধিদৈব; সুতরাং জগতের যাবতীয় দুঃখানুভব এই গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া গেল। দুঃখহেতু, দুঃখস্বরূপভেদ বুঝা গেল, এখন দুঃখের প্রতীকার বেশ সহজসিদ্ধ হইল। বারান্তরে কাপিল তত্ত্বসমাসের অপর অংশ ব্যাখ্যাত হইবে।

(ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিতস্য।
কপিল সেবকস্য কস্যচিৎ
বেদবিদ্যালয় যশোহর।

শঙ্কর-গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অতঃপর শঙ্কর-গীতার মূলতত্ত্ব আরম্ভ। সর্ব্বাগ্রেই বৈরাগ্যোপদেশ লিখিত। নৈমিষ-কাননের মুনিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঋষি পুঙ্গব! মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কি জন্য কোথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন? সূত তদুত্তরে কহিলেন—তাপসগণ! দণ্ডক অরণ্যে ভার্য্যাবিয়োগকাতর শ্রীরাম চন্দ্রকে উপদেশ দিতে অগস্ত্যঋষি আপন ইচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অগস্ত্য রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াই কহিলেন—হে রাজন্! আপনি বৃথা আশা করিতেছেন। লঙ্কা-দুর্গ অজেয়—মহাবল পরাক্রান্ত দশানন তাহার অধিপতি, বৃত্র-নিধনকারী ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ তাহার পুত্র, দেবগণত্রাস কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা, দিব্যাস্ত্রধারী অতিকৌশলী বিভীষণ অপর অনুজ। লঙ্কাপতি রাবণ শঙ্কর-দত্ত বরলাভে মহা-দর্পিত হইয়া এই স্বর্ণলঙ্কা উপভোগ করিতেছে। বালকে যেমন চন্দ্র ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, তুমিও সেইরূপ লঙ্কা-বিজয় আশা করিতেছ। আমি দেখিতেছি, মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ গ্রহণ অনিচ্ছার ন্যায় তুমি কামক্রোধাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া হিতকর বাক্য গ্রহণ করিতেছ না। ইত্যাদি প্রকার কতকগুলি ভয়সূচক কথায় অগস্ত্য রামচন্দ্রকে লঙ্কাবিজয়কার্য্যে অনুৎসাহিত করিয়া তাহার পর মূলতত্ত্ব আরম্ভ করিলেন যথা—

"ন গৃহ্লাতি বচঃ পথ্যং কামক্রোধাদি পীড়িতঃ
হিতং ন রোচতে তস্য মুমূর্ষোরিব ভেষজম্ ॥১
মধ্যেসমুদ্রং যানীতা সীতা দৈত্যেন মায়িনা
আয়াস্যতি নরশ্রেষ্ঠ! সা কথং তব সন্নিধিং ॥২
বধ্যস্তে দেবতাঃ সর্ব্বা দ্বারি মর্কটযুথবৎ
কিঞ্চ চামরধারিণ্যো যস্য সন্তি সুরাঙ্গনাঃ ॥ ৩
ভুংক্তে ত্রিলোকী মখিলাং যঃ শম্ভুবরদর্পিতঃ
নিষ্কণ্টকং তস্য জয়ঃ কথং তব ভবিষ্যতি।
ইন্দ্রজিন্নাম পুত্রো যস্য [illegible]স্তু স বরোদ্ধতঃ
তস্যাগ্রেসমরে দেব[illegible]রং পলায়িতাঃ
কুম্ভকর্ণোহনুজো [illegible]াস্তি সুরসূদনঃ
অন্যো দিব্য[illegible]প্রকাশচরজ্ঞানী বিভীষণঃ
দুর্গং যস্যাস্তি লঙ্কাখ্যং দুর্জ্জেয়ং দেবদানবৈঃ
চতুরঙ্গ বলং যস্য বর্ত্ততে কোটি সংখ্যয়া।
একাকিনা ত্বয়া জেয়ঃ সকথং নৃপনন্দন।
আকাঙ্ক্ষতে করে ধর্ত্তুং বালশ্চন্দ্রমসং যথা
তথা ত্বং কাম মোহেন জয়ং তস্যাভিবাঞ্ছসি।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর যখন রামচন্দ্র সীতা শোকে অভিভূত হইয়া ক্রোধে লঙ্কা জয় করিতে প্রস্তুত হইতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন—তখন অগত্যা অগস্ত্য ঋষি বৈরাগ্যোপদেশ দ্বারা শত্রুমিত্রসমজ্ঞানতা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রথমেই মুনিবর কহিলেন—

[illegible]বং নিষীদসি রাজেন্দ্র কাঙ্ক্ষাকস্য বিচার্য্যতাং
জড়ঃ কিংনুবিজানাতি দেহোহয়ং পাঞ্চ-ভৌতিকঃ
নির্লেপঃ পরিপূর্ণশ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
আত্মা ন জায়তে নৈব ম্রিয়তে নচ দুঃখভাক্ ॥

অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! এই দেহ পঞ্চ ভূতের—কেহ কাহারো প্রিয় অপ্রিয় নহে।

বিবেচনা করিলে কে কার কান্তা? তবে আপনি এত ম্লান হইতেছেন কেন? যিনি সর্ব্বদা পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ আত্মা, তাঁহার সহিত কাহারো সংযোগ বিয়োগ নাই; অথবা তাহার জন্ম মৃত্যু নাই। তিনি কিছুতেই দুঃখের ভাগী নন।

সূর্য্যোঽসৌ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুষ্টেন ব্যবস্থিতঃ
তথাপি চাক্ষুষৈর্দোষৈর্নকদাচিদ্বিলিপ্যতে।
দেহোঽপিমলপিণ্ডো[illegible]মুক্ত জীব জড়াত্মকঃ
দহ্যতে বহ্নিনাকাষ্ঠৈ[illegible]বাদৈর্ভক্ষ্যতেঽপিবা
তথাপি নৈবজানাতি[illegible] তস্য কা ব্যথা।

অর্থাৎ সূর্য্য যে[illegible] চক্ষুর উপর অবস্থিত থাকিয়াও, চাক্ষুষ-দোষসংশ্লিষ্ট নহেন, তদ্রূপ আত্মা সর্ব্বঅন্তরগত হইয়াও, দৃশ্যমানদোষদ্বারা বিলিপ্ত হন না। জীবন বিনষ্ট হইলে, এই জড়াত্মক মলভাণ্ডপূর্ণ দেহ কাষ্ঠাদি উদ্ভিদ্দ্বারা ভস্মীভূত হয় অথবা শৃগাল আদি জীবকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়—দেহ-বিনাশবেদনা কেহ অনুভব করেনা।

সুবর্ণ গৌরী দূর্ব্বায়া দলবচ্ছ্যামলাপিবা
পীনোত্তুঙ্গস্তনাভোগভুগ্নসূক্ষ্মবিলগ্নিকা॥
বৃহন্নিতম্বজঘনা রক্তপাদসরোরুহা।
রাকাচন্দ্রমুখী বিম্বপ্রতিবিম্বরদচ্ছদা॥
নীলেন্দীবর নিকাশ নয়নদ্বয় শোভিতা
মত্তকোকিল সংলাপা মত্তদ্বিরদগামিনী
কটাক্ষৈ রনুগৃহ্লাতি মাং পঞ্চেষু শরোত্তমৈঃ
ইতি যাং মন্যতে মূঢ়ঃ স তু পঞ্চেষুণাসিতঃ॥
তস্যাবিবেকং বক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতোনৃপ
ন চ স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চায়ং নপুংসকঃ॥
অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ পূর্ণো দ্রষ্টা দেহী স জীবিনঃ।
যা তন্বঙ্গী মৃদুর্বালা মলপিণ্ডাত্মিকা জড়া
সা ন পশ্যতি যৎ কিঞ্চিন্ন শৃণোতি ন জিঘ্রতি
চর্ম্মমাত্রা তনুস্তস্যাবুদ্ধ্বা ত্যক্ত্বস্ব রাঘব॥ ১৬

হে রঘুকুলশেখর রাম! যে মূঢ় ব্যক্তি কামের বশবর্ত্তী হইয়া দূর্ব্বাদলপ্রভ শ্যামলাঙ্গী, রক্ত কোকনদ তুল্য চরণতল ধারিণী, চন্দ্র-মৌলিশুভ্রদশনপংক্তি শোভিনী, নীলোৎপল-সদৃশ নয়না, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা, পীনোন্নত-পয়োধরা, কোকিলকলনাদিনী, দ্বিরদগামিনী রমণীর পূর্ণকামকটাক্ষপরিপুরিতদৃষ্টি ইচ্ছা করে, তাহার যেরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়, তাহা তোমাকে ক্রমে শুনাইয়া সত্য পথে আনিতেছি—শ্রবণ কর। এই বিশ্বে স্ত্রী পুরুষ ক্লীব কেহ নহে; পরিপূর্ণ সর্ব্ব-ব্যাপী আত্মাই সমগ্র বিষয় দৃষ্টি করিতে-ছেন। যাহাকে মূঢ়গণ কোমলহৃদয়া কৃশাঙ্গী বালা বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার কোন-রূপ শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, এবং ঘ্রাণ শক্তি নাই। সেই মলপিণ্ডময়ী জড়াত্মিকা রমণী কেবল রক্তমাংসময়চর্ম্মেরদেহ ধারণ করে মাত্র। হে রাম! এই সকল জানিয়া শুনিয়া ভ্রম জ্ঞান বিদূরিত কর—ভার্য্যা-সীতাবিয়োগদুঃখ দূর কর।

যা প্রাণাদধিকা সৈব হন্ত তে স্যাদ্ ঘৃণাস্পদং
জায়ন্তে যদি ভূতেভ্যো দেহিনঃ পাঞ্চ-ভৌতিকাঃ॥

হিত্বা যদেকলস্তেষু পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ।
কা কান্তা তত্র কঃ কান্তঃ সর্ব্ব এব সহোদরাঃ॥
নির্ম্মিতায়াং গৃহাবল্যাং তদবচ্ছিন্নতাং গতং
নভস্তস্যাং তু দগ্ধায়াং ন কাঞ্চিৎ ক্ষতি-মৃচ্ছতি॥

তথদাত্মাপি দেহেষু তেষ্বেব স স্বয়ং নৈব হন্যতে।
হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং
তাবুভৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে
অস্মাৎ পতি দুঃখেন কিং খেদস্যাস্তি কারণং
স্বস্বরূপং বিদিত্বেদং দুঃখং ত্যক্ত্বা সুখী ভব॥

হে রাম! যখন এই দেহ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, তখন যে নারীকে অতি আদরের বলিয়া বোধ করা হয়—সে অতি ঘৃণাস্পদ।

একমাত্র পরিপূর্ণ সনাতন আত্মাই যখন সকল বস্তুতে নিত্য বিরাজমান, তখন কেহ কাহারও স্ত্রী নহে অথবা কেহ কাহারও স্বামী নহে। ধরিতে হইলে, সকলি একস্থান হইতে উদ্ভূত বলিয়া সহোদর স্বরূপ। হে রাজেন্দ্র! সর্ব্বগত আত্মা অবিনাশী তাহার বিনাশ নাই। শূন্যের উপর যেমন গৃহের ভিত্তি ক্ষণভঙ্গুর হয়, সেইরূপ জগতের সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থ মাত্রেই ক্ষণ ভঙ্গুর। আবার শূন্যে অবস্থিত গৃহ দগ্ধ হইলে, যেমন শূন্যের কোন অনিষ্ট নাই সেইরূপ দেহীর দেহ বিনাশ হইলে, আত্মারও কোনরূপ ক্ষতির কারণ নাই। আবার হত্যাকারী হত্যা করিয়া, এবং আহত ব্যক্তি হত হইয়া, কেহই "আমি হত্যা করিতেছি, কি, আমি হত হইতেছি" ইহা অনুভব করিতে পারেনা; সুতরাং হে রঘুকুল ভূষণ! আত্মার এই রূপ স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া, বিষাদভাব পরিত্যাগ করিয়া, সুখী হইতে চেষ্টা কর।

তপোবননিবাসী চিরব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী আত্মতত্ত্বজ্ঞ অগস্ত্য যখন মায়িকজগতের একটি সাংসারিককামক্রোধাদি পীড়াগ্রস্তজীবকে, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা বিষয়ে, এইরূপ একটি নাতিহ্রস্ব নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা, ভার্য্যা কিছু নহে, জগত মিথ্যা, আত্মা সত্য, এই উপদেশ দিতে লাগিলেন, তখন শ্রোতা রাম কহিলেন—হে ভগবন! আপনি বলিলেন যে, দেহের কোনরূপ সুখ দুঃখ নাই, এবং আত্মারও তদ্রূপ অবস্থা। তবে আমি এইমাত্র কেন সীতার বিরহানলে দগ্ধীভূত হইতেছি! [illegible] যাহা সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি, [illegible] তাহা বলিতেছেন, "কিছুই না"। [illegible] ইহা আমি কিরূপে বিশ্বাস করি[illegible]

মুনে দেহস্য নো দুঃখং নৈব চেৎ পরমাত্মনঃ
সীতাবিয়োগদুঃখাগ্নির্মাং ভস্মীকুরুতে কথং?
সদানুভূয়তে যোঽর্থঃ স নাস্তীতি ত্বয়েরিতঃ
জায়তাং তত্র বিশ্বাসঃ কথং মে মুনি সত্তম!
অন্যাত্র নাস্তি কো ভোক্তা যেন জন্তুঃ প্রতপ্যতে
সুখস্য বাপি দুঃখস্য তদব্রূহি মুনিপুঙ্গব!

শিষ্যের কঠোর প্রশ্ন শুনিয়া, গুরু বা উপদেষ্টা ঋষি অগস্ত্য কহিলেন শুন—

দুর্জ্ঞেয়া শাম্ভবী মায়া তয়া সংমোহ্যতে জগৎ
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং॥
[illegible]বয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ
[illegible]নাত্মকোঽনন্তো বিভুরাত্মা মহেশ্বরঃ॥
তস্যৈবাংশো জীবলোকে হৃদয়ে প্রাণিনাং স্থিতঃ
বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়ন্তে কাষ্ঠযোগতঃ॥
অনাদি কর্ম্ম সম্বদ্ধাত্তদংশা মহেশিতুঃ।
অনাদিবাসনাযুক্তাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা ইতিতে স্মৃতাঃ॥

মনো বুদ্ধি রহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ং
অন্তঃকরণ মিত্যাহুস্তত্র তে প্রতিবিম্বিতাঃ॥

এই জগত শম্ভুর শাম্ভবী মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন, ইহা অতীব দুর্জ্ঞেয়, স্থূল কথা মায়াই বা প্রকৃতি, মায়ী ই মহেশ্বর। আবার সর্ব্বজ্ঞানময় অনন্তআত্মাই মহেশ্বর; সুতরাং মহেশ্বরের সকল অবয়বময় ভূতগণদ্বারা এই চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। এই মহেশ্বরের অংশই জীবহৃদয়ে অবস্থিত। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন কাষ্ঠ দাহ্যপদার্থ সংযোগে উৎপন্ন হইয়া সেইরূপ লোকের হৃদয়স্থিত অনাদি শৈবাংশ অনাদি বাসনাযুক্ত হইয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ নামে পরিচিত হয়। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধিও মন লইয়া অন্তঃকরণ গঠিত হইয়া থাকে। মহেশ্বর রূপ আত্মার অনন্ত অংশ, এই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া আছে।

জীবত্বং প্রাপ্নুয়ুং কর্ম্ম ফল ভোক্তার এব তে
ততো বৈষয়িকং তেষাং সুখং বা দুঃখমেববা
ত এব ভুঞ্জতে ভোগায়তনেঽস্মিন্ শরীরকে
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চেতি দ্বিবিধং বপুরুচ্যতে
স্থাবরা স্তত্র দেহাঃ স্যুঃ সূক্ষ্মা গুল্মলতাদয়ঃ
অণ্ডজাঃ স্বেদজাস্তদ্বদুদ্ভিজ্জা ইতি জঙ্গমাঃ
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ
স্থাণু মনোঽন্যে সংযন্তি যথাকর্ম্ম যথা...
সুখ্যহং দুঃখ্যহঞ্চেতি জীব এবাভিমন্যতে
নির্লেপোপি পরং জ্যোতির্মোহিতঃ শম্ভু-
মায়য়া
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো মদোমাৎসর্য্যমেব চ
মোহশ্চেত্যরিষড়্বর্গমহঙ্কারগতং বিদুঃ।
স এব বধ্যতে জীবঃ স্বপ্ন জাগ্রদবস্থয়োঃ।
সুষুপ্তৌ তদভাবাচ্চ জীবঃ শঙ্করতাং গতঃ॥
স এব মায়াসংস্পৃষ্টঃ কারণং সুখদুঃখয়োঃ
শুক্তৌ রজতবদ্বিশ্বং মায়য়া দৃশ্যতে শিবে।
ততো বিবেকজ্ঞানেন ন কোঽপ্যত্রাস্তি
দুঃখভাক্
ততো বিরম দুঃখাদ্বং কিং মুধা পরিতপ্যসে।

উক্ত প্রতিবিম্বিত অংশই জীবত্ব পাইয়া প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করে। কেননা উহারাই সুখ দুঃখাদি সাংসারিক ঘটনার-কারণ। স্থাবর জঙ্গম ভেদে শরীর দুই রূপ—লতাদিগণ স্থাবর! আর অণ্ডজ স্বেদজাদিই জঙ্গম নামে পরিচিত। এই দ্বিবিধ শরীরে মহেশ্বরের সেই কথিত অংশই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন জীব কর্ম্মানুসারে স্থাণুশরীর এবং যোন্যন্তর আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় জীব নির্লিপ্ত হইলেও, শৈব মায়ায় অভিভূত হইয়া "আমি সুখী" আমি দুঃখী" ইত্যাদি রূপ অহঙ্কার বা অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে। কামাদি-ষড়রিপুর সমষ্টিকে অহঙ্কারতত্ত্ব কহে। জীব-গণ স্বপ্ন আর জাগ্রদবস্থায় উক্ত অহঙ্কা-রের বশীভূত হয়, সুষুপ্তি অবস্থায় ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া জীব শিবত্বপদ প্রাপ্ত হয়। মায়ার মোহিনীশক্তিতে যেরূপ শুক্তিকে রজত জ্ঞান হয়, সেইরূপ মায়াবশে বিশ্ব আরোপিত হয়। স্থূল কথা এই যে—জীব মায়াকর্ত্তৃক সুখদুঃখ উপভোগ করে। কিন্তু পরমমঙ্গলাস্পদ আত্মতত্ত্বজ্ঞানউন্মেষি-বিবেকবুদ্ধি উপস্থিত হইলে, আর দুঃখাদি অনুভব হয় না—সুতরাং হে রামচন্দ্র! তুমি এই সকল জানিয়া শুনিয়া বৃথা বিলাপ পরিত্যাগ কর।

যখন আত্মারূপী মহেশ্বর সতত জীবদেহে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছেন, শীতাতপাদিদ্বন্দ্ব যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, তখন— ইহা আমার, উহা আমার, ইত্যাদি জ্ঞান করিয়া, ভার্য্যাদিবিনাশরূপ অনিত্যচিন্তা হইতে বুদ্ধিকে সত্য স্বরূপ অব্যয় চিন্ময় সদাশিবের প্রতি বিনিযুক্ত করিয়া বিগতক্লেশ হও। ইত্যাদি। তখন শ্রীরামচন্দ্র আবার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ আমি সকল বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু প্রারব্ধভোগ আমাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেছেনা। ইহার যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তাহাই আমায় বলুন। মদ্য যেমন নিরহঙ্কারী ব্রাহ্মণকে উন্মত্ত করে, সেইরূপ কর্ম্মফল ও বিবেকিকে পরিত্যাগ করিতে চাহেনা।

মত্তং কুর্য্যাদ্ যথা মদ্যং নষ্টবিদ্যমপি দ্বিজং।
তদ্বৎ প্রারব্ধভোগোঽপি ন জহাতি বিবেকিনং

তখন রামচন্দ্র আবার কহিলেন— হে ব্রহ্মন্! আমি আর সহ্য করিতে পারি না—প্রপীড়িত হইয়া জীব স্থূলদেহ বিনাশ করিয়া থাকে—আমারও তদ্রূপ প্রজ্ঞা উপস্থিত। এখন ইহার উপায় করুন।

আমি ক্ষত্রিয় হইয়া স্ত্রী হরণকারী দুরাচার-আততায়ীরাক্ষসকে বিনাশ করিতে না পারিলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি?

ক্ষত্রিয়োঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ ভার্য্যা মে রক্ষসাহৃতা।
যদি তং ন নিহন্ম্যাশু জীবনে মেঽস্তি কিং ফলং।

এইরূপ কহিয়া, অতঃপর রামচন্দ্র সীতাহরণ জনিতশোকমিশ্রিতক্রোধের অনুগত হইয়া, আবার কহিলেন—মহর্ষে! আমার আর তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের অবশ্যক নাই। ক্রোধাদিরিপুগণ নিয়ত আমাকে দগ্ধ করিতেছে। নিজস্ত্রী শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িতা হইলে, যে পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান অবলম্বন করিয়া, তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে, তাহাকে পুরুষাধম ভিন্ন আর কি বলিব? যাহাতে রাবণবিনাশ হয় আমারে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন, দণ্ডকারণ্যে দ্বিতীয় গুরু কেহ নাই।

কামক্রোধাদয়ঃ সর্ব্বে দহন্ত্যেতে তনুং মম
অহঙ্কারোঽপি মে নিত্যং জীবনং হন্তুমুদ্যতঃ।
হৃতায়াং নিজকান্তায়াং শত্রুণাবমতস্য বা
যস্য তত্ত্ববুভুৎসা স্যাৎ [illegible] লোকে পুরুষাধমঃ।
তস্মাত্তস্য বধোপায়ং [illegible] সাম্বুধিরণে।
ব্রূহি মে মুনিশার্দ্দূল [illegible] অন্যোঽস্তি মে গুরুঃ॥

ইহার [illegible] ঋষি প্রদত্ত শৈবীয়-"বিরজা"দীক্ষাপদ্ধতি আরম্ভ। এই বিরজা দীক্ষা অরাতিবিজয় কার্য্যে সহায়। শাস্ত্রে দীক্ষার অনেকরূপ ক্রম আছে। তাহার মধ্যে, তন্ত্র ভিন্ন পুরাণের মতে দীক্ষাপদ্ধতি চারি প্রকার। বিরজা দীক্ষা তাহার অন্যতর। এই পর্য্যন্ত শঙ্করগীতা কীর্ত্তন করিয়া তাপসপ্রবর সূত সেদিনের মত নৈমিষকাননের তাপসগণের নিকট বিদায় লইয়া, সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে গমন করিলেন। মহাগুহ্যবিরজাদীক্ষাপদ্ধতি তাহার পরদিন পবিত্রভাবে উপবেশন করিয়া [illegible] করিতে লাগিলেন।

[illegible] দীক্ষা বলিতে—

দীয়তে জ্ঞান মত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ
তেন দীক্ষেতি সাখ্যেয়া পাপচ্ছেদক্ষমা ক্রিয়া।

অর্থাৎ যে ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান দান করা হয় এবং পাপ ক্ষয় হয় তাহাকে দীক্ষা কহে। কিন্তু শঙ্করগীতার এই বিরজা দীক্ষা ক্রিয়া অন্যরূপ। এইরূপ দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে

লোকের পাপবিনাশকরা দূরে থাকুক, বরং প্রাণীহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অগস্ত্যপ্রদত্তদীক্ষার গুণে রামচন্দ্র নাকি রাবণবিনাশ করিয়াছিলেন! তাই এই শঙ্করগীতা গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে। স্তুতমুখপদ্ম হইতে ব্রাহ্মণগণ অতঃপর বিরজাদীক্ষাপদ্ধতি শুনিতে লাগিলেন।

আমরাও অদ্য হিন্দু-পত্রিকার পাঠকের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। শঙ্করের ইচ্ছা হইলে আবার [illegible] বিরজাদীক্ষা-পদ্ধতি বর্ণনায় প্রবৃত্ত [illegible]। (ক্রমশঃ)

ডাক্তার—শ্রীমো[illegible] ভট্টাচার্য্য—
[illegible]রা।

চারুচর্য্যা।

শ্রীলাভসুভগঃ সত্যাসক্তঃ স্বর্গাপবর্গদঃ।
জয়তাৎ ত্রিজগৎপূজ্যঃ সদাচার ইবাচ্যুতঃ॥ ১
ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তে পুরুষস্ত্যক্তেন্নিদ্রামতন্দ্রিতঃ।
প্রাতঃ প্রবুদ্ধং কমলমাশ্রয়েচ্ছ্রী গুণাশ্রয়া॥ ২

লক্ষ্মী লাভে সৌভাগ্যবান, সত্যে আসক্ত কৃষ্ণপক্ষে—সত্যভামায় আসক্ত, স্বর্গ ও মোক্ষদাতা ও ত্রিজগৎপূজ্য শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সদাচার জয়যুক্ত হউন। ১

মনুষ্য আলস্য ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা ত্যাগ করিবেন; গুণের আশ্রয়ীভূত লক্ষ্মী (শোভা) প্রাতঃকালের সুহাসিনী সরোজিনীকে আশ্রয় করে। ২

[এ বিষয়ে মনু যথা—
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুদ্ধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
৪ অধ্যায়ে ৯২

পুণ্যপূত শরীরঃ স্যাৎ সততং স্নান নির্ম্মলঃ।
তত্যাজবৃত্রহাস্নানাৎপাপংবৃত্রবধার্জ্জিতম্॥ ৩
নকুর্ব্বীত ক্রিয়াং কাঞ্চিদনভ্যর্চ্য মহেশ্বরম্।
ঈশার্চনরতং শ্বেতং নাভূন্নেতুং যমঃ ক্ষমঃ॥ ৪

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষযামে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থের বিষয় চিন্তা করিবে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে তুত্থায় ধর্ম্ম মর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
কূর্ম্ম পুরাণে ১৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তেউত্থায়মূত্রপুরীষোৎসর্গংকুর্য্যাৎ।
বিষ্ণুসংহিতা ৬০ অধ্যায়ে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বণি ১০৪ অধ্যায়।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত যথা—
রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে।
আহ্নিক তত্ত্বধৃত পিতামহ বচনং।
রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে॥
ঐ ভবদেবীয় নির্ণয়ামৃতে স্মৃতস্ত বচনং।
পশ্চিমে যামে পশ্চিমার্দ্ধপ্রহরে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ইত্যর্থঃ।
মদন পারিজাতে প্রথমস্তবকে উচ্চারবিধি-প্রকরণে।]

সর্ব্বদা স্নানদ্বারা নির্ম্মল হইয়া পুণ্য পূত শরীর হইবে; ইন্দ্র স্নানদ্বারা বৃত্রবধার্জ্জিত পাপ দূর করিয়াছিলেন। ৩

মহাদেবকে অর্চ্চনা না করিয়া কেহ [illegible]ন কার্য্য করিবে না; মহাদেব অর্চ্চনায় রত শ্বেত মুনিকে যম লইয়া যাইতে পারেন নাই। ৪ (এই উপাখ্যানটি লিঙ্গ পুরাণের পূর্ব্বভাগে ৩০ অধ্যায়ে আছে উহার তাৎপর্য্য এই—শ্বেতনামা মুনি মহাদেবের পূজা অর্চ্চনায় রত থাকিতেন, কালক্রমে দেহ-পরিবর্ত্তনের সময় হওয়াতে, যম আসিয়া তাঁহাকে বদ্ধ করিলেন। তিনি কহিলেন যে,

শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধান্বিতং কুর্যাচ্ছাস্ত্রোক্তেনৈববর্ত্মনা।
ভুবিপিণ্ডঃ দদৌ বিদ্বান্‌ভীষ্মঃ পাণৌ ন শন্তনোঃ॥ ৫

নোত্তরস্যাংপ্রতীচ্যাংবাকুর্ব্বীতশয়নেশিরঃ।
শয্যাবিপর্য্যয়াদ্‌গর্ভোদিতেঃশক্রেণপাতিতঃ॥ ৬

আমার কে বদ্ধ করিবে? আমি মৃত্যুঞ্জয়ের ভক্ত। যম কহিলেন শ্বেত! আমি তোমাকে যমালয় লইতে আসিয়াছি মহাদেব তোমার কি করিবেন? এই শুনিয়া শ্বেতমুনি ‘হা রুদ্র’ হা রুদ্র’ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মহাদেব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃত্যুঞ্জয়কে দর্শন করিয়া, ভয়ে যম শ্বেতমুনিকে ত্যাগ করিয়া মুনির নিকট পড়িয়া গেলেন ও চীৎকার করিতে লাগিলেন—

সসর্জ্জ জীবিতং ক্ষণাৎ ভবং নিরীক্ষ্য বৈ ভয়াৎ।
পপাতচাশু বৈ বলী মুনেস্তু সন্নিধৌ দ্বিজাঃ॥

পরে যম মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাদেবও মুনির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।)

শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্রদ্ধান্বিত শ্রাদ্ধ করিবে; বিদ্বান্ ভীষ্ম মৃত্তিকায় পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন, শান্তনু রাজার হস্তে দান করেন নাই। ৫ (এই উপাখ্যান শ্রীহরিবংশে প্রথম পর্ব্বে ১৬ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

উত্তর কিম্বা পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেনা; শয্যাবিপর্য্যয়ে দিতির গর্ভ ইন্দ্র কর্তৃক পাতিত হইয়াছিল। ৬

(উদক্ শিরা ন স্বপেত তথা প্রত্যক্‌শিরা ন চ।
মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বণি ১০৪ অধ্যায় ৪৯।

নোত্তরাভি মুখঃস্বপ্যাৎ পশ্চিমাভিমুখো ন চ।
কূর্ম্ম পুরাণে ১৯ অধ্যায়।

অর্থি ভুক্তাবশিষ্টং যৎ তদশ্নীয়ান্মহাশয়ঃ।
শ্বেতোঽর্থি রহিতং ভুক্ত্বা নিজমাংসাশনোঽভবৎ॥ ৭

নার্দ্রপাদঃ স্বপ্যাৎ। নোত্তরাপরাবাক্‌শিরাঃ।
বিষ্ণুস্মৃতৌ ৭০ অধ্যায়।

আর্দ্র পদে, উত্তর পশ্চিম ও নিম্ন মুখে নিদ্রা যাইবে না। একদিন দিতি সন্ধ্যা বেলায় ব্রতকর্শিত হইয়া উচ্ছিষ্ট ও পদ ধৌত না করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন, ইন্দ্র এই অবসরে দিতির গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রদ্বারা গর্ভ সাত খণ্ড করিয়াছিলেন—

একদা সাতু সন্ধ্যায়ামুচ্ছিষ্টা ব্রত কর্শিতা।
অপৃষ্টবার্য্যধৌতাংঘ্রিঃ সুষ্বাপ বিধিমোহিতা॥
লব্ধ্বা তদন্তরং শক্রো নিদ্রাপহৃত চেতসঃ।
দিতেঃ প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমায়য়া।
চকর্ত্ত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কণক প্রভং॥
শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ১৮ অধ্যায়।)

মহাশয় ব্যক্তি যাচকের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবেন; শ্বেতরাজা যাচককে না দিয়া ভক্ষণ করিয়া, নিজের মাংস ভক্ষক হইয়াছিলেন। ৭

(দেবান্ পিতৄন্ মনুষ্যাংশ্চ ভৃত্যান্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃশেষভুগ্‌ভবেৎ॥
বিষ্ণুস্মৃতৌ ৬৭ অধ্যায়।

দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, ভৃত্যগণ ও গৃহ দেবতাগণের পূজা করিয়া তদনন্তর গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন।

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথি সোদরান্।
হিত্বাগৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ৮ উল্লাসে।

গৃহী কণ্ঠগত প্রাণ হইলেও, মাতা, পিতা পুত্র, স্ত্রী, অতিথি ও সহোদরকে ত্যাগ করিয়া ভোজন করিবে না।

শ্বেত রাজার উপাখ্যান বাল্মিকীয় রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৭৮ সর্গে।)

জপহোমার্চ্চনং কুর্য্যাৎ সুধৌতচরণঃ শুচিঃ।
পাদশৌচবিহীনং হি প্রবিবেশ নলং কলিঃ॥ ৮
ন সঞ্চরণশীলঃ স্যান্নিশি নিঃশঙ্ক মানসঃ।
মাণ্ডব্যঃ শূললীনোঽভূদ চৌরশ্চৌরশঙ্কয়া॥ ৯

চরণ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুচি হইয়া জপ ও হোমার্চ্চনা করিবে; কলি, নলের শৌচপদ না থাকাবশতঃ নলের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৮

(সুস্নাতঃ প্রক্ষালিত-পাণিপাদঃ স্বাচান্তো দেবতার্চায়াং স্থলে [illegible] গবন্ত মনাদি নিধনং বাসুদেবমভ্যর্চ্চয়েৎ [illegible]
[illegible]স্মৃতৌ ৬৫ অধ্যায়।

উত্তমরূপে স্নান[illegible] প্রক্ষালন, পরে আচমন করিয়া, দেবপ্রতি[illegible]ত অথবা স্থলে, অর্থাৎ ঘটাদিতে জন্মমৃত্যুরহিত ভগবন্ বাসুদেবের পূজা করিবে।

নল রাজার শরীরে কলির প্রবেশ উপাখ্যান—
কৃত্বা মূত্রমুপাস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্ত নৈষধঃ।
অকৃত্বা পাদয়োঃশৌচং তত্রৈনং কলিরাবিশৎ॥
মহাভারতে বন পর্ব্বণি ৫৯, অধ্যায়।

নিষধাধিপতি মূত্র পরিত্যাগ করিয়া, পদ ধৌত না করিয়া, আচমনপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন দেখিয়া, কলি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।)

নিঃশঙ্ক মনে রাত্রে গমন করিবেনা। সাধুমাণ্ডব্য চোর বিবেচনায় শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। ৯

(নৈকোঽধ্বানং প্রপদ্যেত। নাধা[illegible] সার্দ্ধম্।......নাতি প্রত্যুষসি। নাতিস[illegible]। ন সন্ধ্যয়োঃ। ন মধ্যাহ্নে ন সন্নিহিত পানীয়ম্। নাতিতূর্ণং। ন রাত্রৌ। ন সন্ততং ব্যাল ব্যাধিতার্ত্তৈর্বাহনৈঃ।
বিষ্ণুস্মৃতৌ ৬৩ অধ্যায়।

একা পথে চলিবে না, অধার্ম্মিকের সহিত না, অতি প্রত্যুষে না, অতি সন্ধ্যাকালে না, উভয় সন্ধ্যায় নয় অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও প্রাতঃকালে না, মধ্যাহ্নে না; জলের নিকটে না, অতি শীঘ্র না; রাত্রে না, সর্ব্বদা সর্প পীড়িত কিম্বা পরিশ্রান্ত বাহন দ্বারা না।

মাণ্ডব্যোপাখ্যানং মহাভারতে আদি পর্ব্বণি ১০৭ অধ্যায়—

মাণ্ডব্য নামে ব্রাহ্মণ স্বীয় আশ্রমস্থ-বৃক্ষনিম্নে মৌনব্রতাবলম্বন করিয়া, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। এক দিন কতকগুলি দস্যু অপহৃত দ্রব্য লইয়া, রক্ষকের অনুসরণ ভয়ে সেই আশ্রমে ধন লুকাইয়া আপনারাও সেই স্থানে থাকিল। পরে রক্ষকগণ সেই স্থানে আসিয়া, মুনিকে কোন পথ দিয়া দস্যুগণ গিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, মুনি কোন উত্তর প্রদান না করিলে, রক্ষকগণ সেই আশ্রমে অনুসন্ধান করাতে অপহৃত দ্রব্য সহিত দস্যুগণকে দেখিতে পাইল। রক্ষকেরা মুনিকেও বন্ধন করিয়া রাজসমীপে লইয়া গিয়াছিল। রাজা মুনিকেও বধের আজ্ঞা দিলেন। রক্ষকেরা মাণ্ডব্যমুনিকে আনিতে না পারিয়া, শূলে আরোপণ করিয়াছিল—
তং রাজা সহ তৈশ্চৌরৈরন্বশাদ্বধ্যতামিতি।
স রক্ষিভি স্তৈরজ্ঞাতঃ শূলে প্রোতো মহাতপাঃ॥)

ন কুর্য্যাৎ পরদারেচ্ছাং বিশ্বাসং স্ত্রীষু বর্জ্জয়েৎ।
হৃতো দশাস্যঃ সীতার্থে হতঃ পত্ন্যা বিদূরথঃ॥১০

অন্যের স্ত্রীতে স্পৃহা করিবে না ও স্ত্রীকে বিশ্বাস করিবে না; সীতার জন্য রাবণ হত হইয়াছিলেন ও বিদূরথ রাজাকে তাঁহার রাণী হনন করিয়াছিলেন। ১০

(পরান্নং পরবস্ত্রঞ্চ পরশয্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ।
পরবেশ্মনি বাসশ্চ শক্রাদপি হরেচ্ছ্রিয়ম্॥
গরুড় পুরাণে পূর্ব্বার্দ্ধে ১১৫ অধ্যায়।

পরান্ন, পরদ্রব্য, পরশয্যা, পরস্ত্রী ও পরগৃহে বাস ইন্দ্রেরও লক্ষ্মী হরণ করে।

"মমদাবাসনী কাবঃ কুর্য্যাদ্ বেতালচেষ্টিতম্।

তত্রৈব কহিয়াছেন—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥
ঐ ১১১ অধ্যায় ১২।

স্ত্রীতে অবিশ্বাস কর্ত্তব্য যথা—

নখীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনম্।
বিশ্বাসোনৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥
ঐ ১০৯ অধ্যায় ১৪।

স্ত্রীষু রাজাগ্নি সর্পেষু স্বাধ্যায়ে শত্রু সেবনে।
ভোগাস্বাদেষুবিশ্বাসংকঃপ্রাজ্ঞঃকর্ত্তুমর্হতি॥
ঐ ১১৪ অধ্যায় ৪৬।

স্ত্রীষু রাজসু সর্পেসু স্বাধ্যায়প্রভুশত্রুষু।
ভোগেম্বায়ুষিবিশ্বাসংকঃপ্রাজ্ঞঃকর্ত্তুমর্হতি॥
মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বণি ৩৬ অধ্যায় ৫৭।

তজ্জন্য শান্তিশতকে কহিয়াছেন—

আবর্ত্তঃসংশয়ানামবিনয়ভবনংপত্তনংসাহসানাং
দোষানাং সন্নিধানং কপটশতময়ং ক্ষেত্র-
মপ্রত্যয়ানাং।
দুগ্রাহ্যং যন্মহদ্ভিঃ সুরনরবৃষভৈঃ সর্ব্বমায়া-
করং তৎ।
স্ত্রীরূপং কেন লোকে বিষমমৃতময়ং ধর্ম্ম-
নাশায় সৃষ্টং॥

সংশয়ের উদাম, অবিনয়ের ভবন, সাহসের আদিস্থান, দোষের আকর, কপটময়, অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, দেবতা নর, বৃষ ও মহৎ ব্যক্তিও ত্যাগ করিতে পারেন না; এই অমৃতময় স্ত্রীরূপ বিষকে ধর্ম্মনাশের জন্য কে সৃষ্টি করিয়াছেন!

বিদূরথ উপাখ্যান বৃহৎসংহিতার '৭৮' অধ্যায়ে আছে—

'শস্ত্রেণ বেণীবিনিগূহিতেন বিদূরথং স্বা
মহিষী জঘান।'

বেণীতে লুকায়িত শস্ত্র দ্বারা বিদূরথকে তাঁহার মহিষী হত্যা করিয়াছিলেন।

'বেণীনিগূঢ়েন চ শস্ত্রেণ বিন্দুমতী বৃষ্ণিং
বিদূরথং (জঘান)
হর্ষচরিতে ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাসে।

বৃষ্ণয়ো হি যযুঃ ক্ষীবাস্তৃণপ্রহরণাঃ ক্ষয়ম্॥ ১১
(ক্রমশঃ) শ্রীবিধুভূষণ দেব।

মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া ভূতের ন্যায় কার্য্য করিবে না; কারণ বৃষ্ণিগণ মত্ত হইয়া পরস্পর তৃণদ্বারা প্রহার করিয়া নষ্ট হইয়াছিলেন। ১১

(হিন্দুশাস্ত্রে মদ্যপান মহাপাপ। মহাপাপ পঞ্চ যথা—

ব্রহ্ম হত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পানকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥
মনুঃ ১১ অধ্যায় ৫৫

ব্রহ্ম-হত্যা, সুরা[illegible], ব্রাহ্মণের ৮০ তোলা স্বর্ণ চুরি, [illegible] গমন এই চারিটি মহাপাপ [illegible] সহিত যিনি এক বৎসরকাল [illegible] করেন তিনিও মহাপাপী মধ্যে পরিগণিত।

ব্রহ্মহামদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।
এতে মহাপাতকিনো যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ॥
৩য় অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ উশনঃস্মৃতৌ

বহ্মহত্যা সুরাপানং ব্রাহ্মণ সুবর্ণ হরণং গুরুদার গমনমিতি মহাপাতকানি। তৎসংযোগশ্চ। বিষ্ণুস্মৃতৌ ৩৫ অধ্যায়। সম্বৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্। ঐ

এই যদুবংশক্ষয় কথা মহাভারতে মৌষলপর্ব্ব ১ম অঃ। শ্রীভগবতে ১১ স্কন্ধে ৩০ অঃ ব্রহ্মপুরাণে ১০০ অঃ। শ্রীদেবী ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৮ অঃ। ইতিহাস এই—একদিন কতিপয় মুনিকে যদুবংশীয় কতিপয় বালক [illegible] করেন, আমাদের এই স্ত্রীলোকটি কি [illegible] করিবে? বালকগণ একটি বালককে [illegible]বতী স্ত্রী সাজাইয়াছিলেন। মুনিগণ জানিতে পারিয়া ক্রোধে কহিয়াছিলেন "ইনি নাশন মুষল প্রসব করিবেন।" কালক্রমে একটি মুষল প্রসূত হইল। মুষল চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ক্ষিপ্ত হইল। চূর্ণভাগ তীরে লাগিয়া উহা হইতে এরকা উৎপন্ন হইয়াছিল; যদুগণ মত্ত হইয়া উহাদ্বারা পরস্পর বিবাদ করিয়া হত হন।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্ট্রী কৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা।



বর্ণভেদতত্ত্ব।

(পূর্বানুবৃত্তি।)

(বর্ণ ও জাতি শব্দ।)

মনুসংহিতায় আরও দেখা যায়।—

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্। এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥ ১২ ২৬

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥ ১২ ২৭

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোঽপ্রতীপং বিদ্যাৎ সততং হারিদেহিনাম্॥ ১২ ২৮

যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥ ১২ ২৯

সত্ত্বগুণের লক্ষণ জ্ঞান, তমোগুণের অজ্ঞান ও রজোগুণের লক্ষণ রাগ-দ্বেষ। সকল প্রাণীরই এই তিনগুণ আছে। যখন আমার প্রীতিকর শুদ্ধাভ, প্রশান্ত কোনও জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যাইবে, তখন বুঝিবে, তাহা সত্ত্ব। যাহা নিজের অপ্রীতিকর, দুঃখযুক্ত ও প্রতিকূল, তাহাকেই অনিষ্টোৎপাদক রজ বলিয়া জানিবে। যাহা মোহযুক্ত, অব্যক্ত, বিষয়াত্মক, অপ্রতর্ক্য, অজ্ঞেয়, তাহাই তম বলিয়া ধারণা করিবে।

সাংখ্য পাতঞ্জল শাস্ত্রে সত্ত্বাদিগুণত্রয় বিষয়ে বিপুল গবেষণা আছে, তাহা এস্থানে অতিরিক্ত; সংক্ষেপে ঐ শাস্ত্রের রহস্য— পঞ্চশিখসূত্র,—

"সত্ত্বং নাম প্রসাদ লাঘবাভিষঙ্গ প্রীতি-তিতিক্ষা সন্তোষাদিরূপানন্তভেদং সমাসতঃ সুখাত্মকং, এবং রজোঽপি শোকাদি নানাভেদং সমাসতো দুঃখাত্মকং এবং তমোঽপি নিদ্রাদি নানাভেদং সমাসতো মোহাত্মকমিতি।"

প্রসাদ, লাঘব, অভিষঙ্গ, প্রীতি, তিতিক্ষা, সন্তোষ ইত্যাদি বহুবিধ লক্ষণ সত্ত্ব গুণের,

সংক্ষেপে সত্ত্ব সুখাত্মক। এইরূপ রজো-গুণের শোকাদি নানা লক্ষণ, সংক্ষেপে রজ দুঃখাত্মক। ঐরূপ তমোগুণের নিদ্রাদি নানা লক্ষণ, সংক্ষেপে ঐ গুণ মোহাত্মক।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় দেখা যায়—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ!

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহি-নম্॥১৪।৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহি-নাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত!॥১৪।৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত!
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥১৪।৯

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥১৪।১১

লোভ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ! ১৪।১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন!১৪।১৩

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥১৪।১৭

সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতা হেতু প্রকাশক অনাময়; এ গুণ সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা বন্ধন করে। অর্থাৎ সুখে আকৃষ্ট করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক ও তৃষ্ণাসঙ্গোত্থ, উহা কর্ম্মসঙ্গ দ্বারা জীবের বন্ধন নিষ্পাদন করে। জীব ঐ জন্য কর্ম্মপর হয়। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জাত, উহা সকল জীবের মোহজনক। প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা ঐ গুণ জীবকে বন্ধন করে; অর্থাৎ তমোগুণবশতঃ নিদ্রাদির আধিক্য হয়। সত্ত্ব সুখের দিকে চালিত করে, রজোগুণ কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করিয়া প্রমাদের পথে জীবকে পরিচালিত করে। যখন সকল ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানাত্মক প্রকাশের আধিক্য অনুভূত হইবে, তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যে সময় লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, (যাহা লৌকিক প্রতিষ্ঠাজনক, তাদৃশ কর্ম্মারম্ভ) অশম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন রজোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে, জানা যায়। তমোগুণ আতিশয্য লাভ করিলে, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ ইত্যাদি উদ্ভূত হয়। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ, তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রকৃতির কর্ত্তা, কর্ম্ম, দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও জ্ঞান কিরূপ, আবার রজঃপ্রকৃতির ও তমঃপ্রকৃতির জ্ঞান কর্ত্তা ইত্যাদি কি প্রকার, এ সকল বিষয় গীতাশাস্ত্রে বহুল পরিমাণে বিচারিত হইয়াছে। সে সকলের অবতারণা এ প্রসঙ্গে অতা-বিক। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের লক্ষণ বুঝা গেল, এখন সত্ত্বাদিগুণানুসারে শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির কি প্রকার কর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করা যাউক। সংক্ষেপে ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয় সত্ত্ব-উপসর্জ্জন রজঃ-প্রধান, বৈশ্য রজউপসর্জ্জন তমঃপ্রধান এবং শূদ্র তমঃপ্রধান।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যাইতেছে,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥
৭।১১।২১

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥
৭।১১।২২

দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্য-
লক্ষণম্॥ ৭।১১ ।২৩

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্॥
৭।১১।২৪

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥
৭।১১।৩২

ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, সরলতা, ক্ষমা, জ্ঞান, দয়া, ঈশ্বরপরতা ও সত্য, এগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য, এগুলি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেবতা, গুরু ও পরমেশ্বরে ভক্তি, ধর্ম্মার্থকাম, এই ত্রিবর্গের পরিপোষণ, আস্তিক্যতা, নিত্য উদ্যম ও নৈপুণ্য, বৈশ্যের লক্ষণ। সন্নতি, শুচিতা, অকপট প্রভুসেবা, মন্ত্রহীন যজ্ঞানুষ্ঠান, চুরি না করা, সত্য এবং গো-ব্রাহ্মণের রক্ষণ, এই সকল শূদ্রের লক্ষণ। স্বভাববিহিত বৃত্তিদ্বারা সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া বর্ত্তমান পুরুষ ক্রমে স্বভাবজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণত্ব (মোক্ষ) লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণগুলি পাঠকরিলে ব্রাহ্মণাদির পরস্পরের শ্রেষ্ঠতা যে গুণকর্ম্মানুসারী, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে দেখিতে পাই—

ভরদ্বাজ উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়োবা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ব্রুহি বদ-
তাম্বরং ॥২১॥

ভৃগুরুবাচ।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ
শুচিঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্বব-
স্থিতঃ ॥২২॥

শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরু-
প্রিয়ঃ। নিত্যব্রতো সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ
উচ্যতে ॥২৩॥

সত্যং দানমথাদ্রোহ অনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥২৪॥

ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥২৫॥

বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥২৬॥

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোহশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি
স্মৃতঃ ॥২৭॥

ভরদ্বাজ ঋষি ভৃগুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ কিরূপে হয়, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ও শূদ্রইবা কিরূপে হয়, আমাকে বলুন। ভৃগু বলিলেন, জাতকর্ম্মপ্রভৃতি সংস্কার দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্কৃত ও শুচি, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন, ষট্কর্ম্মশালী (সন্ধ্যা-বন্দনা, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসৎ-কার, এই ছয়টী, অথবা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সৎপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ,

এই ছয়টী ষট্‌কর্ম্ম। শেষোক্ত ছয়টী অধিক সঙ্গত। যে শৌচাচারস্থ, দেবপ্রসাদ-ভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সে ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ এই সকল গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়। সত্য, দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, লজ্জা (অকার্য্য করিতে লজ্জা) ঘৃণা (নিন্দ্য কর্ম্মে ঘৃণা) ও তপস্যা যাহাতে দেখিবে, সেই ব্রাহ্মণ জানিবে। যিনি বেদাধ্যয়ন করেন এবং ক্ষত্রোচিত বিপন্ন রক্ষায় দীক্ষিত হয়েন, সৎপাত্রে দান ও প্রজার নিকট হইতে যোগ্যকর গ্রহণ করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। বৈশ্যও বেদাধ্যায়ী হইবে। পশুরক্ষা, কৃষি, ধনোপার্জ্জন, প্রিয় ও শুচি হওয়া বৈশ্যের লক্ষণ। যে ব্যক্তির সকল খাদ্য গ্রাহ্য অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, আর যাহার ভাল মন্দ কর্ম্মের বিচার নাই, এবং যে বেদত্যাগী, আচাররহিত, সে শূদ্র বলিয়া কথিত হয়। এই সমস্ত শ্লোকে সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল যে, কর্ম্মভেদেই ব্রাহ্মণাদির ভেদ। জন্মভেদের কোনও কথা এ সকল স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গেলনা। যদি গুণ-কর্ম্মই বর্ণভেদের কারণ হয়, জন্মের সহিত উহার কিঞ্চিন্মাত্রও সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সমাজের আদিম অবস্থায় বর্ণ-ভেদের কারণ পাওয়া কষ্টকর এবং বর্ত্তমান জাতিভেদ বৃথা। মানব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই যদি ব্রাহ্মণাদি হইল, তবে এ সকল কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে সে কি ছিল? সৃষ্টিপ্রবাহের আদি অন্ত নাই, সুতরাং চিরন্তন অনাদি অদৃষ্ট আশ্রয় করিয়া দার্শনিক সহজ উত্তর দিতে পারিবেন। সামাজিক স্তর কল্পনা করিয়া ক্রম পরি-বর্ত্তন-বাদী আধুনিক অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। তিনি সুতরাং বলিবেন, প্রথমে সকলেই সমান ছিল, বর্ণভেদ ছিল না; স্বীয় কর্ম্মানুসারে মনুষ্য ব্রাহ্মণত্বাদি লাভ করিয়াছে; তাহা পরবর্ত্তিসময়ের সামাজিক নির্দ্দেশমাত্র। সমাজে সম্মান, স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা, উচ্চনীচতার পরিমাণানুসারে যোগ্য-তমের প্রতিষ্ঠা ও অধিকারলাভ, দোষের প্রশ্রয় না দেওয়া, বরং সুসংস্কারে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি কত[illegible] যুক্তি দ্বারাই জাতি বা বর্ণভেদ [illegible] হইয়াছিল। গুণ-কর্ম্ম ত্যাগ [illegible] জাতীয় যুক্তি-বিকাশের অবকাশ থাকিবে না, সুতরাং বর্ণভেদ প্রহেলিকা মাত্রে পরিণত হইবে। বস্তুতঃ জাতিভেদ প্রথমে ছিল না, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

ভৃগুরুবাচ।

নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥১০

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়-সাহসাঃ। ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥১১॥

গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ। [illegible] নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং-গতাঃ ॥১২॥

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥১৩॥

ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ। ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥১৪॥

ইতোহন্যে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী। বিহিতা ব্রাহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥ ৫॥

ভৃগু বলিলেন, বর্ণ বা জাতির কোনও বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়, তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ কাম-ভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ ক্রোধপরবশ, সাহসপ্রিয়, স্বধর্ম্মত্যাগশীল, রক্তবর্ণ, তাহারা ক্ষত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ গোরক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছে, পীতবর্ণ দেহ, কৃষিজীবী, ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না, তাহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ হিংসা ও মিথ্যা পরতন্ত্র, লোভী, শুচিতাবিহীন, সর্ব্বকর্ম্মজীবী, কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ইত্যাদি বাক্য আলোচনা করিলে বোধ হয়, প্রথমে একমাত্র ব্রাহ্মণই ছিল, অর্থাৎ জাতিভেদ ছিল না, পরে কর্ম্মানুসারে তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্বাদি লাভ করিয়াছে। ইহার অন্যতম প্রমাণ যথা,—

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্যএকাগ্নি র্বর্ণ এব চ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এ বচন হইতে অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্বে এক বেদ, এক নারায়ণ দেবতা, এক অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। বাস্তবিকও এক প্রকারের বহু ব্যক্তি বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া উৎকর্ষ অপকর্ষ লাভ করিলে, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের জন্য সমাজ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন; নচেৎ গুণের পূজা এবং দোষের সংশোধন হয় না; তাহাতে সমাজ উচ্ছিন্ন যায়। সমাজের মজ্জাগত দোষ দূর করিতে হইলে উত্তমাধম বিভাগ আবশ্যক হয়। মহাভারত ও ভাগবত মতে বর্ণভেদ সমাজ শাসন বা সম্বর্দ্ধনের জন্য আবশ্যক বলিয়াই হইয়াছিল, এরূপ মনে হয়। গুণ বংশগত হওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত নয় বলিয়া, বংশগত জাতিভেদ গুণকর্ম্ম জন্য জাতিভেদের ফলস্বরূপ সমাজে দেখা দিয়াছিল। জাতি বংশগত থাকিলে, গুণ-কর্ম্মানুসারে শরীরের বর্ণ-পার্থক্য বিশেষ সম্ভব নয়। ক্ষত্রিয়োচিত আচরণে মহাভারতের দ্রোণগুরু বা কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার সিত ভিন্ন রক্তবর্ণের উৎপত্তি কোনও স্থানে পাওয়া যাইতেছে না। কর্ম্মত্যাগ এবং অন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিলে, শরীরের রঙ্ সহসা পরিবর্ত্তিত হইবে, ইহার বিশেষ কারণ অনুসন্ধান করিয়া মিলান কষ্টকর।

শরীরের বর্ণে ব্রাহ্মণ না হইলেও কর্ম্মে ব্রাহ্মণ অনেকে ছিলেন। রক্তবর্ণ ব্রাহ্মণ ও শ্বেতবর্ণ ক্ষত্রিয় অসবর্ণ বিবাহের ফল বলিয়া মনে হয়। শরীরের বর্ণ বংশগত সামগ্রী, ভিন্ন বর্ণে বিবাহ হইলে সন্তান অন্যতরবর্ণ হইবে। এইরূপ ত্রিজাতীয় আদান প্রদানে ব্রাহ্মণ রক্ত, পীত হইয়াছিল, ক্ষত্রিয় শ্বেত ও পীত এবং বৈশ্য শ্বেত-রক্ত হইতে পারিয়াছে বোধ হয়। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিল, শাস্ত্রের এ কথার অর্থ বিবেচ্য। শুধু ক্ষত্রিয় হইয়াছিল বলিলে কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদের সমর্থন হইত। রক্তবর্ণ ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার প্রমাণ,—

ভরদ্বাজ উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ॥

শরীরের বর্ণানুসারে যদি ব্রাহ্মণাদি জাতি-বিভাগ হয়, তবে সকল বর্ণেরই শারীর বর্ণ সঙ্কর দেখা যাইতেছে। এই বচন পাঠে বুঝা যায়, 'সর্ব্বেষাং' পদ থাকায় চারি বর্ণের বর্ণগত সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছিল; তাহা হইলে শূদ্রর সহিত ত্রিবর্ণের বিহিত অবিহিত যেমন হউক, শোণিত-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল অনুমান করা অনুচিত নয়। ভরদ্বাজের সময়ে অবশ্য গুণের আদর ছিল, শরীরের রঙের আদর ছিল না; তাহা হইলে রক্তবর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে পারিত না। মোটের উপর জাতিভেদের মূলতত্ত্ব শাস্ত্রকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ধারণা হয় না। ভাগবতের শূদ্র বিনয়ী, শুচি, সত্যবাদী, গোব্রাহ্মণরক্ষক ও অকপট-প্রভুসেবক, আর মহাভারতের শূদ্র অনাচারী, খাদ্যাখাদ্য-বিচারহীন, সর্ব্বকর্ম্মকারী। সম্ভবতঃ উভয় লক্ষণের লক্ষ্য এক না হইতে পারে। শূদ্র-লক্ষণ যেখানে থাকুক না কেন, তিনি শূদ্র; ব্রাহ্মণে থাকিলেও ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবেন। গুণকর্ম্মের রাজপূজা যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র শাস্ত্রবাক্যে যুক্ত্যনুসরণ বৃথা প্রয়াসে পর্য্যবসিত হয়, এই টুকুই সান্ত্বনার স্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদান্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥৩৫

পুরুষের জাতিপরিচায়ক যে সকল লক্ষণ বলা হইল, তাহা যদি অন্যত্র অর্থাৎ ভিন্ন জাতিতে দেখা যায়, তাহাহইলে সেই লক্ষণ দ্বারা সেই ব্যক্তিকে তজ্জাতি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবে। ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি বৈশ্য জাতিতে দৃষ্ট হয়, তবে বৈশ্যকেও ব্রাহ্মণ-লক্ষণানুসারে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কথাটী বড় বিষম। সমাজে অনেক স্থানে অনেক সময় এ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। আরও দেখা যায়—

শূদ্রেচৈতত্ত্ববেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥২৮॥

শূদ্রর লক্ষণ [illegible] শূদ্র এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি [illegible] না থাকে, তবে সে শূদ্র শূদ্র নহে এবং সে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে। ব্রাহ্মণের গুণ যদি ব্রাহ্মণে না থাকে, একথায় বুঝা যায়, জন্ম-বলে যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাঁহাতে ব্রাহ্মণের গুণ না থাকে। নচেৎ গুণ-কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলে তাহাতে গুণ থাকিবেনা কেন? গুণকর্ম্ম-বাদীও এখানে জন্মমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রাদি হইতে পারিবেনা, এই কথা বলিতেছেন। গুণ থাকিলে জন্মমাহাত্ম্যের আবশ্যকতা নাই, এরূপ বলিলে বুঝা যায়, জন্মানুসারে জাতিভেদ প্রচলিত থাকার সময় যৌক্তিকতা অবলম্বন করিয়া গুণকর্ম্মানুসারী জাতিভেদ [illegible] স্থাপিত হয়। অতএব উভয়বিধ জাতিভেদ সময়ানুসারে আবশ্যক মতে অবলম্বিত হয়। এইরূপ বুঝিতে বিশেষ বাধা নাই।

গুণ-কর্ম্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে বর্ণান্তর-প্রাপ্তির আরও পরিচয় শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

তপোবীজ-প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ ॥

মনু তপোবীজপ্রভাবের সহিত "জন্মত"ও লিখিয়াছেন। গৌতম বলেন, "বর্ণান্তর-গমনং উৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।"

গুণোৎকর্ষে উৎকৃষ্ট বর্ণ হওয়া যায়, ইহা মহর্ষিগণের মত।

অত্রিসংহিতায় দেখা যাইতেছে,—

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥
অস্ত্রাহতাশ্চ সংগ্রামে ধন্বানঃ সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥
কৃষিকর্ম্মরতো য[illegible]াঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়[illegible] বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥
লাক্ষা লবণ সম্মিশ্র[illegible]ক্ষীরসর্পিষঃ।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স[illegible] শূদ্র উচ্যতে॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥

বেদান্তানুশীলনরত, সঙ্গত্যাগী, সাংখ্য-যোগবিচারনিরত, বেদপাঠী ব্যক্তি দ্বিজ। যুদ্ধে অস্ত্রধারী বিপ্র ক্ষত্রিয়; বাণিজ্যশীল, কৃষিকারী গোরক্ষক বিপ্র বৈশ্য, লাক্ষালবণ-মধুমাংস-দধিদুগ্ধাদি বিক্রেতা বিপ্র শূদ্র। ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত, সকল প্রাণীর উপর নির্দ্দয় বিপ্র চণ্ডাল। বেদ-পাঠীই বিপ্র। সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজ। এখানে বুঝা গেল, বেদপাঠীও যদি উক্ত হীনকর্ম্মশীল হন, তিনিও শূদ্র বা চণ্ডাল বলিয়া [illegible]। পূর্ব্বে শূদ্রের যে লক্ষণ পাওয়া [illegible] এ লক্ষণ তাহা অপেক্ষা অন্যরূপ। এই [illegible] বেদাধ্যায়ীবর্গকে স্বধর্ম্মনিরত হইতে বলা হইয়াছে। না হইলে তাঁহাদিগকে নিম্নবর্ণ বলিয়া গণ্য করা হইবে, এইরূপ ভীতি-প্রদর্শন ব্যতীত এ শ্লোকের অপর কোনও মূল্য আছে, বোধ হয় না। দ্রব্য বিক্রয় বাণিজ্য, তাহা অবলম্বন করিলে বেদাধ্যায়ী শূদ্র হইবে কেন, বুঝা যায় না। নিন্দিত দ্রব্য বিক্রয় বাণিজ্যের বহির্ভূত এবং সেবা-মাত্রাবলম্বী শূদ্রের একটা লক্ষণ, একথা শাস্ত্রের হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনায় বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্যযোগ-বিচার ব্যাপারটা কি, বুঝিতে হইলে, সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের লক্ষণ একরূপ লেখা হয় নাই, বলিতে হয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের লক্ষণ স্থির। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের লক্ষণ সময় মত পরিবর্ত্তিত হইত বোধ হয়। এ বিষয়ের বিচার এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আর একটী বচন আছে "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥" জন্মে শূদ্র হইয়া, সংস্কারের পর নাম দ্বিজ, বেদপাঠে বিপ্র এবং ব্রহ্ম জানিলে ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হয়। এ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝা দুষ্কর। বেদপাঠী ও সংস্কার-সম্পন্ন হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য নন, যদি ব্রহ্ম না জানিয়া থাকেন। অন্য-শাস্ত্রের বহুবিধ ব্রাহ্মণ-লক্ষণ সাংখ্যযোগ-বিচার পর্য্যন্তেও কুলাইল না। ব্রহ্মকে জানা চাই। ব্রাহ্মণ তবে বড় বড় মহর্ষিরাও হইতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদেরও অনেকের ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সামান্য পরিচয় ছিল না, ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। নামজাদা ঋষি মহাশয়েরাও রাজা অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে গিয়াছিলেন। রাজা দেখিলেন, ঋষিরা বেশ বুদ্ধিমান, সুতরাং তাঁহাদিগের উপনয়নাদি না দিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই দিলেন। উপনিষদের

এই সুদীর্ঘ গল্পের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। মোটের উপর অলঙ্কারের আতিশয্যে ও গোঁজামিলের প্রাচুর্য্যে শাস্ত্রের জাতিতত্ত্ব অপরের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। বহুদিন পরে আলোচনা করিয়া ইহার শৃঙ্খলা সংগ্রহ করা কষ্টকর।

জন্মানুসারে অর্থাৎ বংশগত ও গুণগত জাতিভেদ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বংশগত জাতিভেদ এখনও বিদ্যমান, গুণ-কর্ম্মগত জাতিভেদ দৃষ্টান্ত পুরাণে পাওয়া যায়।

হরিবংশ ২৯ অধ্যায়ে দেখুন—

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥

গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিল। এক পিতার পুত্রগণ গুণ-কর্ম্মানুসারে ভিন্ন জাতি হয়, ইহার আরও প্রমাণ আছে। যথা বায়ু পুরাণে—

পুত্রো গৃৎসমদস্য চ শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
এতদ্‌ বংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ।

শুনকের বংশে বিভিন্ন কর্ম্ম দ্বারা দ্বিজগণ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র হইয়াছিল। আরও বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—

গৃৎসমদস্য শুনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতা'ভূৎ।
শুনক চারিবর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা হইয়াছিলেন।

আরও আছে।—

শৃণু রাজন্‌ যথা রাজা বীতহব্যো মহাযশাঃ।
রাজর্ষিত্বং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং লোকসৎকৃতম্‌॥

রাজা বীতহব্য যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। এ প্রমাণে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইবার দৃষ্টান্ত মিলিল না কি? আরও হরিবংশ ১১ অধ্যায়ে।—

নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

বৈশ্য নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভারতীয় সমাজে সুপরিচিত বিশ্বামিত্র মহোদয় যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত। শাস্ত্রে, তাঁহার দেহ বিনাশ করিয়া পুনর্দ্দেহে ব্রাহ্মণত্ব লা[illegible] কথিত আছে। সেরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম স[illegible] অসম্ভব, তাহা এখানে আলোচ্য না[illegible] বুঝা যায়, ঐ টুকু বংশগত জাতি[illegible]তরে গোঁজামিল। বর্ত্তমান যুগেও কৌলিন্য-প্রথার কুবাতাসে কত নিম্নজাতি, ঘটকের অঘটন ঘটাইবার ক্ষমতায়, রজতচন্দ্রের কল্যাণে একেবারে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়াছে! তবে ইহাতে গুণ-কর্ম্মের কিছু নাই; আর এ নিয়তা গোপনে রক্ষিত হইয়াছিল, এই মাত্র পার্থক্য। এখনও—অল্পদিনের কথা,—

"* * * আমি যে কৈবর্ত্ত সেই কৈবর্ত্ত।" ইত্যাদি শ্লোক আবালবৃদ্ধ বঙ্গীয় জনের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতের শুভাদৃষ্টবশতঃ ভারতীয় সমাজের উদরাগ্নিতে অনেক কোটি বৌদ্ধ জাতিভেদ ত্যাগী [illegible]গ-কর্ম্ম-জন্ম সবই পরিপাক পাইতে[illegible]। বংশগত জাতিভেদ যে কত-রূপে তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহা অল্পদিন পূর্ব্বের "ভরার মেয়ে বিবাহে" অনেক বুঝা যায়। ব্যভিচারের কথা বলিতে চাহি না। গুণ, কর্ম্ম এবং জন্ম, এই মাত্র শাস্ত্রীয় জাতি-ভেদের নিদান। তাঁহার কোনটী বর্ত্তমান

সমাজে অক্ষুণ্ণ আছে; সুতরাং বর্ত্তমান জাতি-ভেদ, না জন্মানুসারে, না গুণ-কর্ম্মানুসারে; বস্তুতঃ অশাস্ত্রীয়; যেহেতু শাস্ত্রে ঐ উভয়বিধ ব্যতীত অন্য উপায়ে জাতিভেদ সমর্থিত হয় নাই।

শাস্ত্রের জাতিভেদে যুক্তি আছে কি না, তাহা আমরা এখন দেখাইব। সম্প্রতি দেখা যায়, গুণ, কর্ম্ম এবং জন্মানুসারে জাতি-ভেদ হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে আছে।

যখন দেশের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা পত্পত্রবে উড়ীন থাকে, তখন দেশীয় ব্যক্তিবর্গের চতুর্ব্বিভাগ নিতান্ত অসঙ্গত নয়। ব্রাহ্মণশ্রেণী জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা দেশের মহোপকার সাধন করিতেন। ক্ষত্রিয়-শক্তি বাহুবলে অস্ত্র-তেজে স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও প্রকৃতিপুঞ্জের শান্তি সংস্থাপনে প্রয়াস পাইতেন। বৈশ্য জাতি ধন-ধান্য দ্বারা দেশ সমৃদ্ধ রাখিতেন। বাণিজ্য ও গো-রক্ষায় দেশের অসংখ্য অভাব পূরণ ও বিদেশীয় বিজাতীয় উন্নতির অংশ গ্রহণ করাতে বিবিধ হিত সাধন হইত এবং কৃষিবল অক্ষুণ্ণ থাকিত। এই তিন সম্প্রদায়ই দেশের কর্ম্মযোগী। চতুর্থ শূদ্রগণ জ্ঞানচর্চ্চা, রাজনীতি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির অযোগ্য বলিয়া কেবল দ্বিজ-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। দেশে যখন শান্তির সুবাতাস বহিতে থাকে, তখন এই অপূর্ব্ব প্রথাই দেশের অশেষ মঙ্গল নিদান হয়। বিদেশীয় বিজাতীয় জনের নিকট পরাজিত পদদলিত ঘৃণিত দেশের পক্ষে ক্ষত্রিয়-শক্তি স্বপ্নদর্শন। কৃষি-বাণিজ্য আবশ্যক, কিন্তু তাহাতেও বর্ত্তমান সমাজ উদর-পোষণ করিতে পারিতেছেনা। গ্রাসাচ্ছাদন নিষ্পন্ন হওয়াও যখন কৃষি-বাণিজ্য দ্বারা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে, তখন দেশের বৈশ্য-বল বৃথা হইয়া গিয়াছে। শূদ্রকর্ম্ম পরিচর্য্যা। এখন সকলেরই তাহাই সম্বল; কিন্তু ইহাতে জাতীয় জীবন উন্নতির স্রোতে নীত হয় না; অতএব রন্ধনকারী 'পশ্চিমে ব্রাহ্মণ' কায়স্থ প্রভুর পদমর্দ্দন করুক, আর কায়স্থ স্বজাতি অথবা পরজাতির বাটীতে খানসামাগিরিই করুক, কিছুতেই দেশের জাতীয় উপকারের প্রত্যাশা নাই। অধিকন্তু উদরান্ন সংস্থানের সম্ভাবনা থাকিলেও, স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা অতিক্রম করেন নাই; এই জন্য শ্বেতাঙ্গ, গৌরাঙ্গ, কাহারও সেবায় আমাদের জাতিভেদের মর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে না। ব্রাহ্মণ বল এখন কেবল সমাজের গলদেশে বিস্ফোটক মাত্র। যে জ্ঞানের আলোচনায়, যে দর্শন-বিজ্ঞানের গৌরবে, যে গণিতের, যে সমাজনীতির—অর্থনীতির মহিমায় ভারতের নাম জগতের মুখে শুনা যায়, যে জন্য ভারত জগতের সম্মানার্হ, যে ধর্ম্মবিজ্ঞানে ভারত সমগ্র সভ্যজগতের আচার্য্য, সেই জ্ঞান, সেই শক্তি ব্রাহ্মণ-শক্তি। সেই শক্তি কুশিক্ষায়—কুদীক্ষায়, অনাচারে, কদাচারে, ব্যভিচারে, ভারতের ভবিষ্যৎ আশা কলঙ্কিত করিয়া, সেই কলঙ্ক-মসী স্বীয় গাত্রে মাখিয়া মলিন দীন ক্ষীণ পরাধীন হইয়াছে। বলিতে গেলে, এক কথায়—ভারতের জাতীয় জীবনের মূলদেশ দৃঢ়রূপে আঘাতিত, এমন কি—অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অবস্থিত। সুতরাং ভারতীয় বর্ত্তমান সমাজে শাস্ত্রোক্ত উভয়বিধ জাতিভেদই

বিড়ম্বনা ব্যতীত কিছু নয়। আমরা বর্ত্তমান কালোপযোগী জাতিভেদ বুঝিবার জন্য শাস্ত্রীয় জাতিভেদের যৌক্তিকতা ও মৌলিকতা এবং বর্ত্তমান জাতিভেদের মৌলিকতা বিচার করিব। পরে উহার পরিণাম চিন্তা করিয়া, এই প্রবন্ধের অবসানে উপস্থিত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলানন্দ ভারতী।

যশোহর।

আপস্তম্বীয় গৃহসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

ব্রহ্মচারীর কেশবপন ব্যাপার পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার প্রকার-বিশেষ প্রতিপাদিত হইতেছে। আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

দক্ষিণতো মাতা ব্রহ্মচারীবানড্হে শকৃৎপিণ্ডে যবান্ নিধায় তস্মিন্ কেশান্ উপযম্য উত্তরয়া উদুম্বরমূলে দর্ভস্তম্বে বা নিদধাতি। ৮

যে ব্রহ্মচারীর কেশবপন করা হইতেছে, তাহার মাতা অথবা অন্য কোনও ব্রহ্মচর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার দক্ষিণদিকে উপবেশন করিয়া, কোন পাত্রে বৃষগোময়পিণ্ড স্থাপন করিয়া, তাহাতে কতকগুলি যব ছড়াইয়া দিবেন; এবং ঐ পাত্রে কেশসমূহ উপযমন পূর্ব্বক "উপ্তায়কেশান্" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা উদুম্বরমূল বা কুশস্তম্বে কেশরাশি রক্ষণ করিবেন। কুমারের মস্তকমুণ্ডন ব্যাপারে মন্ত্রপাঠ আবশ্যক। যদি কুমারের মাতা এই কার্য্যে প্রস্তুত হন, তবে অপর যে কেহ তাঁহাকে মন্ত্র পড়াইয়া দিবেন। ব্রহ্মচর্য্যবান্ ব্রাহ্মণ হইলে, তিনি স্বাধ্যায়শীল, সুতরাং তাঁহাকে অপরের পড়াইবার অপেক্ষা নাই।—

স্নাতমগ্নেরুপসমাধানাদ্যাজ্যভাগান্তে পালাশীংসমিধমুত্তরয়াধাপ্য উত্তরেণাগ্নিং দক্ষিণেন পদাশ্মানমাস্থাপয়তি আতিষ্ঠেতি। ৯

কেশবপনানন্তর স্নাত অলঙ্কৃত বদ্ধশিখ সুবাসা কুমারকে [illegible] যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞোপবীত প্রদান করিবে। তৎপরে অগ্নির উপসমাধান হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ্যভাগহোম পর্য্যন্ত শ্রৌতসূত্র-প্রতিপাদিত কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া, পরে কুমারের দ্বারা পলাশনির্ম্মিত সমিধ প্রদান করাইবেন। আচার্য্য মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক (আযুর্দাদেব ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক) কুমারের দ্বারা সমিধ্ প্রদান করাইবেন। মতান্তরে কুমার মন্ত্রপাঠ করিবে, আচার্য্য তাহাকে পড়াইবেন। পাঠের পর অগ্নির উত্তরদিকে স্থাপিতশিলা দক্ষিণচরণের দ্বারা [illegible] আক্রমণ করিবেন; এই সময় আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া "আতিষ্ঠেমং" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন। সূত্রে "স্নাতং" এই কথাটীর দ্বারা যজ্ঞোপবীত প্রদানাদি সমস্ত কর্ম্মের কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, ইহা বৃত্তিকার [illegible] স্বামীর অভিপ্রায়। তিনি বলিতেছেন, "ততো যজ্ঞোপবীতিনং দেববজনমপরনতি

ইতি বোধায়নঃ, তত্সর্বস্তু উপলক্ষণং স্নাত-বচনং।" বোধায়ন বলেন, অনন্তর যজ্ঞো-পবীতাকে দেবযজনে উপনয়ন করিবে; সুতরাং এ সূত্রে দেবযজন উপনয়নের পূর্ব্বে যে স্নানের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই যজ্ঞোপবীতদানাদির উপলক্ষক। কেশবপনের পরেই স্নান করান, এবং সুবাস পরিধান পূর্ব্বক ব্রহ্মচারিরূপ ধারণ, ও তদনন্তর যজনস্থানে আচ্ছাদিত দেহে গমন, উপবীত ধারণ, এই সকল কার্য্যের পরেই সমিৎপ্রদানাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। [illegible] মধ্যে কুমারকে আচমন করাইবার কথা বলা হয় নাই; কিন্তু বোধায়ন-গৃহ্যসূত্রমতে তাহাও স্নানের পর যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া করিতে হইবে। বোধায়ন বলিতেছেন, "যজ্ঞোপবীতিনং অপ আচময্য দেবযজনমুপনয়ন্তি" অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতধারী ব্রহ্মচারীকে জল দ্বারা আচমন করাইয়া দেবযজন স্থানে লইয়া যাইবে।

অশ্মারোহণের সময় হরদত্তমতে আচার্য্য মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর দক্ষিণপদ দুই-হাতে ধরিয়া লইয়া তাহাকে শিলায় উঠা-ইয়া দিবেন। ব্যবহার-বুদ্ধিতে ইহা বড়ই বিসদৃশ দৃশ্য, তবে পরিবর্ত্তনশীল ব্যবহার-জগতে হয়ত কোনওকালে এরূপ [illegible] প্রচলিত ছিল। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে একথা বলেন নাই, তথাপি যখন হরদত্ত বলিয়াছেন, তখন হরদত্তের সমসাময়িক ব্যবহার-বৃত্তান্তে তৎকালীন সমাজের একটা চিত্র ইহা হইতে গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায় নহে। সাধা-রণের অবগতির জন্য হরদত্তের বাক্যটুকু উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। হর-দত্ত বলেন "আচার্য্যো মন্ত্রমুক্ত্বা দক্ষিণং পদং হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা অশ্মনি নিধাপয়তি।"

বাসঃসদ্যঃকৃত্তোতমুত্তরাভ্যামভিমন্ত্র্য উত্ত-রাভিস্তিসৃভিঃ পরিধাপ্য পরিহিতং উত্ত-রয়াভিমন্ত্রয়তে। ১০

"সদ্যঃকৃত্তোতবস্ত্র রেবতীস্ত্বা" ইত্যাদিমন্ত্র-দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া 'যা অকৃন্তন' ইত্যাদি তিনটী মন্ত্রপাঠ করিয়া পরিধান করাইবে এবং 'পরীদং বাসঃ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সদ্যঃ কৃত্তোতবস্ত্র পরিধানকারী ব্রহ্মচারীকে অভি-মন্ত্রিত করিবে। যে বস্ত্র সদ্যঃকৃত্তোত নামে এই সূত্রে অভিহিত হইয়াছে, তাহার সূত্র নির্ম্মাণ ও বয়নক্রিয়া একই দিনে করিতে হইবে, এইরূপ কথা হরদত্ত বলিয়াছেন।

সদ্যঃকৃত্তোত শব্দের অর্থ সদ্যনিষ্পন্ন সূত্রজাত বসন। এইরূপ বস্ত্র পরিধান করিতে সম্প্রতি দেখা যায় না। অস্মদ্দেশে ইহার স্থানে বহুমূল্য পট্টবস্ত্রই ব্যবহৃত হইতে চলিয়াছে; তবে পূর্ব্ববঙ্গে কোনও কোনও স্থানে "জোলার কাপড়" ব্যবহৃত হইয়া থাকে, শুনিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপনয়নার্থে ব্রহ্মচারীর পরিধেয়রূপে "জোলার কাপড়" পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয় কিনা, জানিতে পারিবেন; দীন লেখকের স্বদেশের অভিজ্ঞতা অত্যল্প মাত্রই সম্বল, সুতরাং শ্রুতমাত্র বিষয়ে বিশেষ নির্ভর করা চলে না।

মৌঞ্জীং মেখলাং ত্রিবৃতাং ত্রিঃ প্রদক্ষিণং উত্তরাভ্যাং পরিবীয়াজিনমুত্তরমুত্তরয়া॥ ১১॥

অনন্তর আচার্য্য কুমারকে মুঞ্জ-নির্ম্মিত মেখলা দ্বারা 'দুরুক্তাৎ' ইত্যাদি

মন্ত্রপাঠ সহকারে তিনবার প্রদক্ষিণ পরি-ধ্যান করিবেন। মেখলা ত্রিবৃতা, অর্থাৎ ত্রিরাবৃত্তা, তিন তারওয়ালা। এই মেখলা ধারণ করিবার মন্ত্র বলা হইল। অজিন অর্থাৎ কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম "অজিনং কৃষ্ণং ব্রাহ্মণস্য" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ধারণ করাই-বেন। মেখলা ও অজিনধারণ বিনিযুক্ত মন্ত্র কুমার পাঠ করিবেন, আচার্য্য স্বয়ং তাহাকে পড়াইবেন। মেখলা ধারণ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু কোথাও মুঞ্জ-নির্ম্মিত, কোথাওবা কুশনির্ম্মিত মেখলা ধারণ করা হইয়া থাকে। অজিনধারণ এখন সংক্ষিপ্ত ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। একটী সূত্ররচিত যজ্ঞোপবীতের একস্থানে একটী সর্ষপপরিমাণ চর্ম্মের টুক্‌রা বাঁধিয়া তাহাই ধারণ করা হয়। ঐ চর্ম্মটুকু প্রায়ই যজমানকে সংগ্রহ করিতে হয় না। পুরো-হিত ঠাকুরের পুঁথির গাত্রে উহার বড় একটা টুকরা সহস্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের যজ্ঞো-পবীত পবিত্র করিবার জন্য বহুকাল হইতেই বাঁধা থাকে, তদ্দ্বারাই কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যার হিন্দু-পত্রিকায় উপনয়ন-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, কৃষ্ণাজিন ধারণের উদ্দেশ্য এবং শাস্ত্রীয়তা কি। সম্প্রতি অজ্ঞাতবৃত্তান্ত চর্ম্মখণ্ড-বিশেষ সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া উহার গৌরব এবং কুসংস্কারের প্রাবল্য ও শাস্ত্রমর্ম্মের অবমাননার প্রমাণ স্পষ্টরূপে উপস্থিত করিতেছে। অধঃপতিত সমাজ আর কৌলিক মার্জ্জার-বন্ধন প্রথার অনুসরণ না করিয়া পারিবে কেন? উদ্দেশ্য ভুল হইলে কাজটা একটা খেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের সংস্কারানুষ্ঠানাদি বিকৃত হইতে হইতে একেবারেই কিছু নয় মত হইয়া পড়িয়াছে; আমাদের এদিকে লক্ষ্য নাই। শাস্ত্রমর্ম্ম উদ্‌ঘাটন, প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতির অনুসরণ ও তাহার মৌলিক সত্যানিষ্কার এখন পণ্ডিত-সমাজের কর্ত্ত-ব্যের বাহিরে গিয়াছে। এখন 'বিদায়' ভিন্ন অন্যদিকে লক্ষ্য নিক্ষেপের সময় নাই। হা আচার! তুমি এখনও হতভাগ্য সমাজের উপর করুণাকটাক্ষপাত কর।

উত্তরেণাগ্নিং দর্ভান্ সংস্তীর্য্য তেষেন-মুত্তরমগ্নেঃ...ঙ্গুলিমাত্মা অঞ্জলাবানীয় ...ত্রিঃ প্রোক্ষ্য উত্তরৈর্দক্ষিণে হস্তে গৃহীত্বা উত্তরৈ দেবতাভ্যঃ পরীদায়োত্তরেণ যজুষা উপনীয় সুপ্রজা ইতি দক্ষিণে কর্ণে জপতি ১২

অনন্তর আচার্য্য অগ্নির উত্তরদিকে কুশ বিস্তৃত করিয়া সেই কুশসমূহের উপরি-ভাগে উপনেতব্য কুমারকে অবস্থিত করা-ইবেন। তৎকালে আচার্য্য "আগন্ত্রা সমগন্মহীং" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবেন। কুমারকে কুশে বসাইয়া, নিজে ভূমিতে অবস্থান করিয়া, নিজের হস্তের অঞ্জলি জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া, সেই জলাঞ্জলি কুমারের হস্তে দিবেন। অনন্তর ঐ জলা-ঞ্জলি দ্বারা "সমুদ্রাদূর্ম্মিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তিনবার প্রোক্ষণ করিতে হইবে। (প্রোক্ষণ শব্দের অর্থ জল ছিটাইয়া দেওয়া।) অনন্তর ব্রহ্মচারীকে দক্ষিণহস্তে ধারণ করিয়া আচার্য্য "অগ্নিষ্টে হস্তমগ্রহীৎ" ইত্যাদি দশমন্ত্র পাঠ করিবেন। কুমার আচার্য্যের অনুমতিমতে স্বপাঠ্য মন্ত্র পড়ি-

দেন। তৎপরে তাঁহাকে "অগ্নয়েত্বা পরিদদামি" ইত্যাদি একাদশমন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতাদিগকে দান করিবেন। তদনন্তর "দেবস্যত্বা সবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উপনয়ন করিবে। হরদত্ত বলেন "যজুরুচ্চারণমেব তত্র ব্যাপারো নান্যঃকশ্চিৎ"। এখানে যজুর্বেদীয় "দেবস্যত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ ব্যতীত আর কিছুই করিতে হইবে না।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচারীকে এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গুরুকুলে লইয়া যাওয়া হইত; হরদত্তের সময়ে গুরুগৃহে বাস প্রথা বিলুপ্ত হইয়া স্বগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করা প্রচলিত হইয়াছিল, কাজেই তিনি লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মন্ত্রপাঠ ভিন্ন কিছু করিতে হইবে না।

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারীর দক্ষিণকর্ণে আচার্য্য 'সুপ্রজা' ইত্যাদি মন্ত্রজপ করিবেন। উপনয়ন কথার অর্থ গুরুগৃহে শিক্ষার্থ লইয়া যাওয়া, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সম্প্রতি অস্মদ্দেশে কোন কোন প্রদেশে গুরুগৃহবাস ও বেদপাঠ প্রচলিত নাই, তবে স্থানে স্থানে দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে দুইচারি লোকে বেদপারায়ণ দেখা যায়। ভারতের অন্যস্থলে ইহা প্রচলিত নাই; সুতরাং উপনয়ন এখন নাই, তবে উপনয়নকালে যে সকল যাগদানাদি ও পূজনাদি অনুষ্ঠিত হইত, ভারতের প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা অদ্যাপি তাহাদের যৎকথঞ্চিৎ বিকৃত নিয়ম সকল ও পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া ঐ প্রথার স্মৃতি জাগাইতেছেন।

দশমখণ্ড
সম্পূর্ণ।

একাদশখণ্ড, চতুর্থপটল।

এইখণ্ডে উপনয়নের প্রকৃত মৌলিক উদ্দেশ্য বিবৃত হইতেছে। উপনয়ন কেবল ব্রহ্মচর্য্য বা বেদাধ্যয়নের সূচনা করিয়া দেয়, তজ্জন্যই এই সংস্কারের এত গৌরব। জীবনে ব্রহ্মচর্য্যই পবিত্রতার জনক—ব্রহ্মজ্যোতির আবির্ভাবসম্পাদক। এতক্ষণ এই প্রধান কার্য্যের জীবনোন্নয়নের—জ্ঞানবিকাশের এই মূল রহস্যের পূর্ব্বকার্য্য সকলই কথিত হইতেছিল, এই সূত্রে সেই ব্রহ্মচর্য্য-বৃত্তান্তের পরিচয় দেওয়া হইবে। গুর্ব্বভিবাদন ইহার "প্রারম্ভ।" আপস্তম্ব দেখাইতেছেন,——

ব্রহ্মচর্য্যমাগামিতি কুমার আহ।১

কুমার গুরুগৃহে গিয়া" ব্রহ্মচর্য্যমাগাং" ইত্যাদি "সবিত্রাপ্রসূত" ইত্যন্ত মন্ত্র উচ্চরবে উচ্চারণ করিবে। হরদত্ত বলেন "আহ" কথাটীর অর্থ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করা।

পৃষ্টঃ পরস্য প্রতিবচনং কুমারস্য।২

'কোনামাসি' ইত্যাদি মন্ত্ররূপ আচার্য্যের প্রশ্নে, 'শ্রীঅমুকনামাস্মি' এইরূপ কুমার প্রতিবচন প্রদান করিবেন। আচার্য্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিবেন "কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি অমুক !" (ওহে! তুমি কাহার ব্রহ্মচারী? এইরূপ অর্থ।) ব্রহ্মচারী বলিবেন, "প্রাণস্যব্রহ্মচার্য্যস্মি।" (আমি প্রাণের ব্রহ্মচারী) এক কথায় সূত্রের অর্থ বলিতে হইলে বলিতে হইবে, "কোনামাসি" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তর বোধক চারিটী মন্ত্রের মধ্যে প্রশ্নবোধক মন্ত্র আচার্য্যের প্রশ্ন এবং উত্তরবোধক মন্ত্র কুমারের প্রত্যুত্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। গৃহ্যসূত্রে সাধারণতঃ মন্ত্রবিনিয়োগ-

প্রণালীর অনুসরণ করায় ক্রিয়া-প্রতিপাদনের ক্রম-ভঙ্গ হয়।

শেষং পরো জপতি। ৩

শেষ অর্থাৎ অনুবাক শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্র আচার্য্য পাঠ করিবেন। সুদর্শনাচার্য্যের-মতে শেষ অর্থ অনুবাকশেষৈকদেশ "বিষ্ণুশর্ম্মবতে দেব" ইত্যাদি "অনুসঙ্কর বিষ্ণুশর্ম্মন্" ইত্যন্ত মন্ত্রই আচার্য্যের পাঠ্য।

প্রত্যগাশীষং চৈনং বাচয়তি ৷ ৪

তৎপরে আচার্য্য কুমারকে প্রত্যগাশী-মন্ত্র পড়াইবেন। "অধ্বনামধ্বপতে" ইত্যাদি মন্ত্রই প্রত্যাগাশীর্মন্ত্র, এইরূপ হরদত্ত বলেন। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "অধ্বনাং" ইত্যাদি মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়ন-সমাপ্তি পর্যন্ত "যোগেযোগঃ" ইত্যাদি যে সকল প্রত্যাগাশীর্মন্ত্র অর্থাৎ আত্মগামী আশীর্ব্বাদ-বোধকমন্ত্র আছে, তাহা সকলই পাঠ করাইতে হইবে। আচার্য্য নিজে পাঠ করিবেন, কুমার শ্রবণ করিয়া অনুচ্চারণ করিবেন।

উক্তমাজ্যভাগান্তং। ৫

আজ্যভাগান্ত উক্ত করিয়া পশ্চাৎ যে প্রত্যাগাশীর্মন্ত্র মেখলা পরিধারণাদি ব্যাপারে উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই "ইয়ং দুরুক্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রও পাঠ করাইতে হইবে, ইহাই সূত্রার্থ।

অথৈনমুত্তরা আহুতীর্হাবয়িত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে। ৬।

প্রত্যাগাশীর্ব্বাচনের পর "যোগেযোগঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সংযুক্ত একাদশটী প্রধানাহুতি আচার্য্য কুমারের দ্বারা প্রদান করাইবেন। প্রকৃতপক্ষে কুমার ঐ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঐ একাদশটী প্রধান আহুতি দিবে আচার্য্য কেবল প্রযোজককর্ত্তা মাত্র। মন্ত্র পড়াইয়া দিলেই তাঁহার প্রযোজকত্ব সিদ্ধি হইল। একাদশ আহুতি শেষ হইলে, আচার্য্য স্বয়ংই জয়াদিহোম সম্পাদন করিবেন। এখানে ব্রহ্মচারীর দ্বারা করাইলে চলিবে না।

পরিষেচনান্তং কৃত্বা অপরেণাগ্নিমুদগগ্রং-কূর্চং নিধায় তস্মিন্ উত্তরেণ যজুষোপবেশ্যোপবিশতি। ৭

জয়াদিহোম ও পরিষেচনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া, [illegible] অপরদিকে কূর্চনামক কুশময় আসন স্থাপন করিয়া, 'রাষ্ট্রভৃদসি' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আচার্য্য ঐ কূর্চাসনে উপবেশন করিবেন।

পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্ঙাসীনঃ কুমারো দক্ষিণেন পাণিনা দক্ষিণং পাদমন্বারভ্যাহ সাবিত্রীংভো-অনুব্রূহীতি। ৮।

আচার্য্যের সম্মুখে প্রত্যঙ্মুখ উপবিষ্ট কুমার দক্ষিণকরদ্বারা আচার্য্যের দক্ষিণ-চরণ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে বলিবে, "সাবিত্রীংভোঅনুব্রূহি।" (সাবিত্রী মন্ত্রটি আমাকে একবার বলুন, এইরূপ অর্থ।) সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণই উপনয়নের দীক্ষাংশ। [illegible]তা অর্থ সূর্য্য অথবা জগৎপ্রসবকর্ত্তা [illegible]ঈশ্বর পরব্রহ্ম, তৎসম্বন্ধী মন্ত্রকেই সাবিত্রী মন্ত্র বলা সঙ্গত। আমরা দেখিতে পাই গায়ত্রী মন্ত্রই সাবিত্রী মন্ত্র নামে আখ্যাত হয়। এই মন্ত্রে সেই শ্রেষ্ঠাৎশ্রেষ্ঠতর জগৎ-প্রসবকর্ত্তার মহামহিম তেজঃ, মহিমা অপরূপ অলৌকিকজ্যোতি একমাত্র ধ্যেয় পদার্থ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই পরম

তেজঃ যে জীবুজালের বিবেকবুদ্ধির প্রণোদক, ইহাও ঐ মন্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, এজন্য এই মন্ত্রকে পণ্ডিতেরা সাবিত্রীমন্ত্রই বলেন। সাবিত্রী বেদত্রয়ের সারসংকলন। ইহাই সর্ব্বপ্রথম শ্রোতব্য এবং শিক্ষণীয়। বেদাধ্যায়ী বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের পরমজ্যোতির বিষয়ই সর্ব্ব প্রথমে জানিয়া, পরে বেদবিচার-বেদাধ্যয়নে ব্যাপৃত হইলে, কোনমতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন না, এইজন্যই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসারভূত ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। প্রকৃত বিদ্যা বা [illegible]শাস্ত্রের মতে ব্রহ্মজ্ঞান, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সেই উপদেশই অপেক্ষিত, অতএব সর্ব্বতোভাবেই প্রথমে সাবিত্রী শিক্ষা করা সঙ্গত। প্রথমে মূলতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে, আর কেহ সহসা ভ্রমে পতিত হয় না।

তস্মা অন্বাহ তৎসবিতুরিতি ॥৯

ব্রহ্মচারী সাবিত্রী শুনিতে চাহিলে, আচার্য্য তাহাকে "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি সাবিত্রী মন্ত্র অর্থাৎ সবিতৃদৈবত ঋক্ মন্ত্র উপদেশ দিবেন। এই "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্র কিরূপে পড়াইবেন, তাহার প্রণালী কথিত হইতেছে। প্রথম শিশিক্ষু কুমার একেবারে সমগ্র মন্ত্রটী হৃদ[illegible] করিতে পারিবে কিনা, এই আশ[illegible] উহা অংশ অংশ করিয়া ক্রমে ক্রমে শিখাইয়া, পরে সমগ্র মন্ত্র পাঠ করান উচিত বিবেচনা করিয়াই মহর্ষি আপস্তম্ব উহার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পচ্ছোঽর্দ্ধর্চ্চশস্ততঃ সর্ব্বাং। ১০।

প্রথমে পচ্ছঃ, অর্থাৎ পাদে পাদে পরিসমাপ্তি করিয়া। একপাদ একপাদ ভিন্ন ভিন্ন বারে উচ্চারণ করিয়া, পরে "অর্দ্ধর্চ্চশঃ" অর্থাৎ সমগ্র ঋক্‌টীর অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক একএকবারে উচ্চারণ করিয়া, অনন্তর সমগ্র মন্ত্রটী একেবারে উচ্চারণ করিতে হইবে। ইহাই "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের ক্রম।

এই পাঠের বিশেষ নিয়ম বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে,—

ব্যাহৃতীর্বিহৃতাঃ পাদাদিষ্বন্তেষু বা ।১১।

প্রথমে যেবার এক একপাদ করিয়া পাঠ করিতে হইবে, সেইবারে প্রত্যেক পাদের শেষে অথবা প্রথমে একএকটী ব্যাহৃতি সংযোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া পাঠের সময় এবং সমস্ত পাঠ কালে কিরূপে ব্যাহৃতিযোগ করিতে হইবে, তাহা এতৎসূত্রে মহর্ষি আপস্তম্ব বলিতেছেন।

তথার্দ্ধর্চ্চয়োরুত্তমাং কৃৎস্নায়াম্।১২

দ্বিতীয়বার পাঠকালে অর্থাৎ যেবার অর্দ্ধর্চ্চ অর্দ্ধর্চ্চ করিয়া পাঠ করিতে হইবে, সেবার অর্দ্ধর্চ্চ দুইটীর পূর্ব্বে বা পশ্চাতে প্রথম দুইটী ব্যাহৃতি যথাক্রমে যোগ করিয়া [illegible]ঠ করিতে হইবে। আর অবশিষ্ট তৃতীয় [illegible]াহৃতিটী সমগ্র মন্ত্রপাঠ সময়ে সংযোগ করিতে হইবে। প্রত্যেকবার পাঠকালেই সর্ব্বসারভূত প্রণব অর্থাৎ "ওঁ" এই বাক্যটী সর্ব্বাগ্রে যোজনা করিতে হইবে। এখন পাঠের রীতি হইল "ওঁ ভূঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং" "ওঁ ভুবঃ ভর্গোদেবস্য ধীমহি" "ওঁ স্বঃ ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ" এইরূপ

প্রথমপাদশঃ পাঠকালে। "ওঁ ভূঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি" "ওঁ ভুবঃ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" এইরূপ দ্বিতীয়বার পাঠসময়ে। তৃতীয়বার পাঠ সময়ে "ওঁ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।" এইরূপ ক্রম ঋগ্বেদীয়গণের সাবিত্রীপাঠে ব্যবহৃত হয়, অন্যবেদীয় প্রথায় শাখান্তরে ব্যাহৃতিপাঠে একটু বিশেষত্ব কদাচিৎ উপলব্ধ হয়, বিস্তারভয়ে সে সকল বিধান বিবেচিত হইল না। বৃত্তিকার হরদত্ত এইরূপ ক্রমপ্রণালী উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার বাক্য হইতেই আমরা রীতি অনুবাদ করিলাম। সুধীগণ জানিবেন, সুদর্শনাচার্য্য এখানে অন্যপ্রকার মত অবলম্বন করেন নাই, এইমতেই অনুমোদন করিয়াছেন।

কুমার উত্তরেণ মন্ত্রেণোত্তরমোষ্ঠমুপস্পৃশতে।১৩

অনন্তর সেই স্থানে উপবিষ্ট কুমার "অবুধ্নমসৌ" ইত্যাদি উত্তরমন্ত্র দ্বারা নিজের ওষ্ঠ উপস্পর্শন করিবে। মন্ত্রে যে 'অসৌ' শব্দটী রহিয়াছে, তাহার অর্থ প্রাণ। কুমার বা আচার্য্য কেহই এই 'অসৌ' শব্দের বাচ্য নহে। যদি কুমার হইত, তাহাহইলে নামোল্লেখ করা হইত, অর্থাৎ 'অসৌ' শব্দের স্থানে কুমারের নামটী দিবে করিয়া, সেই কুমার নামযুক্ত মন্ত্রটী পাঠ করিতে হইত। সূত্রের "উপস্পৃশতে" এই আত্মনেপদ বিধান ছান্দসত্বপ্রযুক্ত। বেদে সর্ব্বত্র ব্যাকরণ-নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। কেহ কেহ বলেন, বেদ অতি প্রাচীন ভাষা, জগতের যাবতীয় সভ্যজাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে রচিত গ্রন্থই বেদ। জগতে পুস্তক প্রণয়নের ইতিহাস লিখিতে গেলে হিন্দুর ঋগ্বেদকে সর্ব্বপ্রথমস্থানে উল্লেখ করিতে হইবে। এহেন বেদ রচনার কালে ব্যাকরণের নিয়ম বড়ই শিথিল ছিল। ভাষার প্রথমদশায় বা বর্দ্ধনশীল অবস্থায়, তাহা ব্যাকরণের শাসন মানিয়া চলিতে পারে না। বস্তুতঃ তখন ভাষার ব্যাকরণও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কাজেই বেদের ভাষা সর্ব্বদা ব্যাকণের নিয়মের ধার ধারিতে বাধ্য হয় না। অপর কেহ বলেন যে, সাধা[illegible] প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মদ্বারা বৈদিকভাষা শাসিত হয় না বটে, কিন্তু বৈদিকব্যাকণের দ্বারা উহা নিয়মিত হয়। আমরা দেখিতে পাই, প্রচলিত কলাপ, সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্ম, মুগ্ধবোধ, প্রক্রিয়াকৌমুদী, রত্নমালা, হরিনামামৃত, লঘুকৌমুদী এবং মধ্যকৌমুদী প্রভৃতি ব্যাকরণ দ্বারা যে সমস্ত বৈদিকপদ সাধিত হয় না, তাহারাই আবার পাণিনীয় ব্যাকরণের দ্বারা সমর্থিত হয়। সকল মতেই সামঞ্জস্য অল্পাধিক আছে।

কর্ণাবুত্তরেণ।১৪

অনন্তর কুমার "ব্রহ্মণ আণীস্থ" ইত্যাদি [illegible]পাঠ পূর্ব্বক এককালীন স্বকীয় কর্ণযুগল [illegible]হস্তে স্পর্শ করিবে। পূর্ব্বসূত্রের "উপস্পৃশতে" পদের সহিত এই সূত্রের অন্বয় করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

দণ্ডমুত্তরেণাদত্তে।১৫

"সুশ্রবঃ সুশ্রবসং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দণ্ডগ্রহণ করিবে। ব্রহ্মচারীর দণ্ডগ্রহণ প্রথা বর্ত্তমানকালে প্রচলিত রহিয়াছে, তবে

দণ্ডধারণের সময় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যকাল তিন রাত্রিতে শেষ হওয়ায়, প্রায় সর্ব্বত্রই তৎপরে দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এখনও সাতরাত্রি ঘরে থাকিবার প্রথা আছে।

কোন্ অধিকারীর দণ্ড কিরূপ কাষ্ঠজাত হইবে, তাহার সবিশেষ বিবরণ বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে।

পালাশো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য নৈয়গ্রোধস্কন্ধজোবাঙ্গ্রোরাজন্যস্য বাদর ঔদুম্বরো বা বৈশ্যস্য। ১৬

পলাশবৃক্ষজাত দণ্ড ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ধারণ করিবেন। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী স্কন্ধজ অবাচীনাগ্র ন্যগ্রোধবৃক্ষজাত দণ্ডগ্রহণ করিকরিবেন। বৈশ্যব্রহ্মচারী বদর বা ঔডুম্বর বৃক্ষজাত দণ্ড গ্রহণ করিবেন। বর্ণগত পার্থক্যের সহিত দণ্ডেরও পার্থক্য বিধান উক্ত হইল।

পার্থক্য কথনের পর এই সূত্রে যাহা বলা হইতেছে, তাহা অধিকারিবিশেষের জন্য নহে; এই বিধি সর্ব্বসাধারণ। এখানে বিধ র্থ করিতে হইলে অনুবাদ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ইষ্টসিদ্ধি করিতে হয়।

বার্ক্ষো দণ্ড ইত্যবর্ণ সংযোগেনৈকেউপদিশন্তি। ১৭

যজ্ঞীয় বৃক্ষবিকারজ দণ্ড কোনও বর্ণের সহিত সংযুক্ত নহে, অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণসাধারণ, এইরূপ কোনও কোনও আচার্য্য উপদেশ দিয়া থাকেন। বর্ণত্রয়ের মধ্যে পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিশেষভাব পরিহারপূর্ব্বক এই সূত্রের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

স্মৃতং চ ম ইত্যোত্তথাচরিত্বা ভরণে বরং দত্ত্বা উদায়ুষেত্যুত্থাপ্য উত্তরৈরাদিত্যমুপতিষ্ঠতে॥ ১৮

কুমার দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক সেইস্থানে উপবেশন করতঃ 'স্মৃতং চ ম' ইত্যাদি ব্রত সংকীর্ত্তন করিবে। এই 'স্মৃতং চ ম' ব্রতসংকীর্ত্তন মন্ত্র আচার্য্য কুমারকে পড়াইবেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী "গুরো! বরং তে দদামি" ইত্যাদি মন্ত্র আচার্য্যকে বর দিবেন। তৎপরে আচার্য্য কুমারকে "উদায়ুষা" ইত্যাদি মন্ত্রে উত্থাপিত করিবেন। "তদচক্ষুঃ" ইত্যাদি সূর্য্যাদৃশঃ" ইত্যন্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা আদিত্যোপস্থান করিতে হইবে। এই মন্ত্রসকল আচার্য্য পড়াইবেন, ব্রহ্মচারী পাঠ করিবেন। 'ণিচ্' প্রত্যয়ের অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে, প্রযোজকত্বরূপে আচার্য্যের কর্তৃত্ব-প্রতিপাদনও এখানকার লক্ষ্য নহে।

যং কাময়েত নায়মচ্ছিদ্যোতেতি তমুস্তরতো দক্ষিণে হস্তে গৃহ্ণীয়াৎ। ১৯

যে কুমার সমাবর্ত্তন (ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক গৃহগমনকালে সমাবর্ত্তন নামক হোম করিতে হয়।) পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে ছিন্ন হইবে না, অর্থাৎ বিপ্রযুক্ত হইবে না (অন্যত্র চলিয়া যাইবে না) বলিয়া আচার্য্য মনে বাঞ্ছা করিবেন, তাহার দক্ষিণহস্ত "যস্মিন্ভূতং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা গ্রহণ করিবেন। ছাত্র ব্রহ্মচারী অন্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে না যায়, সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত পূর্ণব্রহ্মচর্য্যকাল আমার নিকটই পড়িবে, এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে, আচার্য্য ঐ মন্ত্রপাঠ করিয়া শিষ্যের দক্ষিণহস্ত ধারণ করিবেন। প্রাচীনকালে শিষ্য বড় সম্মানের সম্পত্তি ছিল। শিষ্য যাহাতে অপরের শিষ্যত্ব গ্রহণ

করিতে না পারে, তাহার জন্য বৈদিক মন্ত্রাদি-চেষ্টাও করা হইত। শিখা ভাগিয়া না যায়, ইহা এখনও বেশ লক্ষ্য করিবার জিনিষ; যখন শিখ্যাই সম্বল ছিল, তখন যে উহা কত অধিক-মাত্রায় ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অধিক বেগ পাইতে হইবে না। ছাত্রসংরক্ষণ আবশ্যকও বটে।

ত্র্যহমেতমগ্নিং ধারয়ন্তি। ২০

ব্রহ্মচারীকে তিনদিবস পর্য্যন্ত উপনয়নাগ্নি ধারণ করাইবে।

ক্ষারলবণবর্জ্জনংচ। ২১

ক্ষারলবণাদিশূন্য ভোজন অর্থাৎ (তাৎপর্য্যাধীন) হবিষ্যান্ন গ্রহণ করাইবে।

ব্রহ্মচর্য্য-জীবন কঠোরতার সুযোগ্য শিক্ষাস্থল। মনোমত আহার্য্যগ্রহণ ও বিলাস-বাসনার চরিতার্থতা সাধন করিতে লাগিলে, মানব পৌরুষশক্তিহীন হইয়া ক্রমশঃ অলস অবস্থায় উপনীত হন এবং জীবনের উন্নতির আশা ভাসাইয়া দিতে বাধ্য হন। সুতরাং কর্ত্তব্যের কুটিল ও কণ্টকিত পথে পদার্পণ করিতে তিনি অপারগ হইয়া উঠেন। ব্রহ্মচর্য্য এইজন্য মানবকে শিক্ষা দেয় যে, কষ্ট-দুঃখকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, বিপদের প্রতিকূলে অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, স্বকার্য্য সাধন করিতে হইবে। আহার নিয়ম-সঙ্কোচ লাভ না করিলে, মানব ঔদ্ধত্য নামক রজোগুণের কার্য্য অতিক্রম করিয়া ধীর, স্থির, শান্তিপ্রিয়তারূপ সাত্ত্বিক-গুণের অধিকারী হইতে পারেন না। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী এখানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। প্রথমবর্ষের হিন্দু-পত্রিকায় "ব্রহ্মচারীর প্রতি গোভিলের উপদেশ" নামক প্রবন্ধে উহা বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। সে সকল প্রবন্ধে ঐ সকল নিয়মের বৈজ্ঞানিক মৌলিকতা সম্বন্ধেও কিছু কিছু সাধারণ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ সেই সংখ্যা দর্শন করিলেই জানিতে পারিবেন। এখানে সে বিষয়ে আমরা বিরতিলাভ করিলাম।

পরিষেতি পরিমৃজ্য তস্মিন্নুত্তরৈর্মন্ত্রৈঃ সমিধ আদধ্যাৎ। ২২

"পরিত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উপনয়নাগ্নির চতুর্দ্দিকে জলদ্বারা মার্জ্জন করিয়া, "অগ্নয়ে সমিধং" ইত্যাদি দ্বাদশমন্ত্র দ্বারা দ্বাদশখানি সমিধ অগ্নিতে প্রদান করিবে। এই সমিৎপ্রদান কার্য্য নিত্যকর্ম্ম। হরদত্ত-মতে প্রত্যহই দ্বাদশখানি সমিৎপ্রদান করিতে হইবে। উপনয়নাগ্নিধারী ব্রহ্মচারীর উপনয়নাগ্নিতে এই হোমকার্য্য সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

এবমন্যস্মিন্নপি। ২৩

অন্য অগ্নিতেও এই সমিৎপ্রদান করিতে হইবে। উপনয়নাগ্নি চিরকাল ধারণ করাই কর্ত্তব্য; অপারগ হইলে, কেবল তিন দিনেই চলিবে। পূর্ব্বে যে তিনদিন ধারণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অপারগতা পক্ষে বুঝিতে হইবে। যাঁহারা নিত্য উপনয়নাগ্নি ধারণ করিবেন, তাঁহারা তিন দিন ঐ উপনয়নাগ্নিতে সমিধ্ দিবেন, পরে অন্য অগ্নিতে সমিধ্ দিবেন। যে অগ্নিতে হউক না কেন, সমিৎপ্রদান নিত্যকর্ম্ম, উহা করিতেই হইবে। উপনয়নাগ্নি ধারণ করা হয়, তাহাই;

নচেৎ অন্ন আঁখিতে দিলেও চলিবে। ফলে সমিধ্ দেওয়াটা বাদ না পড়ে।

ক্রমশঃ—

তীর্থপদাশ্রিতস্য কস্যচিৎ।

(বেদবিদ্যালয়, যশোহর।)

আত্মজ্ঞান।

জীবাত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র, ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। স্থূল দেহের সহিত যেমন তাঁহার সম্পর্ক নাই, সেইরূপ সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ নাই। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমষ্টিকে 'সূক্ষ্ম-দেহ' কহে এবং আদ্য-উপাদান-স্বরূপিণী অব্যক্ত-প্রকৃতিকে 'কারণ-শরীর' কহে। অতএব স্থূলদেহ জীবাত্মা নহেন; সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদিও জীবাত্মা নহেন। কেহ কেহ মন-বুদ্ধিকে জীবাত্মা বলিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু মহর্ষি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে ইহা মীমাংসিত হইয়াছে যে, মনোবুদ্ধি, জীবাত্মারূপ কর্ত্তার করণমাত্র; সুতরাং মনো-বুদ্ধ্যাদি সহিত সূক্ষ্ম দেহ এবং প্রকৃতি বা স্বভাবরূপী কারণ-দেহও জীবাত্মা নহেন। উক্ত কোনরূপ দেহ তাঁহার উপাদান নহে এবং তিনিও কোনরূপ দেহের উপাদান নহেন। মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা প্রভৃতির স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ-দেহ তাঁহার স্বজাতীয় ও আত্মীয় স্থান নহে। সেই সব দেহ হইতে তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবাত্মা স্বতন্ত্র এবং সে প্রত্যেক দেহই অনাত্মা। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোন জীবের দেহ, বৃক্ষাদি কোন স্থাবর পদার্থের দেহ, অথবা দৈব ও আসুরিক কোন মূর্ত্তি জীবাত্মা নহে। জীবাত্মা, জন্ম-বৃদ্ধি-অপক্ষয়-পরিণামশূন্য এবং অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী। রথচক্রের নাভিদেশে অর সকল যেমন প্রতিষ্ঠিত থাকে, জীবাত্মা সকল সেইরূপ ভূতেন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত কলার অর্থাৎ করণের সহিত পরমাত্মাতে চিরপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক সৃষ্টি-কালে তাঁহারা ঐ সকল কলার সহিত সেই ব্রহ্মচক্রে প্রকটিত ভাবে ঘূর্ণামাণ হন, এবং প্রত্যেক প্রলয়কালে সেই চক্রেতেই অপ্রকটিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এই প্রকটাবস্থা উপলক্ষে তাঁহাদের জন্ম এবং তাঁহাদের হৃদয়ে অন্তর্যামী, চিদাভাস বা আভাস-চৈতন্যরূপে পরমাত্মার অনুপ্রবেশ পরিকল্পিত হয়; নতুবা পরমার্থতঃ তাঁহাদের জন্ম নাই এবং পরমার্থতঃ জ্যোতিঃ-সম্পন্ন নয়নের ন্যায় তাঁহারা নিত্যকাল কূটস্থ ব্রহ্মের রত্নকল্প চিদাভাস সমন্বিত। এই পরমাত্মা ও জীবাত্মার আত্মীয় সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়তত্ত্ব এবং প্রাকৃত-বুদ্ধি-যুক্তির অগম্য। জীবাত্মার ন্যায় ঐ সমস্ত উপাধির আদি-বীজস্বরূপিণী প্রকৃতিও ব্রহ্মচক্রের অন্তর্গত।

বতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, কিন্তু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব।

"তদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে।"

সেই একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান প্রতিপাদিত হয়। যে জীবাত্মার ঐ ব্রহ্মচক্রে, অর-স্বরূপে পরিভ্রমণ সাঙ্গ হয়, তিনি ঐ চক্রের নাভিদেশে স্থান লাভ করেন; আর তাঁহাকে ঘূর্ণামান হইতে হয় না। ইহাই শান্তি;

ইহাই মোক্ষ। ইহারই নাম ব্রহ্মভাব। এই ব্রহ্মভাব প্রত্যেক মুক্ত আত্মার পক্ষে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও প্রলয়ের মহানন্দময় মহা জাগ্রত অবস্থা। যদিও সমস্তই ব্রহ্ম, কিন্তু যতদিন চক্রে পরিভ্রমণ, ততদিন আত্মহারা হইয়া, জীব, প্রকৃতিকে আত্মস্থে বরণ করেন; কেননা প্রকৃতি ফল-ফুলে পরম শোভাময় এবং দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সচেতন উপাধি দ্বারা পরমসুখের প্রস্রবণ। এই-রূপে আত্মতত্ত্ব রূপ নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া এবং আত্মস্বরূপ নিবাসে নিরাশ হইয়া, জীবাত্মা প্রবাসে ভ্রমণ করেন। আত্ম-তত্ত্বের অন্বেষণ করেন না। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও সুখ-সম্পদ-সম্বন্ধাধীন তিনি আপনাকে কর্ত্তা-ভোক্তা রূপে অভিমান করেন। কিন্তু যখন আত্মরতি নিবন্ধন প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-জ্ঞান জন্মে, দেহ আত্মা নহে, এই বিবেক-জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম হয়, সর্ব্বপ্রকার ফলভোগে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং "আমি হই—আমি করি" এই অভিমান নিদূরিত হয়, তখন জীবাত্মা আপনার উৎসস্বরূপ একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ভূমা পরমাত্মাতে আত্মবুদ্ধি করেন। পরমাত্মাই জীবাত্মার আত্মা, জগ-তের আত্মা, জগদ্‌যোনি, সকল আত্মার একাধার ও মহাসম্ভাব। জীবাত্মা, এইরূপে দেহাত্মজ্ঞান ও নানাপ্রকার দেহসম্বন্ধীয় জীবভাব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, বিসর্জন দিয়া, পরমাত্মাকে যে আত্মধাম ও আত্ম রূপে জ্ঞান করেন, সেই জ্ঞানের নাম আত্মজ্ঞান, আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান।

(২) কেবলমাত্র জীবাত্মার অমরত্ববোধ বা লোকান্তরে পরিভ্রমণের বিশ্বাস আত্ম-জ্ঞান নহে। কেননা, সে জ্ঞানে মোক্ষ হয় না। জীবাত্মাতে ঐহিক পারত্রিক কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাঁহার স্বীয় হৃদয়-গুহাতে আত্মারূপে ব্রহ্মের স্বয়ম্প্রকাশ-অধিষ্ঠান দৃষ্ট হয়। ঐ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, আত্মপ্রত্যয়সার, এবং ব্রহ্মাত্মরূপ পুরাতন সম্পত্তি। উহা "জীবাত্মকোষে ছিল না, কোন প্রকার যত্ন বা ক্রিয়া দ্বারা দেশান্তর হইতে আনিলাম" এমন নহে; সুতরাং উহা কোনরূপ পুরুষকার দ্বারা উৎপাদ্য বা অবতরণীয় নহে। আর এমনও নহে যে, অ[illegible] বা যত্নের ত্রুটিতে উহা মলিন-ভাবে আছে, আমি গুণাধান ও সংস্কার দ্বারা ইহাকে মাজিয়া ঘষিয়া রসান দিয়া নির্ম্মল করিয়া লইলাম; সুতরাং উহা বিকার্য্য বা সংস্কার্য্য নহে। "আত্মাতে আত্মাত্ম করা ব্রহ্মের সাধন।" (রাঃ মোঃ রায়) তাহাই জীবাত্মার পরম পুরুষার্থ।

"ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানে জাতে সতি-
সর্ব্বাত্মনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ।"

একমাত্র ব্রহ্মই আত্মা, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞান-নিবৃত্ত হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন সাধন দ্বারা জীবাত্মার কোনরূপ সংস্কার ও উন্নতি করা হয় না। জীবাত্মা স্বরূপতঃ নির্ম্মল। প্রকৃতি ও দেহরূপ আবরণ সরিয়া গেলেই তাঁহার নির্ম্মল তত্ত্ব ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে মগ্ন হইয়া যায়। তখন এক অদ্বয় আত্মজ্ঞান শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ও দ্বিধাশূন্য আনন্দরূপে প্রতিভাত হন। ঐ আত্মজ্ঞান শুদ্ধ, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অপাপবিদ্ধ, অশরীরী, সর্ব্বগত, নিত্য, প্রপঞ্চোপশম, এক, অদ্বিতীয়। উহা কর্তৃ,

ভোক্তৃ, দ্রষ্টা, দৃশ্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক লক্ষণাক্রান্ত নহে। কিন্তু সৃষ্টি ও প্রকৃতির অতীত এক স্বতন্ত্র আনন্দনিকেতন।

(৩) এত বড় মহা কর্ম্মস্থান যে ভারত কর্ম্মভূমি, যেখানে দ্বিজাতি প্রভৃতি জাতিদিগের অসংখ্য অসংখ্য বৈদিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি শাখা সম্প্রদায় সকল, হিমাদ্রি হইতে কুমারিকাখণ্ড পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম সাগরাবধি পূর্ব্বসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এমন ক্রিয়াক্ষেত্রে, ক্রিয়াসংস্পর্শবিহীন আত্মজ্ঞানের উপদেশ স্থান পাইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য! কিন্তু তাহার বলবৎ [illegible] আছে। তাহা এই যে, ভারতবর্ষে বেদের অসামান্য সম্মান। কর্ম্মী ও জ্ঞানী বেদশাস্ত্রকে সমভাবে "শব্দ-ব্রহ্ম" অভিধানে আদর করেন। কর্ম্মই হউক আর জ্ঞানই হউক, তাহাকে অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য কাহারই নাই। তবে অধিকার বিশেষে যথা যেমন প্রয়োজন, উহার প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কর্ম্মীগণ অনাদর না করিয়া, ঐ অক্রিয়াপর আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানকে স্ব স্ব অধিকারে ক্রিয়ার লক্ষণ মধ্যে গ্রহণ করেন, এবং অনেক জ্ঞানীও সেইরূপ অখিল কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানে পরিসমাপন করেন। ভগবদ্গীতা—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" হে পার্থ! ফল সহিত শাস্ত্রবিহিত সকল ক্রিয়াই জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে। কিন্তু উপনিষৎ শাস্ত্রসমূহ ও তাহার মীমাংসা স্বরূপ বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানকে ক্রিয়াসংস্পর্শরহিত রূপেই উপদেশ করেন। ইহাই কর্ম্ম, দেহ ও প্রকৃতিসংস্পর্শশূন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি।

(৪) ঐ সমস্ত শাস্ত্রের মীমাংসা এই যে, আত্মজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ নহে। যজ্ঞ, দান, ব্রত, অনশন, তপস্যা প্রভৃতি বৈদিকী বা তান্ত্রিকী ক্রিয়াই হউক, আর পুরুষকাররূপ সাংসারিক ক্রিয়াই হউক, তাহার ফল প্রকৃতির অধিকারে ইহকাল বা পরকালে শরীর, ইন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা ভোগ হয় এবং জীবাত্মা সেই সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা ও ফলভোক্তা। কোন ফলই শরীর ও মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ ব্যতীত জীব ভোগ করিতে পারেন না। যত প্রকার ভোগ আছে, স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, পার্থিবই হউক আর স্বর্গীয়ই হউক, তাহার ভোক্তাস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়মনোযুক্ত জীবাত্মার প্রয়োজন। কিন্তু তাদৃশ অবস্থাপন্ন জীব দেহাদিতে আত্মজ্ঞান এবং স্বীয় কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিস্মৃত হইতে পারেন না। শ্রুতি কহেন, কেবল ব্রহ্মকে আত্মজ্ঞান জন্মিলেই দেহাদি উপাধি বিগত হয়। সেই আত্মজ্ঞানোদয়ে সর্ব্বপ্রকার দেহেন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি, ফলকামনা, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, পরব্রহ্মজ্ঞানানন্দ-সুধার্ণবে বিলীন হইয়া যায় এবং জীবাত্মা তখন জীবত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় অসাধারণ আত্মউৎস স্বরূপ ব্রহ্মেতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করেন। অতএব আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে, আর কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও কর্ম্মফল জন্মে না এবং কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও ক্রিয়া দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না। এতাবতা ক্রিয়া ও আত্মজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাব নাহি।

(৫) ক্রিয়ার লক্ষণ এই যে, তাহা

বিধিপরতন্ত্র, কর্ত্তৃতন্ত্র এবং মানসব্যাপারা-ধীন। শাস্ত্র-বিধি অনুসারে ক্রিয়া আচরিত হয়, অতএব তাহা বিধিপরতন্ত্র। কর্ত্তার ইচ্ছাই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, অতএব তাহা "কর্ত্তৃতন্ত্র"। ধ্যান-ধারণা-উপাসনা-প্রার্থনা প্রভৃতি উপাসকের মানসিক কর্ত্তৃত্বাধীন, অতএব তাহা "মানসব্যাপারাধীন"। ক্রিয়া কখনও বস্তুতত্ত্বকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু কেবল মানসিক সাধনা এবং শাস্ত্রবিধির উত্তরসাধকতা অনুসারে সাধিত হয়। অতএব ক্রিয়া বেদের দাসত্ব, বিধিকৈঙ্কর্য্য এবং কর্ত্তৃতন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানের লক্ষণ এই যে, তাহা বস্তুতত্ত্বস্বরূপ। সূর্য্যের প্রকাশ যেমন সত্যবস্তু-স্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশ সূর্য্যপরতন্ত্র; কোন পার্থিব আলোক বা মানসকর্ত্তৃত্ব তাহা প্রকাশ করিতে পারে না; সেইরূপ, জ্ঞান স্বয়ম্প্রকাশ পরমাত্মরূপ পরম সত্যবস্তুর অধীন। তাহা মানসব্যাপার, বেদবিধি ও ক্রিয়ার অতিক্রান্ত। শাস্ত্রানুসারে যাহা জ্ঞান, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞান নহে। তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বয়ম্প্রকাশ। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা। তিনিই জীবের মুখ্যাত্মা।

(৬) দেহ হইতে যে আত্মা স্বতন্ত্র, এই পরমার্থতত্ত্ব কেবল জীবের ব্রহ্মেতে আত্মজ্ঞান জন্মিলেই অনুভূত হয়; নতুবা পরমাত্মাকে ব্যতিরেক করিয়া, বহু তর্ক-যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা জীবাত্মার অমরত্ব এবং এই মর্ত্ত্য শরীরান্তে তাঁহার স্থায়িত্ব নিরূপণ করিলেও, তাঁহার দেহ-সম্পর্কবিবর্জ্জিত নিরবচ্ছিন্ন পরম কৈবল্য-সত্তা অনুভূত হইতে পারে না। কেননা, এই মর্ত্ত্যদেহের অভাবেও তাঁহার মনো-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় রচিত সূক্ষ্ম কলেবর এবং প্রকৃতিরূপী কারণ-শরীর তাঁহার সহগামী হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ঐ সূক্ষ্ম কলেবর ও কারণ-শরীর অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অসংখ্য স্থূল শরীরের বীজস্বরূপ। অতঃপর জীবাত্মা দেহ-বিনাশের উত্তরকালে, দেহ হইতে উড্ডীন হইলে, নানা সম্প্রদায়ের বাদীরা তাঁহাকে নানাপ্রকার দেহ ও অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন, এবং তাঁহার অনেকরূপ সুখ-দুঃখ কল্পনা করেন। জীবাত্মার এই সকল ঔর্দ্ধদেহিক কোন অবস্থা হইতে তাঁহার চূড়ান্ত দেহবিরহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। তাঁহাকে পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেই, মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়াদি-সূক্ষ্মদেহ ও প্রাকৃতিক স্নেহ-মমতা তাঁহাকে অপহরণ করিবে; এবং তিনি মহা মোহে তাহাদের সমষ্টিকে আমি ও আমার বলিয়া জ্ঞান করিবেন। অতএব তাঁহার তাদৃশ অবস্থাপন্ন অমরত্ব প্রকৃত অমরত্ব নহে; বিশুদ্ধ দেহবিহীন ভাব নহে।

(৭) কেবল যে জীবাত্মার পরমাত্মাতে আত্মজ্ঞান জন্মে, তিনি স্বকীয় পরকীয় [illegible] কোন দেহকে আত্মজ্ঞান করেন না; কেননা পরস্পর দুটি বিরুদ্ধ জ্ঞান জীবাত্মার পক্ষে এক কালে সম্ভব হয় না। যদি পরমাত্মাকে আত্মজ্ঞান করেন, তবে দেহ-মনাদিকে আত্মজ্ঞান করিতে পারেন না; আর যদি দেহাদিকে আমি বলিয়া ভাবেন, তবে তো পরমাত্মা পরিত্যক্ত হইলেন। অতএব পরমাত্মাতে জীবের যে আত্মজ্ঞান, তাহাই

বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব। সেইজন্ত আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক যতশাস্ত্র আছে, সর্ব্বত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একাধারে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাকে দ্বৈতবাদই বল, আর অদ্বৈতবাদই বল, কিন্তু এ আত্মজ্ঞান মহামোক্ষস্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞান মাত্র। জীবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব একীকৃত না হইলে মোক্ষ হয় না। আর ব্রহ্মেতে আত্মজ্ঞান জন্মিলে, ব্রহ্মই জীবাত্মার অবলম্বন স্বরূপ একমাত্র আত্মারূপ প্রাধান্ত লাভ করেন। সেই প্রাধান্তের গ্রহণে মোক্ষপ্রাপ্ত নিরুপাধিক জীবাত্মারও গ্রহণ সিদ্ধ হয়। মোক্ষাধিকারে "আত্মজ্ঞান" শব্দ প্রকৃতির সহিত দেহাদি-উপাধি-বিনির্ম্মুক্ত আত্মার একমাত্র অবলম্বন ও পরমলোক স্বরূপ কেবল পরমাত্মাকে প্রতিপাদন করে। কিন্তু ক্রিয়ার অধিকারে উহা কেবল সোপাধিক জীবাত্মাকে বুঝায়। ফলে পরমাত্মার আত্মজ্ঞানই সত্য, আর জীবাত্মজ্ঞান, নানাপ্রকার ক্রিয়া, কারক, ফল, কল্পনা অধ্যারোপিত বিধায় অসত্য। কেননা, পরমাত্মাকে লাভ করিলে এ সমস্ত আরোপ তিরোহিত হয়। অতএব মোক্ষশাস্ত্রে জীবাত্মজ্ঞানকে কোথাও আত্মজ্ঞানরূপে গ্রহণ করেন নাই। কেবল উপাধিকল্পনাশূন্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকেই আত্মজ্ঞানরূপে মানিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

২৩।৩ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।)

চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ।

(শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতঃ।)

(১ম হইতে ১২শ শ্লোকে কবি শ্রীমতী রাধিকার রূপবর্ণনচ্ছলে তাঁহার স্তুতি করিতেছেন।)

(১)

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
মণিস্তবকবিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গনাফণাম্॥

নব গোরোচনা সম তব কলেবর
গৌরবর্ণে কিবা শোভা পায় নিরন্তর।
তোমার সুরম্য-বেণী-কৃষ্ণসর্পী ফণা
মণিগুচ্ছ বলিয়াই হয় বিবেচনা।
রম্য নীলপদ্ম সম তোমার বসন;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(২)

উপমানঘটামানপ্রহারিমুখমণ্ডলাম্।
নবেন্দুনিন্দিভালোদ্যৎকস্তূরীতিলকশ্রিয়ম্।

সেই পদ্ম সেই চন্দ্র, কিংবা আর আর
যত কিছু বস্তু আছে উপমা দিবার,
সেই সবাকার গর্ব্ব খর্ব্বের কারণ,
বিরাজ করিছে তব সুন্দর বদন;
অষ্টমীর চন্দ্র-নিন্দি-ললাট উপর
কস্তূরী-তিলক-বিন্দু থাকি নিরন্তর
তোমার অঙ্গের শোভা করিছে বর্দ্ধন,
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(৩)

ভ্রূজিতানঙ্গকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলিম্।
কজ্জলোজ্জলতারাজচ্চকোরীচারুলোচনাম্॥

তোমার দুইটী ভুরু রম্য অতিশয়,

মদনের ধনুকেও করে পরাজয় ;
তুমি সে ভ্রূভঙ্গ-বাণ বারেক হানিয়া,
সে ত্রিভঙ্গ শ্যামে রাখ বিমুগ্ধ করিয়া !
পরম শ্যামল—পুনঃ পরম চঞ্চল
তোমার অলকাবলী শোভে অবিরল ;
কজ্জলে উজ্জ্বল তব নয়ন-চকোরী—
যত দর্শনীয় বস্তু—সব পরিহরি,
শুধু কৃষ্ণচন্দ্রে লক্ষ্য রাখে সর্ব্বক্ষণ ;
বৃন্দাবনেশ্বরি ! বন্দি তোমার চরণ !

(৪)

তিলপুষ্পাভনাসাগ্রবিরাজদ্বরমৌক্তিকাম্ ।
অধরোদ্ধূতবন্ধূকাং কুন্দালী-বন্ধুরদ্বিজাম্ ॥
তিলপুষ্প সম তব নাসাগ্রে নিয়ত
কনক-জড়িত-মুক্তা রহে সুশোভিত ;
বন্ধূক-কুসুমে তব লোহিত অধর
রাখিয়াছে পরাজিত করি নিরন্তর ;
কুন্দমালা সম তব বন্ধুর দশন,
বৃন্দাবনেশ্বরি ! বন্দি তোমার চরণ !

(৫)

সরত্নস্বর্ণরাজীবকলিকাকৃতকর্ণিকাম্ ।
কস্তূরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্ ॥
হীরকাদি-রত্ন যুত স্বর্ণ-রচিত
পদ্মকলি কর্ণে তব শোভে অবিরত ;
অধরের অধোভাগে তব নিরন্তর
কস্তূরী-তিলক-বিন্দু শোভে মনোহর !
রত্নময় কণ্ঠহার তোমার ভূষণ ;
বৃন্দাবনেশ্বরি ! বন্দি তোমার চরণ !

(৬)

দিব্যাঙ্গদপরিষ্বঙ্গলসদ্ভুজমৃণালিকাম্ ।
বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাচিকাম্ ॥
সুন্দর কেয়ূরে ভুজ-মৃণাল তোমার—
পরম সুন্দর শোভা ধরে অনিবার।
ইন্দ্রনীল-মণি-যুত পরম সুন্দর
তোমার বলয় মণিবন্ধের উপর
করিতেছে সুমধুর শব্দ অনুক্ষণ,
বৃন্দাবনেশ্বরি ! বন্দি তোমার চরণ !

(৭)

রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসিবরাঙ্গুলিকরাম্বুজাম্ ।
মনোহরমহাহারবিহারিকুচকুট্মলাম্ ॥
তব কর-কমলের অঙ্গুলি সকল
রত্নময় অঙ্গুরীতে শোভে অবিরল ।
মহামূল্য মুক্তাহার পরম সুন্দর—
তোমার কমল-কলি-কুচের উপর
পড়িয়া করিছে [illegible] শোভা বিবর্দ্ধন,
বৃন্দাবনেশ্বরি ! বন্দি তোমার চরণ !

(৮)

রোমালিভুজগীমূর্দ্ধরত্নাভতরলাঙ্কিতাম্ ।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাম্ ॥
সর্পীর মস্তকে শোভে মাণিক যেমন,
সেইরূপ রোমাবলী তব সর্ব্বক্ষণ—
হার-মধ্য-মণি-যোগে নিত্য শোভা পায়,
তব ক্ষীণ কটিদেশ পাছে ভেঙ্গে যায়,
ত্রিবলী লতায় বদ্ধ আছে একারণ ;
বৃন্দাবনেশ্বরি ! বন্দি তোমার চরণ !

(৯)

মণিসারসনাধারবিস্ফারশ্রোণিরোধসম্ ।
হেমরম্ভামদারম্ভস্তম্ভনোরুযুগাকৃতিম্ ॥
তোমার বিশাল কটি-তটের উপর
মণিময় চন্দ্রহার শোভে নিরন্তর ;
সুবর্ণ-রম্ভার গর্ব্ব করিবে বিনাশ,
তব উরু-যুগ করি এই অভিলাষ,
আপনার শোভা সদা করে প্রদর্শন ;
বৃন্দাবনেশ্বরি ! বন্দি তোমার চরণ !

(১০)

জানুদ্যুতিজিতফুল্লপীতরত্নসমুদ্গকাম্।
শরন্নীরজনীরাজ্যমঞ্জীরবিরণৎপদাম্॥

ক্ষুদ্র সম্পুটক পীতরত্ন-বিনির্ম্মিত—
তোমার জানুর কাছে হয় পরাজিত;
পরম সৌন্দর্য্যময় তব পদদ্বয়
শরতের কোকনদে করে পরাজয়।
করিছে চরণ তব নূপুর-স্বনন;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(১১)

রাকেন্দুকোটিসৌন্দর্য্যজৈত্রপাদনখদ্যুতিম্।
অষ্টাভিঃ সাত্বিকৈর্ভাবৈর[illegible]ীকৃতবিগ্রহাম্॥

পূর্ণিমার কোটি চন্দ্রে যে শোভার স্থিতি,
তাহাকেও জিনে তব পদ-নখ-দ্যুতি;
শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি পানে রাখিলে নয়ন,
যে অষ্ট সাত্বিক ভাব দেয় দরশন,
তাহাতে ব্যাকুল হয় তব দেহ-মন;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(১২)

মুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাম্।
ত্বামারব্ধপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি॥

হানিলে কৃষ্ণের পানে কটাক্ষের বাণ,
মদন-তরঙ্গে তুমি হও ভাসমান;
তোমার এরূপ ভাব হেরিলে নয়নে,
পরম আনন্দ হয় শ্রীকৃষ্ণের মনে;
তুমি বৃন্দাবনেশ্বরী, বলে ত্রিভুবন,
ভক্তিভরে বন্দি আমি তোমার চরণ।

(১৩শ হইতে ১৭শ শ্লোকে সাধক কবি শ্রীমতী রাধিকাকে বিনয় সহকারে সম্বোধন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন।)

(১৩)

অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাবমাধুরীবিহ্বলান্তরে।
অশেষনায়িকাবস্থাপ্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে॥

তব স্থায়ী রতি-রস-ভাব নিরন্তর
বিহ্বল করিয়া[illegible] তোমার অন্তর।
নায়িকা নারীর যে যে অষ্ট ভাব রয়,
সে সব তোমার যবে উপস্থিত হয়,
তখন তোমার কথা কি বলিব আর,
কর নানা চমৎকার বিলাস-সঞ্চার!

(১৪)

সর্ব্বমাধুর্য্য-বিঞ্জোলীনির্ম্মঞ্ছিতপদাম্বুজে।
ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে॥

ধন্য ধন্য ধন্য তব চরণ-কমল,
সর্ব্ব মাধুর্য্যের স্থিতি যথা অবিরল।
তব পদ-নখ-[illegible] যে শোভা সতত,
লক্ষ্মীও তাহার জন্য সদা লালায়িত!

(১৫)

গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দসীমন্তোত্তংসমঞ্জরি।
ললিতাদিসখীযূথজীবাতুস্মিতকোরকে॥

গোকুল নগরে শত শত চন্দ্রাননা
বসতি করেন সদা গোপের ললনা;
সেই সব ললনার তুমিই সুন্দরি!
সীমন্ত-ভূষণ-[illegible]কুসুম-মঞ্জরী।
তব মৃদু-মন্দ হাস্য-কলিকার বলে
ললিতাদি সখীগণ বাঁচে ভূমণ্ডলে।

(১৬)

চটুলাপাঙ্গমাধুর্য্যবিন্দূন্মাদিতমাধবে।
[illegible]তপাদনখস্তোমকৈরবানন্দচন্দ্রিকে॥

তব কটাক্ষের বিন্দুমাত্র মধুরস
কৃষ্ণকে করিয়া দেয় আনন্দে অবশ;
বৃষভানু-রাজ-কীর্ত্তি-রাশি-কুমুদিনী,
তুমিই কৌমুদী তার উল্লাস-কারিণী!

(১৭)

অপারকরুণাপূরপূরিতান্তর্মনোহ্রদে।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি নিজদাস্যস্পৃহাজুষি॥

অগাধ অপার তব কৃপা-জল-রাশি—
তব মনোহ্রদ পূর্ণ রা[illegible]বানিশি।
দাসীভাবে রাখিয়া মোরে বারমাস
সুপ্রসন্ন থাক রাধে! এই অভিলাষ।

(১৮শ হইতে ২১শ শ্লোকে শ্রীমতী রাধিকার দাসী-ভাব-প্রার্থী ভক্ত কবি স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেছেন।)

(১৮)

কচ্চিত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গপ্রসাদাদ্রক্ষ্যসে ময়া॥

এ মোর মনের সা[illegible]মিটিবে কখন,—
যখন দেখিব, সেই [illegible] নন্দন
শত শত প্রিয়বাক্যে [illegible] সাধনা,
করিবেন তব কৃপা-কটাক্ষ প্রার্থনা।
তুমিও তাঁহারে কৃপা করি প্রদর্শন,
চঞ্চল কটাক্ষ-শর করিবে ক্ষেপণ!

(১৯)

ত্বাং সাধু মাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যামাহং কদা॥

এ মোর মনের সাধ [illegible] কখন,—
যখন দেখিব, শিল্পী শ্রীমধুসূদন
মাধবী কুসুম দিয়া যতন করিয়া
দিবেন তোমার দেহখানি সাজাইয়া।
তাঁর স্পর্শে তব স্বেদ ঝরিবে যখন,
ব্যজন করিব আমি তোমায় তখন!

(২০)

কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি

এ মোর মনের সাধ মিটিবে কখন,—
কৃষ্ণ সনে কেলি-কালে তোমার যখন
আলুথালু হবে বক্র অলক-সম্ভার,
আদেশ করিবে মোরে তাহার সংস্কার!

(২১)

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে।

এ মোর মনের সাধ মিটিবে কখন,—
সুলোহিত ওষ্ঠাধরে তোমার যখন
প্রদান করিব এক মধুর তাম্বূল,
অমনি দেখিয়া তাহা, হইয়া ব্যাকুল
ব্রজধাম-পতি সেই নন্দের নন্দন
কাড়িয়া লইয়া সুখে করিবে ভক্ষণ!

(২২শ হইতে ২৩শ শ্লোকে সাধক কবি শ্রীমতীর দাস্যভাব প্রার্থনা করিয়া স্তুতি সমাপ্ত করিলেন।)

(২২)

ব্রজরাজকুমারবল্লভা-
কুলসীমন্তমণি প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা
পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণের আছে বহু প্রিয়সীমন্তিনী,
কিন্তু তুমি তাঁহাদের সীমন্তের মণি!
প্রসন্ন হইয়া রাধে! আমার উপরি,
দাসীভাবে লও মোরে বিলম্ব নাকরি।

(২৩)

করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং
তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ
সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ।

বৃন্দাবনে একমাত্র তুমি সর্বেশ্বরী,
দাসী ভাবে লও দেবি! মোরে কৃপা করি।
তা হ'লে হইব আমি অবশ্য তখন
কেশি-প্রাণ-নাশি কৃষ্ণ-প্রার্থনা-ভাজন।

(এই শ্লোকে ফলশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে।)

(২৪)

ইদং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবম্।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্

রাধিকার এই স্তব "চাটুপুষ্পাঞ্জলি"
যেই জন পাঠ করে হ'য়ে কুতূহলী,
অমনি তখন সেই বৃন্দাবনেশ্বরী
নিজ-দাসী-পদ তারে দেন কৃপা করি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি এ।
(২৬।২ বৃন্দাবন পালের লেন।
শ্যামবাজার, কলিকাতা।)

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-

স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র।

(সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত।)

(১)

রাহুগ্রস্ত জড় শশধর যবে,
কলঙ্কী পূর্ণিমা প্রকাশিতা ভবে;
চতুর্দ্দশ শত সাত গৌড়-সালে,
মায়াপুরে শচী-গর্ভে সায়ংকালে,
চিচ্ছক্তি-প্রকট-লীলা-মূর্ত্তি ধরি
অবতীর্ণ সেই মিশ্র-সুতে স্মরি।

(২)

বিশ্বম্ভর হরি-প্রিয়-গৌরাঙ্গ প্রভৃতি—
ক্রমে যাঁর ইত্যাকার নামের বিস্তৃতি,
নবখণ্ড-বিমণ্ডিত ধন্য এই বঙ্গে,
স্মরি সদা সে কলিপাবন শ্রীগৌরাঙ্গে,

(৩)

স্বসুখদা রাধা-ভাব-কান্তি লয়ে,
মিশ্রাবাসে স্বশ্রী গৌরহরি হয়ে,
পল্লীবধূগণের উল্লাস-বৰ্দ্ধিনী
বাল্যক্রীড়া [illegible]লেন যিনি,
হামাগুড়ি দিলা [illegible]তে রঙ্গে;
বন্দি আমি সেই স্বর্ণবর্ণ-অঙ্গে।

(৪)

সর্পাঙ্গ অনন্ত হলে স্বাঙ্গন প্রবিষ্ট,
তদঙ্গ আসন করি যিনি উপবিষ্ট!
স্বজনানুরোধে যিনি ত্যজিলেন তাঁরে,
নমি আমি নিত্য সেই দেব বিশ্বম্ভরে।

(৫)

"হরিবোল—[illegible]" বাল্যে শুনি,
রোদন নিবৃত্ত হইতেন যিনি;
তাহে নারীদলে সদা নাম-গান!
মাটি খেয়ে যিনি মায়ে দিলা জ্ঞান;
নাম-গানাশ্রয়—কলিমলহর,
বন্দি আমি সেই গৌরাঙ্গসুন্দর।

(৬)

বাল্যে দ্বিজগৃহে চাপল্য-বিস্তারী,
বিদ্যারম্ভে শিশু-বেষ্টন-বিহারী;
গঙ্গাস্নানে রঙ্গে অঙ্গে দিয়ে বারি,
দ্বিজপতিগণ উদ্বেজনকারী,
চপলের চূড়া—কৌতুকি প্রধান,
স্মরি আমি সেই গৌর ভগবান।

(৭)

তীর্থাটক এক দ্বিজকুল-মণি,
তাঁহার পকান্ন ভক্ষিলেন যিনি;
পরে সুকৃপায় দিলা জ্ঞান গূঢ়!
যোহি চৌরদ্বয়ে হৈলা স্কন্ধারূঢ়!
সুজন-সুখদ—দুর্জ্জন-দণ্ডদ—
বন্দি আমি সেই শ্রীগৌর-শ্রীপদ।

(৮)

শিবভক্ত ভিক্ষু পৃষ্ঠ-আরোহণে,
আনন্দিত রুদ্র-ভাণ্ডকীর্ত্তনে;

ভক্তজন-ভক্ত মহানন্দধাম,
নমি আমি সেই [illegible] ভগবান।

([illegible])

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর [illegible]র-বিহিত
মিষ্টান্নাদি যিনি করি অঙ্গীকৃত,
দিলা শুভবর চিত্ত-সন্তোষণ;
মসীচিহ্নে যিনি তুষিলা স্বজন;
স্মরণ করি সে পরম রসিকে,
চিত্তচোর সেই শ্রীগৌর হরিকে।

(১০)

একদা উচ্ছি[illegible] হয়ে অধিষ্ঠিত,
অদ্বৈতমার্গের [illegible]কের উপাসিত—
মহাজ্ঞান মাকে যিনি দিলা সে প্রসঙ্গে,
নমি আমি নিত্য সেই বরাঙ্গ গৌরাঙ্গে।

(১১)

নিজ লোষ্ট্রাঘাতে দেখে মাতৃক্লেশদশা,
বাৎসল্য-ভকতিভরে যে শিশু সহসা—
শ্বেত নারিকেলদ্বয়ে মায়ে তুষ্ট করে,
নমি আমি নিত্য সেই মাতৃভক্তবরে।

(১২)

ত্যজি গৃহবাস, লইলে সন্ন্যাস
বিশ্বরূপ যদগ্রজ,
মিষ্টালাপে যাঁর, শমিত পিতার
শোক সুত-বিরহজ।
বিয়োগে পিতার, শোকার্ত্তা মাতার,
শোক নিলা যিনি হরি,
পরম সুখদ সে মাতৃভক্ত
শ্রীগৌরাঙ্গে আমি স্মরি।

(১৩)

দ্বিজ-পরিবৃত, গয়াতীর্থগত
সর্ব্বদেব-বন্দ্যমান—
[illegible]লীলাচ্ছলে পুরী-গুরু-স্থলে
দশাক্ষর মন্ত্র পান;
এসে বঙ্গধামে, চিত্তবিকৃতি-ভাণে
আত্মতত্ত্ব ব্যক্তকারী—
নবরসপর, ভক্তমূর্ত্তিধর
সে গৌরাঙ্গে আমি স্মরি।

(১৪)

বিপ্র পদ-বারি যিনি পান করি,
হইলা নীরোগ বপু;
বর্ণাশ্রমাচার সুপালিত যাঁর,
স্মরি সেই মহাপ্রভু।

(১৫)

যথাবিধি শ্রীবল্লভআচার্য্যের মেয়ে
শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে শুভবিবাহ করিয়ে,
গৃহস্থ হইয়ে যিনি পূর্ব্বদেশে যান;
শাস্ত্রমূর্ত্তি—বিদ্যালাপে বহুধন পান;
গৃহস্থপ্রধান যিনি—ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান,
স্মরি আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান।

(১৬)

সুজন তপনমিশ্রে কাশী পাঠাইয়া,
দেশে এসে লক্ষ্মীর বিয়োগ-দগ্ধ-হিয়া
স্বীয় প্রসূতিরে শান্তি-সুখদ বচনে—
সান্ত্বনা দিলেন যিনি তত্ত্বআলোচনে;
বিরক্তি সুখদ যিনি—শান্তি মূর্ত্তিমান,
স্মরি আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান।

(১৭)

মাতৃবাক্যবশে যিনি পুনরায়
বিবাহ করিলা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়;
গঙ্গাতীরে যিনি নিজগণ সঙ্গে,
দিগ্বিজয়ী-দর্প হরিলেন রঙ্গে;
অধ্যাপকসিংহ সকল সমক্ষে;
বন্দি সুধীশ্বর সে নদীয়া-চন্দ্রে।

(১৮)

স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, অথবা তান্ত্রিক,
সর্ব্বাদিরে জয় করি,

নিত্যানন্দ বিলাসে নদীয়া-নিবাসে
বিরাজিত গৌরহরি !
সাক্ষাৎ যে জ্ঞান মূর্ত্তিমান,
নমি সে গৌরাঙ্গ ভগবান।

(১৯)

তদা সদা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে,
কৃষ্ণভক্তি-রস আলাপনে,
অদ্বৈতাদি মুখ্য মহাজন
যাঁর পদাশ্রয় প্রাপ্ত হন ;
যাঁর ঐশীচেষ্টা-যোগে হয়—
নিত্যানন্দ চন্দ্রের উদয় !
সুদর্শন ষড়ভুজধারী,
বন্দি সে দয়াল গৌরহরি॥

(২০)

সহসা স্মরণীয় বরাহ শরীরে
করিলা করুণা যিনি গুপ্ত মুরারীরে ;
ব্যাসপূজাছলে বলদেব-ভাব ধরি
মধুযাজ্ঞাকারী সেই পরতত্ত্বে স্মরি।

(২১)

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিজগণ-সহকারে,
ভক্তিভরে কৃষ্ণমন্ত্রে পূজিলেন যাঁরে ;
শ্রীবাস-মন্দির-নিধি পরিপূর্ণ তত্ত্ব,
শ্রীধরাদি-মোহান্ত—শরণে স্মরি নিত্য।

(২২)

যে প্রভু স্বকীয় গুণগণ-প্রদর্শনে
বিশোধিয়া শ্রীবাসের পালিত যবনে,
সাধু ভক্ত বিষয়-বিরক্ত প্রেম-মত্ত
করিলেন, স্মরি সেই গোরাচাঁদে নিত্য।

(২৩)

শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীরঘুনাথ-স্তুতি—
শ্রীরামস্বরূপে শুনি সুখী যিনি অতি ;
কৃপায় মুকুন্দে যিনি ছাড়ান কুসঙ্গ ;
শুদ্ধভক্তিরসদাতা স্মরি সে গৌরাঙ্গ।

(২৪)

অবধূতে, হরিদাসে, যেই ভগবান
আদেশিলা নগরে বিলাতে হরিনাম,
সর্ব্বত্রই—ছোটবড় সর্ব্বজীবে আর ;
সে মহাপুরুষ স্মরি করুণাবতার।

(২৫)

নিত্যানন্দ সহ যেতে অদ্বৈত-মন্দিরে,
ধর্ম্মধ্বজী সুরাসক্ত ভাক্ত সন্ন্যাসীরে
দিলেন ললিতপুরে যিনি তত্ত্বজ্ঞান,
স্মরি সেই শিবদাতা শুদ্ধভক্তিধাম।

(২৬)

কপট অদ্বৈতবাদী অদ্বৈতের পৃষ্ঠ
সহসা চাপড়ি প্রেমে, ভক্তিপথ-নিষ্ঠ
করিলেন তাঁরে যিনি, সেই গৌরহরি,
মায়াহর সুবিমল, সদা তাঁরে স্মরি।

(২৭)

লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধরি চন্দ্রশেখরের ঘরে,
দিলা নিজ দুগ্ধ ভজনাব্ধি-মগ্ন নরে ;
উদ্ধারিলা স্ববিভূতি দেখায়ে বিজয়ে ;
স্মরি সেই সর্ব্বশক্তি-বিভব-আশ্রয়ে

(২৮)

নিদ্রোত্থান, স্নানাহার, পূর্ব্বাহ্নে গোক্রমে;
সংকীর্ত্তন-বিচরণ ক্রমে গ্রামে গ্রামে ;
অল্পনিদ্রা, ইত্যাদি নিয়মধারী হয়ে,
যামে যামে লীলা যাঁর ভক্তগণে লয়ে;
সেই প্রভু গৌরাঙ্গ ভজন-সুখধাম,
স্মরণ তাঁহারে আমি করি অষ্টযাম।

(২৯)

শ্রীনিবাস আদি সংকীর্ত্তন-সঙ্গিগণ-
সঙ্গে রঙ্গে করিলেন পতিতোদ্ধারণ ;
জগাই মাধাই আদি দুর্ব্বৃত্ত পতিত
দ্বিজগণ-হৃদিবর প্রেমেতে পূরিত
করিলা যে প্রেমসিন্ধু পতিত-শরণ,
করি সেই শ্রীগৌরাঙ্গে সতত স্মরণ।

(৩০)

যিনি ভাবভরে সর্ব্ব সুজনেরে
শিখালেন ভক্তিতত্ত্ব ;
সদয় হৃদয়ে দোষ সমুদয়ে
ক্ষমিলেন যিনি সদা ;
সজ্জন-সভায় ভক্তির ব্যাখ্যায়
বিখ্যাত যে গৌরহরি,
স্বজন-দুষ্কৃতি- মার্জ্জন-মূরতি—
সে মহাপ্রভুরে স্মরি।

(৩১)

কীর্ত্তন-সুধারি চাঁদকাজী উদ্ধারিয়া,
নগরে নগরে সুখে নাচিয়া নাচিয়া,
করি হরিসংকীর্ত্তন কলি-মলহারী,
বারম্বার নদীয়ায় নদীয়া-বিহারী,
নর্ত্তন-বিবশ অঙ্গ দীর্ঘভুজবান,
স্মরি আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান।

(৩২)

গঙ্গাদাস, শ্রীধর, মুরারি,
ভিক্ষু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী,
সবে যাঁর প্রেমে হয়ে বদ্ধ,
প্রেমপূর্ণ হইলেন সদা ;
যাঁহার শ্রীমুখোচ্ছিষ্ট সেবি,
সুরতিকা নারায়ণী দেবী ;
পরম পুরুষ দিব্যকায়,
স্মরি সেই শ্রীগৌরাঙ্গরায়।

(৩৩)

শ্রীবাস-প্রণয়ে বশীভূত হয়ে,
মৃত-সুত-মুখে তার,
বিকাশিয়া বাণী, শুনালেন যিনি
শুভদ সুতত্ত্বসার !
ভৃত্যদলে আর সুমতি-সঞ্চার
করিলা যে গৌরহরি।
সেই অকুহক জীব-নিস্তারক—
শ্রীমহাপ্রভুরে স্মরি॥

(৩৪)

লভি প্রেমাবেশ, আবিষ্ট যে পরমেশ,
মুষ্টিবদ্ধ যষ্টি-দণ্ড ধরি,
বাদাসক্ত জড়মতি মূঢ়ছাত্রগণ-প্রতি
তাড়ন করিলা কোপ করি ;
তাই সে মূঢ়েরা হায় ! বিস্তারিয়া বৈরতায়
হ'ল যাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আ'র,
বিমুখ-দমনে যেই দিব্যসিংহ সম, সেই
শ্রীগৌরাঙ্গদেবে আমি স্মরি।

(৩৫)

তা সবার পাপরাশি- প্রশমন-অভিলাষী,
অকস্মাৎ কাটোয়ায় আসি,
সিতপক্ষে মাঘমাসে কেশবভারতী-পাশে,
সাজিলেন নবীন সন্ন্যাসী !
বিদ্বৎসমাজে যিনি সুবিদ্বান-শিরোমণি,
পণ্ডিতের যিনি অগ্রগণ্য,
আহা ! সে মুণ্ডিতমুণ্ড ধৃত-কমণ্ডলু দণ্ড,
স্মরি প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

(৩৬)

স্বজন-সগৃহ নবদ্বীপে ত্যজি,
নিতাইচাঁদের প্রেমানন্দে মজি,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কাটোয়া ত্যজিয়ে,
শান্তিপুরে যিনি উদিলা আসিয়ে ;
ব্রজ-গমনেচ্ছাবিষ্টমূর্ত্তি যাঁর,
স্মরি সেই শ্রীচৈতন্য অবতার।

(৩৭)

হর্ষ-শোকাহতা সে অজিত-মাতা
তথায় আনীতা হয়ে,
দিনকত ধরি, ভিক্ষা দান করি,
পালিলেন যে তনয়ে ;
মাতৃভক্ত্যাবেশে, মাতার আদেশে,
যিনি ক্ষেত্রধামগামী,
ভ্রমণতৎপর ন্যাসীকুলেশ্বর,
স্মরি সে গৌরাঙ্গে আমি।

(৩৮)

সাধু হরিদাস, দামোদর, নিত্যানন্দ,
সেবক মুকুন্দ, সুধী শ্রীজগদানন্দ

চন্দ্র-পদ-ভৃঙ্গ-অনুগামী—
প্রণত-প্রিয়াজ—স্মরি সে গৌরা ম।

(৩৯)

তাজি গাঙ্গদেশ, দেখি অম্বুলিঙ্গেশ্বরে,
উড়িষ্যায় রেমুণায় দেখি ক্ষীরচোরে,
কটকনগরে যিনি করিলা গমন,
আত্মরূপ গোপালকে করিলা দর্শন ;
স্বভজন-পরায়ণ ভক্তমূর্তিধর,
স্মরি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।

(৪০)

ক্ষুদ্রলিঙ্গ দেবে করিয়া প্রণাম,
শিবের একাম্রবনে,
নিজ দণ্ড রেখে, পুনঃ যিনি যান
কপোতেশ-দর্শনে ;
এই অবসরে নিত্যানন্দ যাঁর—
করিলা সে দণ্ড-ভঙ্গ ;
ভক্ত-ভক্ত যিনি চন্দনরাকার,
স্মরি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ।

(৪১)

দণ্ডভঙ্গে হয়ে কপট-কুপিত,
ভক্তগণে ত্যাগ করি,
একাকী যে প্রভু লভিলা ত্বরিত
নীলাচল-পতি-পুরী ;
কৃষ্ণরূপ তথা হেরিয়া সে প্রভু
মহাভাবাবিষ্ট-অঙ্গ ;
বিরহিতদণ্ড, স্বর্ণবর্ণ বপু,
স্মরি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ।

(৪২)

ভাবাস্বাদাবেশ প্রকট যখন,
সার্ব্বভৌম যাঁরে সেবিলা তখন
সে সেবার ফলে স্বাভাবিক যত
অনর্থ যাঁহার কৃপায় বিগত ;
যাঁহার বিপুল কৃপার বৈভব
লভি সার্ব্বভৌম হইলা বৈষ্ণব ;
প্রকৃত বেদার্থ-প্রচার-প্রসঙ্গে
ভাবমূর্ত্তি সেই—স্মরি শ্রীগৌরাঙ্গে।

(৪৩)

দিগ্বিজয় করি তথা অধিষ্ঠান,
দাক্ষিণাত্যে যিনি করিলা প্রয়াণ ;
যিনি কূর্ম্মক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগভোগী
বাসুদেব দ্বিজে করিলা অরোগী ;
বিজয়নগরে রায় রামানন্দে
প্রেমসিন্ধু যিনি দিলা প্রেমানন্দে ;
জন-সুখকর তীর্থমূর্ত্তিমান!
স্মরি আমি সেই গৌর ভগবান।

(৪৪)

দেশে দেশে সাধুখণে প্রেম বিতরিয়া,
রঙ্গক্ষেত্রে ভট্টদের পল্লীতে আসিয়া,
কিছুদিন রহি তথা, ভট্টাচার্য্যগণে—
করিলেন কৃষ্ণভক্ত কৃপাবিতরণে ;
শ্রীগোপাল-আলয়ের আনন্দের নিধি,
স্মরি সেই গৌরাঙ্গমূরতি নিরবধি।

(৪৫)

বৌদ্ধ-জৈন—যারা ভক্তি-ভজন-বিহীন,
তত্ত্ববাদহত—মায়াবাদ-হ্রদ-লীন,
শুদ্ধভক্তি প্রচারিয়া—দিয়া আত্মবল,
করিলা তাসবে যিনি ভজন-কুশল,
এইমতে বহুমত-বোদ্ধ-উদ্ধারণ—
স্মরি সে গৌরাঙ্গচন্দ্র পতিতপাবন।

(৪৬)

যে ঈশ্বর, বিতরিয়া দাক্ষিণাত্য-জনে
কলিযুগ্ধরানন্দ, কৃষ্ণদাস-সনে,—
ভজনের গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহ করিয়া,
আলালন থের মন্দিরের পথ দিয়া,
প্রত্যাগত নীলাচলে প্রমোদিতমতি,—
ভক্তপাল সে গৌরাঙ্গে স্মরি নিরবধি।

(৪৭)

কাশীমিশ্র-গৃহে যেই হেমকান্তিধর,
স্বরূপ-প্রমুখ সহ স্বজন-নিকর,
করি অধিষ্ঠান, সর্ব্বজীবে সর্ব্বক্ষণ
করিলেন কৃষ্ণনামানন্দ বিতরণ ;
স্বজন-সহিত সেই প্রফুল্লমূরতি
শ্রীগৌরাঙ্গদেবে আমি স্মরি নিরবধি।

(৪৮)

নীলাচল-নাথ যবে বিরাজিত রথে,
বেষ্টিত-বৈষ্ণববৃন্দ—যিনি তদগ্রেতে,
প্রেমানন্দে নেচে নেচে গেয়ে হরিনাম,
প্লাবিত করিলা প্রেমে সবাকার প্রাণ।

গজপতি-প্রমুখ উড়িয়া ভক্তগণে—
শুদ্ধভক্ত করিলেন প্রেম বিতরণে
স্বসুখ-জলধি যিনি ভাব-মূর্ত্তিমান,
স্মরি আমি সদা সে গৌরাঙ্গ ভগবান।

(৪৯)

উড়িয়া পার্ষদগণে উড়িষ্যা-সীমায়
পরিহার করি, পরে যিনি পুনরায়
গেলা গৌড়দেশে ওড্রদেশ পরিহরি,
শচীসুত সে গৌরাঙ্গদেবে আমি স্মরি।

(৫০)

শ্রীবাসে ও শ্রীরাঘবে, আর দত্ত বাসুদেবে,
গিয়ে সে সবের স্বমন্দিরে,
দিয়ে দরশন-দান, যিনি শান্তিপুরে যান,
স্মরি সেই গৌরাঙ্গসুন্দরে।

(৫১)

বিদ্যানগরাখ্য গ্রাম, বিদ্যাবাচস্পতি-ধামে
করিলেন যিনি আগমন;
নদীয়ার কুলিয়াতে গেলা যিনি তথা হতে,
করি সেই গৌরাঙ্গ ভজন।

(৫২)

বিদ্যা-রূপ-জন্ম-ধন-জনে ভবে
যে দুর্লভ ধন না লভে মানবে,
শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাই সে ধন!
দেবানন্দ যাহা করিলা অর্জ্জন,
কেবল সরল দীনতার বলে,
পূজিয়া যাঁহার ভকতমণ্ডলে;
কুলিয়ানগরে যাঁহার কৃপায়—
মদমুক্ত সাধু সুধীসমুদায়—
এক শুদ্ধভক্তিযোগে যাঁরে পান,
বন্দি আমি সেই গৌরভগবান।

(৫৩)

বৃন্দাবন-দরশন ছলে গৌড়দেশে
মাতৃদরশন যিনি করিলেন এসে;
স্নেহে রূপ-সনাতনে করিয়া উদ্ধার
যবন-কবল হতে, উৎকলে আবার
আসিয়া, স্বজন-ত্রাণে যিনি হৃষ্টচিত্ত,
স্বতন্ত্র পরাত্ম, স্মরি সে গৌরাঙ্গে নিত্য।

(৫৪)

যেতে পুনঃ দৃঢ়মতিমান—
হয়ে যে স্বতন্ত্র পুরুষপ্রধান,
বহুবিধ-জন-সঙ্গ পরিহরি,
একমাত্র বলভদ্রে সঙ্গী করি,
বন-পথে ব্যাঘ্র আদি পশুদলে—
প্রেমে মাতাইয়া যিনি আত্মবলে,
চলিলেন আত্ম-আনন্দ বিতরি!
পশুমতিহর সে গৌরাঙ্গে স্মরি।

(৫৫)

গিয়ে বৃন্দাবন, গিরি-নদী-বন,
গ্রাম-কুঞ্জ দরশনে,
স্মরি পূর্ব্বলীলা মূর্চ্ছিত হইলা
ভাবপুঞ্জাকৃষ্ট মনে!
বলভদ্র তা'তে ব্রজ-বন হ'তে
বাহির করিলা যাঁয়;
নিজ-জনাধীন মূরতি সুদীন!
স্মরি সে গৌরাঙ্গরায়।

(৫৬)

করি যাঁরে দৃষ্ট মহাভাবাবিষ্ট,
পথিমধ্যে, কতিপয়
শুভমতিমান ম্লেচ্ছ ভাগ্যবান
কৃপা যাঁর প্রাপ্ত হয়;
তারা ভক্তিপূত, প্রেম-বশীভূত,
হ'ল যাঁর পরসাদে,
জন্ম-মলহর শুদ্ধমূর্ত্তিধর,
স্মরি সে গৌরাঙ্গচাঁদে।

(৫৭)

শ্রীজাহ্নবী-যমুনার মিলনে উদ্ভব যাঁর,
পুণ্যতীর্থ সে প্রয়াগধামে,
রূপে করি কৃপালেশ, প্রসাদিলা যে পরেশ,
পররসময়ী বিদ্যা দানে।
যিনি বুধ বল্লভেরে করিলা করুণাভরে
গোকুলপতির প্রেম দান,
রস-গুরু-শিরোমণি, মূর্ত্তিমান শাস্ত্র যিনি,
স্মরি সে গৌরাঙ্গ ভগবান।

(ক্রমশঃ—)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

৯ম বর্ষ। ফাল্গুন, চৈত্র। ১১শ, ১২শ সংখ্যা।

১৩০৯, ১৯০৩।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম. এ. বি. এল
কর্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৪।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১।০ মাত্র। এই সংখ্যার মূল্য

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্ট্রী কৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

জাতিভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যাঁহারাই একটু প্রণিধান পূর্ব্বক মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, গাঙ্গ্যপ্রদেশের প্রথম যোদ্ধৃ-জাতিরা কিরূপ সৎসাহসী, তেজস্বী, মহাবলশালী ও স্ব স্ব অধিকার রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। যে সকল জাতি গাঙ্গপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাদিগের অসীম-কীর্ত্তিসমূহ হিন্দুদিগের মহাকাব্যে বর্ণিত রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কুরু ও পঞ্চালের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের যুদ্ধ-বিবরণই হিন্দুর মহাকাব্য।

কিন্তু ভাগীরথীবিধৌত শস্যশ্যামল উর্ব্বর সুরম্য গাঙ্গপ্রদেশে কয়েক শতাব্দী বাস করিতে করিতে হিন্দুদিগের ভিতর যেমন বিদ্যাচর্চ্চা ও সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্দ্ধন হইতে লাগিল, তেমনি আবার অপরদিকে তাঁহাদিগের সাহস ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতে লাগিল। যতই তাঁহারা নিম্নতর প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, ততই যোদ্ধৃজাতির বীরত্ব, সাহস ও তেজস্বীতার লক্ষণগুলি তাঁহাদিগের স্বভাব হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তখন বিদেহ ও কাশী পণ্ডিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু তখনকার ইতিহাসে বীরত্বের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। রামায়ণ পাঠে সামাজিক ও পারিবারিক কার্য্যনিচয়ের যথেষ্ট সবিচার দেখিতে পাওয়া যায়। কোশল রাজ্যের মনুষ্যগণ যে একটী সুমার্জ্জিত জাতি হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন যে পৌরহিত্যের প্রাধান্য হইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারা যায়। ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্ধ-বিশ্বাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও প্রমাণ আছে। কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত সেই বীরত্বের কাহিনী তখন শুনিতে পাওয়া যায় না। তখনকার সময়ে তাহারই অভাব হইয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে হিন্দুদিগের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ধর্ম্মপ্রণালীর পর্য্যন্ত কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিল।

পঞ্চনদের সেই সকল বিজয়ী আর্য্যগণ যে সকল সরল ঋক্ উচ্চারণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে সরলহৃদয়ে ভক্তিভরে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন, পূর্ব্বপ্রদেশের শাস্ত্র, সূত্র, কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় হিন্দুদিগের হৃদয়ে তাহাদিগের স্থান ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারা এখন ধীরে ধীরে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তখনকার সেই সকল সরল ক্রিয়াকাণ্ড আর যেন তাঁহাদিগের মনঃপূত হইত না। ক্রমশঃ পুরোহিতদিগের সংখ্যা ও প্রতাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে বংশানুক্রমে পৌরহিত্যের নিয়ম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি হইল।

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, আর্য্যগণ যখন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের জীবনে একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। সেই অত্যুন্নত তুষারধবল শৈলশিখর—সেই কলনাদিনী খরগামিনী তরঙ্গিনী—সেই অসংখ্য ফলফুল-শোভিত সুন্দর সুন্দর বনশ্রেণী—সেই উর্ব্বর ক্ষেত্রপরিপূর্ণ শ্যামল শস্য-সম্ভার, সেই বিহগকূজন, ভ্রমরগুঞ্জন, সেই রক্তিম রাগরঞ্জিত সুন্দরপ্রভাত—সেই কুয়াশাবিমুক্ত জলদজালপরিমুক্ত সুনীল আকাশ—সেই শুভ্র-জ্যোৎস্নাময়ী পুলকিতা যামিনী—সেই মাতিশীতোষ্ণ মৃদুমন্দপবন সঞ্চালন,—এই সমস্তই একে একে আর্য্যদিগের হৃদয়ে কবিত্বের সৃষ্টি করিল। সেই দিবাকরপ্রতপনবিস্তারিত কিরণ সম্পাতে সমুজ্জ্বল প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি, প্রাবৃটের ঘনজলদজালাচ্ছন্ন প্রকৃতির গম্ভীরা মূর্ত্তি প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদিগের নয়ন-পথের পথিক হইতে লাগিল। বালকের জগৎদর্শনের ন্যায় তাঁহারা বিমুগ্ধ চিত্তে সমস্তই অবলোকন করিতে লাগিলেন। যখন নির্গলিতাম্বুগর্ভ মেঘবিমুক্ত বিমল শারদাকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, তখন তাঁহাদিগের সরল হৃদয়ের মধুর বাঁশরী আপনি বাজিয়া উঠিত। তাঁহারা মন্ত্রের পর মন্ত্র রচনা করিয়া, ঋকের পর ঋক্‌সমূহ সৃষ্টি করিয়া, সেই সরল হৃদয়ের সরল কোমল চঞ্চল ভাবসকল গাহিয়া উঠিতেন। তাই তাঁহারা যাহা দেখিতেন, তাহারই মন্ত্র রচনা করিতেন। প্রকৃতি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া প্রকৃতি-নিয়ন্তার স্তোত্র গাহিতেন; ভারতবর্ষের জগৎ তাঁহাদিগের নিকট বড় সুন্দর বোধ হইয়াছিল। সুন্দরে সরলে মিশিল—আর্য্যগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ঋকের স্রোত বর্ষার জলপ্লাবনের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তখনকার যুগে বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছিল না, তখন লিখিত ভাষা ছিল না। কিন্তু এই সকল মন্ত্রগুলি অভ্যাস করিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কারণ তখনকার ধর্ম্ম বল, যাগ বল, যজ্ঞ বল—তখন আর্য্যদিগের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই এই সকল মন্ত্রের শাসনে চালিত হইত। তাই তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই এই সকল মন্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞস্থলে এ সকল মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়াই যজ্ঞের সহায়তা করা

কিন্তু আর্য্যগণ স্বস্ব কার্য্য স্বহস্তে তেন। তাঁহারা যেমন হলচালনা করিতেন, তেমনি আবার হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদানও করিতেন। তাই সকলের পক্ষে বেদের এতগুলি মন্ত্র শিক্ষা করা ঘটিয়া উঠিত না; অনেকের সেরূপ সুযোগও ছিল না এবং অনেকের পক্ষে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অভাবও আসিয়া শিক্ষার পথ রোধ করিত। অন্যান্য সহস্র কার্য্যের মধ্যে মন্ত্র শিক্ষার সুময় এবং ধৈর্য্য ক্রমশঃই অনেকটা হ্রাস পাইতে ছিল। কারণ জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত জীবন-সংগ্রামও ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য হইতেছিল। তাই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাঁহাদিগের চিন্তা সহস্র পথে ধাবিতা হইত।

"There were over a thousand of them (the hymns); and each would on the average fill one page of an octavo volume. This was not all; every hymn must be recited in a particular manner—every word, every syllable must be pronounced in a prescribed way. Besides many idioms of the ancient hymns gradually became obsolete. The Aryan territories gradually covered a considerably wider area; population increased ....Every Aryan was expected to have gone through hymns once. But very few of those, who were engaged in the ordinary occupations of life could afford room in their brains, for a thousand and odd long hymns, with obsolete idioms and expressions, so as to be able to reproduce them at notice. All these circumstances tended to [illegible]te a class of men, the Brahmans"*

সহস্রাধিক মন্ত্র শিক্ষা করিবার মত ক্ষমতাও তখন সকলের ছিল না। কারণ প্রত্যেক মন্ত্র অতিশয় দীর্ঘ, তাহার উপর সেই সকল মন্ত্রগুলির উচ্চারণ ভিন্ন২ প্রকার এবং তাহাদিগের আবৃত্তি-পদ্ধতিও একই রকম ছিল না। এই সকল কারণে সকলেই মন্ত্রগুলি শিক্ষা করিতে পারিল না। অথচ সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মের জন্য প্রত্যহই মন্ত্রগুলি আবশ্যক। তাই যাহারা শিক্ষা করিল, তাহারাই সমাজের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিল। এক বৎসরে বা দুই বৎসরে সমাজের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল না।

এখনও আমরা এমন অনেক 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' দেখিতে পাই, যাঁহারা ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু পণ্ডিত নহেন। অথচ সামাজিক কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যক মন্ত্রগুলি তাঁহারা যেমন শিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি আবৃত্তিও করিতে পারেন—এদিকে মন্ত্রার্থবোধ তাঁহাদিগের নাই। তখন দিন দিন আর্য্যগণের অধিকৃত জনপদসমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দেশে শিল্প প্রভৃতির উন্নতি হইল—আর্য্যগণ ধনসম্পদ (wealth) প্রাপ্ত হইলেন; এতদ্ভিন্ন এক সহস্রেরও অধিক মন্ত্র এরূপ ভাবে স্মরণ করিয়া রাখা সকলের

* Hindu civilisation under British Rule.

পক্ষে যে সম্ভব হইয়াছিল না, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু দৈনিক ধর্ম্ম-চর্য্যার জন্য প্রত্যহই সেই সকল মন্ত্র আবশ্যক হইতে লাগিল। অথচ তাহাদিগের শব্দ-বিন্যাস ভিন্ন, যতি ভিন্ন, ছন্দ আবার দিনে দিনে তাহাদিগের মধ্যে অনেক শব্দ পর্য্যন্ত অপ্রচলিত হইয়া উঠিল, তখন কতকগুলি লোক সেই সকল মন্ত্ররাশি প্রাণপণ-যত্নে শিক্ষা করিলেন। তাঁহারাই তখন হইতে যজ্ঞাদির সময়ে উপস্থিত হইয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তখনকার সমাজের ইহাতে কোন অনিষ্ট হয় নাই।

একই ব্যক্তি যুগপৎ সহস্রবিধ-চিন্তা ও লক্ষবিধ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারে না। তাহা থাকিলে, কোন কার্য্যই করা হয় না। তাই তখনকার আর্য্যসমাজে যাঁহারা মন্ত্রগুলি শিক্ষা করিলেন, তাঁহারা কেবল তাহা লইয়াই থাকিলেন। বরং অবসর পাইয়া তাঁহারা দিবানিশি অধ্যাত্ম চিন্তাতেই মগ্ন হইলেন; দার্শনিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কারে মনোযোগ করিলেন। তাঁহা-দিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পূর্ব্বেই এক দল লোক গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহারাই সেই ক্ষত্রিয়।

কিন্তু আপন প্রাধান্য বিস্তারের জন্য এবং ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ক্রিয়াকলাপ দুরূহ করিয়া তুলিলেন; প্রত্যহই নানাবিধ খুঁটি নাটি সংযোজিত হইতে লাগিল। কেমন করিয়া কোন্ কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণ তাহার নূতন নূতন নিয়ম করিতে লাগিলেন। তাহারই ফলে-'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ। এক সম্প্রদায়কে এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া অন্যান্য সকলে নূতন নূতন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল—আর তাঁহাদিগের ক্রিয়া কর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্য-গুলি ব্রাহ্মণের হস্তেই অর্পিত হইল।

এই স্থলে আর একটী কথা বলা প্রয়ো-জন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার রীতি যেরূপ, তখন তেমন ছিল না। অর্থাৎ তখন শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিদ্যালয় ছিল না, গুরুগৃহই তখনকারই শিক্ষা-মন্দির ছিল। শিষ্যগণ গুরুগৃহে বাস করিতেন, তাঁহারই কাষ্ঠ আহরণ করিতেন, গোসেবা করিতেন, আর অভীষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তখনকার গুরুগণ নিয়মিতরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না, পরন্তু শিষ্যদিগকে আহার ও থাকিবার স্থান দিয়া প্রতিপালন করিতেন। তখনকার শিক্ষক ও শিষ্যের ভিতর পিতা ও পুত্রের ভাব বিদ্যমান ছিল। মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির অভাবে বিদ্যার্থীদিগের যে কি কষ্ট ও অসুবিধা হইত, তাহা অবর্ণনীয়। যখন পর্য্যন্ত বর্ণমালারও সৃষ্টি ছিল না, তখনকার কথা ত তুলনাহীন। তাই সেকালে ব্যুৎপন্ন গুরুর সংখ্যাও কম হইত এবং উৎসাহী, উদ্যমপূর্ণ বিদ্যাভ্যাসেচ্ছু কষ্টসহিষ্ণু শিষ্যের সংখ্যাও তখন অল্প হইত। যে সকল গুরু শাস্ত্র-বিশারদ বলিয়া খ্যাত হইতেন, নানা দিগ্‌দেশ হইতে শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইত। গমনাগমন সুগম ও সহজ না হওয়াতেও অনেকে আসিতে পারিতনা।

মনুষ্যের স্বভাব এই, যে বিষয়ে যে পারদর্শী ও ব্যুৎপন্ন হয়, তাহার স্বতঃই সাধ

হয় যে, সেই বিদ্যা আপন পরিবারেই নিবদ্ধ থাকুক। সেই জন্যই এখন পর্যন্ত অনেক বিদ্যাই আমাদের দেশে কৌলিক অবস্থায় আছে। উদাহরণ স্বরূপ চাঁদশির ডাক্তারদিগের অস্ত্রচিকিৎসার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখনও যেমন, তখনও তেমনি; মনুষ্য-স্বভাব চিরদিনই প্রায় একই রকম। সুতরাং গুরুগণ সর্ব্বদা হয়ত এই চেষ্টাই করিতেন যে, বেদবিদ্যা তাঁহাদিগের আপন আপন বংশেই বদ্ধ থাকুক। এইরূপে ধীরে ধীরে পৌরহিত্য কৌলিক হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে লাগিলেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এক সম্প্রদায়ের লোক সর্ব্বদা যুদ্ধার্থে সজ্জিত থাকিতেন। তাঁহারাই আর্য্যভূমির রক্ষক ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মানও বড় কম ছিল না। কালক্রমে এই যুদ্ধ-বিদ্যাও তাঁহাদিগের কৌলিক হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা এবং কার্য্যও যে কৌলিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। তখন দেশের অবশিষ্ট লোকগুলি কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতিতে মনোনিবেশ করিল। ইহাদিগের সংখ্যাই তখন অধিক ছিল; সকল সময়েই দেশে সাধারণ লোক-সংখ্যা অধিক থাকে। বেদে এই সকল ব্যক্তিই "বিশ্" বলিয়া পরিচিত। "বিশ্" অর্থে সাধারণ প্রজাবর্গ বুঝায়। এই কারণেই "বিশাম্পতি" অর্থে 'প্রজাদিগের প্রভু'—অর্থাৎ রাজা বুঝায়।

শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বলিতেছেন,—"পঞ্চনদে থাকিয়া যোদ্ধ্‌পুরুষেরা কৃষি ও গোচারণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু গাঙ্গাপ্রদেশে যোদ্ধা ও নরপতিদিগের সৈন্য-আড়ম্বর এবং ভোগবিলাস প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। তাঁহারাও সাধারণ লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক বংশানুক্রমিক ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িলেন। ঋগ্‌বেদে যাহাদিগকে বিশা বা বিশ্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যাহাদের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে হিন্দুজাতি [illegible] থাকিতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের যে সাহস ও বীর্য্য ছিল, একণে তাহারা সে সাহস ও বীর্য্য হারাইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিল।.........ইহার পর হিন্দু-রাজ্য-সমূহে রাজা ও যোদ্ধাদিগের বীর্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের ও জনসাধারণের বীর্য্য, ক্ষমতা বা রাজনৈতিক প্রভাব আর লক্ষিত হয় না।"

এই সকল অপরিহার্য্য কারণে ভারতবর্ষে চারিজাতির সৃষ্টি হইল। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে যখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন জাতিভেদের বর্ত্তমান চিহ্ন সকল কিছুই লক্ষিত হইয়াছিল না। বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তিনটী প্রধান বিষয় আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে।—

(১) নিম্নজাতীয় ব্যক্তির অন্ন-পান গ্রহণ নিষেধ।

জাতিভেদ সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে বক্তৃতা

(২) ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর এবং এক জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন নিষেধ।

(৩) জাতিগত পার্থক্য অনুসারে ব্যবসায়ের পার্থক্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। বেদোক্ত জাতিভেদ বর্ণনা রূপক।

অধুনা অনেকেই বলিয়া থাকেন, বেদে এবং শাস্ত্রাদিতে জাতিভেদ-প্রথার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা রূপক মাত্র। আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। 'বিশ্বকোষ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "জাতি বিভাগের কারণ নির্ণয়" করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিতেছেন, —*

"সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যখন মানবগণ সংখ্যায় অতি অল্প; যখন জীবিকার চিন্তা ছিল না, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মেদিনী প্রচুর আহারসামগ্রী যোগাইতেন; হিংসা, দ্বেষ, লোভ যখন মানবকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; যখন সত্যভাষী সরল মানব কেবল স্বভাবজাত ফলমূলাহারে পরিতৃপ্ত হইত, মানবের সেই প্রকৃত সুখশান্তির যুগে সমাজবন্ধনের কোন প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ-ক্রমে শ্রেণী বা বর্ণ-বিভাগেরও আবশ্যকতা ছিল না। এই কারণে এক দিন মহর্ষি ভরদ্বাজ এইভাবে ভৃগুকে বলিয়াছিলেন, 'বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই। পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন, তখন সমস্তই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।' সৃষ্টির প্রথম যুগই পুরাণেতিহাসে সত্যযুগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সত্য যুগের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আর্য্যজাতির আদিম অবস্থার পরিচয়।

"প্রথমে সমস্তই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মণাত্মক ছিল" এরূপ কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? সর্ব্বপ্রথমে যদি কেবল ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অন্য জাতির অস্তিত্ব আপনি আসিয়া পড়ে। যদি ব্রহ্মণেতর বর্ণই না থাকিত, তাহা হইলে বৃথা 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রাহ্মণ' শব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা কি? এখানে মনে করিয়া রাখ, প্রাচীনতম আর্য্যঋষিগণের সমাজ, ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের কথাই বৈদিক মন্ত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা আর্য্য ভিন্ন অপর কোন মর্ত্ত্যবাসীকে মনুষ্য মধ্যেই গণ্য করেন নাই; সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে যে বর্ণ বা শ্রেণীর কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব—তাঁহাদেরই সমাজের, বৈদেশিক জাতির কথা নহে।"

* * * *

"যখন মহাভারত ও রামায়ণে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন

করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই স্থলে তাহা দ্রষ্টব্য।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

উত্তর গ্রন্থের মতেই স্বীকার করিতে হইবে, সত্যযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হয় [নাই,] কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন। বেদমন্ত্রোচ্চারণ রূপ মুখের কার্য্যই ব্রাহ্মণের মুখ্য ধর্ম্ম, তাই ব্রাহ্মণ বিরাট পুরুষের মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল।"

"যখন পূজ্যপাদ আর্য্যগণ হিমালয়ের তুষারশিখর পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সমতল ভূমে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রজোগুণান্বিত হইয়া রাজ্যবিস্তার, বলবীর্য্য সঞ্চার ও সাত্ত্বিক বেদস্তোতৃগণের রক্ষা বিধানে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারাই শেষে 'ক্ষত্রিয়' উপাধি লাভ করিলেন।* পুরাণোক্তিকালে সেই সময়ই ত্রেতাযুগ নামে বর্ণিত হইয়াছে।† তেজ বা বীর্য্য রজোগুণের পরিচায়ক। তাই পুরাণে ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহুর কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য, তাই ক্ষত্রিয় বা রাজন্য বিরাট পুরুষের বাহু বা বাহুজ বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন।"

ঋক্‌সংহিতায় অনেক মন্ত্রেই "বিশ" বা বৈশ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল স্থানে 'বিশ' শব্দের অর্থ প্রজা-সাধারণ, উহা জাতিবাচক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। বাস্তবিক বেদসংহিতার পুরুষসূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতিবাচক বৈশ্য শব্দের উল্লেখ নাই।* এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে সেই মন্ত্রসমূহ ঋষিগণের হৃদয়াকাশে [উদিত] হইয়াছিল, তখনও বৈশ্য নামক এক [ভিন্ন] জাতি সমাজবদ্ধ হয় নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠে স্পষ্ট বোধ হইবে, যাহারা কৃষি গোরক্ষা, সুবর্ণ, ধন ও ধান্যের উপায় সর্ব্বদা চেষ্টা করিত, তাহারাই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইল।† বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বর্ণোৎপত্তিপ্রকরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে মনে হইবে, মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ এবং যাগ ও যজ্ঞাদিতে যাঁহারা নিরত থাকিতেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তানেরা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা যাগ যজ্ঞাদির উৎসাহদাতা, ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা, রাজা বা জনপদের অধিকারী ও বলবীর্য্যশালী, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়; এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সুখশান্তির জন্য যাঁহারা কৃষি দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন করিতেন, পশ্বাদি পালন করিতেন ও ধন দ্বারা রাজার অভাব পূরণে চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তান

---

* ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ সর্ব্ব প্রথমে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরূপ পাওয়া যায়।—

"ত্রৈষ্টুভো বৈ রাজন্য ওজো বা ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ত্রিষ্টুবোজসৈবৈনং তদিন্দ্রিয়েণ সমর্দ্ধয়তি।"

(১।৫।২)

† এ সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পূর্ব্বভাগ ৮ম অধ্যায় ১০০—১০২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

* অথর্ব্বসংহিতায় (৫। ১৭। ৯) এক স্থলে কেবল বৈশ্য শব্দের উল্লেখ আছে।

† মন্ত্রটী এই—"সর্ব্বা বিশঃ কল্পন্তে স্বস্তি নঃ পথ্যাস্বধন্বস্বস্তাবাহ স্বস্ত্যপ্সু বৃজনে স্বর্বতি স্বস্তি নঃ পুত্র কৃথেষু যোনিষু স্বস্তিঃ রায়ে মরুতো দধাতনেতি মরুতো বৈ দেবানাং বিশঃ।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১।২।

অন্যস্থানে আছে—

"ন গর্ভাঃ বৈশ্যাস্তস্মাদ্ব্রাহ্মণাগন্তা বৈ বৈশ্যো জাগতাঃ পশবঃ পশুভিরেবৈনং তৎ সমর্দ্ধয়তি।" (১।৫।২)

সন্ততিগণ বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বৈশ্য বর্ণের স্বরূপ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।—

"যাঁহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া কেবল মাত্র সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্য এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিতেন, তাহারা ব্রাহ্মণ; তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, বৈশ্য কর্ম্মে নিযুক্ত কৃষকরূপে যাহারা অনিষ্ট উৎপাদন ... করিত এবং ভূমি সম্বন্ধে যাহারা কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহারাই বৃত্তিসাধক কৃষক বৈশ্য।*' বৈশ্যে রজঃ ও তমোগুণের একত্র সংযোগ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র উভয়ের ভাব বিদ্যমান। বৈশ্যের প্রধান অবলম্বন কৃষি। শস্য পরিপক্ক হইলেই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি ও কামনা পূর্ণ হয়, এইজন্য পরিপক্ক শস্যের রূপ পীতবর্ণই হিন্দুশাস্ত্রে বৈশ্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাওয়া যাইতেছে, 'গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণের মধ্য হইতেই বৈশ্য জাতি উৎপন্ন হয়। পুরাণাদি পাঠে বোধ হয়, ত্রেতাযুগের শেষভাগে ও দ্বাপর যুগের প্রথমে বৈশ্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু প্রভৃতি মহাপুরাণে দ্বাপর যুগের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বৈশ্য সমাজের ছবিই প্রকটিত হইয়াছে। কৃষ্যাদি লোক-জীবিকার হেতু বৈশ্য; উরুই তাহাদের প্রধান অবলম্বন; সেই জন্যই বৈশ্য বিরাট পুরুষের উরুদেশজাত, এইরূপ কল্পিত হইয়াছিল।"

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৮ম অধ্যায়।

"পুরাণেতিহাসে বৈশ্যসমাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই শূদ্রোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

"পূর্ব্বে যে সকল ব্রহ্মোৎপন্ন সিদ্ধাত্মা মানবগণের বিষয় কথিত হইয়াছে; তাঁহারাই ত্রেতাযুগে পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগের জন্য যথাক্রমে, শান্তচিত্ত, তেজস্বী, কর্ম্মী ও দুঃখী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।' অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রগণ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইলেন।"

* * * *

"দ্বিজাতির পদসেবাই শূদ্রের মুখ্য ধর্ম্ম—তাই শূদ্র বিরাটপুরুষের পাদজ বলিয়া কল্পিত হইলেন।"

"The Vedas and the Epics carry us back to the good old days of India, when there were no castes and the whole world consisted of Brahmans only. Created equally by Brahma, men have in consequence of their acts, become distributed into different orders. Those who became fond of indulging their desires and were addicted to pleasure and were of a severe and wrathful disposition, endowed with courage and unmindful of piety and worship...........those Brahmans possessing the attributes of Rajas (passion) became Kshatriyas. Those Brahmans again, who, without attending to the duties, laid down for them, became possessed of the attributes of goodness (Satwa) and passion and

took to the practice of rearing of cattle and agriculture, ...syas. Those Brahmans again, were addicted to untruth and injuring others and engaged in impure acts and had fallen from purity of behaviour on account of possessing the attribute of darkness (Tamas), became Sudras. Separated by occupation, Brahmans became members of the other three orders.' (Mahabharata, Moksha Dharma, chap. 188). 'Niether brith, nor study, nor learning constitutes Brahmanhood, character alone constitutes it. (Mahabharata, Vana Parva, chap 313 Vers 108.)"*

(ক্রমশঃ—)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ.

রাজভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

যে অনন্ত প্রকৃতির অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময়ের সর্ব্ব সামঞ্জস্য সূচক অভ্রান্ত সাম্যনীতি ও সনাতন নিয়মাবলী দ্বারা সমগ্র-বিশ্বরাজ্য নিয়মিত, পরিচালিত এবং সমতা-সূত্রে গ্রথিত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সেই বিশ্বনিয়ন্তার সর্ব্বসামঞ্জস্য ও মঙ্গলময় সনাতন উদার সাম্য-আদর্শনীতির অনুকরণে যে রাজ্যের রক্ষণ, পালন ও শাসন-নীতির ভিত্তি, সেই রাজ্যই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রাজ্য। যে রাজ্যের বল একতা, আইন সাম্যনীতি, উদ্দেশ্য জগতের হিত সাধন, সেই রাজ্যই ধর্ম্মরাজ্য। সেই রাজ্যের ভিত্তি অক্ষয়, অচল ও অটল।

আমরা ভারতীয় প্রজা, চিরকাল রাজভক্ত। রাজা আমাদের নিকট ঈশ্বরতুল্য। ভারতে মুসলমান-রাজত্বকালে মহামহিমান্বিত আকবর সাহের লোকহিতকর নূতন সাম্যনীতির আলোক যখন প্রথম ভারতবাসীর চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল, তখনই ভারত সমস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিল যে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা"। ভারতে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তার সাম্যনীতির আদর্শে প্রথম রাজকৃত শুভ্র উদার নীতির জ্যোতির্ম্ময় আভাস যখন ভারতবাসীর চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল, তখনই ভারতীয় রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের অন্তরে ঐ মহান্ ভাব উদিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, ভারত-গগনে বিদ্যুতের ন্যায় ঐ শুভ্র জ্যোতি অল্পকাল মধ্যেই অন্তর্হিত হওয়ায়, ভারতবাসী পুনঃ গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। যেমন প্রাচ্য গগনস্থ সূর্য্যদেব পৃথিবীর পূর্ব্বভাগ হইতে অস্তমিত হইয়া পাশ্চাত্য গগনে উদিত এবং সেই পাশ্চাত্য সৌরজ্যোতি প্রাচ্য গগনস্থ চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত করিয়া, প্রাচ্য ভূমিস্থ নৈশ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া স্নিগ্ধ শুভ্র কিরণজাল বিতরণ করেন, সেইরূপ ভারতের নিয়ন্তা তেজোময় বৃটিশ-সূর্য্যের উদার নীতির স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোতিতে

* "Fusion of sub-castes in India"—by Rai Bahadur Lala Baij Nath, B. A. Judge, court of small causes, Agra.

এই হতভাগ্য ভারতভূমি আজ শতাধিক বর্ষ আলোকিত হইয়াছে, এবং সেই সাম্য-নীতির শুভ্র আলোক শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমেই উজ্জ্বল ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

প্রকৃতি-রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্ব্ব-ক্ষমাময়ী সাম্য-উদারনৈতিক শক্তির ন্যায় মূর্ত্তিমতী সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বমঙ্গল ও সর্ব্বসামঞ্জস্যের আমাদের শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া, এই বিপুলা পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধাংশ সুশাসন পূর্ব্বক একই সাম্য-উদারনীতিসূত্রের দ্বারা গ্রথন ও ন্যায়-রজ্জুর দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

যেমন প্রকৃতির মধ্যে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার হস্তের সর্ব্বসামঞ্জস্যসূচক বিধি, নিয়ম ও ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্তাকে আমরা অনুভব করি, সেইরূপ শাসন, পালন ও উদারনীতির আধার স্বরূপিণী আমাদের মহারাজ্ঞী বহু দূরস্থিত হইলেও, তাঁহার উদারনীতিমূলক শাসনদণ্ড ও রক্ষণ-যন্ত্রের প্রত্যেক ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আসিয়াছি। যিনি রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে পৃথিবীর শীর্ষদেশাধিরোহণ ও সর্ব্বোপরি সিংহাসনারূঢ়া হইয়া পৃথিবীর অর্দ্ধভাগে সুনিয়ম সংস্থাপন ও সার্ব্বভৌমিক উদারনীতির অনুসরণ পূর্ব্বক লোকরক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহার একই শাসন-যন্ত্রের একই সূত্রে সেই বিপুল সাম্রাজ্য নিনাদিত এবং কৃষি, বাণিজ্য, ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সেই রাজরাজেশ্বরীর যশঃস্বরূপ মূর্ত্তি চিরকাল আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার রাজনিয়ম যে সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ স্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সভ্য রাজ্য মাত্রেই রাজতন্ত্র, অভিজাত নিয়মতন্ত্র বা সাধারণ প্রজাতন্ত্র (Kingly form—aristocracy—democracy) এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন একপ্রকারে শাসন কার্য্য সম্পন্ন হয়; কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ বৃটিশ শাসননীতির মধ্যে ঐ তিন প্রকার আদর্শই বিদ্যমান আছে। রাজা আছেন, অভিজাত সমিতি, সাধারণ সমিতি, সমস্তই আছে।

আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে ২৪শে মে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন উইলিয়ম দি ফোর্থের মৃত্যুর পর ২১শে জুন ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্ঞীপদে বরিতা হয়েন। ১৮৪০।১০ই ফেব্রুয়ারি বিবাহ হয় এবং ঐ অব্দের নভেম্বর মাসে প্রথম কন্যা এডিলেড মেরিয়া লুইসিয়া ও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ৯ই নভেম্বর আমাদের বর্ত্তমান রাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্ম হয়, এবং ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ১০ই মার্চ্চ তারিখে বর্ত্তমান রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

আমাদের ভূতপূর্ব্বা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যগ্রহণের সময় আর্চবিসপ প্রত্যূষে যখন তাঁহাকে এই সংবাদ দেন, তখন তিনি আনন্দ প্রকাশ না করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আপনি তবে আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমি যেন রাজদায়িত্ব বহনে সক্ষম হই।" ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালে বৃটিশরাজ্যের সর্ব্ব প্রকারে যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে কোন সময়ে তদ্রূপ উন্নতি সংঘটিত হয় নাই।

তাঁহার সময়ে—

১। রাজ্য বৃদ্ধি।

২। শাসননীতির উন্নতি।

৩। বিজ্ঞানের উন্নতি।

৪। শিল্পের উন্নতি।

৫। শান্তি।

৬। বিদ্যার উন্নতি।

সম্পাদিত হইয়াছে।

আমাদের মহারাজ্ঞী যে অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন, তাহা তাঁহার রাজ্য গ্রহণের পরেই একটী কার্য্যে প্রকাশ পায়। ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন তৎকালে প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার অধীন একজন সৈনিক তৃতীয়বার অপরাধে অপরাধী হওয়ায়, তিনি তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া, মহারাজ্ঞীর স্বাক্ষর-আজ্ঞাপত্র গ্রহণ করিতে যান। রাজ্ঞী তাহা অনুমোদন করিতে না পারিয়া, সজল চক্ষে করুণ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ইহার পক্ষ হইয়া আপনি কি কিছু বলিবেন না?" তিনি কঠোরস্বরে বলিলেন যে "ইহাকে আমি উপর্য্যুপরি দুইবার ক্ষমা করিয়াছি, আর ইহার পক্ষে বলিবার কিছুই নাই।" এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী বলিলেন "আপনি মহানুভব, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।" তখন সেনাপতি অগত্যা মহারাণীর দয়া-প্রবণতা দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ কিছু বলিবার আছে বটে যে, উহার গার্হস্থ্য জীবনে কোন দোষ নাই", "আপনাকে ধন্যবাদ" বলিয়া রাজ্ঞী তাহার প্রাণদণ্ড ক্ষমা করিলেন।

"মহারাণীর রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যান না" এই প্রবাদটী প্রকৃত সত্য; যে হেতু আমেরিকার ক্যানেডা, নিউফাউণ্ডলাণ্ড West Indies; আমেরিকা বৃটিশ গায়না প্রভৃতি; তদ্ভিন্ন অষ্ট্রেলিয়া, যাহার পরিসর সমগ্র ইউরোপের তুল্য, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও ভারতীয় [illegible] সমূহ আটলানটিক ও প্যাসিফিক ওসেনের দ্বীপাবলী, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে সিয়েরালিয়ন, গাম্বিয়া গোল্ড কোষ্ট সেণ্ট হেলেনা প্রভৃতি, দক্ষিণ উপকূলে Cap of Good [illegible], নেটাল, জুলুল্যাণ্ড, এক্ষণে ট্রান্সভাল, পূর্ব্ব উপকূলে মরিচ দ্বীপ, ভূমধ্য সাগরে মাল্টা, সাইপ্রস দ্বীপ প্রভৃতি। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, মহারাণীর অধিকারে কি সূর্য্য অস্তমিত হন?

মহারাণীর সময়েই ভারতবর্ষ সাক্ষাৎভাবে তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়।

ভারতের চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় ও মোগল পাঠান বংশীয় সমগ্র রাজন্যবর্গের রত্ন খচিত মুকুট যাঁহার পদতলে ন্যস্ত হইয়াছে এবং যিনি ভারতের সম্রাজ্ঞীর পদ লাভ করিয়া, ভারতীয় রাজা ও প্রজাবর্গকে সন্তানের ন্যায় সমভাবে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন, যাঁহার অনুগ্রহে পাশ্চাত্যবিদ্যার বিমল জ্যোতিতে প্রাচ্যভূমি আলোকিত হইয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত চিরকাল তাঁহার গুণগান করিব। আজ যে বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, গুর্জ্জরী, তৈলঙ্গি, রাজপুত ও পঞ্জাবী মোগল, পাঠান একত্রিত হইয়া পরস্পর এক পরিবারস্থ ভ্রাতার ন্যায় আত্মীয়তা সংস্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর মনোভাব বিনিময় করিতেছে, সে কাহার প্রসাদে? আমরা অনেকেই এ সব কার্য্য অনভিজ্ঞ, ইহারাও বাঙ্গালা

ভাষা অনভিজ্ঞ, তবে আজ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পরস্পর ভ্রাতার ন্যায় যে সম্ভাষণ হইতেছে, সেই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন-ভাষী ভ্রাতাদিগের শিক্ষয়িত্রী জননী কে, সেই মূর্ত্তিমতী জ্ঞানদেবী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াই এই অজ্ঞান শিশুসন্তানগণের শিক্ষয়িত্রী জননী। তাই ভারতবাসী মাতৃহীন বালকের ন্যায় সকলেই সমস্বরে এবার মা মা বলিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে।

হে মহারাজাধিরাজ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড! আপনার মা ইংলণ্ডেশ্বরী, আর আমরা আপনার অনুগত ও পদাশ্রিত শিশু ভ্রাতাগণ, আমাদের মাও সেই ভারতেশ্বরী; তিনি প্রকৃত পক্ষে মরেন নাই। তাঁহার যশোরূপী সূক্ষ্ম দেহ কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার নহে। যতকাল পৃথিবী থাকিবে, ততকাল তাহা অক্ষয় ও অমর থাকিবে।

"এই যে গোলাপপুষ্প অতীব সুন্দর হায়!
বিতরি সুগন্ধ ভূমে শুষ্ক হয়ে ঝরে যায়॥
কিন্তু তার সার অংশ সহজে পায় কি ধ্বংস,
যদাপি প্রস্তুত হয় সুবাস আতর তায়?
যায় বটে পুষ্প-রূপ, গুণ নাহি ধ্বংস পায়॥
গোলাপী আতর যাহা বিতরে সৌরভামৃত।
স্থূল রূপ ত্যজি তাহা সূক্ষ্ম গুণে বিবর্জ্জিত।"

এইক্ষণ সেই মহাদেবীর স্থূল পার্থিব দেহ অন্তর্হিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার যশোদেহ সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে মহারাজাধিরাজ! আপনি তাঁহার যশঃস্বরূপ দেহের আদর্শে তাঁহার সার্ব্বজনীন উদার সাম্যনীতির অনুকরণে আমাদিগকে এবং আপনার আসমুদ্র মহা মহা দেশবাসী প্রজাবর্গকে পালন করিয়া, যশস্বী হইয়া, দীর্ঘ জীবন লাভ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা। আমরা মাতৃহীন হইয়াছি, এইক্ষণ আপনার সুশীতল ক্রোড়ে যাহাতে স্থান পাই এবং সর্ব্বক্ষণ আপনার পূজা করিতে পারি, ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা। আপনার নামে বুয়ার-যুদ্ধ তিরোহিত হইয়াছে, বুয়ারগণ আপনার পদাশ্রিত হইয়াছে। ভরসা করি, আপনি পৃথিবীস্থ সমগ্র রাজন্যবর্গের শিক্ষার আদর্শ হইয়া, আসমুদ্র-বিপুলা পৃথিবী শাসন, পালন ও নব নব শুভসংঘটন সম্পাদন করিয়া, এই পৃথিবীকে অনাস্বাদিত ফল প্রদান করুন, এবং আপনার স্বদেশীয় ভ্রাতা বুলার লিটন প্রণীত "Coming Race" নামক গ্রন্থের নিম্নোক্ত উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করুন।

"Obedience to the rule adopted by the Government, has become, as much an instinct as if it were implanted by nature.

There being no apprehention of war: there were no armies to mentain,

Being no Government of force, there was no police to appoint and direct, what we call crime was utterly unknown to them."

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষে বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ভারতবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া যে কিরূপ সুখানুভব করিয়াছিলেন এবং কিরূপ আগ্রহ ও রাজভক্তি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনার অতীত। ভারত-ভুবন সেই কয়েক দিন যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া

ছিল। নগরে নগরে আলোকমালা, অগ্নি-ক্রীড়া প্রভৃতি আনন্দপ্রদ [illegible]র ভূরি অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের শেষে [illegible] ভারতে পদার্পণ করেন, তখন ভারতের প্রধান কবি ভারত-মাতাকে সম্বোধনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের আশার সম্বল।

কেঁদনা কেঁদনা আরগো জননি!
মহিষী-নন্দন কোলেতে এল।
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল।
মহিষী তোমার—যাঁহার আশ্রয়ে,
এ শোক সহিয়ে আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইতে
আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে।
ত্যজ শয্যা মাতঃ! অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূয়ে।
কেঁদনা কেঁদনা আরগো জননি!
আচ্ছন্না হইয়া শোকের ধূমে॥

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(সাতক্ষিরা।)

পঞ্চকোষ-বিবেক।

পূর্ব্বানুবৃত্ত

১১। নন্বু দেহমুপক্রম্য নিদ্রা-
নন্দান্তবস্তুষু।
মাভূদাত্মত্ব মন্যস্ত ন কশ্চিদনু-
ভূয়তে॥

বঙ্গানুবাদ। দেহ হইতে আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত যদি আত্মা বলিয়া মনে না কর, তবে আর কিছুইত অনুভূত হয় না।

১২। বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বেঽনু-
ভূয়ন্তে ন চেতরঃ।
তথাপ্যেতেঽনুভূয়ন্তে যেন তং
কো নিবারয়েৎ॥

বঙ্গানুবাদ। আনন্দময় কোষ প্রভৃতি সমস্তই অ[illegible], আর কিছুই অনুভূত হয় না বটে, তথাপি যৎকর্তৃক ঐ পঞ্চকোষ অনুভূত হয়, তাহাকে আত্মা বলিতে বাধা কি?

১১।১২ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।—যদি স্থূলদেহ স্বরূপ অন্নময় কোষাদি আনন্দময় কোষান্ত সকলেরই অনাত্মত্ব স্বীকার কর, তাহাহইলে এই পঞ্চকোষের অতিরিক্ত আর কোন বস্তুকে আত্মা বলিয়া অনুভূত হয় না কেন? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত স্বরূপে বলিতেছেন,—তুমি যে বলিলে, স্থূলদেহ স্বরূপ অন্নময়াদি আনন্দময়ান্ত পঞ্চকোষেরই অনুভব হয়, তদতিরিক্ত আর কোন পদার্থই আত্মস্বরূপে অনুভূত হয় না, ইহা সত্য; কিন্তু যে নিত্য চৈতন্য দ্বারা সেই স্থূল দেহাদির অনুভব হয়, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে কে নিবারণ করে? অর্থাৎ যিনি সেই অনুভবের আশ্রয়, তাঁহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া স্বীকার কর।

১৩। স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্য-
তে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেয়ো
[illegible]॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা স্বয়ং অনুভূতি, ইঁহার অনুভাবক নাই। জ্ঞাতা জ্ঞানান্তর অভাবে অজ্ঞেয়; কিন্তু তিনি অসত্তা নহেন অর্থাৎ তিনি আছেন।

তাৎপর্য্যার্থ। যদি স্থূল শরীর রূপ অন্নময় কোষাদি আনন্দময়ান্ত পঞ্চকোষের অতিরিক্ত নিত্যজ্ঞান স্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মা নামে কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহার উপলব্ধি হয় না কেন? কি কারণে আমরা তাহা লাভ করিতে পারি না? আত্মা বলিয়া যদি কোন অতিরিক্ত পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাঁহাকে জানিতে পারিতাম। এই সংশয়ের নিরাকরণাভিপ্রায়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।— পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকে সচারাচর কেহই জানিতে পারে না; কিন্তু তিনিই সকলের জ্ঞাতা, অর্থাৎ তিনিই সকলকে জানিয়া থাকেন। জ্ঞানান্তরের অভাব হেতু তিনি অজ্ঞেয়; যদি অন্য কোন পদার্থের নিত্য জ্ঞান থাকিত, তবে তাঁহাকে সকলেই জানিতে পারিত। যখন আত্মাভিন্ন অন্য কোন পদার্থে নিত্য জ্ঞান নাই, তখন তাঁহাকে আর কে জানিতে পারে? এই নিমিত্তই তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলে; নচেৎ তাঁহার অসত্তা হেতু তিনি অজ্ঞেয় নহেন।

১৪। মাধুর্য্যাদি স্বভাবানামন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্।

অন্যস্তদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্তাস্ত্যদর্শকম্॥

বঙ্গানুবাদ। মধু-শর্করা প্রভৃতি স্বভাবতঃ মিষ্ট হেতু অন্য বস্তুতে সংসর্গ জনিত তাহার মিষ্টত্ব অর্পণ করে; আপনাতে মিষ্টত্ব অর্পণ জন্য অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করে না।

১৫। অর্পকান্তর রাহিত্যেপ্যাস্ত্যেবাং তৎ স্বভাবতা।

মাভূৎ তথানুভাব্যত্বং বোধাত্মত্বং ন হীয়তে॥

বঙ্গানুবাদ। যেরূপ মধু-শর্করার মিষ্টত্বগুণ অর্পণকারী অন্য কোন বস্তু না থাকায়, স্বভাবতঃ মধু-শর্করাই মিষ্ট, সেইরূপ পরমাত্মার অন্য জ্ঞাতা না থাকায়, তাঁহার অস্তিত্ব নাই, বলা যায় না।

১৪।১৫শ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ—আত্মাই সকল পদার্থের অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অনুভব করে, এমন কোন পদার্থই নাই, এই নিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সে বিষয় প্রমাণীকৃত করিয়া, আত্মার বিদ্যমানতাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন। যেমন মাধুর্য্য গুণশালী মধু ও শর্করা প্রভৃতি বস্তু সকল স্বীয় সংসর্গ বশতঃ অন্য বস্তুতে আপন মাধুর্য্য-গুণ অর্পণ করে, আপনাতে সেই মাধুর্য্য গুণ স্থাপনার নিমিত্ত অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করে না এবং মধু-শর্করা প্রভৃতি বস্তুকে মাধুর্য্য গুণ অর্পণ করিতে পারে, এমত অন্য কোন পদার্থই নাই; সুতরাং সেই মধুশর্করাদির মাধুর্য্য গুণ স্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রকার পরমাত্মারও জ্ঞাতা কেহ নাই এবং তাঁহাকে জানিবার অন্য জ্ঞানও নাই; সুতরাং তিনি অজ্ঞেয় হইলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ নিত্যজ্ঞানস্বরূপের কোন হানি হয় না।

১৬। স্বপংজ্যোতির্ব্বত্যেষ পুরোহস্মাংভাসতেহখিঃ
তমেব ভান্তু মন্বেতি তদ্ভাসা ভাসতে জগৎ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা স্বয়ং প্রকাশক, আদিতে তাঁহা হইতে সকল বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া জানিবে; তাঁহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বকথিত শ্লোকার্থের প্রামাণ্য বিজ্ঞাপনার্থ শ্রুতি সকলের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিয়া বলিতেছেন। শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, এই আত্মা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, তাঁহার প্রকাশক আর কেহই নাই। এই সচরাচর অনন্তব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্ব্বেও সেই একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন এবং এই জগতের প্রলয়াবসানেও তিনিই বর্ত্তমান থাকিবেন; তিনি ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। এই অশেষ জগৎ সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশের অনুগামী, তাঁহার প্রকাশ দ্বারাই এই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৭। যেনেদং জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাম্।
বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাত্ শক্তং বেদ্যেতু সাধনম্ ॥

বঙ্গানুবাদ। যৎ কর্ত্তৃক এই সমগ্র জগৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহাকে অন্য কর্ত্তৃক কি প্রকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে? জ্ঞাতাকে কে জানিবে বা জ্ঞাতাকে অনুভব করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গণকে কে নিয়োজিত করিবে?

তাৎপর্য্যার্থ। যে নিত্যচৈতন্য দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে জানিতে পারা যায়, সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ সেই নিত্যচৈতন্যকে অন্য কোন্ অনিত্য বস্তু দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে? এই জগতে এমন কোন পদার্থই নাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব জানা যাইতে পারে। যিনি এই জগতের পরিজ্ঞাতা, সেই পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা কেহ কখনই জানা যাইতে পারে না। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব জ্ঞেয় বিষয়ে আসক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞাতার প্রতি অনুসরণ করিতে পারে না। পরমাত্মাই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব জ্ঞেয় বিষয়ে নিয়োজিত করেন, কিন্তু সেই আত্মাতে কে আর ইন্দ্রিয়গণকে নিয়োজিত করিবে?

১৮। স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্ব্বং নান্যস্তস্যাস্তিবেদিতা।
বিদিতা বিদিতাভ্যাং তৎ পৃথগ্ বোধস্বরূপকম্ ॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি সমস্ত পদার্থকে জানেন, তাঁহার অন্য পরিজ্ঞাতা নাই। বিদিত ও অবিদিত পদার্থ হইতে তিনি পৃথক্ জ্ঞানস্বরূপ।

তাৎপর্য্যার্থ। পরমাত্মা যে স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং তাঁহার প্রকাশক আর যে কেহ নাই, এতদ্বিষয়ের প্রমাণ এই, এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতে যত কিছু জ্ঞেয় পদার্থ আছে, সেই সমুদায়কেই পরমাত্মা জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় বিদিত পদার্থ আছে, সেই পরমাত্মা তাহা হইতে

[illegible]থক্ এবং যত কিছু অবিদিত পদার্থ আছে, তাহা হইতেও সেই পরমাত্মা বিভিন্ন। তিনি নিত্য-শুদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ, পরম পিতা পরমেশ্বর।

১৯। বোধেঽপ্যনুভবো যস্য [illegible] কথঞ্চন জায়[illegible]।
তং কথং বোধয়েৎ শাস্ত্রং লোষ্টং নরসমাকৃতম্॥

বঙ্গানুবাদ। যাহার [illegible] বোধ [illegible]কা সত্বেও হৃদ্‌গম্য হয়না, সেই মৃৎপিণ্ডবৎ নরাকৃতি এই শাস্ত্র কি প্রকারে বুঝিবে?

তাৎপর্য্যার্থ। যাহারা বিদিতাবিদিত হইতে অতিরিক্ত সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিযোগ সত্বেও অনুভব করিতে পারেনা, তাহারা নরাকৃতি মৃৎপিণ্ডবিশেষ ও জড় পদার্থের ন্যায় সর্ব্বকর্ম্মের অযোগ্য পাত্র। যাহারা জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদিগকে কি প্রকারে শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধ অনুভবস্বরূপ পরমাত্মতত্বের বোধভাগী করা যাইতে পারে? যাহাদিগের বুদ্ধি জড়তাদ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহারা কোনরূপেও শাস্ত্রীয় যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমাত্মতত্ব বোধের অধিকারী হইতে পারেনা।

২০। জিহ্বামেঽস্তি ন বেত্যুক্তি-লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোধব্য ইতি তাদৃশী॥

বঙ্গানুবাদ। আমার জিহ্বা আছে কিনা, এই কথা যেরূপ লজ্জাজনক, আমার জ্ঞান আছে, আমি জানিনা, এই জ্ঞাতব্য সেইরূপ।

তাৎপর্য্যার্থ। যিনি পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম, [illegible] বোধস্বরূপ, তিনি কোন [illegible]রেও আমাদের বোধগম্য হন না; তাঁহাকে আমরা কোন উপায়েও জানিতে পারিনা, এই প্রকার উক্তিকরা নিতান্ত অসঙ্গত। যেমন "আমার জিহ্বা আছে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারিনা" এই বাক্য নিতান্ত লজ্জাজনক, কারণ জিহ্বা না থাকিলে কেহই কথা কহিতে পারেনা, এই জ্ঞান সকলেরই আছে, তথাপিও জিহ্বার প্রতি সংশয় করা যেরূপ লজ্জাকর, "নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি জানি না" এই বাক্যও তদ্রূপ নিতান্ত লজ্জাকর। "নিত্য-বোধস্বরূপ পরমাত্মা বোধগম্য হন না" এই যে বাক্য, ইহা "জ্ঞানকে জানিনা" এই বাক্যের ন্যায় অলীক॥

২১। যস্মিন্ যস্মিন্নস্তি লোকে বোধস্তত্তদুপেক্ষণে।
যদবোধ মাত্রং তদ্ ব্রহ্মেত্যেবংধী-ব্রহ্ম নিশ্চয়ঃ॥

বঙ্গানুবাদ। যে যে বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সেই বস্তু পরিত্যাগ করিয়া; অবশিষ্ট যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম।

তাৎপর্য্যার্থ। লৌকিক ব্যবহার বিষয়ে যে যে বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সমুদয় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সেই বস্তু বিষয়ক যে "জ্ঞান" তাহাকেই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম বলিয়া জান, এবং সেই জ্ঞানকেই 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলা যায়। জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ, জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই তাঁহার স্বরূপ নহে।

২২। পঞ্চকোষপরিত্যাগে সাক্ষি-
বোধাবশেষতঃ।
স্বস্বরূপং স এব স্যাৎ শূন্যত্বং তস্য
দুর্ঘটম্॥

বঙ্গানুবাদ। পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিয়া তাহার যে সাক্ষিবোধ অবশিষ্ট থাকে, সেই বোধই ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব পঞ্চ কোষের অতিরিক্ত শূন্য হইতে পারে না।

তাৎপর্য্যার্থ। যদিও তন্ন তন্ন রূপে ঘটাদি বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অদ্বৈত পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান মাত্রকে পরমব্রহ্মরূপে জানিলে, পরমাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়, তথাপিও পঞ্চকোষ-বিচার নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি হয় না; পরন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি পঞ্চকোষ-বিচারের উপযোগিতা আছে। বিশেষ বিবেচনা পুরঃসর অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার পূর্ব্বক তাহাদিগের অনাত্মত্ব স্থিরীকৃত হইলে পর, সেই অন্নময়াদি পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট সাক্ষী স্বরূপ যে "জ্ঞান" থাকে বা জন্মায়, তাহাই পরমব্রহ্ম স্বরূপ। যদি বল, অন্নময়াদি পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে কেবল শূন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা নহে; পঞ্চকোষ বিচার পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিলে, তাহাদিগের সাক্ষী স্বরূপ যে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, সেই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান; সুতরাং পঞ্চকোষের বিবেচনা আবশ্যক। অগ্রে পঞ্চকোষ-জ্ঞান না হইলে, তাহার অবশিষ্ট জ্ঞান হইতে পারেনা।

উপরোক্ত পঞ্চকোষবিবেকের ১ম শ্লোক হইতে দ্বাবিংশ শ্লোক পর্য্যন্তের তাৎপর্য্য এই যে, অন্নময় কোষাভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময় কোষাভ্যন্তরে মনোময়, মনোময় কোষাভ্যন্তরে ধীময়, তদভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ[illegible] হচ্ছে; ঐ আনন্দময় কোষই আত্মার [illegible]-স্বরূপ। আত্মাই যে ব্রহ্ম, তাহা এই পঞ্চকোষবিবেকের প্রথম শ্লোকেই প্রকাশ। [illegible] পঞ্চকোষবিবেক দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, বর্ণিত আছে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভূতবিবেকের প্রথম শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছে, সেই সৎ অদ্বৈততত্ত্ব পঞ্চভূতবিচার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়; সেই জন্য পঞ্চভূতের বিচার আবশ্যক। ঐ পঞ্চভূত বিচারকালে প্রমাণিত হইয়াছে যে, "ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম" এই পঞ্চভূতাশ্রয়-জ্ঞানের মধ্যে ঐ ভূত সকল বা ভৌতিক সমস্ত পদার্থ ত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট যে নিত্য জ্ঞান বা চৈতন্য থাকে, সেই নিত্য সৎ পদার্থই জ্ঞানময় ব্রহ্ম। এক্ষণে এই পঞ্চকোষবিবেকের প্রথম শ্লোক হইতে দ্বাবিংশ শ্লোক পর্য্যন্তের মীমাংসারও স্থূল অর্থ যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের অতিরিক্ত নিত্য চৈতন্য বা নিত্যানন্দই আত্মা,—যে নিত্য চৈতন্যের বা জ্ঞানের ছায়া (আভাস) প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ কর্ত্তা স্বরূপে এবং যে নিত্যানন্দের প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া আনন্দময় কোষ ভোক্তা স্বরূপে বিরাজমান, সেই নিত্য অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই আত্মা। নিত্যজ্ঞানই যে নিত্যানন্দ সৎ পদার্থ, তাহা তত্ত্ববিবেকের প্রথমেই



প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং সৎই চিৎ বা জ্ঞান এবং সৎই আনন্দ। ঐ জ্ঞান বা আনন্দই যে আত্মা, তাহাও ঐ তত্ত্ববিবেকের প্রথমে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যদি তাহা হয়, তবে ভূতবিবেক বিচার কালে পঞ্চভূত-বিচার দ্বারা মীমাংসিত ও স্বীকৃত [illegible] পুনর্ব্বার পঞ্চকোষবিচার দ্বারা তাহার মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত করার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ভূতবিবেক ও পঞ্চকোষবিবেকের মধ্যে পার্থক্য কি, নির্ণয় আবশ্যক। ঐ পার্থক্য নির্ণয়ের পূর্ব্বে পাঠকগণের একটী বিষয় স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভূতবিবেক বিচার কালে সূক্ষ্মতম আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে ক্রমে স্থূলতম পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন এবং ঐ ভুবনস্থ জড়, উদ্ভিদ, জীব-জন্তু পর্য্যন্ত বিচার ও সেই সকল সূক্ষ্মতম হইতে স্থূলতম পদার্থের জড়ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক চিন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপ মীমাংসিত হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চকোষ বিচারকালে স্থূলতম দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মতম আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া, ঐ সকল কোষের অনাত্মত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। অতএব ভূতবিবেক দ্বারা সূক্ষ্ম হইতে স্থূল এবং পঞ্চকোষবিবেক দ্বারা স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পদার্থের মীমাংসা দ্বারা আর্য্যঋষিগণ সৃষ্টির গূঢ় রহস্য অতি সুকৌশলে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই সৃষ্টি-রহস্যের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিলে, উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় ও ঐ উভয় বিচারের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইবে। ইহাদ্বারা কেবল সৃষ্টির গূঢ় রহস্য নহে, সৃষ্টির উদ্দেশ্যও বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে।

সৃষ্টির বিষয় Evolution theory, মর্ম্ম এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত নিত্যজ্ঞান বা চৈতন্য অপ্রকাশ অবস্থায় কেবল বীজ মাত্রে পর্য্যবসিত থাকে। বিষয় অবলম্বনেই জ্ঞান বা চৈতন্য প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু না থাকিলে জ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, জ্ঞানের দুইটী পার্শ্ব মাত্র। যে শক্তি দ্বারা জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ হয়, সেই শক্তির নাম জ্ঞানশক্তি। যেমন জ্ঞাতা ব্যতীত বিষয়ের বিকাশ বা বিষয় উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ বিষয় ব্যতীত জ্ঞাতারও বিকাশ বা জ্ঞানেরও স্ফুরণ হয় না। এতাবতা সাব্যস্ত হইতেছে যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু লইয়াই জ্ঞান। যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু নিষ্ক্রিয়াসত্তায় লুক্কায়িত থাকে, তখন জ্ঞানশক্তিও অবিকাশিত বীজ মাত্রে পর্য্যবসিত থাকে।

মনুর ৫ম শ্লোকে বর্ণিত আছে, যথা—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥৫

বঙ্গার্থ। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহে; কোনও লক্ষণ দ্বারাও অনুমেয় নহে; তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। ৫।

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তোব্যঞ্জয়ন্নিদম্
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥

পরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া, এই বিশ্ব সংসারকে ক্রম-প্রকটিত করিয়া, সেই

তমোভূত অন্ধকার ধ্বংসক রূপে প্রকাশিত হন।৯।

স্বয়ম্ভু ভগবান অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত মহাভূতে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত মত সমস্ত জগৎ অব্যক্ত থাকিলে তাহার বীজ ঐ অব্যক্তের মধ্যে অবশ্য থাকে। ঐ অব্যক্তের মধ্যে ভগবান ও আদি মহাভূত না থাকিলে, "স্বয়ম্ভু" ও "মহাভূতাদি বিবৃত্তৌজাঃ" শব্দের কোনও অর্থ থাকে না। ঐ স্বয়ম্ভু ভগবানই জ্ঞাতা এবং আদি মহাভূতই জ্ঞেয়। ঐ জ্ঞাতাই জ্ঞানশক্তি দ্বারা, যাহা অপ্রকাশ ছিল, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত জ্ঞেয় বস্তুতে প্রবৃত্তবীর্য্য অর্থাৎ কার্য্যপ্রবৃত্ত হইয়া, অজ্ঞান বা অপ্রকাশ রূপ তমোনাশক স্বরূপে প্রকাশিত হইলেন। গীতায় কথিত হইয়াছে "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি" প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ই অনাদি বলিয়া জানিও; এই পুরুষই জ্ঞাতা এবং প্রকৃতিই বিষয়ের বীজস্বরূপিণী। এই পর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, উভয়ই নিত্য; উহাব উৎপত্তি-বিনাশ নাই। পূর্ব্ববর্ণিত জ্ঞানের মধ্যে উভয়ই বিদ্যমান আছে। ঐ জ্ঞাতার নিকট যখন জ্ঞেয় বস্তু প্রতিভাসিত হয়, তখন উভয় সম্মিলিত হইয়া মানসাকারে (Ideal form এ) ব্রহ্মাণ্ড প্রকটন করেন, ইহাই বেদান্তোক্ত মায়াবাদ; এই মায়াবাদই বিবর্ত্তবাদের মূল। উহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া অতীব কঠিন; কিন্তু যতই কঠিন হউক, ঐ মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদ হৃদয়ঙ্গম না হইলে, এই পঞ্চকোষবিবেকের প্রকৃত মর্ম্মের কখনই ধারণা হইতে পারে না; এই জন্য গ্রন্থকার সর্ব্বাগ্রে তত্ত্ববিবেক দ্বারা মায়াবাদ, তৎপরে ভূতবিবেক দ্বারা বিবর্ত্তবাদ বুঝাইয়া, এই পঞ্চকোষবিবেকের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, [illegible]ও কেহ হাতে গড়াইয়া সৃষ্টি করেন না; এবং ঈশ্বর কোন বিশেষ ব্যক্তি নহেন। অনাদি চিৎ বা জ্ঞানের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ভাবও লুক্কায়িত থাকে; উহার বিকাশ [illegible] সৃষ্টি, অবিকাশ বা অপ্রকাশই প্রলয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যখন বিশেষ কেহ নহেন, তবে সৃষ্টির বিকাশ অবিকাশ তাঁহার নিকট এবং কেই বা তাহা অনুভব করে? ইহার উত্তর এই যে, চৈতন্যের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ভাবের যখন স্ফুরণ হয়; তখন ঐ চৈতন্যই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু ভাবে বিকাশিত হন। ভাষান্তরে বলিতে হইলে, ঐ চৈতন্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাবানুভূতির সহিত মানসাকারে বিকাশিত হন। আপনার দেহ চৈতন্য নহে, দেহ ধ্বংসশীল; দেহাতিরিক্ত যে চৈতন্য আছে, তাহা তত্ত্ববিবেক ও ভূতবিবেক মীমাংসা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ চৈতন্য জাগ্রতাবস্থায় জ্ঞাতা স্বরূপে কেবল উপস্থিত জ্ঞেয় বস্তু বাহেন্দ্রিয়ের দ্বারা, অনুপস্থিত বস্তু অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা এবং স্বপ্নকালে কেবল অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয়বস্তু যখন অনুভব করেন, তখন জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতার নিকট মানসাকারে প্রকটিত হয়; অর্থাৎ মনের মধ্যে রাম, শ্যাম, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, দ্বার, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতি প্রতিভাসিত বা প্রকটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ বস্তু সকল বাহ্য বা

অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইলে, মনের মধ্যে আকারবিশিষ্ট হয়। ভাষান্তরে বলিতে হইলে, মনই তদাকারে প্রকাশিত হয়েন। সুষুপ্তি কালে অন্তর ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ারোধ হইলে, জ্ঞেয় বস্তু মানসপটে প্রতিভাত হয় না এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তু অবিকাশিত হইয়া হয়।

চৈতন্য যখন দেহাতিরিক্ত, তখন দেহাশ্রিত চৈতন্য ছাড়িয়া দিয়া, অসীম অনন্ত শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞেয় ভাব (অর্থাৎ সমষ্টি ভাব) প্রতিবিম্বিত হইলেই এ অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় মহা মানসাধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। এ সমষ্টি-মানসাকারই দার্শনিক মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্ব।

ঐ সমষ্টি জ্যোতির্ম্ময় বুদ্ধিতত্ত্বে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ব্যষ্টিভাবে প্রতিবিম্বিত ও যুক্ত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ মানসাকারে গ্রথিত হয়, এবং সেই গ্রথিত মানসাকারই অহং অর্থাৎ আমিত্ব ভাবে বা কর্ত্তাস্বরূপে পরিণত হইয়া, তাহা হইতে বহুভাব প্রসূত হয়। মনে করুন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তন্মাত্রের ভাব চিৎক্ষেত্রে অর্থাৎ মহৎ বুদ্ধিতত্ত্বে ক্রমিক বিকাসিত হইয়া, যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতিতত্ত্বের ভাব প্রকটিত হইল। আবার ঐ সকল তত্ত্ব সংযুক্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে একটি গোল পিণ্ডবৎ সৌর জগতের ভাব মানসাকারে গ্রথিত হইয়া, উহার মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী, এবং পার্থিব জড়, উদ্ভিদ, জীবজন্তু আকারে মহামানস-ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল। এ মহামানসক্ষেত্র মধ্যে প্রত্যেক একটি ব্যষ্টি জ্ঞেয় বস্তুর ভাব যে পৃথক্ পৃথক্ এক একটি মানসাকারে প্রকটিত হয়, সেই সেই ব্যষ্টি মানসাকারই সেই সেই ভাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সমষ্টি-মানসাকারই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা।

চিৎক্ষেত্রে এ মানসাকার যে মৌলিক চৈতন্য হইতে যে জ্ঞানশক্তি বিকাশিত হয়, সেই শক্তিই জ্ঞেয় বস্তু (মানসাকারে) প্রকটিত করিয়া দেয়। এ শক্তির মধ্যে আকর্ষণী ও বিয়োজনী ক্রিয়া আছে।

আকর্ষণই অনুরাগ, বিয়োজনই বিরাগ। এই আকর্ষণ বিয়োজন বা অনুরাগ বিরাগ প্রত্যেক জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে প্রধান কার্য্যকারী।

এক অনন্ত অসীম চিৎক্ষেত্রে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশক মানসাকার যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিরূপ (মানস-গ্রাহ্য) বস্তুভাবে এবং এ এ বস্তুর গুণ যথাক্রমে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-গ্রাহিকা শক্তি ভাবে প্রকটিত হয়; এ ভাবব্যঞ্জক মহামন বা মহত্তত্ত্ব কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়াভাবে ব্যক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন। এ মহামানস মধ্যে ভাবগ্রাহিকা শক্তিই কর্ত্রী। গ্রাহ্যভাব সমূহ—যথা আকাশ-বায়ু-তেজাদি কর্ম্ম এবং পূর্ব্বোল্লিখিত আকর্ষণ বিয়োজনই ক্রিয়া। উল্লিখিত আকর্ষণী ও বিয়োজনী ক্রিয়া হইতে প্রথমতঃ এ মানসক্ষেত্র কম্পিত (vibrated) হইয়া শব্দের ভাবরূপ আকাশ ও গতি উৎপন্ন বা কল্পিত হয়। তদ্দ্বারা স্পর্শের ভাবরূপ বায়ুর বিকাশ হয়। উহাদের সংঘর্ষণে রূপপ্রকাশক

তেজ বিকাশিত হয়। ঐ তেজের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ হইতে যথাক্রমে জল ও ক্ষিতি রূপ ভাবের বিকাশ হয়, এবং ঐ ঐ গ্রাহিকা শক্তি পৃথক্ পৃথক্ রূপে তত্তৎভাব গ্রহণের নিমিত্ত সজীব সূক্ষ্ম পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রির সহ জৈবতত্ত্বে পরিণত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ এবং বিয়োজন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা ঐ মানসপ্রোথিত ভাবসমূহকে নানাকারে গঠন করিয়া জড় জগদাকারে ভাসমান হয়। ঐ পঞ্চভূত এবং ভৌতিক জড়-জগতের ক্রমিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ভূতবিবেক ব্যাখ্যাকালে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ জড়াভ্যন্তরে পূর্ব্বোক্ত ত্রিতত্ত্ব-সংশ্লিষ্ট মানস-শক্তি গুহ্যভাবে থাকায় এবং পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণী ও বিয়োজনী প্রভৃতি সজীব-শক্তির আভ্যন্তরিক ক্রিয়া চলিতে থাকায়, ঐ জড়ের উপাদান সকল উদ্ভিদের উপাদানে এবং উদ্ভিদের উপাদান সকল জৈবোপাদানে পরিণত হইয়া, স্বেদজ কীট পতঙ্গাদি রূপে বিকাশিত হয়। ঐ সকল কীট পতঙ্গ রূপ ভাবের মধ্যে ভাবগ্রাহিকা শক্তি অনন্যভব্যীয় রূপে স্ফুরিত হওয়ায়, ঐ স্থান হইতে চক্রের গতি পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়; অর্থাৎ কর্ম্মরূপ ভাবপ্রবাহ পূর্ব্বোল্লিখিতমত ভূত ও ভৌতিক তত্ত্বে পরিণত এবং জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, যৌন কর্তৃত্বশক্তি রূপে পরিণতির জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মহা মানস-ক্ষেত্রস্থ ভাব ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিভক্ত ও এক একটি জড় বা জড়তত্ত্বাশ্রিত জীবরূপে বিকাশিত হয়। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব রূপ বস্তুর মধ্যে জৈবতত্ত্ব বিকাশিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত ত্রিতত্ত্বযুক্ত মানদশক্তি স্ফুরিত হইতে থাকে। ঐ ঐ কল্পিত ভাব-রূপ বস্তু যেন সজীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কল্পনা-কারী মনরূপে নব নব ভাব গ্রহণ ও উৎপাদন করিতে যেন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়। যেন ভাবের মধ্য দিয়া অহং চিহ্নিত ভাবগ্রাহক ও ভাবউৎপাদক কর্ত্তা শনৈঃ শনৈঃ বিকাশিত হন।

পাঠকগণ যদি পৌরাণিক সৃষ্টিপ্রকরণের উপাখ্যানটি বিশেষ করিয়া, উহার রূপক-গুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন, তবে সৃষ্টিরহস্য এবং ঐ সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে স্বেদজ জীবের উৎপত্তি এবং ঐ স্বেদজ জীব হইতে সৃষ্টিচক্রের গতির পরিবর্ত্তন স্পষ্ট-রূপে বুঝিতে পারিবেন। উদ্ভিদ এবং স্বেদজ জীবের মধ্যে উৎপত্তির প্রক্রিয়ার কিছু প্রভেদ থাকিলেও, উভয়ই প্রায় একই নিয়-মের অধীন; কিন্তু অণ্ডজ ও জরায়ুজ জীব-সৃষ্টির বাহ্য প্রক্রিয়া উদ্ভিদ ও স্বেদজ জীবের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া হইতে ভিন্নরূপ। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে, অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ এবং প্রাণময় মধ্যে মনোময় কোষ কিরূপে উৎপন্ন এবং প্রস্ফুটিত, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

এখন একটি কথা বুঝিবার আবশ্যক। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সমস্ত দৃশ্য বস্তু সেই নিরাকার চিৎক্ষেত্রস্থ বিরাট মানস-কল্পিত এক একটি ভাব ভিন্ন প্রকৃত কোন বস্তু নহে। এক চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। ঐ চৈতন্যই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে বিকাশিত হন মাত্র। যদি তাহাই হয়, তবে ঐ কল্পিত ভাবরূপবস্তু (যাহা প্রকৃতবস্তু নহে) প্রথ-মতঃ অন্নময়কোষে স্থূল-আকারবিশিষ্ট

দেহরূপে কিরূপে পরিণত হয়, এবং তন্মধ্যে প্রাণময়, মনোময়, ধীময় ও আনন্দময় কোষের বিকাশই বা কি প্রকারে হয়; যাহা প্রকৃত কোন বস্তু নহে, কল্পিত ভাবমাত্র তাহা কি প্রকারে দৃশ্য আকার অর্থাৎ স্থূল দেহ ধারণ করে? ইহার উত্তর এই যে, ঐ কল্পিতভাব প্রথমেই স্থূল আকারবিশিষ্ট কখনই হইতে পারে না। প্রথমতঃ চিৎক্ষেত্রস্থ মহৎ বুদ্ধিতত্ত্বই ক্রিয়া ও গতিশীল হইয়া সূক্ষ্ম জগৎরূপ মানস আকারবিশিষ্ট হন; অর্থাৎ অনন্ত চিৎক্ষেত্রে মানসকল্পিত জগৎ প্রকটিত হয়, এবং ঐ মানসক্ষেত্রস্থ জগৎ বাহ্যপ্রকাশের জন্য তাহাতে ব্রহ্মচৈতন্য চিদ্রূপে প্রবিষ্ট হইয়া, আকর্ষণীশক্তি-প্রভাবে ঐ সকল কল্পিত ভাব সত্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়া অনুভব করেন; উহারই নাম সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বা বিবর্ত্তবাদ।* ঐ সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় প্রথমতঃ অবনয়ন-প্রণালী অনুসারে চৈতন্যশক্তি জড়ভাবে মগ্ন হইয়া পুনরুন্নয়ন প্রণালী অনুসারে ঐ জড়ের মধ্য হইতে চৈতন্যরূপে স্ফুরিত হন; কিন্তু মহামানস-গ্রথিত ভাবরূপ জগৎ প্রথমতঃই স্থূলাকারে বা অন্নময়কোষে পরিণত হয় না। ঐ মানসগ্রথিত ভাবসমূহ মানসক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্মাকারে পরিণত ও গতিবিশিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বোক্তমত আকর্ষণী ও বিকর্ষণী ক্রিয়া দ্বারা স্থূল জড়াকারে পরিণত বা উপলব্ধ। স্থূল জড়ভাবের মধ্যে সুপ্ত চিৎশক্তি কর্ত্তৃক জড়ের উপাদান সকল গতিবিশিষ্ট হইয়া জীবভাবে পরিণত হইলে, যথাক্রমে অন্নময় ও প্রাণময় কোষের বিকাশ হয়। ঐ অন্নময় ও প্রাণময় কোষের মধ্যে মানসশক্তি অঙ্কুরিত হইলে, মনোময় কোষ-প্রস্ফুটিত বিজ্ঞানময় জ্ঞাতার আবির্ভাব হয়। প্রথমতঃ সমষ্টি-ব্রহ্ম-চৈতন্য মহামানসক্ষেত্রস্থ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে স্থূল জড়াকারে অর্থাৎ জড়জগতে পরিণতি পর্য্যন্ত সৃষ্টির অবনয়ন-প্রণালী, এবং পার্থিব বা ভৌতিক জগতস্থ জড়ভাবের মধ্য দিয়া অন্নময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষের বিকাশ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ পার্থিব জীব-জগতের প্রারম্ভ হইতে চরম উন্নতি পর্য্যন্ত) উন্নয়ন-প্রণালী। অবনয়ন-প্রণালীর তাৎপর্য্যই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণতি। উহার নিয়ম এইরূপ, যথা—প্রথমতঃ চিৎক্ষেত্রে মহৎ বুদ্ধিতত্ত্ব যে বিকাশিত হয়, ঐ বুদ্ধিতত্ত্বই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রথম কোষ; উহাই দর্শন-শাস্ত্রোক্ত মহত্তত্ত্ব। ঐ মহৎ বুদ্ধিতত্ত্বেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবের স্ফুরণ হয়, অর্থাৎ বিরাট পুরুষ প্রকৃতির গর্ভে মহামানসাকারে বিষ্ণু ও বিশ্বীজরূপে প্রকটিত হয়েন। কিন্তু ঐ জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তু প্রকাশের (সৃষ্টির) অভিমানরূপ অহংত্ব বা আমিত্ব-ভাব প্রকটিত না হইলে, অনুভাবক ও অনুভাব্য বিষয়ের পার্থক্য-উৎপত্তি হইবে কেন? আমিত্ববোধই ব্রহ্মের মায়াশক্তির কার্য্য। ঐ আমিত্বভাবের স্ফুরণ হইতেই সৃষ্টি-আরম্ভ; উহাই দার্শনিক হিরণ্যগর্ভ ও পৌরাণিক

* প্রকৃতপক্ষে দৃশ্য জগৎ একেবারে মিথ্যা বা অস্তিত্বহীন নহে। বিবর্ত্তবাদ অর্থে এক পদার্থের পদার্থান্তর-বিকাশ বুঝায়; এই জন্যই দার্শনিকগণ দৃশ্য জগৎ ইন্দ্রজালের সহিত তুলনা করেন বা রজ্জুতে সর্পভ্রম বলেন; বস্তুতঃ যাহা নাই, তাহার বিকাশ অসম্ভব।

ব্রহ্মা। ঐ মহামানসই বুদ্ধতত্ত্বে সৃষ্টির অভিমান রূপ আমিত্ব (ভাব) বা অহংতত্ত্ব ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বিতীয় কোষ; অতএব চৈতন্য, বুদ্ধি, মানস, এই ত্রিতত্ত্ব হইতেই মহাআমিত্বের বিকাশ হয়, এবং আমিত্বের বিকাশ মাত্রেই মহা মানসক্ষেত্রে কম্পিত অর্থাৎ গতিশীল হইয়া, ঐ আমিত্ব-বোধের বা জ্ঞানের নিকট শব্দের ভাবরূপ আকাশ স্ফুরিত হয়; ঐ মহাকাশই ব্রহ্মচৈতন্যের তৃতীয় কোষ; ইহাই বিশ্বের আদি ভূত। এ আকাশে পূর্ব্বোক্ত গতিবিশিষ্ট স্পর্শের ভাব রূপ বায়ুর যে বিকাশ হয়, ঐ বায়ু ব্রহ্মের চতুর্থ কোষ; ঐ বায়ুতে রূপপ্রকাশক তেজ বা তৈজসতত্ত্ব পঞ্চমকোষ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরব্রহ্ম-স্তোত্রম্।

(মহানির্ব্বাণতন্ত্রোদ্ধৃতম্।)

(১)

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥

তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকের শরণ,
তোমায় প্রণাম করি আমি অনুক্ষণ।
তুমিই বিশ্বের আত্মা, তুমি জ্ঞানময়,
তোমায় প্রণাম করি হইয়া তন্ময়।
তুমিই অদ্বৈত তত্ত্ব, মুক্তিদাতা তুমি,
তোমায় প্রণাম করি ভক্তিভরে আমি।
তুমিই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যাপ্ত চরাচর,
তোমায় প্রণাম করি আমি নিরন্তর।

(২)

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥

একমাত্র তুমি হও সবারি শরণ,
একমাত্র তুমি হও ভবে শ্রেষ্ঠ ধন।
একমাত্র তুমি হও হেতু জগতের,
একমাত্র তুমি বিশ্বরূপ এ বিশ্বের।
একমাত্র তুমি কর সৃষ্টি-স্থিতি লয়,
একমাত্র তুমি হও নিশ্চল নিশ্চয়।
একমাত্র তুমি সদা পূজ্য পরাৎপর
একমাত্র তুমি নির্ব্বিকল্প নিরন্তর।

(৩)

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥

ভয়-সমূহের তুমি ভয় অনুক্ষণ,
ভীষণের মধ্যে তুমি পরম ভীষণ।
তুমিই জীবের এক গতি সর্ব্বক্ষণ,
পাবন-গণের মধ্যে তুমিই পাবন।
তুমিই মহোচ্চ পদ দাও নিরন্তর,
রক্ষকের রক্ষাকর্ত্তা, তুমি পরাৎপর।

(৪)

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্,
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।

অচন্দ্রাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব,
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥

ওহে প্রভু! পরাৎপর! সর্ব্ব-রূপ ধর!
অক্ষর! অজ্ঞেয়! সত্য! ইন্দ্রিয়াগোচর
হে অচিন্ত্য! হে অক্ষর! সর্ব্ব-বস্তু-চর!
হে অব্যক্ত-তত্ত্ব! ভব-ভাসক! ঈশ্বর!
করুণা করিয়া তুমি আমাদের প্রতি,
যত দুরিত-দুর্গতি।

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম-
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

সেই এক বস্তুকেই মনে মনে স্মরি,
সেই এক বস্তুকেই সদা জপ করি;
জগতের সাক্ষী যিনি রন অনিবার,
সেই এক বস্তুকেই করি নমস্কার;
সবাই আশ্রয়ে যাঁর রহে সর্ব্বক্ষণ,
অথচ কাহারো যিনি আশ্রয় না লন;
ত্রিসংসারে স্থিতি যাঁর চিরদিন ধরি,
ভব-সাগরের যিনি একমাত্র তরি;
যাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলে ত্রিভুবন,
লইলাম একমাত্র তাঁহারি শরণ।

(৬-৭)

পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমা-
প্নুয়াৎ ॥
প্রদোষেঽদঃ পঠেন্নিত্যং সোমবারে
বিশেষতঃ।
শ্রাবয়েদ্ বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্
স্ববান্ধবান্ ॥

পরম ব্রহ্মের এই পঞ্চরত্ন স্তুতি
যেই জন পাঠ করে হয়ে একমতি,
জন সন্ধ্যায় ইহা নিত্য পাঠ করে,
বিশেষতঃ যেই জন ইহা সোমবারে,
ব্রহ্মনিষ্ঠ নিজ বন্ধু সকলে ডাকিয়া,
শ্রবণ করায় কিম্বা দেয় বুঝাইয়া;
কিবা সে পরম ব্রহ্ম, কিবা সেই জন,
উভয়ের মধ্যে ভেদ না রহে কখন!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন,
উদ্ভটসাগর, বি-এ

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা

স্মরণমঙ্গল-স্তোত্র।

[সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাশীধামে রসহীন অদ্বৈতবাদ বিলীন
প্রেমহীন সন্ন্যাসীসমাজে
প্লাবি কৃষ্ণ-প্রেমরসে, স্বজন-কৃপার বশে,
অবশেষে রূপের অগ্রজে—
হয়ে যিনি কৃপাবান, সুশক্তি করিলা দান,
বিষ্ণুভক্তি-স্মৃতি রচনায়;
ভজন বিষয়ে যিনি সাধুগুরু-শিরোমণি,
বন্দি সেই শ্রীগৌরাঙ্গরায়। ৫৮

"ধিক্ শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রতি প্রণতিবিহীন!
ধিক্ শুষ্ক-তর্কবাদদগ্ধ রসহীন!"
এইমত বাক্য কত লাগিল চলিতে
শঙ্কর-মতাবলম্বী সন্ন্যাসীমণ্ডলীতে। ৫৯

আমাদের মহত্ত্বে মহত্ত্বীনতায়,
চিনিতে লাগিল যাঁর পূজা অতঃপর ;
অদ্ভুত গুণানন্ত মূরতি যাঁহার,
স্মরি আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার।
গৌরহরির সুখ করি পুরী আগমন,
রামানন্দ সার্বভৌম আদি ভক্তগণ
ডুবিলেন তাঁর প্রেম রস-সাগরে ;
যাপিলেন বহুবর্ষ তথা ভক্তসঙ্গে।
হরিকৃপা-রসাস্বাদ পরিপূর্ণ যিনি,
গৌরহরি, সদা মম স্মরণীয় তিনি। ৬০

বিধি শিবারাধ্য যাঁর পাদপদ্ম
করিবারে দরশন,
প্রতি বর্ষে বর্ষে, রথোৎসবে হর্ষে
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ—
আসিতেন পুরী, হেরি গৌরহরি,
ভাসিতেন প্রেম রসে ;
মানসে মহতী লভিয়া প্রীতি,
ফিরিতেন নিজদেশে।
এরূপে উৎকল হতে যে সকল
ভক্তজন গৌড়গামী,
তাঁদের পরম সুহৃদ যে জন,
সে যতীন্দ্রে স্মরি আমি। ৬১

সন্ন্যাসীসংহতি, অতি অশোভিত
পায় নারী সম্ভাষণে,
সে হানি ঘটিতে স্বধর্মে রহিতে
যে ঈশ বাঞ্ছা মনে ;
তাই স্ত্রীসম্ভাষে— ক্ষুদ্র দোষাভাসে
ছোট হরিদাসে তায়!
করিলা দণ্ডন,— স্বসঙ্গ-বর্জ্জিত ;
প্রমোদিত যিনি তায়!
পরম পবিত্র সুচারু চরিত্র
ধরিলা ধরায় যিনি,
সাধু মূর্ত্তিধর গৌরাঙ্গ সুন্দর;
স্মরণীয় মম তিনি। ৬২

দৈবাধীন জীব জন্ম যার,
তত্ত্ববুদ্ধি প্রভাবে তাহার
আচার্য্যত্বে হয় অধিকার,
এই এক গূঢ় তত্ত্বসার ;
হয়ে যিনি অতি কৃপাবান,
প্রদ্যুম্নে দিলা এ তত্ত্বজ্ঞান,
জাতিশূন্য [illegible] দ্বারে—
স্মরি সেই গৌরাঙ্গসুন্দর। ৬৩

স্বভক্তগণের [illegible],
গোস্বামী [illegible] লভে,
[illegible]
[illegible] যিনি [illegible];
অন্তকালে সিন্ধু-তীরদেশে
স্থাপিলেন যিনি [illegible],
স্বপদ-[illegible],
স্মরি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু। ৬৪

রামচন্দ্রপুরী গুরুজননিন্দাকারী
কলি পাপ-কূপময় প্রাকৃতবুদ্ধিধারী,
উপেক্ষিয়া তারে, হরিজন-কৃপাশ্রিত—
অমোঘেরে করিলেন যিনি অঙ্গীকৃত,
সে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন
থাকুন আমার হৃদি-ভূপে সর্ব্বক্ষণ। ৬৫

কণ্ডুরস-পীড়িতাঙ্গ সনাতনে যে গৌরাঙ্গ
আলিঙ্গিলা স্পর্শিয়া প্রেমভরে ;
তার [illegible] কুষ্ঠ [illegible] যার কৃপাশক্তি,
স্মরি সেই দয়াময়-সাগরে। ৬৬

সরল উৎকল হতে রক্ষিলেন গোপীনাথে
[illegible] পুরুষ [illegible],
রামানন্দাদি ভক্তগণে নিজগণ জ্ঞান করে,
শিখাইলা এই ব্যবহার,—
"পালনীয় নিজগণ, [illegible] তাহা তাহা"
এরূপ স্বজন-[illegible]—
সেই ভদ্রমূর্ত্তিধর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুবর
অন্তরেতে স্মরি আমি সদা। ৬৭

স্বদেশ সমুপাগত নানা-উপায়ন যত—
রাঘব-প্রেরিত ভক্তিভরে ;
সেই ভক্ত-উপহার করিলা যে অঙ্গীকার,
স্মরি সেই গৌর পদাম্বুজে। ৬৮

জগদানন্দের প্রদত্ত তৈলের
প্রতিগ্রহ নাহি কার,
সন্ন্যাস-ধরম রক্ষিলা যে জন,
সে মহাপ্রভুরে স্মরি। ৬৯

জগন্নাথ-মন্দিরের মাঝে,
গরুড়-স্তম্ভের অতি কাছে,
প্রেমেতে বিহ্বলা এক বুড়ী,
যে গৌরহরির স্কন্ধে চড়ি,
শ্রীমূর্ত্তি করিল দরশন!
যে প্রভু তাহাতে তুষ্টমন!
থাকুন সে শচীর কুমার
স্মৃতিপথে সতত আমার। ১০

সুমধুরা শুদ্ধপদ-যোগ্যা—
ভক্তি যাঁর পুর[illegible] যোগ্যা,
পরিনিষ্ঠ পরিচর্য্যাদিত[illegible]
গোবিন্দ যাঁহার কৃপাশ্রিত,
স্বরূপাদি প্রিয়গণ-প্রতি
যাঁর মধুরসরূপা প্রীতি,
থাকুন সে শচীর কুমার
স্মৃতি-পথে সতত আমার। ১১

কৌপীন-উপরে সুশোভন
পরিহিত অরুণ বসন!
স্বর্ণ শৈলসম কান্তিধর
যাঁর সর্ব্বশরীর সুন্দর!
"রাধাকৃষ্ণ" নামের জপনে,
ধারা যাঁর বহে দুনয়নে!
থাকুন সে শচীর কুমার
স্মৃতিপথে সতত আমার। ১২

সুমধুর "হরিবোল" বলি,
গেয়ে গেয়ে নেচে নেচে চলি,
যান যিনি নিজজন সঙ্গে,
নগরের পথে প্রেমরঙ্গে;
সবে যিনি বলেন কাতরে,
"বল "হরি"—এ দুটি অক্ষরে;
থাকুন সে শচীর কুমার
স্মৃতি-পথে সতত আমার। ১৩

যে রহস্য শাস্ত্র সমূহের—
অবিদিত পূর্ব্বপণ্ডিতের,
শ্রুতির সে গূঢ় দশ তত্ত্ব,
প্রেম-মুকলিত যার সত্ত্ব,
শিখালেন অতি দয়া করি,
যে দয়াল প্রভু গৌরহরি,
থাকুন সে শচীর কুমার
স্মৃতিপথে সতত আমার। ১৪

এ ভবে পরমতত্ত্ব হরি,
হরি হন সর্ব্বশক্তিধারী;
হরি হন রসপারাবার,
জীবেরা বিভিন্ন অংশ তাঁর
কতক প্রকৃতি-কবলিত,
কতক ভাবেতে তদতীত;
এ সমগ্র বিশ্বের বিকাশ—
ভেদাভেদে হরির প্রকাশ!
সাধন বিশুদ্ধভক্তি হয়,
তাঁরপ্রেম সাধ্য সুনিশ্চয়;
জনগণে উপদেশ এই—
দিলা স্বয়ং গৌরচন্দ্র সেই॥ ১৫

হরিপ্রিয় ব্রহ্মা আদি হতে
বেদ যত বিদিত জগতে,
স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ম্প্রমাণ,
সহিত প্রত্যক্ষ-অনুমান;
তাঁহার প্রেমের নববিধ,
বেদেতেই বিদিত বিহিত;
অচিন্ত্য বিষয়ে তর্ক-যুক্তি
প্রবেশিতে নাহি ধরে শক্তি। ১৬

বিধি-শিব সুরেন্দ্র-বন্দিত
এক তত্ত্ব হরি, বেদে বৃত্ত;
প্রকৃতিবিহীন ব্রহ্ম যিনি,
যাঁহার শ্রীঅঙ্গপ্রভা তিনি!
বিশ্বময় বিশ্বের জনক
পরমাত্মা যাঁহার অংশক;
নবজলধর-কান্তি যিনি,
চিন্মুদিত রাধাকান্ত তিনি। ১৭

হইয়াও পরাশক্তি হইতে অভিন্ন,
আত্মমহিমায় যিনি নিত্য প্রতিপন্ন;
জীবশক্তি-চিৎশক্তি-অচিৎশক্তি আর,—
এই ত্রিপাদিকা হয় ইচ্ছাশক্তি যাঁর;
সে শক্তি-সাধিত যাঁর সমস্ত বিষয়,
নির্ব্বিকার সে পরম পুরুষের জয়! ১৮
হ্লাদিনী স্বরূপা সেই প্রেমময়ীসঙ্গে,
সম্বিৎ-সুপ্রকটিত ভাবরস-রঙ্গে,

সন্ধিনী-স্বপ্রকাশিত শ্রীধামনিচয়ে,
রসের সমুদ্রমাঝে নিমজ্জিত হ'য়ে,
যাঁহার স্বরূপতত্ত্ব নিত্য ব্যক্ত রয়,
ব্রজরসবিলাসী সে শ্রীহরির জয়! ৭৯

জলদগ্নি হ'তে স্ফুলিঙ্গ যেমন,
চিৎ হ'তে জীব চিৎকণ তেমন,
হরি সূর্য্য, জীব জ্যোতিঃকণরূপ,
অভিন্ন হয়েও বিভিন্নস্বরূপ;
প্রকৃতির পতি, মায়া-অধীশ্বর
যিনি এ জগতে, তিনিই ঈশ্বর।
মুক্ত হ'য়ে সেই প্রকৃতিতে বদ্ধ,
স্বগুণানুসারে, সেই জীবতত্ত্ব। ৮০

স্বরূপার্থহীন, নিজসুখ লীন,
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ যারা,
হরির মায়ার গুণ-পাশ-ভার
দণ্ডে দণ্ডনীয় তারা।
স্থূল লিঙ্গ আর, দেহ দ্বিপ্রকার,
কর্ম্মবন্ধে ক্লিষ্টঅতি;
চড়িছে স্বরগে, পড়িছে নরকে,
এইমত জীব-গতি। ৮১

ভ্রমিতে ভ্রমিতে হরিরসামৃতে
রসিক বৈষ্ণবজনে—
কচিৎ দর্শনে তদনুগমনে
রুচি হয় জীব-মনে।
ক্রমে "হরি হরি" উচ্চারণ করি,
মায়াদশা যায় তার;
স্বরূপ সে লভে, ভুঞ্জে সে এ ভবে
নিরমল রসসার! ৮২

চিদচিৎ এ বিশ্বমণ্ডল,
হরিশক্তি-পরিণতি-ফল।
বিবর্ত্তন অসত্য অশুদ্ধ,
কলিমল, বেদের বিরুদ্ধ।
হরি-ভেদাভেদ-তত্ত্বফল—
শ্রুতি-সুবিহিত সুবিমল;
সে তত্ত্ব হইতে নিত্য হয়—
নিত্যতত্ত্বে সিদ্ধ প্রেমোদয়। ৮৩

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন,
স্মরণ ও চরণ-পূজন,
অর্চ্চনা-বন্দনা-সেবকতা,
সখ্য-আত্মনিবেদন তথা;
এই নব অঙ্গ শ্রদ্ধাভরে
অনুদিন সাধন যে করে,
আহা! সেই ভক্ত সুনিশ্চয়
সুবিমল রতিদীপ্ত হয়। ৮৪

স্বরূপাবস্থিত ভক্ত যবে হয়,
মধুর রসের সঙ্গে ভাবোদয়;
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-যুগল-ভজনে
ভাব জাগে, স্ফূর্ত্তি নন্দনন্দনের.
প্রীতি [illegible]ঐশ্বর্য্য অতুল জগতে—
লভিয়া অন্তরে, পরানন্দে মেতে,
বিলাস তত্ত্বের রস-সাধনায়,
চরমে পরম সেবানন্দ পায়! ৮৫

কেবা প্রভু, জীব কেবা, এ জড়জগৎ কিবা,
বিচারি এ অনর্থ প্রচুর,
ভক্তিভরে যেই জন করেন হরিভজন,
সেইজন শাস্ত্র-সুচতুর।
অভেদ-মুক্তির আশ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পাশ,
সর্ব্ব অপরাধ তেয়াগিয়ে,
হরিভক্তগণ সঙ্গে হরিদাস ভাসে রঙ্গে,
হরিনামানন্দরস পিয়ে। ৮৬

সেবি দশমূল মহৌষধি,
বিনাশি অবিদ্যা-মহাব্যাধি,
সাধুসঙ্গে ভক্তজন ভবে
আত্মতুষ্টি ভাবপুষ্টি লভে। ৮৭

নিজ পাদপদ্ম-অলিগণে,
এই সব শিক্ষা বিতরণে,
নিজ দীর্ঘোজ্জ্বল দেহটিরে
স্নাত করি নিজ নেত্রনীরে,
জগতের অনুপম বন্ধু,
যতিবর পরানন্দসিন্ধু,
সদা সেই শচীর কুমার
স্মৃতিপথে রহুন আমার! ৮৮

গতি যিনি বর্ণাশ্রমী গৌড়ীয় জনের,
সরলহৃদয় দীন উড়িয়াগণের,
পাশ্চাত্য সদরচিত্ত সুধীদের তথা;
রহুন সে শচীসুত স্মৃতিপথে সদা। ৮৯

আহা! মিশ্রালয়ে, পতিপতি-বিরহে,
উৎকণ্ঠিতচিত্ত কত।
গ্রন্থি শিথিলিত, অস্থি দীর্ঘীকৃত
বিশাল শ্রীকর পদ।
ক্ষিতি নিপতিত, মাত বিকলিত,
মুখে বাণী গদগদ।
সে শচীকুমার রহুন আমার
সদা স্মৃতিপথগত। ৯০

[illegible] পাষাণ-রচিত
গৃহ [illegible] ছাড়িয়া,
ভাঙিয়া প্রাচীর, [illegible]
প্রকোষ্ঠেতে প্রবেশিয়া,
সঙ্কোচিত কায়, পতিত ধরায়,
যেন কচ্ছপের সম,
সে শচীকুমার করুন বিহার
সদা স্মৃতিপথে মম। ৯১

স্মরি বৃন্দাবন করিয়া ক্রন্দন,
বিরহ-বিকল-মন,
ধরিত্রি-গায় ঘর্ষিয়া হায়!
ক্ষরিতাক্ত শ্রীবদন।
"মম কান্ত হায়! সে কৃষ্ণ কোথায়,
বল বল" প্রলপিত—
সে শচীকুমার রহুন আমার
স্মৃতিপথে সমুদিত। ৯২

সিন্ধুতীরস্থিত বালু-বিনির্মিত
চটক পর্ব্বত-পরে,
গোষ্ঠের ভ্রমণে, গোবর্দ্ধন-ভ্রমে
কৃষ্ণ দরশন তরে,
সহ নিজগণ যে গৌরাঙ্গ হন
প্রধাবিত—প্রমুদিত,
সে শচী-কুমার রহুন আমার
স্মৃতিপথে সমুদিত। ৯৩

জন-গণ-সুখকরী করুণা প্রকাশ করি
সংসার-কূপেতে মগ্ন দাস রঘু দেখে
যে পুরুষ উদ্ধারিলা, দিলা গুঞ্জা মালা শিলা,
নমি আমি ভক্তিভরে সে গৌরাঙ্গদেবে। ৯৪

সাধুভক্তি-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদ বৃন্দের,
সহ বহির্মুখদের, বৈরস্তভাবাদি,
ভাসিয়া এ সব সঙ্গে, সুভক্তসমাজে রঙ্গে
বিরাজিত শ্রীগৌরাঙ্গে নমি নিরবধি। ৯৫

বহিরঙ্গ-পাত্রে করি হরিনামার্পণ,
হইলেন লোকে যিনি কলির পাবন;
অন্তরঙ্গ-পাত্রে যিনি রসতত্ত্বদাতা,
ভক্তিভরে নমি আমি সে গৌরাঙ্গে সদা। ৯৬

আশ্রিত যাঁহারা "কৃষ্ণচৈতন্য" নামের,
নামাপরাধের দায় নাহি তাঁহাদের,
হইলেন জনে যিনি পরাভক্তিদাতা,
ভক্তিভরে [illegible] নমি আমি সে গৌরাঙ্গে সদা। ৯৭

এই লীলাময় স্বরূপ-শ্রীমান্
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভগবান,
চব্বিশ বৎসর যাপি গৃহবাসে,
সমকাল যিনি যাপিলা সন্ন্যাসে;
সর্ব্বলোকাশ্রয় শ্রীচরণ যাঁর,
বন্দি আমি সেই গৌরঅবতার। ৯৮

দীনে দয়া করি যেই দয়াময়
তুষিলেন দিয়া ধন-বস্ত্র চয়,
ক্ষুধিত অতিথিগণে দিয়া অন্ন,
প্রীত করি যিনি আপনি প্রসন্ন;
বিদ্যার্থীরে করি বিদ্যাধন দান,
হইলেন যিনি অতি প্রীতিমান,
সেই শ্রীগৌরাঙ্গ সতত আমার
স্মৃতিপথবীথে করুন বিহার। ৯৯

সন্ন্যাস প্রারম্ভে যিনি তীর্থযাত্রা করি,
বঙ্গবর্ষ ভক্তিময় জগতে বিতরি,
পুনঃ পুরীধামে ফিরি আসি অতঃপর,
যাপিলেন নীলাচলে দ্বাদশ বৎসর;
নিরন্তর যোগমায়া-বলে বলীয়ান্—
বন্দি সে প্রকট গৌর-চরিত্র মহান্। ১০০

তারপর হায়! হায়! কি কব আগত!
সর্ব্ব জগতের—ভক্তের বিশেষতঃ;
সন্ধ্যাসমাগমে—হরিকীর্ত্তন সময়ে,
শ্রীগোপীনাথ দেবের মন্দির-আলয়ে,
স্বভক্ত গণের চক্ষু মায়ামুগ্ধ করি,
অকস্মাৎ অন্তর্হিত শ্রীগৌরাঙ্গহরি।

তাঁহার যে অপ্রাকৃত নিত্যপ্রকটিত
শ্রীলীলাচরিত সম নিরত বন্দিত ॥ ১০১
সর্ব্বদা সর্ব্বত্র—গৌড়দেশে বিশেষতঃ,
যে ভক্তেরা হয় ভক্তি-নির্ম্মলচিত,
এ লোকের গৌর-গাথা গান উচ্চরবে,
যুগল-ভজনে সিদ্ধ করিতে সবারে,
বিতরণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণবঁধু—
প্রদান করেন তুমি প্রেমাবেশ-মধু। ১০২

শ্রী... মিত্র,
(অনুবাদক।)

বিপ্লব।

—•—

কোন নগরবাটিতে মহামারী প্রবর্ত্তিত হইলে, সামান্য সামান্য ঔষধ, প্রতিষেধ বা সতর্কতাদি অবলম্বনে বিশেষ কিছুই ফলোদয় হয় না; তখন কোন একটা প্রবল প্রাকৃতিক বিপ্লব, যথা—ঝড়-ঝটিকা বা অতিবৃষ্টি প্রভৃতি উপস্থিত না হইলে, অথবা কোন প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া নগর দগ্ধ না করিলে, কিম্বা নগরবাসিগণ একেবারে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাস্থ্যকর স্থানান্তরে প্রস্থান না করিলে, মহামারী বিপদের কোনরূপ বিশিষ্ট প্রতীকার হইতে পারেনা। সচরাচর দেখা যায়, যে কোন বিষয়ে যে কোন উপদ্রব উপস্থিত হয়, তন্নিরাকরণার্থ তদুপযুক্ত উপায়াবলম্বনই আবশ্যক হয়। একখানি প্রাচীন গৃহ পুনঃ পুনঃ জীর্ণসংস্কার দ্বারা রক্ষা করিলেও, কিছুতেই তাহা সুরক্ষিত হইতে পারে না; উহার আমূল পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক উহাকে নূতন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

একমণ ভারবিশিষ্ট একটি বস্তু উত্তোলন করিতে হইলে, একমণ উত্তোলনী শক্তিই আবশ্যক। যদি একসের-উত্তোলনী শক্তি চল্লিশ বার, এমন কি—শতবার প্রয়োগ করা যায়, তথাপি উহা উত্তোলিত হইবে না। উহার উত্তোলনার্থে একেবারেই একমণ-উত্তোলনী শক্তি আবশ্যক। অনুপযুক্ত শক্তির প্রয়োগ আজীবন করিলেও কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। উপর অঙ্গার খণ্ড একেবারে ধরাইয়া দিলে যেরূপে আমার ভাত হইয়া যায়, সেস্থলে এক একখানি করিয়া বহুসংখ্যক অঙ্গার খণ্ড পোড়াইলেও আমার চাউল সিদ্ধ হইবেনা। বহু দিনের পুরাতন দামদলাবৃত পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইলে, শুধু উপরের উদ্ভিজ্জ-আবর্জ্জনাদি তুলিয়া ফেলিলেই ফল হয়না; নীচের পূতিপঙ্কে দামদলের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, আবার উহা পূর্ণ হয়; সুতরাং তাহার সেই দামপচা জল সম্পূর্ণ সেঁচিয়া পঙ্কোদ্ধার করা ব্যতীত পূর্ণসংস্কার সম্ভবেনা।

যেখানে কোন বিশেষ প্রাকৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, সেখানে তৎপ্রতীকারের পযোগী বিশেষ উপায় অবলম্বন ভিন্ন উদ্দেশ্যসিদ্ধি অসম্ভব। যাহার শরীরটি একেবারে পূর্ণরূপেই "ব্যাধিমন্দিরং", তাহার সামান্য টোট্‌কা টাট্‌কা ঔষধে কিছু হইবেনা; তাহার দেহের আমূল সংশোধক, সর্ব্বযন্ত্র-সংস্কারক ও রক্ত-পরিষ্কারক রসায়ন মহৌষধের প্রয়োজন।

কোন স্থান মল-মূত্রাদি দূষিত গলিত অমেধ্য পদার্থে পূর্ণ হইলে, সামান্য জল-

প্রক্ষালনাদি উপায়ে তাহা সংশোধিত হইবার নহে ; তজ্জন্য একটা প্রবল প্লাবনের প্রয়োজন। প্লাবনের প্রবল প্রবাহে সমস্ত দূষিত পদার্থ দূরীভূত হইয়া, সেস্থান প্রক্ষালিত ও সুমার্জ্জিত হইয়া যাইবে এবং ঐ অস্বাস্থ্যকর স্থানে পুনরায় সুস্বাস্থ্য বিরাজ করিবে।

সমাজে সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক বা রাজনৈতিক, যে কোন সামান্য ২ বিকৃতি-বিপর্য্যয়াদি উপস্থিত হয়, তাহার নিরাকরণ করিবার জন্য আমরা যে ক্ষুদ্র ২ উপায়াবলম্বন করিয়া থাকি, তাহাকে আমরা 'সংস্কার' (চলিতার্থে মেরামৎ) বলিয়া থাকি ; কিন্তু ঐ সমস্ত বিকৃতি বা বিপর্য্যয় যখন গুরুতর আকার ধারণ করিয়া সমাজ একেবারে বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করে, তখন দেশব্যাপী প্লাবনের ন্যায় কোন সুবৃহৎ উপায়াবলম্বন আবশ্যক হয়। এইরূপ উপায়াবলম্বনকেই 'বিপ্লব' বলা যাইতে পারে। বিপ্লব যেখানে অনাবশ্যক, অর্থাৎ কেবল উচ্ছৃঙ্খল হুজুকের ফল মাত্র, সেখানে 'বিপ্লব' অনিষ্টকর অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে ; কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ মহাপ্রতীকারোপায় স্বরূপ যে বিপ্লব, তাহা বস্তুতঃ মহাসংস্কার বা পূর্ণ সংস্কার মাত্র ; সুতরাং উহা ভগবদভিপ্রেত ও মঙ্গলপ্রসূ, সন্দেহ নাই। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলেই জাতিগত মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়া, জাতীয় জীবন নূতন করিয়া গড়িয়া গিয়াছে। সমগ্র জাতিকে এক নবসঞ্জীবনী শক্তি সংযোগে সজীব, সবল ও সমুন্নত করিয়া দিয়াছে।

মানবজাতির উপর নানাবিধ অন্যায় প্রভুত্ব দ্বারা অত্যাচার করিতে পারে। ধন, বল, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদির যেরূপ সুব্যবহার আছে, সেইরূপ অপব্যবহারও আছে। ইহাদের কোন একটির সমাজব্যাপী অপব্যবহার যখন অতিমাত্র বর্দ্ধিত হয়, তখনই সমাজে স্বাভাবিক নিয়মে বিপ্লবের প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ফরাসী জাতির বিগত বিখ্যাত রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয় চিন্তা করুন। সাধারণ প্রজাবর্গ পার্থিব ধন-বল-প্রভুত্বের কেন্দ্র স্বরূপ রাজশক্তি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া যে দেশব্যাপী জাতীয় মহাবিপ্লব উপস্থিত করিল, তাহারই পরিণাম মহাসংস্কার স্বরূপে সমগ্র জাতিকে সুসংস্কৃত—নবীভূত করিয়া দিল। অত্যাচারের নিদানভূতা সেই রাজশক্তি সমূলে সমুৎপাটিত হইয়া তৎস্থলে প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। আজ পাশ্চাত্য সভ্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ আদর্শ স্বরূপ "ফরাসী-সাধারণতন্ত্র" সেই মহাবিপ্লবেরই মহৎ ফল।

ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লবের একটি উদাহরণ মনে করুন। সমগ্র খৃষ্টান-জগতের একমাত্র ধর্ম্মাধিনেতা 'পোপ' সমগ্র ইউরোপীয় খৃষ্টিয়ান জাতিকে স্বীয় অসাধারণশক্তির সম্পেষণে নিপীড়িত, নির্জ্জীব এবং ক্ষীণধর্ম্মপ্রাণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহারই অতি বিবর্দ্ধন-জনিত নৈসর্গিক নিয়মে খৃষ্টান-সাধারণে এক মহাধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইল, এবং উহা পোপের বিশ্ববিজয়ী প্রভুত্ব হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিয়া, সমগ্র খৃষ্টান জাতিতে এক নবধর্ম্মবল ও নবজীবন আনয়ন করিল।

ভারতের বিখ্যাত বৌদ্ধ-বিপ্লব স্মরণ

করুন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বালোচনায় জানা যায়, ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের উত্থান-পতনশীল তরঙ্গায়িত গতির তাৎকালিক পতনে ভারতে বৈধহিংসা-বিহিত যাগ-যজ্ঞের স্থলে যখন অবৈধহিংসাশ্রিত যাজ্ঞ-যজ্ঞসমূহ অতিচাররূপে পরিণত হইয়া, ভারত-ভুবনের ধ্বংস সাধনের উপক্রম করিল, তখন—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

এই রূপ অঙ্গীকার-সূত্র ধরিয়া ভারতবক্ষে বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইলেন। তারপর বৌদ্ধাবতারের সেই ভারতব্যাপী বিরাট-ধর্ম্মবিপ্লবের মহাবিপ্লাবন উপস্থিত হইল, এবং শ্রীবুদ্ধদেব তৎসাময়িক সেই হিংসা-পাপে ধ্বংসোন্মুখ পশু-রক্ত-প্লাবিত ভারতবর্ষকে মৃতসঞ্জীবন অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পুনঃসঞ্জীবিত করিলেন। ভারতে ধর্ম্মবিপ্লবের এই জগদ্বিখ্যাত জীবন্ত পরিণামফল ইতিহাসের অমর অক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে।

তারপর আবার "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ" বাক্যে বিখ্যাত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বৈদিক-ধর্ম্মের পুনর্বিজয়ভেরী বাজাইয়া ভারত স্তম্ভিত করিলেন। আবার ভারত-ধর্ম্ম-সাগরে নব-বিপ্লব-বাত্যা সমুত্থিত হইল। জ্ঞানমার্গে বেদান্তত্ত্ব প্রবাহিত হইল। কর্ম্মমার্গে নানা দেবদেবীর মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কালে বৌদ্ধধর্ম্মের শুষ্ক জ্ঞানতর্কের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধির ফলে ভারতে ভবতাপ-জুড়ানো ভক্তিধর্ম্ম একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাৎকালিক ভারতসমাজে 'জ্ঞানী' পদে পরিচিতেরা কেবল ভক্তিশূন্য শুষ্ক হৃদয় লইয়া আত্মতাপে আপনি পুড়িতেছিলেন; আর ইতর অজ্ঞানেরা ঘোর রজস্তমসাচ্ছন্ন হইয়া সমাজ-শান্তি ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, তখন শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। বৌদ্ধ-বিকৃতি-বিপর্য্যস্ত আর্য্যসমাজ সেই শঙ্কর-বিজয়-বিপ্লাবনের শুভফলেই পুনঃ প্রকৃতিস্থ ও স্বীয় সনাতন আর্য্যধর্ম্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আজিও এই পতিত ভারতের যে 'শিখ' জাতি জগতে মহা বীরজাতি বলিয়া অভিনন্দিত হইতেছে, যে গুরুগোবিন্দ সিংহের বীরমন্ত্র সঞ্জীবিত শিখজাতি আজ মহাসংগ্রামে বৃটিশসিংহের বাহুবল বিবর্দ্ধিত করিতেছে; ভারতভূমি যে বীরপ্রসূ, যে জাতি তাহার নির্ব্বাপিতপ্রায় শেষ পরিচয় আজও জগতে জানাইতেছে, সেই শৌর্য্য-মূর্ত্তিমান শিখ জাতির এই বীরবীর্য্যবান নবজীবন কেবল একটি মঙ্গল-পরিণাম মহৎ বিপ্লবের ফল মাত্র।

এদিকে বঙ্গে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের নবানুরাগের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে তৎসাময়িক বাহ্যপঞ্চমকারাদিমত্ত বঙ্গীয় তান্ত্রিক শাক্ত-প্রধান সমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই অমৃতময় ফলে আজ অমৃতময় ভগবন্নাম-কীর্ত্তন সম্পূর্ণ ভিন্নদেশীয় ও ভিন্নজাতীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম সমাজেও প্রবেশ করিয়াছে। অন্নপ্রাণ কলি-কলুষ-কাতর জীবের সুসাধ্য ভবপাশ-নাশন ভগবন্নাম-সাধন গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের প্রবল-প্রেম-প্লাবন-তরঙ্গেই অঙ্গে—বঙ্গে—উৎকলে—কলিঙ্গে—

তাৎকালিক ভারতের প্রায় সর্ব্বাংশে বিস্তারিত ও বিতরিত হইয়াছিল।

এগুলি প্রায় সমস্তই সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লবের মঙ্গল-পরিণামিতার সমুজ্জ্বল উদাহরণ। এক্ষণে ভারতের একটি ধর্ম্ম ও রাজনৈতিকতার বিমিশ্র বিপ্লবের বিষয় বিবেচনা করুন। যখন যবন-গৌরবরবি ভারতাকাশে পশ্চিম প্রান্তে রক্তাক্ত অঙ্গ অস্তগমনোন্মুখ, তখন সেই আসন্নমৃত্যু বিকারাচ্ছন্ন রোগীর বিকৃত হস্ত বিক্ষেপের ন্যায় যবনের রাজমদ-দৃপ্ত অত্যাচারে ভারতীয় হিন্দুপ্রজার ধর্ম্ম, সমাজ, শরীর, মন, ধন, প্রাণ, সমস্তই বিপন্ন ও অবসন্ন হইতেছিল; এবং তখনই ভারতে সেই মহারাষ্ট্রমহাবীর, মহাশক্তি ভবানীর সার্থক সাধক শিব-প্রসাদ প্রদীপ্ত শিবজীর অভ্যুদয় হইয়াছিল; আর সেই হইতে ক্রমে ভারতে যে মহারাষ্ট্র-শক্তি-সৃষ্ট রাষ্ট্রবিপ্লব ঘনীভূত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়া দেখিলে, তাহারই শেষ শুভপরিণাম এই ইংরাজরাজ! মহারাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল পবনোচ্ছ্বাসে ভারতাকাশে ভীষণ রাজনৈতিক কৃষ্ণমেঘমালা দিগন্তে অপসারিত হইলে, এই যে নবসূর্য্যের সুপ্রকাশ হইয়াছে, তাহারই অপূর্ব্ব আলোকে আজ ভারত-ভূলোক আলোকিত এবং আশার প্রসন্ন প্রমোদে পুলকিত!

ভারতে আবার এখন যেন একটি আসন্ন বিপ্লবের সূচনা শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চারিত হইতেছে। সেটি অবশ্য ধর্ম্মবিপ্লব। ইংরাজ-রাজের সুশাসনে কোনরূপ রাজনৈতিক বিপ্লবের আশঙ্কা বা আবশ্যকতা নাই; কিন্তু আবার একটি ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লবের আশঙ্কা না হউক, কিন্তু আবশ্যকতার সূচনা অনুমিত হইতেছে। অবশ্য ভগবদিচ্ছায় তাহা যথাসময়েই সম্পাদিত হইবে, ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস। ফলে বর্ত্তমান ভারতে জন-সাধারণ-সমাজে ধর্ম্মের যেরূপ শোচনীয় অধঃপতন উপস্থিত, তাহাতে এই ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্র ভারতে সময়োপযোগী ধর্ম্ম-কর্ম্মের সংস্থাপনার্থ আবার কোন অবতার বা তত্তুল্য মহাপুরুষের সমুত্থান ও সমাজ-সংস্কার [illegible] বলিয়াই বোধ হয়। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির বীজ ধর্ম্মেই নিহিত। এই ধর্ম্মের চরম ও পরম অভ্যুদয়ের ফলেই ভারত একদিন এ মহীমণ্ডলের মুকুট-মণিরূপে শোভা পাইয়াছিল এবং সেই ধর্ম্মের পতনেই ভারতের আজ এই পতন; সুতরাং সেই ধর্ম্মের পুনরুত্থানেই ধর্ম্ম-সর্ব্বস্ব ভারতের পুনরুত্থান অবিচ্ছিন্ন-সূত্রে অনুস্যূত। অতএব এই মহাপতনের পর মহৎ-পুনরুত্থান সাধনার্থেই বোধহয় আবার একটি মঙ্গল-পরিণাম মহা ধর্ম্ম-বিপ্লব আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী। তবে কিনা, সব ভগবদিচ্ছা বা ভবিতব্যতা।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্ট্রী কৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পঞ্চম শ্লোকালোচনার পরিশিষ্ট।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

"অয়ি নন্দতনুজ"!—"অয়ি—কোমলামন্ত্রণে"—যাঁহাকে অতি মোলায়েম ভাবে ডাকিতে হয়, তাঁহারই সম্বোধনে "অয়ি" শব্দ প্রযোজ্য। সাধারণতঃ এবং সচরাচর স্বভাব-সুকুমারী স্বতঃমাধুর্য্যময়ী রমণীজাতির প্রতিই "অয়ি" সম্বোধনের প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে যেখানে আবার বড় স্নেহাদয়ের বিশেষত্ব হইয়া পড়ে, সেখানে হয়ত পুরুষের প্রতিও ঐ সম্বোধনটি নর-নারীর নবনীতনিন্দিত হৃদয়-বিশেষ হইতে উছলিয়া উঠে। মহাকবি কালিদাস রতির মুখে হরকোপানলদগ্ধ পতির উদ্দেশে "অয়ি জীবিতনাথ!" বলাইয়াছেন। ভারতীয় কাব্য-পুরাণাদিতে এরূপ উদাহরণ অপ্রচুর হইলেও অপ্রাপ্য নহে।

এখানে কোমল আমন্ত্রণের পাত্র কে? সেই জগজ্জীবিতনাথ নন্দতনুজ। আহা! যাঁহার তুল্য সুন্দর নাই, যাঁহার তুল্য মধুর নাই; যাঁহার তুল্য প্রিয়তম—প্রাণপ্রতিম—প্রাণাধিক কেহ নাই, এখানে কোমল আমন্ত্রণসূচিত 'অয়ি' সম্বোধনের পাত্র সেই হৃদয়ানন্দ নন্দতনুজ।

"হে" ঐশ্বর্য্য-সম্বোধন; "অয়ি" মাধুর্য্য-সম্বোধন। কৃষ্ণকৃপায় "হে কৃষ্ণ!" অনেকে বলিয়াছে; কিন্তু "অয়ি কৃষ্ণ" বলার লোক বড় কম। তবে অবশ্য কৃষ্ণকৃপায় সবই হইতে পারে। মাধুর্য্যাধিকারী সাধক যা খুসি তাই বলিতে পারেন। তাঁর ভগবানের কাছে আদব্ কায়দার দরকার নাই। আদব্ কায়দার সীমা ঐশ্বর্য্যতত্ত্বেই সমাপ্ত। মাধুর্য্যাধিকারী ভক্ত 'অয়ি' 'হে' সবই বলিতে পারেন। অধিক কি, 'রে'

বলিতেও পারেন। ব্রজমণ্ডীরা ও ব্রজ-রাখালরা ত সদাই 'রে' বলিতেন। 'বাৎসল্য' ও 'সখ্য' রসের সাধকেরা মাধুর্য্যাধিকার-বলে মুখে সর্ব্বদা 'রে' বলুন আর না বলুন, তাঁদের সেই চঞ্চল প্রাণ-কৃষ্ণটির প্রতি কেবল প্রাণেরই টান,—সম্ভ্রমের ভাব কিছুই নাই। ভগবানও মুখের কথায় ধার ধারেন না। সে চিরপ্রসিদ্ধ চিত্তচোরের চিত্তটি লইয়াই কারবার। অতএব মাধুর্য্যাধিকারী ভক্তেরা মুখে যাহাই বলুন আর না বলুন, বাহিরে কিছু ভজনাদের ক্রিয়া করুন বা না করুন, ভগবান তাঁহাদের 'হে' 'রে' 'অয়ি'—সকল সম্বোধনেরই পাত্র। ভগবৎকৃপায় মাধুর্য্য-ভক্ত 'বৈধী' উপাসনার সীমা অতিক্রম করিয়া "রাগানুগা" উপাসনায় পঁহুছিয়াছেন। তখন তাঁহার কথাই বিধি। তখন তাঁহার কথাই ভগবানের কথার পার্থিব ভাষানুবাদ বলিয়া গ্রহণ করাই সাধু-গুরু-কৃপাপিপাসু সাধকসমাজে সাদরস্বীকৃত। যাহা হউক, ভগবানের মাধুর্য্যতত্ত্বে সাধনাধিকারী ও রাগানুগভক্তিপথানুসারী ভাগ্যবানই ভগবানকে মাধুর্য্যসম্বোধনে 'অয়ি' বলিবার স্বাভাবিক অধিকারী।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মাধুর্য্যভাবেই প্রাণপ্রিয়তম সখাজ্ঞানে কৃষ্ণপ্রেমে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন; তারপর যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভুবনপাবনী ভগবদ্গীতার মধুবর্ষণ-মধ্যে অকস্মাৎ, তাঁহার সেই প্রাণকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নিঃসংশয়ে বিশ্বাস হইল, তখনই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যতত্ত্বের চমক আসিয়া অর্জ্জুনের চিত্তে লাগিল; অমনি কৃষ্ণবিষয়ে অর্জ্জুনের ভয়-বিস্ময়-সম্ভ্রম-সমাদরের ভাব যেন যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন অর্জ্জুনের সেই স্থির ধীর নীরব নিশ্চল মাধুর্য্য-ক্ষীরোদহ্রদে অকস্মাৎ ঐশ্বর্য্যের প্রবল প্রখর বন্যাপ্রবাহ মহা কল কল কল্লোলগর্জ্জনে যেন দিগন্ত ভাসাইয়া আসিয়া পড়িল! অমনি কৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ হওয়ায়, অর্জ্জুনের ঐশ্বর্য্য-পূর্য্যাহত মনশ্চক্ষে যেন আঁধারি লাগিল! অর্জ্জুন ভীত, বিস্মিত, অবনত ও করযোড়যুত হইয়া, "ঈশ্বর" কৃষ্ণের উদ্দেশে পুনঃ২ প্রণাম করিয়া, তাঁহার সেই "মধুর" কৃষ্ণের প্রতি আপনার পূর্ব্বব্যবহার স্মরণে আপনাকে অপরাধী বোধে কহিয়াছিলেন,—

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং,
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥"

অর্থাৎ—

সখা জ্ঞানে যত বলেছি তুচ্ছিয়া,
হে কৃষ্ণ! হে সখে! হে যাদব! ইতি।
প্রমাদে অথবা প্রণয়ে ভুলিয়া,
না জানিয়া তব মহিমা এমতি॥

তবুত অর্জ্জুন 'হে' বলিয়াই ডাকিয়াছেন। সখা হইয়াও অর্জ্জুন ব্রজসখাদের মত 'রে' কখনও বলেন নাই। শুদ্ধ মাধুর্য্য কেবল ব্রজ-জনেরই হৃদয়-সৌন্দর্য্য; উহা জগৎপূজিতা গীতার "পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ" এই ভগবদ্বাক্যে অভিনন্দিত অর্জ্জুনেও দুর্লভ। সে যাহাহউক, মূলতঃ অর্জ্জুন সুসভ্য সুবিদ্বান ক্ষত্রিয়রাজ, আর ব্রজ-সখারা

অনক্ষর অমার্জ্জিত গ্রাম্য গোয়ালা জাতীয় রাখালসমাজ; অর্জ্জুনের মুখে 'রে' সাজে না; ব্রজ-রাখালদের মুখে 'হে' আসেনা। কিন্তু "অয়ি" সম্বোধন, সম্ভ্রমার্থক 'হে' ও তুচ্ছার্থক 'রে'—এ দুয়ের মধ্যগত, কেবল "কোমলামন্ত্রণে" ব্যবহৃত। ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত "অয়ি" সম্বোধনসুধা ভারতীয় পুরাণসাহিত্যসিন্ধুমন্থনে বোধ হয় অতি অল্পই মিলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখের এই শুভশিক্ষাষ্টক শ্লোকে মিলিয়াছে: আর একবার মহাপ্রভুরই মনুষ্যমূর্ত্তিলীলায় "পরম গুরু" অর্থাৎ গুরুর গুরু শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর গুরু হরিভক্তিরসকল্পতরু শ্রীশ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর সেই শুদ্ধ-মাধুর্য্য-নির্ঝর-স্রোত—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ!"—

শ্লোকটিতে ভারতীয় বৈষ্ণবজগতের ভাগ্যে মিলিয়াছিল।

আর একটি কথা, মুখে আমরা কে কি না বলি? আমরা যে গান গাই, বক্তৃতা করি, রচনা লিখি, তৎসমস্তের বিষয়বিচার ও সিদ্ধান্তগুলি যদি আমাদের জীবনে ফলিত হইত, তবে ত আমরা কৃতার্থ হইয়া যাইতাম। মুখে আমরা হয়ত ধ্রুব-প্রহ্লাদকেও অতিক্রম করিতে পারি, বুকে কিন্তু বাল্মীকি-জগাই-মাধাইর পাপগ্রস্ত প্রথম জীবনকেও পরাস্ত করিয়া বসিয়া আছি। বক্তৃতার ব্যাপকতায় হয়ত আমি তাঁহাকে "অয়ি প্রাণাধিক!" বলিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হয়ত আমার অভ্যাসযোগার্জ্জিত অহিফেণবটিকাধিকও নহেন! সে কালাচাঁদ হইতে এ কালাচাঁদের ভাবনা বেশি ভাবি।

যাহাহউক, মহাপ্রভুর "কাঙ্গালীভোজন" স্বরূপ এই শিক্ষাটিকে আমরা তাঁহার শ্রীমুখের প্রসাদ পাওয়ার ন্যায়ই "অয়ি-নন্দতনুজ" সম্বোধনে এ জনমের আসল আবেদনটি সে চরণ দরবারে নিবেদন করিতে পারিলেও কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার চরম ও পরম ভক্তভাব-লীলায় যে মহামাধুর্য্যময় কৃষ্ণ-প্রেমোৎসবের চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীমুখোক্ত শিক্ষাশ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'অয়ি' সম্বোধন কেমন সাজিয়াছে? যেমন কম্বু কণ্ঠে অম্বুজমালা! যেমন হিরণ্ময় করপ্রকোষ্ঠে হীরার বালা!

তারপর, শ্রীকৃষ্ণকে এখানে "নন্দ-তনুজ" বলা হইয়াছে। "তনুজ" শব্দের অর্থ ঔরস বা গর্ভজাত অপত্য। তবে মহাপ্রভুর মুখ হইতে কৃষ্ণের "নন্দতনুজ" নাম নির্গলিত হওয়ার কোন হেতু-রহস্য আছে কি? কৃষ্ণকে যদি কাহারও 'তনুজ' বলিতে হয়, তবে তিনি বসুদেব-তনুজ বাসুদেব, ইহাই সাধারণতঃ পৌরাণিক প্রচলিত সংস্কার। আর বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহ পরতত্ত্বের পরাৎপর "বাসুদেব" আখ্যাতেও কৃষ্ণের বসুদেব তনুজত্বই প্রকৃষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। অতএব মহাপ্রভুর মুখের "নন্দতনুজ" বাক্যে কোন তত্ত্বরহস্যগত বিশেষত্ব আছে কিনা, কেহ২ তাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। কেহ২—(ফলে অনেকেই) বলেন, 'নন্দসুত' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ পুরাণাদিতে ভূরি পরিদৃষ্ট হয়; তবে 'সুত' শব্দে জাত অর্থ

হওয়ায়, "নন্দতনুজ" ও "নন্দসুত" ফলিতার্থে এক পাত্রই সূচনা করিতেছে; অতএব মহাপ্রভুর উক্ত "নন্দতনুজ" সম্বোধনে কোন তত্ত্বরহস্যগত বিশেষত্ব নাই; উহা সাধারণতঃ কৃষ্ণবাচক বাক্য মাত্র।

যাঁহারা মহাপ্রভুর উক্ত বাক্যের একটু স্বতন্ত্র অর্থ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকে তত্ত্বগত "এক কৃষ্ণ"কে লীলাগত ভাবে "দুই কৃষ্ণ" জানিয়া উহার একরূপ সমাধানে উপনীত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীতও আবিষ্কৃত, অনাবিষ্কৃত, বিকৃত, বিলুপ্ত, পূর্ণ বা অপূর্ণ-প্রকাশিত বিবিধ পুরাণ উপপুরাণাদিতে ভগবল্লীলা বিবিধ ভাববৈচিত্র্যে চিত্রিত। তাহাদের পরস্পর যৌক্তিক সিদ্ধান্ত-সামঞ্জস্যসংস্থাপন অন্ততঃ অস্মদাদির ন্যায় অশাস্ত্রজ্ঞ অধমাধিকারীর অসাধ্য। ফলে আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আপাততঃ উক্ত বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিতর্কবিচারের প্রতি উদ্দেশে নমস্কার করিয়া, সংক্ষেপে উহার পৌরাণিক মর্ম্মটি মাত্র এস্থলে নিবেদন করিতেছি।

বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, কংসাদি দুর্দ্দান্ত দানবের দুর্দ্দমদৌরাত্ম্য-পীড়িতা পৃথিবীর করুণক্রন্দনাকৃষ্ট দেবগণের প্রার্থনায়, দানবদলনার্থ মথুরাধামে বসুদেব-দেবকীর 'তনুজ' হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে গোলোকেশ্বর দ্বিভুজমুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়তমা গোলোকেশ্বরী রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা, তাঁহার কৃষ্ণের নিত্যসখা শ্রীদামের অভিশাপবিশেষবশে শতবর্ষব্যাপী কৃষ্ণবিরহভোগজন্য বৃষভানু-রাজনন্দিনীরূপে বৃন্দাবনে বিরাজিতা হইলেন। সুতরাং রাধাহৃদয়েশ্বর রাস-রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ভূতলে অতুলা ব্রজলীলায় অপূর্ব্ব বিলাসমাধুর্য্য আস্বাদনার্থ ও বাসুদেব বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যশক্তিলীলার সাহায্যার্থ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী যোগমায়া ভগবতীকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহাই যমজভাবে গোকুলে যশোদাগর্ভে "নন্দতনুজ" হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। যোগমায়ার মায়াবশে নন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীবৃন্দ মোহাবিষ্ট থাকিয়া তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ওদিকে কংসভয়াভিভূত বসুদেব তাঁহার প্রাণপুত্তলীটি লইয়া, যোগমায়ার প্রসাদে যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে পঁহুছিলেন, এবং যশোদার সূতিকাগারে মায়ানিদ্রাভিভূতা যশোদার ক্রোড়পার্শ্বে তাঁহারই নিজ ক্রোড়ের নিধির ন্যায় নীলকান্তকান্তি সদ্যোজাত শিশুকৃষ্ণ ও স্থির সৌদামিনীরূপা যোগমায়াকে দর্শন করিলেন। অপূর্ব্বভাবাবিষ্ট বসুদেব তারপর "দুই কৃষ্ণ" একস্থানে করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ দুয়ে মিশিয়া এক হইলেন! তখন বিহ্বল বসুদেব বিলম্বে অসমর্থ হইয়া, যশোদার কন্যারত্নটি বুকে করিয়া দ্রুত মথুরাপ্রস্থিত হইলেন। অতঃপর ঐভাবে দুই কৃষ্ণ এক হইয়া বৃন্দাবনে থাকিলেন। ব্রজের ঐশ্বর্য্যলীলা সমস্ত বৈকুণ্ঠনাথ বাসুদেব কৃষ্ণের অংশে ও মাধুর্য্য-লীলাবলী "নন্দতনুজ" গোলোকেশ কৃষ্ণের অংশে অভিনীত বা প্রকটিত হইতে লাগিল। ফলে ইচ্ছাময় কৃষ্ণের ইচ্ছায় এ গুহ্যতত্ত্ব বাল্যলীলায় নিয়ত উহ্যই রহিল। তারপর কৃষ্ণের মথুরাগমনে বাসুদেবেরই প্রকৃত গমন

হইল; কিন্তু গোপেন্দ্রনন্দন যমুনাতীর হইতে অলক্ষিতে বৃন্দাবনেই রহিয়া গেলেন। চতুর্থ শ্লোকের আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ যে "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" বাক্যের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, উক্ত বাক্য এই পৌরাণিক বিবরণের অন্তর্গত শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপ ভিত্তিবিশেষ। যাহাহউক, শ্রীদামের অভিশাপ পূরণার্থ, অর্থাৎ শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহবিধানার্থ কৃষ্ণ একাংশে অলক্ষিতে বৃন্দাবনেই রহিলেন; সুতরাং অলক্ষিততত্ত্বগত ভাবে কৃষ্ণসত্তা বর্ত্তমানেও স্থূল লীলাগতভাবে ব্রজে কৃষ্ণবিরহ ব্যাপ্ত হইল। অবশেষে প্রভাস-মিলনে, রাধাহৃদয়স্থ মাধুর্য্যতত্ত্বগত রাধার কৃষ্ণ রুক্মিণীর কৃষ্ণের সহিত চকিতে পুনর্ম্মিলিত হইয়া, আবার তখনই রাধাসঙ্গ-সম্মিলনে স্বীয় মর্ত্ত্যমাধুর্য্যলীলা সাঙ্গ করিয়া, নিজ নিত্যধাম গোলোকধামে অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে বৈকুণ্ঠবিহারী হরি অবশিষ্ট সমস্ত লীলা সমাপন পূর্ব্বক স্বীয় লীলাংশসম্ভূত সমগ্র যদুবংশ ধ্বংস করিয়া, স্বয়ং ব্যাধ বাণবেধ-ব্যপদেশে সর্ব্বশেষে স্বস্থান বৈকুণ্ঠ ধামে প্রস্থান করিলেন।

অস্মদ্দেশীয় আধুনিক হিন্দুদৃষ্টি-অশিশিষ্ট দার্শনিক—বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের এই রূপ পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা কি চক্ষে লক্ষ্য করিবেন, বলা যায়না; তবে কি না, "হিন্দুর সব ভাল ছিল" মোটের উপর এই এক মোটা ধারণা এখন যেন ভগবদিচ্ছায় ক্রমে ভুবনময় হইয়া দাঁড়াইতেছে; তাই ভগবান কৃষ্ণের লীলার ঐতিহাসিকতায় এখন হিন্দু-অহিন্দু, প্রায় সকলেই অল্পাধিক বিশ্বাসবান হইয়া, কৃষ্ণলীলার বিবিধ পুরাণেতিহাস, আখ্যান, প্রবাদ, প্রচলিত সংস্কার ইত্যাদির সমষ্টি-সিদ্ধান্ত সমুৎপন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণচরিত এখন আর অস্মদ্দেশে কেবল খ্রীষ্টীয় পাদরীর প্রচার-পরিচয়ে বিচারিত হইবার নহে।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমাবতারলীলার পরে প্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রেমভক্তিমান বৈষ্ণব গ্রন্থকার বঙ্গভূমির ক্রোড় বিশোভিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যগত এক কৃষ্ণের লীলাগত দ্বিকৃষ্ণত্ব সম্বন্ধে সুপ্রাচীন বাঙ্গালী গ্রন্থকার পরমভাগবত কবি শ্রীমৎ শিশুরাম দাসের শাস্ত্রপ্রমাণসজ্জিত সুপ্রসিদ্ধ "প্রভাস খণ্ড" গ্রন্থে যাহা অতি ললিত রচনায় লিপীকৃত হইয়াছে, কৃষ্ণলীলামৃতলোলুপ ভক্ত পাঠকসমাজে সেইটুকু এইস্থানে উদ্ধৃত করিয়া উপহার দিলাম।

"শুনিয়া শুকের কথা ব্যাসদেব কন।
সে বড় নিগূঢ় কথা করহ শ্রবণ॥
গোলোকের নাথ কৃষ্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
কেবল আনন্দময় বিভু নিরঞ্জন॥
না করেন কোন কর্ম্ম এই তাঁর রীতি।
কটাক্ষে করেন কর্ম্ম তাঁহার প্রকৃতি॥
প্রধানা প্রকৃতি রাধা তাঁহার কামিনী।
সৃষ্টিকালে মহাবিষ্ণু প্রসবেন যিনি॥
নামমালা তন্ত্রে তার দেখহ প্রমাণ।
মহাবিষ্ণুপ্রসূরপি রাধার আখ্যান॥
যথা-"কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণুপ্রসূরপি"
মহাবিষ্ণু হইলেন রাধার বালক।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর পতি ব্রহ্মাণ্ডপালক॥

দৈত্যভরে ভীত হয়ে যত দেবগণ।
ভূভার হরণ হেতু করিয়া চিন্তন॥
মন্ত্রণা করিয়া সবে ক্ষীরোদ যাইয়া।
মহাবিষ্ণু আরাধিলা প্রণত হইয়া॥
দেবগণ প্রতি দেব হইয়া সদয়।
অবতার হব বলি দিলেন অভয়॥
দেবকীর গর্ভবাস করিয়া স্বীকার।
ভূভার হরিতে বিষ্ণু হন অবতার॥
বিষ্ণুর কামিনী লক্ষ্মী-সরস্বতী দ্বয়।
রুক্মিণী ও সত্যভামা হয়ে জন্ম লয়॥
রুক্মিণীর পতি কৃষ্ণ দেবকীনন্দন।
একণেতে শুন রাধা-কৃষ্ণ-বিবরণ॥
শ্রীদাম-শাপেতে হয়ে রাধা সে সময়।
ব্রজে আসি বৃষভানুগৃহে জন্ম লয়॥
রাধা হেতু কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে অবতরি।
বিষ্ণুর সাহায্য হেতু দুর্গা সঙ্গে করি॥
যমজ হইয়া জন্মে গর্ভে যশোদার।
যামলে শিবের বাক্যে প্রমাণ তাহার॥

যথা—

"নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমপদ্যত।
বাসুদেবো বিশেত্তস্মিন্ ঘনে সৌদামিনী যথা॥"

যশোদার জন্ম নিলা যমজ হইয়া।
নন্দালয়ে নিদ্রা দিয়া সবারে মোহিয়া॥
যশোদার কোলে খেলা করেন যখন।
আইলেন বসুদেব লইয়া নন্দন॥
আসিয়া দেখেন তথা অপূর্ব্ব বালক।
হইয়াছে শ্রীনন্দের পুরের পুলক॥
আপন বালকসম বালকে দেখিলা।
বালিকা দেখিয়া বসু অবাক হইলা॥
তবে বসু বালকে লইয়া সেইক্ষণ।
একত্রে রাখিয়া দোঁহে করেন দর্শন॥
যেইমাত্র দুই শিশু একত্র হইল।
বসুদেবসুত নন্দসুতেতে মিলিল॥
যেইরূপে সৌদামিনী মেঘেতে মিলায়।
বসুদেবসুত নন্দসুতেতে লুকায়॥
তাহা দেখি বসুদেব অনেক ভাবিয়া।
বালকে রাখিয়া গেল বালিকা লইয়া॥
সেই যে বালিকা কংস হাতে নিবর্ত্তিয়া।
অনেক নিন্দিল কংসে উর্দ্ধেতে উঠিয়া॥
বিন্ধ্যাচলে অধিবাস হইল তাঁহার।
ব্রহ্মা আসি করিলেন পূজার প্রচার॥
স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান ব্রজে অবতার।
আনন্দক্রীড়ন বিনা কর্ম্ম নাহি তাঁর॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মে ফল নাহি লন।
ভক্তিগুণে ভক্তগণে ফলপ্রদ হন॥
স্বয়ঙের কর্ম্ম নহে ভূভারহরণ।
অংশ অবতারে করে এ সব করণ॥
যদি বল ভিন্নরূপ নহে কি কারণ।
কংসভয়-লীলায় গোপন প্রয়োজন॥
অথবা কৃষ্ণের কর্ম্ম কে বুঝিবে ভবে।
কি ইচ্ছায় কি লীলায় কি হয় কিভাবে॥
অক্রূরের সঙ্গে যবে করিলা গমন।
তখন বিভিন্ন দেহ হৈলা দুই জন।
বাসুদেব মথুরাতে করেন গমন।
নন্দসুত ব্রজধামে অলক্ষিতে রন॥

যথা—

কৃষ্ণোহন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎনৈব গচ্ছতি॥"
পাঠান্তরং—"পাদমেকং ন গচ্ছতি।"

শ্রীদামের বাক্য হরি করিতে পালন।
চক্ষুর অদৃশ্য হয়ে রন বৃন্দাবন॥
ব্রজবাসীগণ-চক্ষে অলক্ষ্যে রহিয়া।
পুনশ্চ মিশ্রিত হন প্রভাসেতে গিয়া॥

ভক্ত কবিবর শিশুরামের এই মধুমতী ও প্রসাদগুণবতী গাথায় কৃষ্ণলীলাতত্ত্বের যে রহস্যভেদ হইয়াছে, তাহাতে হঠাৎ ঐতিহাসিকতার সমস্যা সমাধান বিষয়ে অনেকের আপত্তি হইতে পারে। তদুত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে, ঐতিহাসিকতার সমাধান সম্বন্ধে এক-কৃষ্ণত্ব স্বীকারে কোন পক্ষের কোন আপত্তির কারণ নাই; বরং তাহাই আবশ্যক। "একমেবাদ্বিতীয়ম্' কৃষ্ণতত্ত্বেরই ঐশ্বর্য্যাসক্ত বৈকুণ্ঠবিলাসী, আর মাধুর্য্যাসক্ত গোলোকবিহারী। বৈষ্ণবী উপাসনার এই সুসূক্ষ্ম অতর্ক্য ভাবতত্ত্ব-ভেদের সহিত লৌকিক স্থূল-ঐতিহাসিকতার কোন সম্বন্ধ নাই। দ্বিকৃষ্ণত্বের জগতে একমাত্র ঐতিহাসিক সাক্ষী রমণেরও যোগমায়াপ্রভাবে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অতএব ঐতিহাসিকতাপক্ষে এবং এমন কি, "চতুর্ব্যূহতত্ত্ব"বিচারবিলাসিনী বৈষ্ণবী দার্শনিকতার পক্ষেও বোধ হয় এককৃষ্ণত্ব স্বীকারে কোন অনুপপত্তির অবকাশ নাই।

এক্ষণে কথা এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অর্থাৎ কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলাস্বাদ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণভজনের নিগূঢ় রসরহস্যভেদ শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে যেরূপ হইয়াছে, তাহা "ন ভূত ন ভবিষ্যতি"—ইহাই গৌরহরি-বিশ্বাসী বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতের বিশ্বাস। তাহা হইলে, গৌরাঙ্গের এই সুবিখ্যাত শিক্ষাশ্লোকে যে "নন্দতনুজ" পদের প্রয়োগ, তাহা সেই গোলোকবিহারী, দ্বিভুজ মুরলী-ধারী, সেবানন্দ-ভিখারী ভক্তের প্রেমমাধুর্য্য-গ্রহণকারী, চিরবৃন্দাবনচারী হরির প্রতিই হইয়াছে, বলিতে হইবে। অতএব এই মতে, মূর্ত্তিমান বেদ-বেদান্ত-বিজ্ঞান স্বরূপ সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি সেব্যমান শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ-বাক্যই সর্ব্বপ্রমাণাধিক প্রমাণ। আর, শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ স্পষ্টই এই তত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বিবিধশাস্ত্রবিশারদ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় স্বীয় সন্দর্ভে সুবিশদ শাস্ত্রীয়তা সহযোগে এই তত্ত্বই বুঝাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা-খণ্ডের প্রারম্ভেই দৃষ্ট হয়, শ্রীবৃন্দাবনপ্রত্যাগত, চৈতন্য-চরণ-মিলনাশায় শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত শ্রীরূপ গোস্বামী উড়িষ্যাদেশে পঁহুছিয়া, "সত্য-ভামাপুর" নামক গ্রামে এক রাত্রি যাপন করেন। তথায় শ্রীসত্যভামাদেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া, এরূপ আদেশ করেন যে, "তুমি যে কৃষ্ণলীলার নাটক রচনা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাতে আমার কৃষ্ণের-লীলা স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিও।" এ আদে-শের অর্থ শ্রীরূপ তখন যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গাশ্রয়ে আসিয়া, তাঁহারি শ্রীমুখে আবার যাহা শুনিলেন, তাহাতে লীলাগত দ্বিকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরূপের আর সন্দেহ রহিল না, এবং তিনিও "ললিতমাধব" ও "বিদগ্ধমাধব" নামে দুইখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাটক—যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "নান্দী প্রস্তাবনা" দিয়া রচিবার সংকল্প করিলেন। এই স্থানে চরিতামৃতের সেই স্থান একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায়াং যাত্রিংশাঙ্কধৃত যামল-বচনং।—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোসাঁই মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানিল পৃথক্ নাটকে প্রভু-আজ্ঞা হৈল ॥
পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুইভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।
পৃথক করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥"

ইহাতেই বেশ বুঝা যায়, লীলাপর দ্বিকৃষ্ণতত্ত্ব-রহস্য শ্রীরূপগোস্বামী স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটেই প্রথম শিক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও ভাগবত, বিষ্ণু, পদ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, হরিবংশ-ভারত প্রভৃতি পুরাণে দ্বিকৃষ্ণরহস্য-ভেদ বিস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং অন্যান্য প্রচ্ছন্ন পুরাণোপপুরাণ, তন্ত্রাদি, প্রাচীন প্রবাদাদি ও বিবিধ দৈব প্রমাণাদি দ্বারা এবং সর্ব্বোপরি মূর্ত্তিমান সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান মহাপ্রভুর নিজ মুখোক্তিরূপ মহা 'আপ্ত' বা 'শব্দ' প্রমাণ দ্বারা উহা শ্রীরূপের হৃদগত হইয়াছিল। সুতরাং 'লঘুভাগবতামৃতে' তিনি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"কেচিদ্ভাগবতাঃ প্রাহুরেকমর্থ পুরাতনাঃ।
দ্বাভ্যাং প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহে আনকদুন্দুভেঃ ॥
গোষ্ঠেতু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমঃ।
গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতিগৃহং বিশন্ ॥
কন্যামেবপরং বীক্ষ্য তামাদায় ব্রজং পুরং।
প্রাবিশদ্বাসুদেবস্ত শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্ ॥"

অর্থাৎ—

কোন ভক্তগণ কন পুরুষৈক পুরাতন।
বসুদেব-পিতৃগৃহে প্রকট হয়ে জন্ম লন ॥
বৃন্দাবনে মায়া-সনে শ্রীলীলাপুরুষোত্তম।
বসুদেব ব্রজে করি সূতিকাগৃহে গমন,
একটি পরমা পুত্রী করি তত্র দরশন,
তাহা লয়ে সমাগত হইলেন নিজ ধামে।
বাসুদেব পশিলেন শ্রীলীলাপুরুষোত্তমে ॥

বৈষ্ণবসমাজে সম্মাননীয় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও শ্রীভাগবতের দশমে—
"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।"

অর্থাৎ—

আত্মজের উদ্ভবে আনন্দ
লভিলেন মহামনা নন্দ।

এই শ্লোকের "আত্মজ" শব্দের অর্থ করিয়া, নন্দ-গৃহেও কৃষ্ণের জন্ম জানাইয়া, দুই কৃষ্ণের একীভবন বা মিলনতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। মর্ত্ত্যজীবজগতে চৈতন্য চরিতামৃত বিতরণকারী আমাদের কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপেরই চরণাশ্রিত; সুতরাং তিনিও শ্রীরূপের হৃদয়েশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-টীকাই সর্ব্বপ্রমাণাধিক প্রমাণ মানিয়া, অথচ শাস্ত্রবিচারসুনিপুণ সারসিদ্ধান্তের সমাধান করিয়া, একাধিক স্থানে উক্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন এবং চতুর্ব্যূহতত্ত্বের মূলপরাৎপরতত্ত্ব নন্দতনুজেই স্থাপন করিয়াছেন। তৎপর, এই নন্দতনুজই যে কলিযুগপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহাও যথাসম্ভব শাস্ত্রপ্রমাণ প্রয়োগেই

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্বকৌতূহলী পাঠক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলাখণ্ডের আদিতেই তাহা যথাযথতঃ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা কবিরাজ গোস্বামীর সেই শাস্ত্রপ্রমাণ সংযুক্ত বিস্তৃত আলোচনার মধ্য হইতে অত্যল্প কিঞ্চিন্মাত্র অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলে যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই॥

* * * *

পরব্যোমেতে বৈসেন নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণ স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে বিভেদ॥
ইঁহো ত দ্বিভুজ—তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক-সাথ॥

* * * *

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর॥
অবতারী নারায়ণ—কৃষ্ণ অবতার।
তিঁহো চতুর্ভুজ—ইঁহো মনুষ্যাকার॥

* * * *

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥
[illegible] নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাহাতে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

অধিক উদ্ধৃতির স্থানাভাব ও প্রয়োজনাভাব। আমাদের পূজ্যপাদ পুরাণ-তত্ত্ববিশারদ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত [illegible] "[illegible]" কৃষ্ণতত্ত্বকাহিনী- (ক[illegible] যতটুকু জানা যায় তত্ত্ব থাক,) এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, লঘুভাগবতামৃত, বামনপুরাণ প্রভৃতি, এবং [illegible] ব্রহ্ম-যামল, [illegible]তন্ত্র, গোপালতন্ত্র, বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণাদির পর্যালোচনার ফল বলা যায়। যাহা হউক, কেবলমাত্র প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার স্থানাভাব এবং অপ্রাসঙ্গিকও বটে। ভগবৎকৃপায়, সুবিধা হইলে, শুধু এই বিষয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। ফলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক আরও অনেক বৈষ্ণবশাস্ত্রীয় প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাদিতে এই তত্ত্ব আলোচিত দেখিতে পাইবেন।

যাহা হউক, মোটকথা, আমাদের আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকটির নিগূঢ় শিক্ষাই এই যে, মাধুর্য-ভজন-ফলে শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ লাভই জীবের চরম চরিতার্থতা; কিন্তু ঐশ্বর্য-ভজনের ঐকান্তিক ফল মুক্তি তাহার নিম্নস্তরের সিদ্ধি। এই শ্লোকটিতেও কৃষ্ণ-সেবানন্দদানই গোপীভাবের অদ্ভুতপূর্ব অতুল্য অবদান। "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকেও স্পষ্টভাবে এই পরম তত্ত্বেরই [illegible] যায়।

"বিদগ্ধমাধবের" উক্ত বিখ্যাত শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার নিত্যভজনধামুত "চৈতন্যচরিতামৃতে" তদভিপ্রায়-স্বরূপ লিখিয়াছেন,—

"সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধি ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধা মুক্তি পাঞা॥

সাষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥"

ফলে 'ব্রজভাব'রূপ রাধাকৃষ্ণসেবানন্দই অহৈতুক রাগানুগ মাধুর্য্য-ভক্তের সম্বল। দীনদাস স্বীয় পদাবলীতে বলিয়াছেন :—

ঐশ্বর্য্যে ভজিলে জীব মুক্ত মাত্র হবে।
মাধুর্য্যে ভজিলে কৃষ্ণসেবানন্দ লভে॥
ঐশ্বর্য্য ভক্তিতে মুক্তি বৈকুণ্ঠে বিহার।
গোলোকে গোবিন্দ-সেবা মাধুর্য্যাধিকার॥

আমাদের বোধ হয়, বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস-ভক্তি-সমন্বিত এই গূঢ় তত্ত্বই শ্রীগৌরাঙ্গের এই শিক্ষা-শ্লোকটির সারস্বরূপ। কৃষ্ণকিঙ্করতাই ভক্তের চরমসিদ্ধি বা পরমপ্রার্থ্য। এই জন্য বলা হইয়াছে —

"কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।"

এই ভীষণ ভবাম্বুধিতে নিমজ্জমান তোমার কিঙ্কর আমাকে উদ্ধার কর। সেব্যই সেবকের রক্ষাকর্ত্তা। তুমিই কৃপা করিয়া তোমাকে সেব্য বলিয়া চিনাইয়াছ এবং আমাকেও শ্রীপদসেবক পদের সুরেখা সেবা-সম্পদ দিয়া কৃতকৃতার্থ করিবার আশা তোমারই শাস্ত্রবাক্যে শুনাইয়াছ; তাই সেব্য তুমি, তোমার এ সেবকাধমকে এ বিষম বিষয়-বাসনা-নিমজ্জন-বিপদে শ্রীপদে রক্ষা কর। যে হতভাগ্য সেবক সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, সে সেই দুস্তর বারিধিবক্ষে স্বীয় সেব্য প্রভুকে নিকটে দণ্ডায়মান দেখিলে, কত না আশায়—আনন্দ—উচ্ছ্বসিত অন্তরে—কতই ব্যাকুল বিহ্বল কাতরস্বরে উদ্ধার প্রার্থনা করে! প্রভো হে আমারও যে সেই অবস্থা। এখন উদ্ধারের ব্যবস্থা তুমি ভিন্ন আর কে করিবে? তুমিত বিপদ-বারণ, মধুসূদন, পতিত-তারণ, সঙ্কট-শরণ; অতএব এ বিষম বিপদে, এ বিকট সঙ্কটে এ নিরুপায় কিঙ্করাধমকে পার রাখ।

ভবোদ্ধারপ্রার্থীর এবম্বিধ প্রার্থনায় আপনাকে ভগবৎকিঙ্কর বলা হইয়াছে। "কিঙ্কর" শব্দের অর্থ আজ্ঞাকারী—অর্থাৎ আদেশপালক ভৃত্য। বস্তুতঃ উপাসনার প্রাণ দ্বৈতবাদ। উপাস্য-উপাসক ভাবই দ্বৈততত্ত্বগত প্রভু-ভৃত্যভাব। অতএব ভগবানে ও জীবে এই প্রভু ভৃত্য বা সেব্য-সেবক সম্বন্ধই স্বতঃসিদ্ধ। জীব মায়াবশে এ সম্বন্ধ ভুলিয়াই ভব-বন্ধে বদ্ধ হয়।

"নিত্য কৃষ্ণদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)।

আমরা যে ভগবদ্ভৃত্য তাহা ভুলিয়া ভব-মজ্জমান; আমাদের একমাত্র সাধন ও প্রয়োজন যে পরিত্রাণ, তাহা মায়ামোহ-বশে আমরা বুঝিতে অক্ষম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, যেমন তাহার বাঁচিতে আর তত ভ্রূক্ষেপ, তীব্রতা বা কূলপাইবার ব্যাকুলতা থাকে না, আমাদেরও দশাও তদ্রূপ। ভগবৎকৃপা-বিধানে—কর্ম্মভোগ অবসানে যার মায়া-মোহের ঘোর অন্ততঃ কিঞ্চিৎ কাটিয়াছে, সেও কথঞ্চিৎ আপন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া স্বীয় পরিত্রাণ-হেতু উদ্বেগে বলিতে পারে—প্রভো! পারি নাকি——

"কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ"
কৃষ্ণকিঙ্করত্বই আমাদের আত্মস্বরূপ।

আমরা যে প্রভুর উপাসক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি না কেন, দাস্যভাব অর্থাৎ সেবকত্ব সকল ভাবেরই অন্তর্নিহিত।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, বৈষ্ণবী সাধনার এই পঞ্চকের মধ্যে চতুর্বিধ ভাব ব্রজে পূর্ণমাধুর্য্য সহকারে স্ফূর্তিমন্ত। অন্যান্য দাস্য অর্থাৎ সেবার ভাবটি সর্বভাবেরই অন্তর্গত। এই পঞ্চবিধ ভাবাধিকারী সাধকেরা স্ব স্ব অধিকারভেদে পঞ্চ প্রকারে কৃষ্ণসেবাই করিয়া থাকেন। অন্যান্য শান্তভাব-সাধনাটি ব্রজসেবাধিকারিণী নহে; কিন্তু চতুর্বেদ ব্রজসেবাধিকারিণী, সন্দেহ নাই। কোন পত্নীর তুল্য পতিসেবা, শিশুর মাতার তুল্য পুত্রসেবা, সখার তুল্য সুহৃৎসেবা, দাসের তুল্য প্রভুসেবা। এবং [illegible] অনন্ত পুরুষের অনুগতসেবা আর কে করিতে পারে? অতএব এই শান্তাদি পঞ্চরসভাবে সেবকের অধিকারভেদে কৃষ্ণসেবাই প্রতিষ্ঠিত। তাই ভগবানের সহিত জীবের সর্বভাবেই সাধারণ সেবা-সেবকত্ব থাকায়, নিত্য কৃষ্ণদাসত্বই জীবের স্বরূপতত্ত্ব।

তারপর আর একটি বিষয় আলোচ্য। কৃষ্ণভক্ত উপাসক জীবের উপাস্য কি? শ্রীগুরু বলিলেন—"তস্মিন্ প্রীতি তৎপ্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা। প্রভুর প্রিয়কার্য্য করিবারই প্রভুর সেবা। শুধু সেবকের প্রভু প্রীতিতে তুষ্ট পাওয়া যায় না, অথবা তাহা হইবার তাঁহার নিরর্থক; কেননা প্রিয় কার্য্যই প্রীতির পরীক্ষা ও পরিচয়। সেই পরম প্রভুর প্রিয় কার্য্য যে কি, তাহা তাঁহারই শাস্ত্রে শাস্ত্রনির্দিষ্ট সৎকর্ম্ম বলিয়া স্থির আছে। সুতরাং কেন না, "নাহং কর্ত্তা, ঈশ্বরায় প্রীত্যর্থং করোমি" অর্থাৎ—

আমি কর্ত্তা নই, প্রভুর প্রীত্যর্থ,
করে যাই কর্ম্ম হয়ে তাঁর ভৃত্য।

এই ভাব সিদ্ধ হইলে, তখন সর্বকর্ম্মই তাঁহার প্রিয় হয়; সব কর্ম্মই তাঁহার উপাসনা হয়।

"যৎকরোমি জগন্নাথ! তদেব তব পূজনম্" যে ভাগ্যবান ভক্ত এই উক্তির যথার্থ যোগ্য, নিত্য কৃষ্ণদাসত্ব তাঁহারই ভাগ্যে যোগ্য।

দাস হইলেই প্রভুসেবার প্রয়োজন, এবং সেবা সাধনই উপাসনা। উপ—সমীপ, আসনা—বসা। উপাসনাই কাছে বসা। কাছে না গেলে সাক্ষাৎ সেবা সম্ভবেনা। আমি যে কাছে বসিতে পাই সেই আমি সেবক; অথবা ভাল সেবক হইলেই কাছে বসিতে পাই। অতএব উত্তমাধিকারী উপাসকই সুসেবা ভাগে, অর্থাৎ প্রভুর প্রিয়কর্ম্ম সাধন ভাগে প্রভুর প্রিয় ভৃত্য হন। গীতার সেই—

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

অর্থাৎ—

যাহা কর, যাহা খাও, হোম, দান, কর যাহা,
তপ যা কর কৌন্তেয়! আমার অর্পহে তাহা।

এই আদেশ যিনি কৃষ্ণকৃপায় পালন করিতে পারিয়াছেন, "কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণ" সিদ্ধ হওয়ায়, তিনিই কৃতার্থ কিঙ্কর; দেবদুর্লভ

কৃষ্ণসেবানন্দ সুখ, তাঁহারও কৃষ্ণপ্রেম সুধায় পরম পরিতৃপ্তি! এক স্থানে যথার্থ কৃষ্ণ কিঙ্করের কি পরার্থ, তাহাই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার এই শিক্ষাষ্টকে জীবের "ভাবাবিষ্ট" এ হেন কৃষ্ণকিঙ্করত্বের আস্বাদনীয়তাই শিক্ষা দিয়াছেন। উপক্রমে যাঁহারা ভব-জ্বালাখী, তাঁহারাই এই মহাশিক্ষার শিক্ষার্থী। তাঁহারাই তাঁহাদের পূর্বকর্ম-দোষজন্যই কৃষ্ণ-সেবক-পদ কৃষ্ণ পদে পুনঃ প্রার্থী।

এবার এ ভব-পারাবার হইতে উদ্ধার পাইয়া, আর ভব-তারণের চরণ ছাড়া না হইলেই কিঙ্কর কৃতার্থ। কিন্তু সেই অচ্যুতের চির চরণাচ্যুত তাঁহারই চরণানুগ্রহ-সাপেক্ষ। ভব-তরঙ্গ-বেগ-বাধা অন্ধ জীবের নিজের সাধ্য কি? সেই কৃপাময় নিজ কৃপায় পার না করিলে আর উপায় নাই। তাই শিক্ষাষ্টকের প্রার্থনা—

"কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলি-
সদৃশং বিচিন্তয়।"—

"তব পদ পঙ্কজের ধূলিকণা প্রায়—
ভাবি মোরে কৃপা করে রাখ হরি! পায়।"

রেণু যেমন পাদ্ম চরণস্থ, ভক্ত দাসও তেমনি ভগবৎপাদপদ্ম চিরলগ্ন হইবার আশী। তাই পাদপদ্মের রেণুরূপ পরিণতির প্রার্থনা। ভক্ত রামপ্রসাদও গেয়েছিলেন, "আমি বিনা মাহিনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অভিলাষী।" এস্থলে "বিনা মাহিনার চাকর"—কিনা নিষ্কাম ভক্ত, আর "চরণধূলার অভিলাষী"—ফলতঃ সেবা-সান্নিধ্যার্থী।

শ্রীভগবানের পাদপদ্মের রেণুত্ব অর্থাৎ তাঁহার চিরচরণসেবকত্ব ভক্তের প্রার্থনায় প্রার্থিত হইলে, তাহা ভগবৎ-চরণে স্থান পায়। চরণে স্থান পাওয়ায় প্রার্থনাটি চরণে স্থান পাইয়া এবং প্রার্থকের চরণে স্থান পাওয়া, ফলতঃ একই কথা। মূল ভগবদিচ্ছা। জীবের যে পুরুষকার, ফলতঃ তাহাও ভগবদিচ্ছা। গীতায় যে রহস্যভেদ করিয়া ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"পৌরুষং নৃষু"—অর্থাৎ নরের যে পুরুষকার, তাহাও আমি। তবেই অহং-বুদ্ধি-পরিচালিত ইন্দ্রিয়-চালনারূপ দড়ি-বাঁধা স্বাধীনতা মাত্র জীবের জন্য বিধান করা হইল। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন, "জীব, দড়ীবাঁধা গরু; খুঁটো থেকে দড়ীর লম্বা মাপ যতখানি, জীবের স্বাধীনতা বা পুরুষকার ততখানি বা ততখানির মধ্যে।" সুন্দর দৃষ্টান্ত! দৃষ্টান্তটি যেন দৈব পুরুষকার সমস্যার শাস্ত্রীয় সমাধানসার! যেখানে দশটি জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয়, তৎপরিচালক স্বরূপ একাদশগণিত অন্তরিন্দ্রিয়; আবার তৎপরিচালনার্থ বিবেক-বুদ্ধি এবং এই সমস্তেরই প্রভু বা মূল পরিচালক অহঙ্কার, জীবের প্রতি ভগবানেরই দান বা বিধান, সেখানে সেই সীমার মধ্যে পুরুষকার আছে, আবার সেই সীমার বাহিরে নাই। যত কিছু বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র-পুরাণ, যত কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষা, সমস্তই যে ঐ সীমাবদ্ধ স্বাধীন জীবের সেবায় নিয়োজিত! অবিদ্যা বা অহঙ্কার যতদিন, জীবত্ব যতদিন, দ্বৈতজ্ঞান যতদিন, উপাসনা ততদিন, এই

তথাকথিত (So called) পুরস্কার হউন। আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকে তৎকাতর ভক্তের প্রার্থনাটুকুই সেই পুরস্কার। ভক্ত বুঝেন, জীবের পুরস্কারের অহঙ্কার কেবল অবিদ্যার উদ্ভব, তাই তিনি আপনার ভগবৎপদধূলিবৎ-পরিণতি কৃপাপূর্ব্বক 'চিন্তা করিতে ("কৃপয়া —বিচিন্তয়") ভগবানকে অনুরোধ করিলেন। এখন ভগবানিচ্ছা পূর্ণ হউক। সমর্পিতাত্ম ভক্তের আর ইচ্ছাবাঞ্ছা কোথায়?

অহঙ্কারে জীব কর্ত্তা, অহঙ্কারে জীব ভোক্তা; ভগবান কেবল ফলদাতা বা বিধাতা। ভক্ত কিন্তু ফল চান না, বরং ফল না চাওয়াই চান। আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকে ভক্ত ভগবৎপদধূলিত্ব চাহিয়াছেন। ফলে ভগবৎপদধূলিত্ব ও অহঙ্কারানুবন্ধী-ফলাভিসন্ধিশূন্যত্ব একই কথা। কেবল ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের আপাতভেদ-বোধক ভাষাভেদ মাত্র। কিঙ্করের প্রভু-পদাশ্রয় চাওয়া কর্ম্মফল চাওয়া নহে। কিঙ্করের কর্ম্ম নিজ জীবত্ব পক্ষে নিষ্কাম; উহা ঈশ্বরার্থক—কেবল প্রভুপ্রীতিকাম। তবে এই যে চরণরেণুর প্রার্থনারূপ কর্ম্ম-বিশেষ, ইহাও ভগবৎপ্রীতিকাম; কারণ ভগবান ইহাতেই প্রীত। "ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ" একথা তাঁহার শাস্ত্রেই তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন। ভক্তি কি? তাঁহার শাস্ত্রেই তিনি বলাইয়াছেন—"পরানুরক্তিরীশ্বরে।" ফলে ভগবৎপদরেণুর প্রার্থনা সেই পরানুরক্তিরই ফল। ভগবৎপদরেণুত্ব সেই পরানুরক্তিরই পরম পরিণাম।

আর ভগবানের কথা কি, আহা! ভক্ত-কাঙ্গাল আমরা ভগবদ্ভক্তের পদরেণুত্ব পাইলেই কৃতার্থ হইতাম। অহো! সুদীন ভক্তোক্তিতেই বাক্ত হইয়াছে,—

তদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো!

অর্থাৎ—

তব দাস, তাঁর দাস, তাঁর দাস যত আর,
কৃতার্থ করহে প্রভো! দিয়ে দাস্য তাঁসবার।

চরণরেণুত্বই চিরদাসত্ব বা চরম দাসত্ব। আহা! পরাৎপর পরমপ্রিয়তম প্রভুর দাসানন্দ কৃতার্থ দাসের দাসত্বই সর্ব্বস্ব-অবিদ্যাপ্রতারিত, প্রভুপদাশ্রিত পরিতাপিত্চিত্ত ভব-ভীত ভৃত্যের প্রভু-পদে পুনঃপদাশ্রয়প্রার্থনাসূচক এই শিক্ষা-শ্লোকটির ভাবসুধার কণিকা-প্রসাদ পাইয়া দীনদাস গাইয়াছেন,—

নাথ হে!
নিত্য ও চরণে, ভৃত্য জীবগণে,
মানব-দানব-দেবা।
মায়ায় মজিয়ে, রয়েছ ভাজিয়ে,
ভেদেছেন চরণ-সেবা॥
ছিনু পদলগ্ন, হনু ভবমগ্ন,
ডুবে গেল ভগতরী।
হায় কি উপায়! কিঙ্করে কৃপায়,
রাখ পায় প্রভু হরি॥
মায়া-মদে মরি আর যেন হরি!
শ্রীপদ ছাড়া না হই।
পদ্মে রেণু যথা, অনুদিন তথা
পদরেণু হয়ে রই॥
অধম তারণ সে চারু চরণ
সুচির শরণ করি।
মনোপ্রাণ খুলি, প্রেমানন্দে গলি,
বল হরেকৃষ্ণ হরি॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(যশোহর।)

চারুচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

ঔর্ব্ব [illegible] মুনি [illegible]।
ঔর্ব্ব [illegible] ॥১১॥

[illegible] মুনি ঔর্ব্ব; [illegible] মুনি [illegible] ঔর্ব্বলোকে [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন ।১২॥

[illegible] ঔর্ব্ব [illegible] নহে; এ বিষয়ে [illegible] উপদেশ দিয়াছেন—

[illegible] ক্রোধনো [illegible]।
[illegible] ॥

[illegible] অধ্যায়ে [illegible]।

মনু [illegible] ক্ষমাবান্ [illegible] —

ক্ষমা [illegible] লোকঃ [illegible]।

[illegible] অধ্যায়ে।

[illegible] লোকে [illegible]।

—— ক্ষমা [illegible] ॥৭৪॥

[illegible] অধ্যায়ে।

[illegible] ক্ষমাই বল।

[illegible] বর্ষের হিন্দু-পত্রিকার ১৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

[illegible] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই [illegible] হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে [illegible] অধ্যায়ে যথা—

[illegible]।
[illegible] ॥

[illegible] করেন হে রাজেন্দ্র! [illegible] পুত্র [illegible] শ্রীমান্ [illegible] প্রাপ্ত হইয়া [illegible] সেই [illegible] বালক [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।] ২

[illegible] প্রভুঃ।
[illegible] ॥১৩॥

[illegible] কার্য্যে [illegible]।
[illegible] ॥১৪

[illegible] করিবে না; [illegible] ১০॥

([illegible] মনুষ্যের [illegible] না।

[illegible]।
[illegible] ॥১৫॥

[illegible] ॥
[illegible] ॥১৬॥

[illegible] ১১১ অধ্যায়ে।

[illegible] পুরাণের ৭ম, ৮ম অধ্যায়ে [illegible] ২৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত।

[illegible]।
[illegible] ॥

[illegible]।

[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible]
২৪ অধ্যায়।] ৩

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি [illegible] করিবেন না; [illegible] করিয়াছিলেন ।৩।

[illegible] যথা —

[illegible]।
[illegible] ॥১৮॥

[illegible]।
[illegible] ॥১৯॥

জন্মৌত সমস্ত দুর্বর্ণ স তপ্ণ বাক্তিঃ।
এপ আমানন্দ। [illegible] রাজং বিভী-
ষণ ॥ ১৫

সত্যং বেদেষু [illegible] সত্যে [illegible]
[illegible] প্রতিষ্ঠিতম্
॥৬৪।

জ্ঞানযোগাদিভ্যো ধর্মঃ সত্যাদৈরেব [illegible]
শ্রুতম্।
[illegible] জ্ঞানযোগো বড়ঃ সত্যং [illegible]
কম ॥৬৮॥

যত্তোধর্মস্তত সত্যং সর্বং সত্যেন বর্দ্ধতে ৬৯।
মহাভারতে শান্তিপর্বে ১৯৯ অধ্যায়ে।
(আমার প্রণীত চতুর্থ বর্ষের হিন্দু পত্রিকার
১৩৮ পৃষ্ঠায় আছে)

মহাভারত দ্রোণপর্বে ১৯১ অধ্যায়ে
দ্রোণকে বধ করিবার জন্য যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থা-
মাহত ইতি গজঃ" বলিয়াছিলেন।

এই ছলনাবাক্য কহিয়াছিলেন, তজ্জন্য
তাঁহাকে একবার নরক দর্শন করিতে হয়।
ব্যাজেন হি ত্বয়া দ্রোণ উপচরিতঃ সুতঃ পিতা।
ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ দর্শিতো নরকস্তব॥
১৫॥

স্বর্গারোহণ পর্বের ৩ অধ্যায়ে।
[ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তুমি ছলনা
করিয়া দ্রোণকে পুত্রশোক বঞ্চনা করিয়াছিলে;
অতএব হে রাজন! আমিও ছলনা করিয়া তোমাকে
নরক দর্শন করাইলাম] ১৫।

সর্বদা সাধুর সঙ্গ করা কর্তব্য,
[illegible] সাধুর সঙ্গ করা কর্তব্য
[illegible]; [illegible] শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গ [illegible]
[illegible] ১৫॥

[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥১॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] ॥ ১৬

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছেন, যোগ
(প্রাণায়ামাদি), সাংখ্য (তত্ত্ববিবেক),
ধর্ম (অহিংসাদি), বেদাধ্যয়ন, তপস্যা,
সন্ন্যাস, ইষ্ট (অগ্নিহোত্রাদি), পূর্ত (কূপাদি
নির্মাণ), দক্ষিণা (দান), ব্রত
(একাদশীর উপবাসাদি), যজ্ঞ (দেবপূজা)
ছন্দ (রহস্য মন্ত্র), তীর্থ, নিয়ম ও
যম (অহিংসাদি) সেরূপ আমায় বশ করিতে
পারে না, যেরূপ সকল সঙ্গের অর্থাৎ—সংসার-
সঙ্গের অপহারক সাধুসঙ্গ আমাকে বশীভূত
করে।

সাধুনাং সমর্থং [illegible]
[illegible] সাধু[illegible] ॥
[illegible] পুরাণে ১৬ অধ্যায়ে ২১।
[illegible] যোগতঃ।
[illegible] ॥
ঐ ১২। ১৯।
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible] বৈরাগ্য প্রকরণে

সর্বদা সাধুর নিকট থাকিতে যদ্যপি
তাঁহারা না উপদেশ দেন, তাঁহাদের যাহা
স্বাভাবিক বাক্য, উহা আমাদের পক্ষে
উপদেশ হইয়া থাকে।

মহাপ্রভুঃ। কিমিহ শ্রেয়ঃ?
রামানন্দঃ। সতাং সঙ্গঃ। শ্রীচৈতন্য-
চন্দ্রোদয় নাটকে ৭ অঙ্কে।] ১৫

[illegible] পিতাকে [illegible] সমস্ত [illegible]
করিবে, তাঁহাদের কোন উৎপীড়ন করিবে
না। [illegible] হইয়াছেন [(এ বিষয় মহাভারতে [illegible]
পর্বের এক উপাখ্যান—[illegible]
[illegible]
ছিলেন; [illegible]
[illegible]

জরাং গ্রাহ্য তুরৈব নিজযৌবনদঃ সুতঃ।
স তু পুত্রঃ কনীয়ান্ মে প্রণয়শ্চক্রবর্ত্তী যযাতিনা॥
১৭॥ যুগ্মকম্

নাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। একদিন বিনতা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে দেখিয়া কহিয়াছিলেন— "এ অশ্ব শ্বেতবর্ণ।" কদ্রু কহিলেন "এ অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ।" উভয়ে পণ হইয়াছিল যে "কল্য অশ্ব দেখা যাইবে, যে হারিবে সে দাসী হইবে।" কদ্রু প্রতারণা করিবার জন্য পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন "পুত্রগণ! তোমরা কৃষ্ণবর্ণ লোম দিয়া উচ্চৈঃশ্রবাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখ, নচেৎ আমাকে দাসী হইতে হইবে।" যে সমুদয় সর্প তাঁহার আজ্ঞাপালন করে নাই, তিনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ধীমান পাণ্ডবেয় রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে।"

"নাবপদ্যত যে বাক্যং তান্ শশাপ ভুজঙ্গমান্।
সর্পসত্রে বর্ত্তমানে পাবকো বঃ প্রধক্ষ্যতি॥
জনমেজয়স্য রাজর্ষেঃ পাণ্ডবেয়স্য ধীমতঃ॥৮॥
২১ অধ্যায়ে।]

এ বিষয় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে অষ্টমোল্লাসে—
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥ ২৫
কুরুতে নব বৃদ্ধস্য মাতরং পিতরং শিশুং।
অবলম্বনা সমস্ত বিশ্ব এব পদে পদে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে—
৮০ অধ্যায়ে].৬

কনিষ্ঠ পুত্র পুরু (পিতা) যযাতির জরা গ্রহণ ও নিজ যৌবন দানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তজ্জন্য যযাতি (পুরুকে) চক্রবর্ত্তী রাজা করিয়াছিলেন [এ বিষয়ে মহাভারতের আদি পর্ব্বে ৭৮।৮৫ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ১০ অধ্যায়ে ও মৎস্যপুরাণে ৩১।৩৪ অধ্যায়ে একটি উপাখ্যান আছে

দানং সর্ব্বস্বং দত্বাত্র পশ্চাত্তাপ দুঃখভাক্
বলির্নাম্না পাতালে বদ্ধো মনস্যপি তুষ্টয়ে। ৮

যে রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্য শাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যযাতিকে বলিয়াছিলেন যে, এই জরা যাহাকে ইচ্ছা দিয়া তাহার যৌবন ভোগ করিতে পার। যযাতির যদু তুর্ব্বসু দ্রুহ্যু অনু পুরু নামে কয়টি পুত্র ছিলেন। তিনি সকলকে জরা দিতে চাহিলে, সকলে জরার দোষ প্রদর্শন করিয়া, কেহ লইতে চাহিলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়া নিজ যৌবন দান করিয়াছিলেন। ভোগবাসনা কখন তৃপ্তি করে না। ইহা অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। যযাতি বিষয়ভোগে তৃপ্তিলাভ না করিয়া পুরুকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া নিজ জরা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন।

পুরোঃ প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে গৃহাণেদং স্বযৌবনম্।
রাজ্যঞ্চৈব গৃহাণেদং ত্বং হি মে প্রিয়কৃৎ সুতঃ॥ বিংশো ৩৪ অঃ ১১।
ভারতে—আদিপর্ব্বণি ৮৫ অঃ ।৭].৭

সাত্ত্বিক দান করিবে, দান করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করিবে না। বলিরাজা শেষ দানে দেহ শ্রীভগবানে শরীর অর্পণ করিয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন (এই উপাখ্যান শ্রীভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে আছে)। সাত্ত্বিক দান যথা—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥ ২০
শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৭ অধ্যায়ে।

অনুপকারী ব্যক্তিকে কিংবা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহা দেওয়া যায় তাহাকে সাত্ত্বিক দান কহে।

ত্যাগে সত্ত্বনিধিঃ কুর্য্যান্নপ্রত্যুপকৃতিস্পৃহাম্।
কর্ণঃ কুণ্ডলদানেঽভূৎ কলুষঃ শক্তিযাচ্ঞয়া॥
১৯

বলি রাজার গুরু শুক্রাচার্য্য বলিকে কহিয়াছিলেন যে "তোমার প্রতিশ্রুত তিন-পাদ ভূমি বামন দেবকে প্রদান করিও না, করিলে তোমার মহান্ অনিষ্ট হইবে, কারণ—

ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তি র্বিপদ্যতে।
৮ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ২৮৩।

যাহাতে বৃত্তি বিপন্ন হয়, এরূপ দানকে প্রশংসা করা যাইতে পারেনা।

দত্তানুতাপী-দোষ যথা—

সম্ভোগ সম্বিদ্ বিষমোঽতিমানী দত্তানুতাপী কৃপণো বলীয়ান্।
বর্গপ্রশংসী বনিতাসুদ্বেষ্টা এতে পরে সপ্ত নৃশংসবর্গাঃ॥ ১৭
উদ্যোগ পর্ব্বণি ৪২ অধ্যায়।

আশাং দত্বাঽদাতারং দানকালে নিষেধকম্।
দত্বা সন্তপ্যতে যস্তু তমাহুর্ব্বক্ষ্যাকম্॥
[যমস্মৃতিঃ] ১৮।

সাত্বিক ত্যাগ করিবে, তাহাতে উপকারের স্পৃহা করিবে না; কর্ণ কুণ্ডলদান কালে শক্তি যাচ্ঞা করিয়া কলুষ চিত্ত হইয়াছিলেন, [এ বিষয়ে মহাভারতে বন পর্ব্বে ৩০৯ অধ্যায়ে উপাখ্যান যথা,—

হস্তিনাপুরে কর্ণ মধ্যাহ্ন কালে জল হইতে উঠিয়া, যখন কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্য-দেবের স্তব করিতেন, তখন ধনের নিমিত্ত যে কেহ তাঁহার নিকট যাইতেন, সকলকে প্রার্থনানুযায়ী দ্রব্য দান করিতেন। এই দেখিয়া ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট গিয়া, তাঁহার শরীরজাত কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করিলেন; কবচ ও কুণ্ডল জন্য কর্ণ সকলের অবধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং দিতে স্বীকার না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে অন্য বহু মূল্য দ্রব্য লইতে কহিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বীকার পাইলেন না। পরিশেষে কর্ণ ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন "বাসব! আমার কবচ ও কুণ্ডল পরিবর্ত্তে আপনি আমার সেনামুখে শত্রুসংহারকারিণী অমোঘা শক্তি প্রদান করুন"।

"বর্ম্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ শক্তিং মে দেহি বাসব।
অমোঘাং শত্রু সঙ্ঘানাং ঘাতিনীং পৃতনা-মুখে॥" ২১॥

উপকার আশা না করিয়া দান করা কর্ত্তব্য—

পাত্রেভ্যো দীয়তে নিত্যমনপেক্ষ্য প্রয়োজনম্।
কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যৎ ধর্ম্মদানং প্রচক্ষতে॥
(দেবলস্মৃতিঃ।)

উপকার আশায় যে দান, উহা অদান—

অদত্তস্তু ভয়ক্রোধহর্ষশোকরুগর্দ্দিতৈঃ।
* * *
বালমূঢ়া স্বতন্ত্রার্ত্তমত্তোন্মত্তাপবর্জ্জিতম্।
কর্ত্তা মমেদং কর্ম্মেতি প্রতিলাভেচ্ছয়া চ যৎ॥১০
নারদস্মৃতি। ৫।] ১৯।

ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবে না, কারণ ব্রহ্মশাপ দুঃসহ; ব্রহ্মশাপে তক্ষকাগ্নিতে পরীক্ষিৎ বিনষ্ট হইয়াছিলেন (এই উপাখ্যান মহাভারতে আদি পর্ব্বে ৪১ অধ্যায়ে—

একদিন রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। একটী পলাতক মৃগের অন্বেষণে শমীক মুনির আশ্রমে গমন করিয়া ধ্যানস্থিত মুনিকে মৃগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি কোন বাক্য উচ্চারণ না করাতে, ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর রাজা মৌন-ব্রতধারী ঋষির গলে ধনুর দ্বারা একটি মৃত সর্প যোজনা করিয়া দিলেন। ঋষি-পুত্র শৃঙ্গী সহক্রীড় বালকের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আশ্রমে পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়াছিলেন যে, যে রাজপাংশুল আমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প যোজনা

ব্রাহ্মণাবমানস্তু ব্রহ্মশাপোহি দুঃসহঃ।
তক্ষকাগ্নৌ ব্রহ্মশাপাৎ পরীক্ষিদগমৎ ক্ষয়ম্॥ ২০

দত্তা রত্নোন্নতং ধর্ম্মং নাচরেদেব নিষ্ফলম্।
ব্রাহ্মণ্যদম্ভদম্ভান্ত বিদ্যা কর্ণস্য নিষ্ফলা ॥২১

নাসেব্য সেবয়ানঘ্যাদ্‌ দৈবাধীনে ধনে খিদ্যন্।
ভীষ্ম-দ্রোণাদয়ো যাতাঃ স্বয়ং দুর্য্যোধনা-
প্রয়াং॥ ২২

করিয়াছে, সেই পাপকে পরমেশ্বর তক্ষক অস্ত হইতে সপ্তাহ মধ্যে যম-সদনে নীত করুক—
যোহসৌবৃষলা ভাভনা তথা কৃচ্ছ্রগতস্য চ।
স্কন্ধে মৃতং সমাসাক্ষীৎ পন্নগং রাজ-
কিল্বিষী ॥ ১২
তং পাপমতিসংক্রুদ্ধস্তক্ষকঃ পন্নগেশ্বরঃ।
আশীবিষস্তিগ্মতেজাম্মদ্বাক্যবলচোদিতঃ ॥১৩
নেষ্যত্যাগ্নিতোনেত্যা যমস্য সদনং প্রতি।
দ্বিজানামবমন্তারং কুরূণামযশস্করম্ ॥ ১৪)

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও পূজ্যত্ব বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণও শ্রুতদেবকে কহিয়াছিলেন—
ন ব্রাহ্মণান্ মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজং।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়োহহম্ ॥৪০
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৬ অধ্যায়ে।

এই প্রাধান্য প্রদর্শন জন্য তিনি ভৃগু-মুনির পদাঘাত বক্ষে ধারণ করিয়াছেন—
শয়ানং শ্রিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ। ১
শ্রীভাগবতে ১০স্কন্ধে ৮৯ অঃ

বেদেও ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।—
"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥"
ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮ অষ্টকে ৪ অঃ ১৭বর্গে ১২
শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতায়াং ৩১ অঃ ১১।
অথর্ব্ববেদ সংহিতায়াং ১৯ কাণ্ডে ৬প্র-
পাঠকে ৬।

সেই বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন......ইত্যাদি] ২০

দম্ভ পূর্ব্বক কোন ধর্ম্ম আচরণ করিবে না, কারণ তাহা পরিশেষে নিষ্ফল হয়। কর্ণের ব্রাহ্মণ্যদম্ভে লব্ধ অস্ত্রবিদ্যা নিষ্ফল হইয়াছিল। (এ বিষয়ে মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে রাজধর্ম্মে তৃতীয়াধ্যায়ে উপাখ্যান—

কর্ণ পরশুরামের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া সমুদয় ব্রহ্মাস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। একদিন পরশুরাম কর্ণের উৎসঙ্গে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন। ইতিমধ্যে মাংস ও রুধির ভোজী একটি কীট আসিয়া কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে কর্ণ সে যাতনা সহ্য করিয়া রহিলেন। পরশুরাম নিদ্রাভঙ্গে যখন কর্ণের উরু রুধিরাক্ত দেখিলেন, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "মূঢ়! তোর ধৈর্য্য দেখিয়া তোরে ক্ষত্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তুই সত্য পরিচয় দে"। তখন কর্ণ ভূতলে পতিত হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া কহিলেন "হে ভার্গব! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে উদ্ভব যে সূত জাতি, আমি সেই সূতকুলোদ্ভব কর্ণ, বিদ্যাদাতা গুরু পিতৃপদবাচ্য জানিয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম; এক্ষণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন"। তখন পরশুরাম কহিলেন "মূঢ়! যখন তুই অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যোপচার করিয়াছিলি, তখন এই সকল ব্রহ্মাস্ত্র তোর নিকট প্রতিভা পাইবে না"।
যস্মান্মিথ্যোপচরিতোহস্ত্রলোভাদিহত্বয়া।
তস্মাদেতদ্ধিতে মূঢ় ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাস্যতি॥)

ইহা দিলাম, যজ্ঞ করিলাম, অধ্যয়ন করিলাম, ব্রত করিলাম, এইরূপ দম্ভ করিলে তাহার কারণ হয়, অর্থাৎ অধোগতি হয়; তজ্জন্য দম্ভ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।
ইতিদত্তমিতি যজ্ঞ ইতি ব্রতম্।
ইত্যেতানি ভয়াত্ম্যাস্তানি বর্জ্জ্যানি সর্ব্বশঃ।
আদিপর্ব্বণি ৯০ অধ্যায়ে।
নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যং চ
বর্জ্জয়েৎ॥ ১৬৩ মনুঃ ৪ অধ্যায়ে।
সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥
গীতা ১৭ অধ্যায়ে ১৮] ২১.

নীচসেবা দ্বারা দৈবাধীন ধনোপার্জ্জনে

পরপ্রাণপরিত্রাণপরঃ কারুণ্যবান্ ভবেৎ।
মাংসং কপোতরক্ষার্থে স্বং শ্যেনায় দদৌ
শিবিঃ ॥ ২৩

যুদ্ধ করিবে না; ভীষ্ম-দ্রোণাদি দুর্য্যোধনের আশ্রয় লইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন; (দুর্য্যোধনের স্বভাব যে অত্যন্ত নীচ, তাহা তাঁহার মাতা গান্ধারী দেবীও ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন, যথা—"হে রাজন্! সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন কাম ও ক্রোধের বশ ও সম্পূর্ণ মোহযুক্ত হইয়াছে—

স এষ কামমন্যুভ্যাং প্রলব্ধো মোহমাস্থিতঃ।
উদ্যোগ পর্ব্বণি ১২৮ অধ্যায়ে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির জন্য দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিয়াছিলেন, তখন দুর্য্যোধন কহিয়াছিলেন—

যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যাবিধ্যেদগ্রেণ কেশব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥
২৬ ঐ ১২৬ অধ্যায়)

নীচসেবা-দোষ যথা—গরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে—

দাতা দরিদ্রঃ কৃপণোঽর্থযুক্তঃ
পুত্রোঽবিধেয়ঃ কুজনস্য সেবা।
পরাপকারেষু নরস্য মৃত্যুঃ
প্রজায়তে দুশ্চরিতানি পঞ্চ ॥ ১৭।
কান্তাবিয়োগঃ স্বজনাপমান-
ঋণস্য শেষঃ কুজনস্য সেবা।
দরিদ্রভাবাৎ বিমুখাশ্চ মিত্রা
বিনাগ্নিনা পঞ্চ দহন্তি তীব্রাঃ ॥ ১৮।
মৃত্যুঃ কিং বদ দুর্জ্জনেষু নতিঃ——"
সপ্তরত্নম্।]

অন্যের প্রাণ পরিত্রাণ জন্য করুণাবান্ হইবে; কপোতরক্ষার জন্য শিবি রাজা নিজ মাংস শ্যেন পক্ষীকে দান করিয়াছিলেন। (এ বিষয়ে মহাভারতে বনপর্ব্বে ১৩১ অধ্যায়ের আখ্যায়িকা—

মহাত্মা রাজা শিবিকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন ইন্দ্র শ্যেনপক্ষীরূপ ও অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কপোত শ্যেনপক্ষীর ভয়ে শিবি রাজার উরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্যেন কহিলেন "রাজন্! আপনি ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তবে আপনি আমার আহার না দিয়া আমার কষ্ট দিতেছেন কেন?" শিবি কহিলেন "এই পক্ষী ভীত হইয়া আমার শরণাগত হইয়াছে—শরণাগতকে রক্ষা করা ধার্ম্মিকের কার্য্য।" শ্যেন কহিলেন "রাজন্! আমার অনেকগুলি পরিবার; আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে তাহাদের গতি কি হইবে?" শিবি কহিলেন "ইহার পরিবর্ত্তে যাহা রুচি হয়, বল, আমি তৎক্ষণাৎ দিব।" শ্যেন কহিলেন "আমার অন্য মাংসের রুচি নাই, যদি তোমার শরীরের মাংস এই কপোতের সহিত তুলায় ওজন করিয়া দাও, তাহা হইলে লইতে পারি।" রাজা শিবি কপোতের সহিত তোল করিয়া নিজ শরীর হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। যখন সমুদায় শরীরের মাংস দিয়াও কপোতের সমান হইল না, তখন রাজা স্বয়ং তুলায় আরোহণ করিয়াছিলেন—

ন বিদ্যতে যদা মাংসং কপোতেন সমং ধৃতম্।
ততউৎকৃত্তমাংসোঽসাবারুরোহ স্বয়ং তুলাম্ ॥

অদ্বেষ পেশলং দুর্ব্বাগ্রমঃ কুসুম-কোমলম্।
বজুষ দ্বেষদোষেণ দেবদানব সংকরঃ ॥ ২৪

শরণাগতকে ত্যাগ করা পাপ, যথা—

যোহি কশ্চিদ্দ্বিজান্ হন্যাদ্ গাং বা লোকস্য মাতরং।
শরণাগতঞ্চ ত্যজতে তুল্যং তেষাং হি পাতকম্ ॥ ৬
বনপর্ব্বণি ১৩১ অধ্যায়ে।

যে কেহ ব্রাহ্মণ অথবা লোকমাতা গাভী বধ করে কিম্বা শরণাগতকে ত্যাগ করে, সকলেরই তুল্য পাপ।] ২৩

কুসুমের ন্যায় কোমল মনকে দ্বেষ

অবিস্মৃতোপকারঃ স্যাৎকুর্ব্বীত কৃতঘ্নতাম্।
হত্বোপকারিণং বিপ্রো নাড়ীজঙ্ঘমধশ্চ্যুতঃ॥

২৫

পূর্ণ করিবে না, কারণ দ্বেষ দোষে দেব ও দানবের যুদ্ধ হইয়াছিল।

(সমুদ্রমন্থনকালে যখন পরিশেষে অমৃত উত্থিত হইয়াছিল, তখন অমৃত পান জন্য দেব-দানবের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল ; এই উপাখ্যান আদিপর্ব্বে ১৯ অধ্যায়ে—

"ততঃ প্রবৃত্তঃ সংগ্রামঃ সমীপে লবণাম্ভসঃ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ সর্ব্বঘোরতরো মহান্॥)

দ্বেষ করা ভাল নহে। দ্বেষ ক্লেশমূল—

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ
পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদে ৩ সূত্রম্।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ। দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ। ৮

ঐ ঐ

রাগদ্বেষাদিযুক্তানাং ন সুখং কুত্রচিৎ দ্বিজ।
গরুড় পুরাণে ১১৩ অধ্যায়ে। ৫৮] ২৪

কখনও উপকার বিস্মৃত হইবে না ও কৃতঘ্নতা করিবে না ; বিপ্র গৌতম উপকারী নাড়ীজঙ্ঘ নামে বককে বধ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[এ বিষয়ে শান্তি পর্ব্বে ১৬৮ হইতে ... অধ্যায় পর্য্যন্ত বকনাড়ীজঙ্ঘোপাখ্যান উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই—ব্রাহ্মণ গৌতম অত্যন্ত দুঃখী ছিলেন। তিনি বক নাড়ীজঙ্ঘের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহাকে দুঃখের অবস্থা কহিয়াছিলেন। বকের বিরূপাক্ষ নামে এক রাক্ষস বন্ধু ছিল। বিরূপাক্ষ গৌতমকে প্রভূত ধনদান করিয়াছিলেন। গৌতম দেশে যাওয়া স্থির করিয়া চিন্তা করিল যে, সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য কিছু নাই, কি প্রকারে এত দূরপথ যাইব ? একদিন রাত্রে উভয়ে একস্থানে শয়ন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য বক অগ্নি স্থাপন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বককে সেই অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া লইয়া দেশে যাইতে ছিলেন। রাক্ষস জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে ধৃত করিয়া আনিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া রাক্ষসদিগকে আহার জন্য দিয়াছিলেন।

কৃতঘ্নতা পাপ, যথা—

কুতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্।
অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নোহি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥
মিত্রদ্রোহো ন কর্ত্তব্যঃ পুরুষেণ বিশেষতঃ।
মিত্রধ্রুক্ নরকং ঘোরমনন্তং প্রতিপদ্যতে॥
পরিত্যাজ্যো বুধৈঃ পাপঃ কৃতঘ্নো নিরপত্রপঃ
মিত্রদ্রোহী কুলাঙ্গারঃ পাপকর্ম্মা নরাধমঃ॥
শান্তিপর্ব্বণি ১৭৩ অধ্যায়ে।] ২৫

স্ত্রীজিতো নভবেদ্ধীমান্ গাঢ়রাগবশীকৃতঃ।
পুত্রশোকাদ্দশরথো জীবং জায়াজিতোহত্যজৎ॥ ২৬

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গাঢ় অনুরাগবশ হইয়া স্ত্রীজিত হইবে না ; রাজা দশরথ স্ত্রীজিত হইয়া পুত্রশোকে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। (এই উপাখ্যান বাল্মীকীয় রামায়ণে ও অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডে বিস্তৃত বর্ণিত আছে।)

পুরুষ স্ত্রীর বশ না হইয়া স্ত্রীকে বশে রাখা কর্ত্তব্য। স্ত্রী বশবর্ত্তিনী না হইলে, সংসার দুঃখের আকর হইয়া থাকে—

... ... বিদ্যা
অবৈদিতা সজ্জনসঙ্গতিশ্চ।
ইষ্টা চ ভার্য্যা বশবর্ত্তিনী চ
দুঃখস্য মূলোদ্ধরণানি পঞ্চ॥ ২০
গরুড় পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে।

স্ত্রীতে স্বামীর প্রভুতা, সুখের বিষয়—
উপপন্নাহি দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী।
শকুন্তলে ৫ অঙ্কে।

যেস্থানে স্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব, সেস্থানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে—

স্ত্রীনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বালনায়কে।৬
গারুড়ে ১১৫ অধ্যায়ে।

যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞাচ ভর্ত্তারমনুগামিনী।
অল্পাল্পেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া॥২৪
গারুড়ে ১০৮ অধ্যায়ে] ২৭

ন স্বয়ং সংস্তুতিপদৈর্গ্লানিং গুণগণং নয়েৎ।
স্বগুণ-স্তুতিবাদেন যযাতিরপতৎ দিবঃ॥ ২৭

নিজ গুণ বর্ণনদ্বারা নিজ গুণকে মলিন করিবে না; যযাতি রাজা স্বগুণ বর্ণনা করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

(রাজা যযাতি এক বৎসর বায়ু ভক্ষণাদি কঠোর তপস্যাবলে স্বর্গারোহণ করেন। একদিন ইন্দ্র যযাতিকে কহিয়াছিলেন "হে নহুষতনয়! যখন তুমি গৃহাশ্রমের সমুদায় কর্ম্ম শেষ করিয়া বন গমন করিয়াছিলে, তখন তপস্যায় কাহার তুল্য হইয়াছিলে, বল। যযাতি কহিয়াছিলেন "হে ইন্দ্র! দেব মানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির মধ্যে আমি কাহাকেও আমার তুল্য তপস্বী দেখি নাই"। ইন্দ্র বলিয়াছিলেন "রাজন্! যখন তুমি অন্যের প্রভাব না জানিয়া তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সকলকে অবমাননা করিলে, তখন তোমার সমুদায় পুণ্যের ক্ষয় হইবে; সুতরাং তোমার স্বর্গভোগেরও শেষ হইল, অতএব তুমি স্বর্গভ্রষ্ট হও,—

যদাবমংস্থাঃ সদৃশঃ শ্রেয়সশ্চ অল্পীয়সশ্চাবিদিতপ্রভাবঃ।
তস্মাল্লোকাস্ত্বন্তবন্তস্তবেমে ক্ষীণে পুণ্যে পতিতাস্যদ্য রাজন্॥ ৩।

ভারতে আদিপর্ব্বণি ৮৮ অধ্যায়ে)

আত্মপ্রশংসা করিলে নরকগামী হইতে হয় ও শৃগাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিতে হয়,—

ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি লালপ্যমানা নরদেব সর্ব্বে।
তে কঙ্কগোমায়ুবলাশনার্থং ক্ষীণা বিবৃদ্ধিং বহুধা ব্রজন্তি॥ ৪

আদি পর্ব্বণি ৯০ অধ্যায়ে।

যযাতি কহিয়াছিলেন "হে নরদেব! যাহারা আত্মপ্রশংসা করে, তাহারা নরকে গমন করে,—

ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি লালপ্যমানা নরদেব সর্ব্বে। ৪

আদি পর্ব্বণি ৯০ অধ্যায়ে।

ত্যজেন্মৃগয়া ব্যসনং হিংসয়াতি মলীমসম্।
মৃগয়ারসিকঃ পাণ্ডুঃ শাপেন তনুমত্যজৎ॥ ২৮

বিবেকী ব্যক্তি দয়াবান হইবেন, প্রতিক্রিয়াচরণ করিবেন না, নির্ভয় ও আত্মশ্লাঘাহীন হইবেন,—

মৃদুঃ স্যাদপ্রতিক্রূরো বিস্রব্ধস্ত্বাদকথনঃ। ৮
শান্তিপর্ব্বণি ১৭৭ অধ্যায়ে।
ইষ্টং দত্তমধীতং বা বিনশ্যত্যনুকীর্ত্তনাৎ।
দেবলঃ] ২৭

হিংসায় অতিমলিন মৃগয়াব্যসন ত্যাগ করিবে; মৃগয়াসক্ত পাণ্ডু রাজা শাপে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। (এ বিষয়ে ভারতে আদি পর্ব্বে ১১৮ অধ্যায়ে এই উপাখ্যান যথা—পাণ্ডু রাজা মৃগপরিবেষ্টিত অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে মৈথুনাসক্ত এক মৃগকে দর্শন করিয়া, শর দ্বারা সেই মৃগ ও মৃগীকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিমিন্দম নামে মুনি মৃগরূপ হইয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডুকে শাপ দিয়াছিলেন যে "তুমি যেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছ, তদ্রূপ তুমি যখন কামমোহিত হইয়া অবশ হইবে, তখন তুমি আমার ন্যায় জীবনান্তকর দশা প্রাপ্ত হইবে"। রাজা পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী দুই পত্নী ছিলেন। মাদ্রী পাণ্ডুর সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় একদিন কামাসক্ত হইয়া মাদ্রীতে মৈথুনাসক্ত হওয়ায়, মুনিশাপে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন—

যথাহং হিংসিতো যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বামপ্যহং শপে।
ত্বয়োনৃশংসকর্ত্তারমবশং কামমোহিতম্॥
জীবিতান্তকরো ভাব এবমেবাগমিষ্যতি॥)

জীবহিংসাদোষ যথা—

ন ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন। ৩০।
শান্তিপর্ব্বণি ২৭১ অধ্যায়ে।

জীবসকলের অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই।] ২৮

কিংপেদ্ বাক্পেশ্যংস্তীক্ষ্ণান্ পাংশ্বাঝুপান্-
তান্।

বাক্পাশুস্ত্রাক্যাচক্রে ভীমঃ কুরুকুল-
ক্ষয়ম্॥ ২৯

কার্য্যেপুরিত তীক্ষ্ণ বাক্যের ক্ষেপণ করিবে না; ভীম বাক্যাবকাক্রোধে কুরুকুলকে ক্ষয় করিয়াছিলেন।

[দুর্য্যোধন ভীমকে অত্যন্ত দুর্ব্বাক্য করিয়াছিলেন, ভীম তজ্জন্য কোপে কুরুকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন]

কাহারও কর্কশ বাক্য বলা উচিত নহে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে নীতি কহিয়াছিলেন "রাজন্! পরুষবাক্য বক্ষচ্ছেদন করিলে তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হয় না; সুতরাং কাহাকেও দুর্ব্বাক্য কহিবে না—

রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতং।
বাচাদুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতি বাক্-
ক্ষতম্॥ ৭৭

উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৩ অধ্যায়।

সংরোহত্যেষুণা বিদ্ধং বনং পরশুনা হতম্।
বাচাদুরুক্তং বীভৎসং ন প্ররোহতি বাক্-
ক্ষতম্।

বামন পুরাণে ৫৪ অধ্যায়ে।

বাক্যোক্তিশল্যাদুরুদ্ধর্ত্তুং নশক্যং মনিসং যতঃ।

শুক্রনীতি, ৩ অধ্যায়ে।

মহাদেবও সতীকে কহিয়াছিলেন—

তথারিভির্নব্যথতে শিলীমুখৈঃ শেতেহর্দ্দিতাঙ্গো হৃদয়েনদূয়তা।

স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভির্দিবানিশং তপ্যতি মর্ম্মতাড়িতঃ। ১৯

শ্রীভাগবতে ৪স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে।

শত্রুর শরে হৃদয় সেরূপ বিদ্ধ হয় না, যেরূপ আত্মীয় ব্যক্তির দুর্ব্বাক্যে হৃদয় বিদ্ধ হয়; কারণ প্রথমোক্ত ব্যক্তি হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াও নিদ্রা যায়, কিন্তু শেষোক্ত দিবানিশি মর্ম্মে ব্যথা পায়।] ২৯

পরেষাং ক্লেশদং কুর্য্যান্ন পৈশুন্যং প্রভোঃ প্রিয়ম্।

পৈশুন্যেন গতৌ রাহোশ্চন্দ্রার্কৌ ভক্ষণীয়-
তাম্॥ ৩০

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

* প্রভুর প্রিয়াচরণ করিতে গিয়া কাহাকেও অন্যকে অন্য ক্লেশ দিবে না, সূর্য্য ও চন্দ্র ক্রুরতা করায় রাহুর ভক্ষণীয় হইয়াছিলেন। (সমুদ্র মন্থনে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবগণ সেই অমৃত পান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাহু দেবরূপ ধরিয়া অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে, এরূপ সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন। ছিন্ন মস্তক আকাশে উঠিয়া ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। এই অবধি রাহুর মুখের সহিত সূর্য্য-চন্দ্রের চিরশত্রুত্ব নিবন্ধন রাহু মধ্যে মধ্যে সূর্য্য-চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে—।

ততো বৈরবিনির্বন্ধঃ কৃতো রাহুমুখেনবৈ।
শাশ্বতশ্চন্দ্র সূর্য্যাভ্যাং গ্রসত্যদ্যাপি চৈব তৌ॥

আদি পর্ব্বণি ১৯ অধ্যায়ে

পিশুনতা দোষ যথা—

লোভোহস্যাস্তি পরেণ কিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ।

ইত্যাদি।

যদি লোভ থাকে, শত্রুর আবশ্যক কি? যদি পিশুনতা থাকে, পাপের প্রয়োজন কি? ৩০

কামকলা-তত্ত্ব।

"যৎকণ্ঠে গরলং বিরাজতি সদা মৌলৌচ
মন্দাকিনী,
যস্যাঙ্কে গিরিজাননং কটিতটে শার্দ্দূল-
চর্ম্মাম্বরম্।
যস্মা হি স্ফুরন্তি বিশ্বমখিলং পায়াৎ স বঃ
শঙ্করঃ
জম্বূবৎ জলবিন্দুবৎ জলজবৎ জম্বালবৎ
জালবৎ।"

যোগাধার মহাযোগী মহেশ্বরের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, তৎকৃপায় তৎকথিত কামকলাতত্ত্ব—যতদূর সম্ভব প্রকাশযোগ্য—সংক্ষেপে বলিতেছি (১)। যোগী ও সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট ইহা দুর্ব্বোধ্য এবং অপকাশ্য ও অতি গোপনীয়। শ্রীক্রমে বলিয়াছেন,—

"গোপনীয়ং হি প্রযত্নেন যদিচ্ছেদাত্মনো হিতং।"

যদি আপনার হিতকামনা থাকে, তবে অতি যত্নের সহিত ইহা গোপন রাখিবে।

যামলে বাক্য আছে—

"এতৎ কামকলা-ধ্যানং গুহ্যাৎ গুহ্যতমং
মহৎ।
নাশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন।
এতৎ প্রকাশনং মাতৃকোটিমরণং পরম্।
দোষচিরাদ্ ভূমাপ্নোতি শত্রুবোক্ত বিধা-
লিপিভিঃ॥"

মূল তাৎপর্য্য—কামকলা ধ্যান গুহ্যাদপি গুহ্য। ইহা অশিষ্য বা অভক্তের নিকট কখনই বলিবে না,—বলিলে শীঘ্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

আমি পর্য্যটন সময় দেখিয়াছি যে, পরমহংস ও যোগী সন্ন্যাসিগণ ভক্ত ও পূর্ণাভিষিক্ত উপযুক্ত সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট কামকলার নাম মুখে আনেন না। আমিও কামকলা-বিষয়িণী গুহ্য তত্ত্বকথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাহা বলিতে হইলে যোগের আভ্যন্তরিণ অনুষ্ঠান প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কামকলার স্বরূপ জানিয়া, কামকলা ধ্যান করা যোগী ও সাধকগণের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কামকলাতত্ত্ব না জানিলে প্রকৃত যোগ হয় না। কামকলার স্বরূপ ও কামকলাতত্ত্ব যে যোগীর অজ্ঞাত, তিনি কখনই যোগী নহেন। এরূপ ব্যক্তি যোগী নামধারী ভেকধারী মাত্র। সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগসাধনা; যোগেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান-ধারণা—কামকলা। এই কামকলা যোগী ও ভোগী সকলেরই গোপ্য ও

(১) সন ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসের হিন্দু-পত্রিকায় 'ব্রহ্মজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—"প্রত্যেক বার শ্বাস-প্রশ্বাসে 'হংস' উচ্চারিত হয়। হংসের কণ্ঠ ও নেত্র কামকলা।" এই কামকলাতত্ত্ব জানিবার জন্য পাঠকগণ আগ্রহ সহকারে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট হইতে ৬৩ খানি পত্র পাইয়াছি; কিন্তু প্রত্যেক পত্রের উত্তরে কামকলাতত্ত্ব বর্ণন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। এজন্য স্বতন্ত্ররূপে কামকলা-তত্ত্ব বর্ণন করিলাম। ঘটনা-চক্রনেমির অনবরত আবর্ত্তনে পড়িয়া এতদিন লিখিব লিখিব মনে করিয়াও লিখিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসু পাঠকগণ দীর্ঘকাল বিলম্ব জন্য ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। গুরু-পরম্পরাক্রমে ইহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় এবং কামকলার ধ্যান দ্বারা ভবসংসার-বন্ধন দূর হয়। যেদিন সম্বন্ধে ভগবান বিষ্ণু কামকলা ধ্যান করিয়া স্বয়ং মোহিনীরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং মহাদেবকেও বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অভূতপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিবার ক্ষমতা লাভের আশায় কামকলা ধ্যান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং সুরাসুর সহিত জগদ্‌গুরু মহাযোগী মহেশ্বরকে বিমোহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শঙ্করাবতার মহামনা শঙ্করাচার্য্য আদ্যাশক্তির স্তব করিবার সময় তাহা বলিয়াছেন, যথা—"হরিস্ত্বমারাধ্য * * * পুরা নারী ভূত্বা, পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ" ইত্যাদি। বাস্তবিক যে ভাগ্যবান সাধক গুরুর নিকট স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদ কামকলা অবগত হইতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সাধু, তিনিই সেবা এবং তিনিই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন

মনুষ্য-দেহের গুহ্যদেশ হইতে অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে ও লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি নিম্নে মূলাধার পদ্ম আছে। এই মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী সার্দ্ধ তিন কুণ্ডলাকারে স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া আছেন। দেব, মানব, অসুর, কুম্ভীর, কীটাদি সমস্ত প্রাণীর শরীরে কুণ্ডলিনী আছেন (* ২)। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই কামকলারূপা হয়েন।

শ্রীক্রমে ব্যক্ত আছে—

"সাপি কুণ্ডলিনী শক্তিঃ কামকলাস্বরূপিণী।"

আগমকল্পক্রম-পঞ্চশাখাতে আছে যে,—

"অখিল-জন-জীব-কমলিনী বামেক্ষণা * * ।
সাধক-মন্ত্রভেদাৎ সা কালী, গৌরী ভদ্রপের্দং"

যিনি অখিল জীবের ষট্‌চক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই কুণ্ডলিনীই সূক্ষ্মরূপে কামকলা। এই ভগবতীই সাধকের মন্ত্রভেদে কালী, তারা, ত্রিপুরা, গৌরী প্রভৃতি নামে অভিহিতা।

কামকলার আকৃতি ত্রিবিন্দু। এই ত্রিবিন্দুর স্বরূপ এবং প্রকৃত অর্থ এখন ব্যক্ত করিতেছি।

"বিন্দু ত্রয়সমাযোগাৎ ত্রিবিন্দৌ ত্রিপুরা-
স্থিতা।
বিন্দুং সঙ্কল্পয়েদ্বক্ত্রং তস্যাধস্তাৎ কুচদ্বয়ং।
তদধঃ সপরার্দ্ধন্তু চিন্তয়েত্তদধো গতম্।
এবং কামকলা সাক্ষাদক্ষরব্রহ্মরূপিণী।"

(দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা।)

অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে ত্রিপুরা দেবী অবস্থিতি করিতেছেন। ঊর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পনা ও অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনদ্বয় কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে হ-কারার্দ্ধ চিন্তা করিবে। এই কামকলা সাক্ষাৎ অক্ষর-ব্রহ্মস্বরূপিণী।

(২০) এই কুণ্ডলিনীকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে না পারিলে মানুষ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কুণ্ডলিনীই জীবন দ্বারা জীবরূপে, মনন দ্বারা মনরূপে, সংকল্পদ্বারা সংকল্পরূপে, বোধ দ্বারা বুদ্ধিরূপে, অহংভাব দ্বারা অহংকার রূপে দেহে অবস্থিতি করেন। কুণ্ডলিনীর দুই মুখ এবং পদ্মের মৃণাল তন্তুর শতাংশের একাংশ তুল্য অতি সূক্ষ্ম। উহার গতি অতিশয় দুর্লক্ষ্য। সদ্‌গুরুর উপদেশে এবং সাধকের সাধন-বল ব্যতীত কুণ্ডলিনী পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন।

ভাব চূড়ামণিতে ব্যক্ত আছে, যথা—

"মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্।
সর্ববিদ্যাসুধাপূর্ণং সর্ববাঞ্ছিতপ্রদানম্।
সর্বার্থসাধকং দেবি সর্বমন্ত্রৈককারণং।
অধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ সপবিন্দুত্রিমণ্ডলম্।
সর্বদেবাদিভূতং তৎ সর্বদেবনমস্কৃতম্।
সর্বাহ্লাদনসম্পূর্ণং সর্বসম্পৎপ্রবর্তকম্।
এতৎ কামকলা-ধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥"

ঊর্দ্ধস্থিত একবিন্দুতে মুখ কল্পনা করিয়া, নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগল কল্পনা করিবে। এই বিন্দুত্রয় অমৃতে পরিপূর্ণ ও সর্ব বিদ্যারূপ, সর্ববিধ বাক্‌শক্তি ও সর্ববিধ অভীষ্টপ্রদায়ক। বিন্দুদ্বয়ের নিম্নে হকারের উত্তরার্দ্ধ * * * কল্পনা করিতে হইবে। ইহা সর্বদেবের আদি, সর্বদেবের পূজ্য ও সকলের আনন্দকর। সাধকের কর্ত্তব্য এই যে, কামকলা-ধ্যান যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে।

শ্রীতন্ত্রার্ণবে কথিত আছে—

"এবং কামকলারূপং মুখবিন্দোঃ সমুত্থিতম্।
নাসাদ্যাঙ্গং স্তনদ্বন্দ্বাৎ বাহুযোনি পদদ্বয়ম্।
অনাদিনিধনং যত্তৎ পরাশক্ত্যাখ্যমব্যয়ম্।
লাবণ্যলহরীসাররূপানন্দ-বারিধিঃ।"

কামকলা মূর্ত্তির বিন্দুত্রয় মধ্যে ঊর্দ্ধস্থিত মুখবিন্দু হইতে নাসিকা প্রভৃতি উত্তমাঙ্গ সমুদয় ও স্তনবিন্দু-যুগল হইতে বাহুযুগল প্রভৃতি এবং হকারার্দ্ধ কটিদেশ হইতে চরণযুগল প্রভৃতি হইবে। ইনিই অনাদি পরাশক্তি ও এই রূপই লাবণ্য-লহরীসার ও আনন্দময়ী।

যামলে বর্ণিত হইয়াছে যে—

"তথা কামকলাং বক্ষ্যে যদেব দেবরূপকম্।
বীজৈর্বর্ণাত্মিকৈর্বর্ণা নিত্যা ব্রহ্মরূপিণী।
পঞ্চাশদ্বর্ণ বিন্দ্বাদ্যা ভববন্ধবিমোচনী॥
বিন্দুনা নির্মিতৈবং সকলা নিষ্কলরূপিণী।
ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা পুরাতনী।
নবো ভিন্না বিন্দুমুখী চন্দ্রসূর্য্যস্বরূপিণী।
সৃষ্টিস্থিতিকলা সা ত্রৈলোক্যানাং জনাম্বিকা।
এবং কলাময়ী রূপা করোতি সা চরাচরম্।
* * * * *
ইতি কামকলা বিদ্যা চক্রবিদ্যাস্বরূপিণী।
যেন পুণ্যবতা কো ন জ্ঞাতা নাপরঃ শিবে।
স দেব্যাঃ খলু লোকেষু স যোগী স চ কৌলিকঃ।
বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন যো বেত্তি কামিনীং কলাং।
তদ্রূপঞ্চ ভবেদাত্মা কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে।
সত্যঃ পন্থাঃ সমীচীনো বর্ণিতস্তব সুন্দরি।
এতৎ কামকলাধ্যানং গুহ্যাৎ গুহ্যতমং মহৎ।
নাশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন।
এতৎ প্রকাশনং মাতরুচ্চাটনকরং পরম্।
প্রকৃত্যাদ্গোপনমিব তস্মান্নৈতৎ প্রকাশয়েৎ।
মোহয়িত্বা তু মামপ্যোক্তিশাস্ত্রৈর্বেতি-বিবাদিভিঃ।"

এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতা-রূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপা। কামকলার ধ্যান করিলে ভব-বন্ধন বিমোচন হয়। গুরু-পরাম্পরা ক্রমে ইহার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহা নিষ্কল বিন্দুরূপা হইয়াও সমুদয় মাতৃকা-বর্ণ-স্বরূপা। ইহার ত্রিবিন্দু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী ও ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান, এই

ত্রিশিক্ (৩৯)। ইহার নম্রোমুখী ত্রিকোণ মুখস্বরূপ, নিম্নে শশী-সূর্য্যরূপ বিন্দু যুগল নয়নযুগল স্বরূপ কল্পনা করিতে হয়। নিম্নে যে হকারার্দ্ধ আছে, তাহা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা পৃথিবী। কামকলা চরাচর জগতে জাগরূকা আছেন। কামকলাবিদ্যা চক্রাবলা স্বরূপিণী। যে পুণ্যবান ব্যক্তি কামকলার স্বরূপ বুঝিয়াছেন, তিনি মুক্তি লাভ করিতে পারেন এবং তিনিই যোগী, তিনিই দেবা।

যিনি বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে কামকলা অবগত হইয়াছেন, তিনি "সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই আমি সত্য ও সমাচীনপথ বর্ণন করিলাম। ইহা অতি গুহ্য। শিষ্য ও ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট কখনই প্রকাশ করিবেনা।

বৃহৎ শ্রীক্রমে আছে—

"বিন্দোরঙ্কুরভাবেন সর্ব্বদেবময়ঙ্কুরঃ।
বিন্দুতো কুটিলীভূয় বামাদীশানমাগতা॥
সা বামা শঙ্করাচ সা শিখা চিৎকলাপরা।
শক্যাশানগতা রেখা প্রত্যগাগ্নের মাত্রগা॥
জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানি ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।
বক্রীভূতা পুনর্ব্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা॥
ইচ্ছা নাদ সমাযোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা।
পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী॥"

কামকলার বিন্দু তিনটীর মধ্যে কুণ্ডলিনী প্রাদুর্ভূতা। দক্ষিণস্থিত বিন্দু অঙ্কুরিত হইয়া ঈশানকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিলে একটী রেখা হইবে। ঐ রেখার নাম বামাশক্তি ও চিৎকলা। ঈশান কোণস্থিত বিন্দু হইতে ঐ রেখা বায়ুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিবে। ঐ রেখার নাম জ্যেষ্ঠা শক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। বায়ুকোণ হইতে ঐ রেখা প্রথমোক্ত দক্ষিণদিকস্থিত বিন্দুতে গমন করিবে। ঐ রেখা ইচ্ছাশক্তি ও নাদ (৪০) এবং

---

(৩৯) এই শক্তিত্রয় প্রণবের জ্যোতিঃস্বরূপ এবং ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী নামে অভিহিতা হয়েন। যথা—

'ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।' (জ্ঞানং গৌরী শক্তিরিচ্ছা ব্রাহ্মী শক্তিঃ ক্রিয়া বৈষ্ণবী শক্তিরিতি ত্রিধা ত্রিপ্রকারা।)

(গোরক্ষ সংহিতা।)

ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া সাবিত্রী বা গায়ত্রী নামে অভিহিতা ও ক্রিয়াশক্তি বিষ্ণুর সহিত সংযুক্তা হইয়া বৈষ্ণবী এবং জ্ঞানশক্তি জ্ঞানযোগী মহাদেবের সহিত সংযুক্ত হইয়া কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হয়েন।

এই তিন প্রকার শক্তি মনুষ্য-শরীরের স্থান বিশেষে উর্দ্ধশক্তি, মধ্যশক্তি, অধঃশক্তি রূপে বিরাজিতা আছেন।

"উর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তি র্ভবেদ্গুদঃ। মধ্যশক্তি র্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যাতীতং নিরঞ্জনং।"

মানবদেহের কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্রে উর্দ্ধশক্তি, নাভিমূলে মণিপুরচক্রে মধ্যশক্তি, গুহ্যদেশে মূলাধারে অধঃশক্তি বিরাজিত আছেন।

এই তিন প্রকার শক্তিকে বন্ধনত্রয় বলে। যথা—

উড্ডীয়মান বন্ধ, জালন্ধর বন্ধ, মূলবন্ধ।

(৪০) নাদ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি-পুরুষ মূর্ত্তিহীন কেবল এক জ্যোতি মাত্র ছিল। সেই সর্ব্বব্যাপক জ্যোতিঃ আত্মা অভেদভাবে নাদ-বিন্দুরূপে প্রকাশমান হয়েন। বিন্দুস্বরূপা। মানবের শিরোদেশে যে সহস্র-

রৌদ্রীশক্তি। “কামকলা এইরূপে ত্রিকোণা-কারা হইয়া পরম শিবের সহিত মিলিতা। তিনিই ব্রহ্মস্বরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী।

দলপদ্ম আছে, তন্মধ্যে ঐ বিন্দুরূপী পরম-শিব বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে বাক্য আছে যে,—“মধ্যাহ্নকালীন কোটি মার্ত্তণ্ড-ভাস্বর বিন্দুরূপ তেজোময় শুদ্ধ-স্ফটিক-নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ পরম শিবাত্মকের জগদুৎপত্তি-পালন-নাশ-করণশীল জগদীশ্বরো বর্ত্ততে।” লিঙ্গেশ্বর তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তিনামে সদাশিব বলিয়াছেন—

“সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণ নিলয়ান্তরে। বিন্দুরূপো মহেশানি পরমেশ্বর ঈরিতঃ।”

শিরস্থিত সহস্রদল পদ্মে বিন্দুরূপ মহেশ্বর আছেন, তাঁহা যোগীর অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং প্রকৃত যোগীগণ জ্ঞাত আছেন। মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া, সহস্রারে ঐ পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। বিন্দুরূপ পরমশিবের নাম পরমাত্মা। তাঁহাকে বৈষ্ণবগণ পুরুষপুরুষ বলেন। শাক্তগণের কেহ কেহ শক্তিস্থান, বা দেবীস্থান; শৈবেরা শিবস্থান; কেহ কেহ পরমাত্মা, কেহ কেহ পরমজ্যোতি এবং সাংখ্যগণ প্রকৃতি-পুরুষ-স্থান বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ অকুল, কেহ কেহ কুলস্থান বলিয়া থাকেন। অতএব বিন্দু পরমশিব বা পরমাত্মা। আর কুণ্ডলিনী ত্রিপুরাদেবী স্বয়ং নাদরূপা। শাস্ত্রে আছে যে “নাদাত্মকং জগৎ।” এবং—

“ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী পরো হরঃ।”

নাদ হইতে সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে। মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী হইতে প্রথম উদিত প্রথম বর্ণ নাদ উত্থিত হইয়া হৃদয়গামী হইয়াছে। তাহাকে ‘পশ্যন্তি’ বলে। যথা—“সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী মধ্যে জ্যোতির্ম্মাত্রা স্বরূপিণী।

কামকলার ত্রিকোণাকার হওয়ার সম্বন্ধে কামকলাবিলাসে বাক্য আছে—

“বিন্দুস্তরঙ্গৌ উচ্ছূনং তচ্চ যদা
ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং স্যাৎম্।”
(কামকলা বিলাস।)

অর্থাৎ—একবিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত রেখা টানিলে, ত্রিকোণাকার হয়। (কামকলা ভাষ্যকার বলেন, উচ্ছূন শব্দের অর্থ বিন্দুরূপের স্ফূর্ত্তি।)

প্রপঞ্চসারে বাক্য আছে যে, কামকলা ত্রিরেখা শব্দব্রহ্মরূপা, ত্রিমূর্ত্তি ও কুণ্ডলিনী

অগ্রে ত্র্যবয়া হৃষ্ট [illegible] ছত্র্ক্ষগামিনী।
স্বয়ং প্রকাশা পশ্যন্তী সুষুম্না শ্রুতা ভবেৎ।
সৈব হৃৎপঙ্কজে প্রাপ্তা মধ্যমা নাদরূপিণী।”

হৃদয়স্থিত দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত নামক পদ্মে এই নাদধ্বনি স্বতঃই হইয়া থাকে। গুরূপদেশে অতি সামান্য চেষ্টায় নাদধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। নাদ সঙ্গীতের প্রাণ। নাদের অন্য নাম পরা। পরাশক্তি আত্মশক্তি নামের অন্ত নাই,—অসীম অপার। তজ্জন্য আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তা বলিয়াছেন,—

“নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি।”

ক্রিয়াযোগসারে কথিত আছে—“বিন্দুং শিবাত্মকং বীজং শক্তিঃ * * * ভবেদ্ যাদ ন্যস্তেতি তাত্ত্বিশক্তয়ঃ।” এই ত্রিশক্তির নাম ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি। (ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।)

কান্যকুব্জবাসী জগদ্‌গুরু লক্ষণাচার্য বলিয়াছেন—নাদ ও বিন্দু সগুণ শিব-শক্তি।

“বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদ”
ইত্যাদি। বায়ুবী সংহিতায় উক্ত আছে—
“আদাবিন্দুস্ততো নাদো, নাদাচ্ছক্তিঃ সমুদ্ভবা।
নাদরূপা মহেশানি চিদ্রূপা পরমাকলা।”

এবং ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিকোণা, পরমব্রহ্ম-স্বরূপা মহাত্রিপুরসুন্দরী।

প্রথমে বলিয়াছি যে, জীবের মূলাধা-রস্থিত কুণ্ডলিনীই কামকলারূপা। কাম-কলার স্থান কুণ্ডলিনীর ত্রয়ী, ত্রিরেখা ইত্যাদি নামে বলিয়া থাকেন। যথা—

"আধারে সর্ব্ব ভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ
শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবী সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
ত্রিগুণা সা ত্রিদোষা সা ত্রিবর্ণা সা ত্রয়ী চ সা।
ত্রিকোণা সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা ত্রিরেখা সা
বিলিখ্যতে।"

কুণ্ডলিনী ও কামকলায় আকৃতিগত বিভিন্নতা নাই এবং কামকলা ও কুল-কুণ্ডলিনী অভিন্ন—এক। কুণ্ডলিনী সার্দ্ধ তিন কুণ্ডলাকারে আছেন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু তাহা সার্দ্ধ তিন বিন্দু।

"সার্দ্ধত্রিবিন্দুরূপা ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী।
নির্গুণা নির্গুণা দেবী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চৈতন্যরূপিণী দেবী সর্ব্বভূতপ্রকাশিনী।
আনন্দরূপিণী দেবী ব্রহ্মানন্দপ্রকাশিনী।"

(বামকেশ্বর তন্ত্র)

কুণ্ডলিনীর ত্রিবিন্দু কামকলা ও অর্দ্ধ-বিন্দু কামকলার নিম্নোক্ত ইকারার্দ্ধ। সুতরাং কামকলা ও কুণ্ডলিনী এক ও অভিন্ন এবং সারাৎসারা আদ্যাশক্তি ত্রিপুরা দেবী। কামকলা অতিগুহ্য ও সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য এবং প্রকৃতযোগী ও সাধনানন্দ-সন্দোহ সোপানে অধিষ্ঠিত সাধক ব্যতীত, অপরের ধারণা করা ও প্রকৃততত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া সুকঠিন।

যোগসার ও কল্পদ্রুম প্রভৃতি গ্রন্থে কুণ্ডলিনীর ধ্যান, কবচ, স্তোত্রাদি আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য একটি ধ্যান বলিতেছি।

"ওঁ প্রসুপ্ত ভুজগাকারাং স্বয়ম্ভূলিঙ্গমাশ্রিতাং।
বিদ্যুৎকোটিপ্রভাং দেবীং বিচিত্র বস-
নান্বিতাং।
সুধাবিন্দুনোন্মাদাং সর্ব্বদা কারণপ্রিয়াং।"

(যোগসার।)

এইরূপ ধ্যানাদি পুঁথিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কামকলার ধ্যানাদি গুরু-মুখ-গীত। উপযুক্ত গুরুর শ্রীমুখাৎ ব্যতীত কামকলার স্থূল ও সূক্ষ্ম ধ্যান এবং প্রকৃত তত্ত্ব কোন-মতেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।

যতদূর বলা হইল, ইহাতে বুঝা যায়, কামকলার আকৃতি ত্রিবিন্দু ও ত্রিকোণাকার এবং ইহাই অনাদি পরাশক্তি কুণ্ডলিনী ত্রিপুরাসুন্দরী। প্রকৃত যোগীর ধ্যান-ধারণা ঐ কামকলার যে যোগী কামকলা-তত্ত্ব অনবগত, তিনি যোগ-পাঠশালে হাতে-কলমী লিখিতেছেন মাত্র।

কামকলার বাহ্যাকৃতি বলিলাম এবং বাহ্যরূপ বর্ণন করিলাম; কিন্তু যোগীর করণীয় ধ্যান ধারণা এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রভৃতি গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারি-লাম না; সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিবার প্রথা নাই; বরং বিশেষরূপে অতি নিষেধই আছে। তত্ত্বের আভাষ একটু দিতেছি। এ পথের পথিকগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন; তদ্ভিন্ন অন্য কেহ ইহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবেন না।

কামকলার ত্রিবিন্দুর নাম ত্রিপুর। মহাদেব ঐ ত্রিপুর বিজয় করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নাম ত্রিপুরবিজয়ী।

মানব-দেহের নাভিদেশে দশদল বিশিষ্ট মণিপুর নামক যে পদ্ম আছে, তাহার মধ্যে ত্রিকোণাকার মণ্ডল রহিয়াছে। এই চক্রের নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। সাধক যখন কুণ্ডলিনী উত্থাপিত করিয়া ষট্‌চক্রভেদ করেন, তখন প্রথমে এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়। ইহা ভেদ করিতে সাধকের বিলক্ষণ কষ্ট হয় এবং প্রথমে উদরাময় হয়। অধিকন্তু, সাধক এই সময় কৃশ হইয়া পড়েন।

হৃদয়ে দ্বাদশদল বিশিষ্ট অনাহত নামক পদ্মে যে ত্রিকোণ-মণ্ডল আছে, তাহাকে ত্রিকোণাশক্তি বলিয়া থাকে। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। প্রথমোক্ত ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া এই বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়।

ভ্রূমধ্যে দ্বিদলযুক্ত আজ্ঞাচক্রে ত্রিকোণ মণ্ডল আছে। এই ত্রিকোণ মণ্ডলের তিন কোণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। এই চক্রকে রুদ্র-গ্রন্থি বলা যায় (৫)। রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া শিরঃস্থিত সহস্রারে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত হন (৬)।

(৫) এই চক্রে জীবের মন আছে এবং ষট্‌চক্রের মধ্যে এই চক্র ভেদ করাই সুকঠিন। গুহ্য হইতে চক্র সহিত সর্ব্বশুদ্ধ নবচক্র আছে; কিন্তু প্রস্তুত প্রস্তাবে মণিপুর, অনাহত ও আজ্ঞা চক্র, এই তিন চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী উত্থাপন করিতে হয়। এই চক্রস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলে শ্বেতবর্ণ বিন্দুরূপ বীজ আছে। সেই বীজ প্রতিপাদ্য মন ও জ্ঞানশক্তিময় শিবলিঙ্গ আছেন। তিনিই জীবের সর্ব্বকর্ম্ম-প্রয়োজক। যোগশাস্ত্রে এইরূপ ব্যক্ত আছে যে,—

"আজ্ঞা নাম পদ্ম-কর্ণিকায়াং তেজোময়ং শুক্লবর্ণং ত্রিকোণ মণ্ডলমস্তি তদেকদেশে শ্বেতবর্ণং বিন্দুমাত্রং বীজমস্তি। তৎপার্শ্বে তদ্বীজ প্রতিপাদ্য মনঃ প্রবর্ত্তক মন্ত্র নিত্যাভিধানং [illegible] মণ্ডলপরদেশে [illegible] স্বচ্ছ জ্ঞানজনকং সর্ব্বকর্ম্মাণ জীবস্য প্রয়োজকং মনোস্তি। মণ্ডল মধ্যে তেজঃপুঞ্জরূপং আত্মনঃ সূক্ষ্ম জ্ঞানশক্তিময়ং শিবলিঙ্গং বর্ত্ততে।"

(৬) ইহার নাম লয়যোগ। মহর্ষি [illegible] জপ ও ধ্যানাপেক্ষা লয়যোগের শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছেন।

"জপাচ্ছতগুণং ধ্যানং, ধ্যানাচ্ছতগুণং লয়ঃ।"

লয়যোগ অনন্ত প্রকার।

"লয়যোগশ্চিত্ত [illegible] সঙ্কেতৈশ্চ প্রজায়তে।
আদিনাথেন সঙ্কেতা[illegible]কোটিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

(দত্তাত্রেয় সংহিতা)

লয়যোগ অনন্ত প্রকার। বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে যত প্রকার পদার্থ আছে, তৎসকলেতে লয়যোগ সাধনা হইতে পারে।

যোগতারাবলীতে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"স[illegible]শিবোক্তানি সপাদ লক্ষ
লয়াব[illegible]নানি বসন্তি লোকে।"

সদাশিব-কথিত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার প্রকার লয়যোগ জগতে বিদ্যমান আছে।

সকল প্রকার লয়যোগের মধ্যে মানব-দেহস্থিত নবচক্রে মনোলয় করিয়া কুণ্ডলিনী উত্থাপন-ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ ও পরমানন্দ দায়ক। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐরূপ লয়যোগ সাধন করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণ দ্বৈপায়নাদৈস্তু সাধিতো লয় সংজ্ঞিতঃ।
নবস্বেব হি চক্রেষু লয়ং কৃত্বা মহাত্মভিঃ"

কলিকালে স্বল্পায়ু-শরীরী-মানবের পক্ষে ঐ প্রকার লয়যোগ সুপ্রশস্ত এবং স্বল্পদিনের চেষ্টায় সহজে সিদ্ধ হয়। ইহা পরমার্থদায়ক ও রোগের আক্রমণভয়ে শরীরের সর্ব্বাংশে উপকারক ও হিতজনক। লয়যোগ

এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে, সাধকের আহার ও মল অতি কম হয়। তাহার কখনও রোগ বা কৃশতা হইবে না; প্রত্যুত, শরীর কান্তি ও লাবণ্যবিশিষ্ট হইবে।

উপর্যুক্ত ত্রিচক্রস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলের নাম ত্রিপুর। যে যোগী লয়যোগ দ্বারা ঐ তিন চক্র ভেদ করিতে সমর্থ হন, তিনিও মহাযোগী মহেশ্বরের ন্যায় ত্রিপুর-বিজয়ী।

আমাদের নিত্যপূজা কিম্বা নৈমিত্তিক ও কাম্য—দুর্গোৎসবাদি পূজা করিতে হইলে অর্ঘ্য স্থাপন করিবার সময় ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয়। পুঁথিতে লেখা আছে "স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডলং কৃত্বা।" তদনুসারে পুরোহিত ও পূজক একটী ত্রিকোণ করিলেন; কিন্তু স্ত্রী-দেবতার পূজার্থে ত্রিকোণ মণ্ডলের কোণ নিম্নদিকে হইবে, পুং-দেবতার পূজার্থে কোণ ঊর্দ্ধদিকে হইবে; দুঃখের বিষয়, ইহা অনেকেই করেন না, বা জানেন না দেখিয়াছি।

স্থাপনের ঐ ত্রিকোণ, দেহস্থিত তিনচক্রে পূর্ব্বকথিত ত্রিকোণ ও কামকলার ত্রিকোণ—এই তিন প্রকার ত্রিকোণের একই অর্থ; কিন্তু প্রকৃত অর্থ, উদ্দেশ্য ও গূঢ়তত্ত্ব প্রকৃত যোগী ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত।

কামকলা বা ত্রিবিন্দু-ত্রিকোণ বিষয়ে যাহা যথাসম্ভব প্রকাশযোগ্য, তাহা বলিয়া নিরস্ত হইলাম। ত্রিবিন্দু বা ত্রিকোণ-রূপিণী কামকলা অথবা ত্র্যক্ষর বা ত্রিকোণ লইয়া যোগীরা কি করেন এবং কিরূপেই বা সাধন করেন, তাহার কিছুই প্রকাশ করিবার উপায় নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত বীজবপন যেমন বৃথা ও অনর্থক পণ্ডশ্রম মাত্র; সেইরূপ উপযুক্ত অধিকারী ব্যতীত সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে এবং গুরুদেবদিগের একান্ত নিষেধ আছে।

আজ কাল যোগীর অভাব নাই। কিন্তু যাঁহারা ভাগ্যবলে যথার্থ যোগীর নিকট যোগোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা প্রকৃত যোগী, তাঁহারা সোমকলার প্রকৃততত্ত্ব সূক্ষ্মধ্যানাদি ও কামকলা লইয়া কিরূপ সাধন করিতে হয়, তৎসমস্তই অবগত আছেন। আসল কথা, কামকলা এক প্রকার লয়-যোগ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যোগ প্রধানতঃ দশ প্রকার। যোগের গুরু মহাযোগী মহেশ্বরের পঞ্চমুখ। ঐ পঞ্চমুখের নাম আম্নায়। কারণ, মহাদেবের মুখকে আম্নায় কহে। পঞ্চমুখের নাম—তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব, ঈশান। এইমুখ হইতে দশ প্রকার যোগ প্রকাশ করিয়াছেন। যে আম্নায় যে দিকে, এবং যে আম্নায় হইতে যে যে যোগ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি।

"মন্ত্রযোগাদিমন্ত্রা দেবি পূর্ব্বমুখে মহোদিতা।
প্রেমভক্তি দশাদিভিঃ দক্ষিণে প্রকটীকৃতং।
ধ্যান পূজা দান যজ্ঞ জপ হোমাত্মিকা ক্রিয়া।
ক্রিয়াযুক্তিরিয়ং দেবি পশ্চিমায় ঈরিতা।
জ্ঞানোপদেশ বিধিশ্চ কথিতশ্চ তথোত্তরে।
বিবক্ষং লয়াসং দেবি ঊর্দ্ধায়ে উদীরিতং।

সাধনকালীন মনে অব্যক্ত অভূতপূর্ব্ব পরমানন্দ উপভোগ হয়।—(ইহা পরীক্ষিত সত্য।)